বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও নিগমানন্দের শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ও ধর্মচিন্তা: একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা

মার্চ, ২০১৭

গবেষক

বিকাশ চক্রবর্ত্তী

পিএইচ. ডি. গবেষক

রেজি: নং- ১৪,

শিক্ষা বর্ষ ২০১২-১৩

দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. আনিসুজ্জামান

অধ্যাপক

দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

সুচিপত্র

ঘোষণাপত্র i

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ii-iii

অনুমোদন পত্র iv

বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও নিগমানন্দের শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ও ধর্মচিন্তা: একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন-ভূমিকা v-x

অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা xi

পৃষ্ঠা নং-

প্রথম অধ্যায়: বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও নিগমানন্দের জীবন ও কর্ম ১-৭৬

স্বামী বিবেকানন্দজীর জীবন ও কর্ম

১.১: ভূমিকা ১-২

১.২: স্বামী বিবেকানন্দের জীবনপঞ্জি ৩-৯

১.৩: কর্মজীবন ৯-১৭

১.৪: উপসংহার ১৮

শ্রী অরবিন্দ জীবন ও কর্ম ১৯

১.৫: ভূমিকা

১.৬: শ্রীঅরবিন্দের জীবন বৃত্তান্ত, বাল্য, যৌবন ও শিক্ষাকাল ১৯-২২

১.৭: সংসার ও চাকুরী জীবন (কর্মজীবন) ২২-২৮

১.৮: অধ্যাত্ম জীবন ও দর্শন ২৮-৩১

Dhaka University Institutional Repository

শ্রী নিগমানন্দের জীবন ও কর্ম ৩২

১.৯: ভূমিকা

১.১০: শ্রীনিগমানন্দের জীবন বৃত্তান্ত ৩২-৩৪

১.১১: সংসার ও চাকুরী জীবন ৩৪-৩৭

১.১২: অধ্যাত্মজীবন ৩৭-৩৯

১.১২:ক: তান্ত্রিক গুরু লাভ ৪০-৪১

১.১২:খ: সন্ন্যাস গুরু সচ্চিদানন্দ পরমহংস লাভ ৪২-৪৩

১.১২:গ: যোগীগুরু সুমেরুদাসজী লাভ ৪৪-৫৫

১.১২:ঘ: প্রেমিক গুরু লাভ ৫৫-৬৫

১.১২:ঙ: অধ্যাত্ম জীবনে জাগতিক কর্ম সম্পাদন ৬৫-৬৯

১.১২:চ: পরম সত্তা দর্শন ৬৯-৭৪

১.১২:ছ: উপসংহার ৭৫-৭৬

দ্বিতীয় অধ্যায়: বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও নিগমানন্দের শিক্ষা চিন্তা ৭৭- ১৩১

২.১: বিবেকানন্দের শিক্ষা চিন্তা ও একটি পর্যালোচনা ৭৭-৮২

২.২: শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি ৮২-৮৪

২.৩: শিক্ষা সম্পর্কে বিবেকানন্দের মতের পর্যালোচনা ৮৫-৮৮

২.৪: উপসংহার ৮৯-৯০

২.৫: শ্রী অরবিন্দের শিক্ষা ও একটি পর্যালোচনা ৯১

২.৫.১: ভূমিকা ৯১-৯৩

২.৫.২: শ্রী অরবিন্দের মতে শিক্ষা কী ? ৯৩-৯৮

২.৫.৩: অরবিন্দের মতে শিক্ষার বৈশিষ্ট্যসমূহ ৯৮-১০১

২.৫.৪: শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মতের পর্যালোচনা ১০১-১০৪

২.৫.৫: উপসংহার ১০৪-১০৬

২.৬: স্বামী নিগমানন্দের শিক্ষা ও একটি পর্যালোচনা ১০৬

২.৬.১: ভূমিকা ১০৬-১১৪

২.৬.২: শ্রীনিগমানন্দের মতে শিক্ষা কী? ১১৪-১২০

২.৬.৩: শ্রী নিগমানন্দের মতে শিক্ষার বৈশিষ্ট্যসমূহ ১২০-১২৪

২.৬.৪: শিক্ষা সম্পর্কে শ্রীনিগমানন্দের মতের পর্যালোচনা ১২৬-১২৯

২.৬.৫: উপসংহার ১২৯-১৩১

তৃতীয় অধ্যায়: বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও নিগমানন্দের সমাজ সংস্কার বিষয়ক চিন্তা: ১৩২- ১৮২

বিবেকানন্দের সমাজ সংস্কার

৩.১: ভূমিকা ১৩২-১৩৩

৩.২: সমাজ সংস্কার বলতে বিবেকানন্দ কী বোঝান? ১৩৩-১৩৬

৩.৩: সমাজ সংস্কার সম্পর্কে বিবেকানন্দের মতের পর্যালোচনা ১৩৬-১৩৮

৩.৪: উপসংহার ১৩৯-১৪০

৩.৫: শ্রী অরবিন্দের সমাজ সংস্কার ও একটি পর্যালোচনা ১৪০

৩.৫.১: ভূমিকা ১৪০-১৪৩

৩.৫.২: সমাজ সংস্কার বলতে শ্রীঅরবিন্দ কী বুঝান? ১৪৩-১৪৫

৩.৫.৩: অরবিন্দের মতে সমাজ সংস্কারের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী? ১৪৫-১৪৮

Dhaka University Institutional Repository

৩.৫.৪: সমাজ সংস্কার সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের মতবাদের পর্যালোচনা ১৪৮-১৫২

৩.৫.৫: উপসংহার ১৫২-১৫৪

৩.৬: স্বামী নিগমানন্দের সমাজ সংস্কার ও একটি পর্যালোচনা ১৫৪

৩.৬.১: ভূমিকা ১৫৪-১৬৩

৩.৬.২: সমাজ সংস্কার বলতে নিগমানন্দ কী বুঝান? ১৬৩-১৭১

৩.৬.৩: নিগমানন্দের মতে সমাজ সংস্কারের প্রধান বৈশিষ্ট্য ১৭১-১৭৬

৩.৬.৪: সমাজ সংস্কার সম্পর্কে স্বামী নিগমানন্দের মতের পর্যালোচনা ১৭৬-১৮০

৩.৬.৫: উপসংহার ১৮০-১৮২

চতুর্থ অধ্যায়: বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও নিগমানন্দের ধর্ম বিষয়ক চিন্তা: ১৮৩-২৩৮

৪.১: বিবেকানন্দের ধর্ম-চিন্তা ১৮৩

৪.১.১: ভূমিকা ১৮৩

৪.১.২: ধর্ম বলতে বিবেকানন্দ কী বোঝান? ১৮৩-১৮৬

৪.১.৩: বিবেকানন্দের মতে ধর্মের বৈশিষ্ট্যসমূহ ১৮৬-১৯০

৪.১.৪: ধর্মসম্পর্কে বিবেকানন্দের মতের পর্যালোচনা ১৯০-১৯২

৪.১.৫: উপসংহার ১৯৩-১৯৬

৪.২: শ্রী অরবিন্দের ধর্মচিন্তা ও একটি পর্যালোচনা ১৯৬

৪.২.১: ভূমিকা ১৯৬-২০২

৪.২.২: ধর্ম বলতে শ্রী অরবিন্দ কী বোঝান? ২০৩-২০৭

৪.২.৩: ধর্ম সম্পর্কে শ্রী অরবিন্দের ব্যাখ্যা অথবা তাঁর মতের প্রধান বৈশিষ্ট্য ২০৮-২১১

Dhaka University Institutional Repository

৪.২.৪: অরবিন্দের ধর্ম সম্পর্কিয় মতের পর্যালোচনা	২১১-২১৬
৪.২.৫: উপসংহার	২১৭-২২০
৪.৩: স্বামী নিগমানন্দের ধর্ম চিন্তা ও একটি পর্যালোচনা	২২০
৪.৩.১: ভূমিকা	২২০-২২৬
৪.৩.২: ধর্ম বলতে নিগমানন্দ কী বোঝান ?	২২৬-২৩০
৪.৩.৩: ধর্ম সম্পর্কে শ্রী নিগমান্দের ব্যাখ্যা অথবা তাঁর মতে ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য	২৩১-২৩৪
৪.৩.৪: শ্রী নিগমানন্দের মতের পর্যালোচনা	২৩৪-২৩৬
৪.৩.৫: উপসংহার	২৩৭-২৩৮
পঞ্চম অধ্যায়: বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও নিগমানন্দের শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ও ধর্ম মতের তুলনামূলক আলোচনা	২৩৯- ২৮৪
৫.১: বিবেকানন্দের শিক্ষা	২৩৯-২৪৩
৫.২: শ্রী অরবিন্দের শিক্ষা	২৪৩-২৪৭
৫.৩: শারীরিক শিক্ষা, প্রাণের শিক্ষা, মানসিক শিক্ষা, অন্তরাত্মিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা	২৪৭-২৫১
৫.৪: শ্রী নিগমানন্দের শিক্ষা	২৫১-২৫৬
৫.৫: তুলনামূলক আলোচনা	২৫৬
৫.৬: বিবেকানন্দজীর তুলনামূলক শিক্ষার আলোচনা	২৫৬-২৫৯
৫.৭: অরবিন্দজীর তুলনামূলক শিক্ষার আলোচনা	২৫৯-২৬২
৫.৮: নিগমানন্দজীর তুলনামূলক শিক্ষার আলোচনা	২৬২-২৬৫
৫.৯: স্বামী বিবেকানন্দজীর সমাজ সংস্কার	২৬৬-২৬৯
৫.১০: শ্রী অরবিন্দের সমাজ সংস্কার	২৬৯-২৭১

৫.১১: শ্রী নিগমানন্দের সমাজ সংস্কার ২৭১-২৭৩

৫.১২: বিবেকানন্দজীর তুলনামূলক সমাজ সংস্কার ২৭৩-২৭৫

৫.১৩: অরবিন্দজীর তুলনামূলক সমাজ সংস্কার ২৭৫-২৭৬

৫.১৪: শ্রীনিগমানন্দজীর তুলনামূলক সমাজ সংস্কার ২৭৬-২৭৮

৫.১৫: স্বামী বিবেকানন্দজীর ধর্মচিন্তার তুলনামূলক আলোচনা ২৭৮-২৭৯

৫.১৬: শ্রী অরবিন্দের ধর্মচিন্তার তুলনামূলক আলোচনা ২৭৯-২৮১

৫.১৭: শ্রী নিগমানন্দের ধর্মচিন্তার তুলনামূলক আলোচনা ২৮১-২৮৩

৫.১৮: উপসংহার ২৮৪

ষষ্ঠ অধ্যায়: বর্তমান সময়ে বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও নিগমানন্দের শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ও ধর্মচিন্তার গ্রহণযোগ্যতা ২৮৫-৩৩০

৬.১.১: ভূমিকা ২৮৫

৬.১.২: বর্তমান সময়ে স্বামী বিবেকানন্দজীর শিক্ষাচিন্তার গ্রহণযোগ্যতা ২৮৬-২৯১

৬.১.৩: বর্তমান সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ সংস্কার চিন্তার গ্রহণযোগ্যতা ২৯১-২৯৭

৬.১.৪: বর্তমান সময়ে স্বামী বিবেকানন্দজীর ধর্মচিন্তার গ্রহণযোগ্যতা ২৯৮-৩০৪

৬.২.১: বর্তমান সময়ে শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষাচিন্তার গ্রহণযোগ্যতা ৩০৪-৩১০

৬.২.২: বর্তমান সময়ে শ্রীঅরবিন্দের সমাজ সংস্কার চিন্তার গ্রহণযোগ্যতা ৩১০-৩১২

৬.২.৩: বর্তমান সময়ে শ্রীঅরবিন্দের ধর্মচিন্তার গ্রহণযোগ্যতা ৩১২-৩১৬

৬.৩.১: বর্তমান সময়ে নিগমানন্দের শিক্ষা চিন্তার গ্রহণযোগ্যতা ৩১৭-৩১৯

৬.৩.২: বর্তমান সময়ে নিগমানন্দের সমাজসংস্কার চিন্তার গ্রহণযোগ্যতা ৩১৯-৩২

৬.৩.৩: বর্তমান সময়ে নিগমানন্দের ধর্মচিন্তার গ্রহণযোগ্যতা ৩২৫-৩২৮

৬.৩.৪: উপসংহার ৩২৯-৩৩০

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি ৩৩১-৩৩৪

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব গবেষণার ফসল। এ সাথে এও প্রত্যয়ন করছি যে, এ অভিসন্দর্ভটি বা এর অংশবিশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে পিএইচ.ডি. বা অন্য কোন উচ্চতর ডিগ্রীর জন্য জমা দেওয়া হয়নি।

অত্র অভিসন্দর্ভে যেসব গ্রন্থ ও জার্নাল থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে সেসবের উল্লেখ যথাস্থানে গ্রন্থপঞ্জিতে দেওয়া হয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. আনিসুজ্জামান

অধ্যাপক

দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

বিকাশ চক্রবর্ত্তী

পিএইচ. ডি. গবেষক

দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অনেক পরিশ্রম করে 'বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও নিগমানন্দের শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ও ধর্মচিন্তা: একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন' নামক গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। এটি যেমন গৌরবের তেমনি আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের। তবে আমার এই গৌরব এবং আনন্দের পিছনে অনেকের অবদান রয়েছে।

আমার লিখিত এই গবেষণা পত্রের পিছনে যাঁর অবদান সবথেকে বেশি, তিনি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে কর্মরত আমার পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান। আজকের এই আনন্দের দিনে তাঁর প্রতি রইল আমার শতকোটি প্রণাম। তিনি এই গবেষণা পত্রটির জন্য যে শ্রম দিয়েছেন এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে যেভাবে আমার গবেষণা কর্মটিকে সফল করতে সহায়তা করেছেন সেজন্য আমি তাঁর নিকট আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব।

যাঁর সাহায্য, সহযোগিতা ও উপদেশ ছাড়া আমার গবেষণা কর্মটি সফল হত না বলে আমি মনে করি, তিনি হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতৃদেব ডাঃ নন্দ দুলাল চক্রবর্ত্তী। আমার পিতার কাছে ঋণ স্বীকার করে তাঁকে আমি ছোট করতে চাই না, শুধু বলতে চাই 'পিতা' এমনি করে তুমি আমাকে হাত ধরে সত্যধামে নিয়ে চল, এই তোমার কাছে আমার একমাত্র চাওয়া।

আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ আমার 'মা' শ্রী মতি রেণু চক্রবর্ত্তী। আমার এই গবেষণা কর্মে তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ, আদর ও ভালবাসার ছোঁয়া রয়েছে। তাঁর অনুপ্রেরণা আমার গবেষণা কর্মের অন্যতম পাথেয় ছিল।

আমার সহধর্মিনী গীতা রাণী চক্রবর্ত্তী সংসারের অনেক কাজ তার আপন কাঁধে নিয়ে আমাকে আমার গবেষণা কর্মের জন্য সময় বের করে দিত, তাছাড়া অফুরন্ত অনুপ্রেরণা তো ছিলই, সেজন্য আমি তার কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

তাছাড়া আমার ছোট বোন বকুল চক্রবর্ত্তী ও তার স্বামী শ্রীমান কৃষ্ণেন্দু দেব এ গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে। তাদের কাছে আমি চিরটা কাল কৃতজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

আমার ছোট ভাই বরদা ব্রহ্মচারী গবেষণা পত্রের প্রুফ সংশোধনে ও কম্পিউটার কম্পোজ পরিচালনা করে আমার কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছে, এজন্য আমি তার কাছেও কৃতজ্ঞ ।

আমার গবেষণা পত্রটি লিখতে গিয়ে যেসকল পুস্তক ও জার্নালের সহায়তা নিতে হয়েছে সে সব পুস্তক ও জার্নালের লেখকদের আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি ।

বিনয়াবনত

বিকাশ চক্রবর্ত্তী

পিএইচ. ডি. গবেষক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

কলা অনুষদ

অনুমোদন পত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, **বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও নিগমানন্দের শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ও ধর্ম চিন্তাঃ একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন**, শিরোনামে রচিত যে অভিসন্দর্ভটি বিকাশ চক্রবর্ত্তী, রেজিঃ নং-১৪, শিক্ষাবর্ষঃ ২০১২-২০১৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেছেন, সেটি আমার তত্ত্বাবধানে করা একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। এ অভিসন্দর্ভে প্রণীত বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তসমুহ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ইতোমধ্যে কোন ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, গবেষণাকর্ম বা এ জাতীয় কোন কাজে ব্যবহার করা হয়নি।

স্থানঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

তারিখ- মার্চ, ২০১৭ইং

(প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামান)

তত্ত্বাবধায়ক

দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও নিগমানন্দের শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ও ধর্মচিন্তাঃ

একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন

ভূমিকা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের মধ্যে আবির্ভূত তিন লোকোত্তর মহামনীষীর বিষয়ে আলোচনার প্রারম্ভে আমি স্মরণ করছি রামচরিতের ভবভূতির প্রশস্তি বাক্যটি ।

'ইদং কবিভ্যঃ পূর্বেভ্যো নমোবাকং প্রশাস্মহে ।

বিন্দেম দেবতাং বাচমমৃতামাত্মনঃ কলাম্' ।।[১]

আমরা ভারত চেতনার শ্রেষ্ঠ ফসল এ ত্রয়ীর (বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও নিগমানন্দ) মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি। এঁরা শুধু ভারত পথিক নন, বিশ্ব পথিক, সর্বজন সাক্ষী। তিন জনই অন্তর চেতনার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন, শুভকর্মকে আহ্বান করেছেন, প্রেম-ভক্তি সেবাকে জীবনের নৈবেদ্য করে শাশ্বত মানবতার জয়গান করেছেন, অর্ঘ দিয়েছেন পরম ভাগবতকে ।

আজ আমরা একটি সঙ্কটের যুগে বাস করছি। সেই সঙ্কট শুধু বাইরের নয়, ভিতরেরও। ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে নানা প্রশ্ন ,নানা সমস্যা। শুধু অন্ন চিন্তা নয়, ক্ষমতার অধিকারীদের প্রচন্ড হুংকার, ক্ষুধিতের বিড়ম্বনা, অতৃপ্তের প্রবঞ্চনা বোধ, বাণী বিলাসীর কন্ঠে নানা ভর্ৎসনা। এ রকম আরও অসংখ্য সঙ্কট জগতে বিরাজমান। সঙ্কট প্রতি যুগেই আসে, সমস্যার সমাধানও হয় জোড়াতালি দিয়ে, তবু নিত্যকালের সত্য মানুষের শেষ প্রশ্ন থেকে যায়ই। দেশ থেকে দেশান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে, সৃষ্টির প্রারম্ভ দিবস থেকে মানুষের মনে, ধ্যানে, জ্ঞানে , জাগরণে ও তন্দ্রায় প্রশ্ন জেগেছে চরম প্রার্থনা নিয়ে, পরম আকূতি দিয়ে ভয়চকিত দৃষ্টিতে- কে তুমি, কী তুমি , কোন পথ গ্রাহ্য, কোন পথ বাহ্য ? তবুও চলছে চিরন্তনীর রথ পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা ভেদ করে এবং নানা বিচ্ছিন্নতাবোধ সত্ত্বেও বদলাচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাস, প্রতিদিনই উল্টে যাচ্ছে পৃথিবীর ভারসাম্য ।

১। কবি কালিদাস রায়, **উত্তররাম চরিতম্**, কলিকাতাঃ আনন্দ প্রকাশনী, ১৯৬৪, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ., ২.

ইতিহাসের দিক থেকে বলা যায় যে, আমরা শুধু দেবদেবীরই পূজা করছি না, তন্ত্রের মধ্যে মহাকালকে শিবে পরিণত করেছি– জীবাত্মা, পরমাত্মা, মায়াবাদ, পুনর্জন্ম, চর্তুবর্ণ এগুলিতেই যে সীমাবদ্ধ আছি তা যথেষ্ট নয়, বরং বেদকেও অপৌরুষেয় বলছি। ধর্ম শাস্ত্রে স্মৃতি শ্রুতির অনুশাসনও গ্রহণ করছি। অর্থাৎ মনে হবে যেন আমরা নানা বিভেদের মধ্য দিয়েই চলছি, আসলে কিন্তু তা নয়, গভীর দৃষ্টিতে দেখলে বুঝা যাবে– সব অনৈক্যের মধ্যেও রয়েছে এক গভীর ঐক্যবোধ। দক্ষিণের কবি সুপ্রক্ষণ্যভারতী বলেছিলেন, ভারত মাতার তেত্রিশ কোটি মুখ, তিনি আঠারোটি ভাষায় কথা বলেন, কিন্তু তাঁর মন একটি। সে কথা শুধু আজই সত্য নয়, যুগযুগ ধরে শাশ্বত মনকে খুঁজতেই ছুটছেন ভারতের কত সাধক, শিল্পী, যোগী, ত্যাগী, জ্ঞানী, গুণীর দল। প্রত্যেকে তাঁরা যা পেয়েছিলেন তা শুধু বাইরের আলোকে বর্হিদৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁরা পেয়েছিলেন, একান্ত নিভৃতে নিজের অন্তরালোকের অন্তর্দৃষ্টিতেও। এখানেই যে শেষ তাও নয়, অন্তরের অমৃত লোকেও তাই কত শত বিচিত্রতা, শত বিভেদ, শত অনৈক্য ও বিবাদের মধ্যেও ফুটে উঠেছে, গভীর অনালোকের মাঝেও একং সত্যের দিব্য আলোক উজ্জ্বল এক অনিবর্চনীয় ঐক্য সুর। এ যেন এক কুল ভাঙে আরেক কুল গড়ে- একটি ধারাবহিকতার মধ্যে তাঁর বৈচিত্র্যতম সৃষ্টি প্রবাহমালা। সেই সৃজনশীল বিবর্তনের মাঝেই গড়ে উঠেছে- ইতিহাসের সত্যিকার চাবিকাঠি। এরই মধ্য দিয়ে চিরন্তনীর রথযাত্রা। একদিকে আশা-আকাঙ্খা, কামনা-বাসনা, তিক্ততা, প্রলুব্ধতা, ভয়-ভালবাসা, মোহ আর একদিকে আনন্দের বিধুত চেতনা, অপরিমেহ মন। একেই বিবেকানন্দ বলেছেন মায়াতীতের খেলা। নিগমানন্দ বলেছেন জীবভাব ও বিশ্বভাব, অরবিন্দ বলেছেন, জড়-চেতনের মধ্যে প্রাণের আভাস যা পূর্ণত্ব পায় মানসাতীতের উপলব্ধিতে। জীব আছে আপন উপস্থিতিকে আঁকড়ে, জীব চলছে আশু প্রয়োজনের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করে। মানুষের মধ্যে সেই জীবকে পেরিয়ে গেছে সেই সত্তা, সে আছে আদর্শকে নিয়ে। এ আদর্শ অন্নের মত নয়, বস্ত্রের মতও নয়, এ আদর্শ একটি আন্তরিক আহ্বান, একটা নিগূঢ় নির্দেশ। কোন দিকে ? না– যেদিকে সে বিচ্ছিন্ন, যে দিকে তাঁর পূর্ণতার স্বভাব– সে দিকে সে যেন ব্যক্তিগত সীমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। একেই বলা যেতে পারে বিশ্ব মানবতা। এটি মানুষকে সংযত ও সংহত হতে শেখায় একটি অখন্ড জীবন প্রত্যয়ে যা জীবনবাদ নয়, জীবন বেদও নয়, জীবনবোধ

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ উপলব্ধিতে জ্ঞাত সত্য। বিবেকানন্দের ভাষায়– "Never forget the glory of human nature, we are the greatest God that ever was or ever will be Christs and Buddhas are but waves on the boundless ocean...." ২

বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও নিগমানন্দ এই তিন মহামানবেরই আদর্শগত দৃষ্টিকোণ এক, আদর্শগত দিক থেকে তিন জনই ব্রক্ষবাদী, নানা দোষ ত্রুটি, অভাব-অভিযোগ-অনটন , উত্থান-পতন, অর্থনৈতিক দুর্দশা, দারিদ্র্যের মধ্যেও তিন জনের ক্ষেত্রে যে শাশ্বত বাণীটি উদ্দীপ্ত ভাস্করের মত কিরণ বিকিরণ করছে– তাহল "তুমিই আমি", (তত্ত্বমসি)। এই ত্রয়ীর সমস্ত ধর্ম ও দর্শন চিন্তা বেদান্তকে ঘিরে। বলতে গেলে বলা যায় বেদান্তই এই ত্রয়ীর এই চিন্তা-ভাবনার মূল উপজীব্য। এই প্রসঙ্গে তিন মহামানবের তিনটি উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিবেকানন্দের মতেঃ

> প্রত্যেক মানুষকে বেদান্ত এই শিক্ষাই দেয় যে, সে এই বিশ্বসত্তার সহিত এক ও অভিন্ন। তাই যত আত্মা আছে সব তোমারই আত্মা। যত জীবদেহ আছে সব তোমারই দেহ, কাহাকেও আঘাত করার অর্থ নিজেকেই আঘাত করা, কাহাকেও ভালবাসার অর্থ নিজেকেই ভালবাসা। তোমার অন্তর হতে ঘৃণারাশি বাইরে নিক্ষিপ্ত হওয়া মাত্র অপর কাহাকেও তাহা আঘাত করুক না কেন, তোমাকেই আঘাত করিবে নিশ্চয়। আবার তোমার অন্তর হতে প্রেম নির্গত হলে প্রতিদানে তুমি প্রেমই পাবে। কারণ আমি-ই বিশ্ব। সমগ্র বিশ্ব আমারই দেহ। আমি অসীম, কিন্তু সম্প্রতি আমার সে অনুভূতি নাই, কিন্তু আমি সেই অসীমতার উপলব্ধির জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছি, এবং যখন আমাতে সেই অসীমতার পূর্ণ চেতনা জাগরিত হবে, তখন আমার পূর্ণতা প্রাপ্তিও ঘটিবে।৩

২। Apurbananda Moharaj **The Complete Works of Swami Vivekananda**, Calcutta: Advaita Ashrama, 6th edetion 1964, vol vii, P.,78

৩। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, **চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ**, কলিকাতাঃ রামকৃষ্ণ মিশন ইষ্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৫, পৃ., ১৯৫

বিবেকানন্দের মত অরবিন্দও বলে উঠলেন, "ঈশাবাশ্যমিদং সর্বম্ আকাশে,বাতাসে, জলে, স্থলে সংসারে-সমাজে, রাষ্ট্রে যা কিছু ঘটছে সবই সেই মহাশক্তির খেলা। বিজ্ঞানীর বিজ্ঞান মন্দিরও তপস্বীর যজ্ঞশালা। আজকের বৈজ্ঞানিক, তাত্ত্বিক রসবেত্তা গুণীও অন্নময় ভূমি থেকে দেখছেন সেই প্রাণময়ী প্রকৃতিকে এই তো বিশ্বরূপ দর্শনের প্রথম ধাপ।"[৪]

বেদান্তের সমর্থনে শ্রীনিগমানন্দের মুখনিঃসৃত বাণী নিম্নরূপঃ

> তুমি ব্রহ্মস্বরূপ, আনন্দস্বরূপত্ব তোমার স্বভাব। তোমার দুঃখ- কষ্ট হবে কেন? এটাই তো ভুল। তুমি যে নিজেই আনন্দের উৎস। আত্মার বিকাশ কর, জানিতে পারিবে জগতের সকল আনন্দ সেই উৎস হতেই উৎসারিত। জগতের সমস্ত সুখ তখন হেয় হয়ে যাবে, ইন্দ্রত্ব তোমার নিকট তুচ্ছ হবে, বাসনা কামনা নিবৃত্ত হবে।[৫]

হেস্টিং সাহেব থেকে শুরু করে ম্যাক্সমূলার পর্যন্ত এ তিন সত্যিকার মহাত্মারাও এ কথা বুঝতে আরম্ভ করলেন, শুধু এর আধ্যাত্মিকতার প্রতিবেদনে নয়, সাংস্কৃতিক মূল্যে নয়, সামাজিক প্রতিক্রিয়ায় নয় বরং সর্বস্ত রের উন্নয়নে। সবই যে মায়ের মন্দির, এই মায়ের মন্দিরের জন্য বিবেকানন্দ দিলেন উদ্দীপনা ও সংগঠন, নিগমানন্দ আনলেন, জ্ঞান, তন্ত্র, যোগ ও প্রেমের রূপ, রস ও ঐশ্বর্য্যের বর্ণ সমারোহ। শ্রী অরবিন্দ বসলেন ধ্যানে, যাতে উর্ধ্বতন লোকের আলোগ্রহীতারা আঁধারে নীচে নামতে পারে– উত্তরণ, অবতরণের মাঝে স্থিতিবান ক্রিয়াশীল হতে পারে। ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রই হল ' অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্' সেই অগ্নিকে জ্বলিতে দিতে হবে প্রাণ সমিধে– তবেই আলোক বন্দনা মন্ত্র জলে মৃত্তিকার মর্ত্যপটে চিরসুন্দরের প্রাণমূর্তি প্রকাশ পাবে ঋষির অভীপ্সায়, সাধকের তপস্যায় সেবার দীপ্তিতে। জীবনের অধীশ্বর তখনই নামাতে পারবেন আলোকের ঐ ঝরণা ধারা থেকে:

৪। Vobaniprosad, **Sri Aurobinda**, Pandichary: Aurobinda Ashrama, 3rd edition, 1972, P.,310
৫। স্বামী নিত্যানন্দ সরস্বতী, **নিগমবাণী**, কলিকাতাঃ হালিশহর আসামবঙ্গীয় সারস্বত মঠ, ৫ম সংস্করন, ১৩৯২ সাল, পৃ.,২১

Dhaka University Institutional Repository

ধুলির আসনে বলি ভূধারে দেখেছি ধ্যান চোখে

আলোকের অতীত আলোকে ।

অণু হতে অনীয়ান মহৎ হতে মহিয়ান

ইন্দ্রিয়ের পারে তারে দেখেছি সন্ধান ।...

শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ যিনি , যতবার ভুলি কেন নাম ,

তবু তারে করেছি প্রণাম ।[৬]

রবীন্দ্রনাথের এই পূর্ণযোগের কথাই অরবিন্দের সাবিত্রীর ব্রত কথা। তাঁর মতে "প্রত্যেক মানুষ সেই পরিপূর্ণতার জন্যে জেগে থাকবে A divine life in a divine body."[৭]

নিগমানন্দও মনে করতেন নিজেকে সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে বেঁধে রেখে পরের কাজ করা যায় না। যার নিজের কোন গন্ডি নেই সে-ই যথার্থভাবে পরিবারের-সমাজের-দেশের ও দশের সেবা করতে পারে। বিবেকানন্দেরও কথা তা-ই, যা বড় তা-ই ধর্ম, যা বৃহৎ তাই আদর্শ, যা মহৎ তা-ই স্বপ্ন। সেই জন্য চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ সম্পন্ন হয় না বলে তিনি মনে করেন। বক্তৃতায় নয়, কুটনীতির কৌশলে নয়, রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে নয়, অর্থনীতির– প্রাচুর্যে নয়, এ সত্যে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে চাই শিক্ষা, প্রেম, ত্যাগ ও সারা জীবনের সমগ্রতার সাধনা।

এই লক্ষ্যে আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে বলতে চাই, বিবেকানন্দ অরবিন্দ ও নিগমানন্দের শিক্ষা সমাজ সংস্কার ও ধর্মচিন্তা বিষয়ক এই যে একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন বা আলোচনা তা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে – নানা মত নানা পথ আমাদের প্রদর্শন করালেও আমরা একটি সমীকরণে উপস্থিত হতে পারি যে, এই তিন মহাত্মাই এক চরম ও পরম সত্যকে স্বীকার করেছেন। বেদ ও বেদান্তকে কেউ উপেক্ষার চোখে দেখেন নি।

৬। রবীন্দ্র রচনাবলী, রবীন্দ্রভারতী কলকাতা: পঞ্চদশ খন্ড, ৭ম সংস্করণ, ১৯৭৬, পৃ.,৪৭৭
৭। A.B Purani, **The Life of Sri Aurobinda**, Pundichary: Sri Aruobinda Ashrama 1964, P.,75

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনায় তুলনা থাকবেই এবং আমরা তুলনা করবই। কিন্তু ভাবলোকে ভারত চেতনার এই ত্রিমূর্তি, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও নিগমানন্দ এ শিক্ষাই দিয়েছেন যে, কর্মে, জ্ঞানে, ভক্তিতে, ত্রিকায়ে, ত্রিলোকে, ত্রিধারায় সেই পরমই পরিট। অতএব বাইরে আমরা পর, অন্তরে আমরা একান্ত আপন। 'ভাবাদ্বৈতং সদা কুর্যাৎ ক্রিয়াদ্বৈতং ন কহিশ্চিৎ' বিখ্যাত দার্শনিক জগৎগুরু শংকর এই অভিমতই প্রদর্শন করে গেছেন। ভাবে ও কার্যে মানব জীবনে পার্থক্য থাকবেই। জীব মাত্রই শিব হতে পারে কিন্তু জীবে ও শিবে– কার্যে পার্থক্য থাকবেই।

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা

আমি ভূমিকাতে বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও নিগমানন্দের চিন্তা চেতনাকে তুলে ধরে তাঁদের সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা প্রদান করতে চেষ্টা করেছি। এখন আমি আমার গবেষণা পর্বের মূলে প্রবেশ করব। আমি আমার এই গবেষণা পত্রটি মোট ছয়টি (৬) ভাগে ভাগ করেছি, এবং উক্ত তিনজন মহামানবের উল্লেখিত বিষয়গুলি এখন পর্যায়ক্রমে তুলে ধরব। নিম্নে উক্ত ৬টি অধ্যায় তুলে ধরা হলঃ

প্রথম অধ্যায়ঃ এ অধ্যায়ে বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, ও নিগমানন্দের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ এ অধ্যায়ে বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও নিগমানন্দের শিক্ষা বিষয়ক চিন্তা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ এ অধ্যায়ে বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও নিগমানন্দের সমাজ সংস্কার বিষয়ক চিন্তানিয়ে আলোচনা করা হবে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ এ অধ্যায়ে তিন মহামানবের ধর্মীয় চিন্তা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ এ অধ্যায়ে উক্ত তিন মহামানবের শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার ও ধর্মমতের তুলনামূলক আলোচনা করা হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ এ অধ্যায়ে উক্ত তিন মহানবের শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার ও ধর্মমতের আলোচনা শেষে বর্তমান সময়ে তাঁদের এ সব চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা বিচার করা হবে।

আমার গবেষণা পত্রটি মূলতঃ এ ছয়টি অধ্যায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এখন আমি ক্রমান্বয়ে আলোচনার মাধ্যমে আমার এই গবেষণা পত্রটির পূর্ণাঙ্গতা দানে সচেষ্ট হবো।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও নিগমানন্দের জীবন ও কর্ম

স্বামী বিবেকানন্দজীর জীবন ও কর্ম

১.১: ভূমিকা

স্বামী বিবেকানন্দজী ভারত উপমহাদেশের একটি অমূল্য রত্ন। এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষটি এই উপমহাদেশে বিশেষ করে ভারত ভূমিতে না জন্মালে আজ হয়তো সনাতন ধর্মের মূল অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেত কি না সন্দেহ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যত ব্যক্তিগত, জাতিগত, সমাজগত, ধর্মগত, প্রথাগত, মত পথের কুসংস্কার, বৈদেশিক ধর্মের আধিপত্য, রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ইত্যাদি যত প্রকার অপসংস্কৃতি এই সনাতন ধর্মের মূল গ্রন্থ বেদ উপনিষদের উপর যেভাবে অপব্যাখ্যা, অপপ্রচার, শত শত সম্প্রদায়গত মত পথের অপসংস্কৃতি ও কুপ্রভাব এই পৃথিবী বিখ্যাত অতি প্রাচীন বৈদিক সনাতন ধর্ম যা ভারতের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের হাজার হাজার বৎসরের প্রমাণিত উপলব্ধিগত এ চিন্তা-চেতনাগত দর্শনকে উপেক্ষা করে ভারতধর্মকে যেভাবে কলুষিত করা হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দজীর মত বিশ্বনন্দিত উদ্ধারকর্তা, আদর্শদাতা, মহামূল্যপ্রাণ ও মহীয়ান ব্যক্তিত্বটির জন্যই শুধুমাত্র আজও আমরা পৃথিবীশ্রেষ্ঠ বেদান্তধর্মের উজ্জ্বল মহিমা সমগ্রপৃথিবীতে সনাতন হিন্দুধর্মের গৌরব রূপে প্রচার ও প্রসার করে এই হিন্দু জাতিটিকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি। সর্বাগ্রে এজন্য আমরা অবনত মস্তকে তাঁর অতুল রাতুল চরণ কমলে আভূমিনত প্রণতি জ্ঞাপন করছি। স্মরণ করছি– আবার তাঁর শুভাগমন হোক।

স্বামী বিবেকানন্দজী কি এবং কে, এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্যের চেয়ে আমার মনে হয়– যে ত্রিকালজ্ঞ মানুষটি যুগাবতার রূপে, অনন্তভাবময় রূপে, সর্বজাতির উদ্ধারকর্তা অবতারগুরু রূপে, সর্বজাতি ধর্মের অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতিভূরূপে– এই আধুনিক বিশ্বে যাঁর ভিতর একফোটা বিদ্যার আলো নেই, সে নাকি

Dhaka University Institutional Repository

এই কঠিন যুক্তি তর্কের যুগেও দাবি করে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলতে একজন আছেন, যাঁর সাথে তাঁর নাকি সদা-সর্বদা দেখা হয়, কথা হয়, রাগ অনুরাগ সহযোগে সর্বক্ষণ তাঁর সাথে জড়িত থাকে– মা ও তার ছেলের বাৎসল্যভাবের মত তাঁরা সর্বদা একে অপরে সম্পৃক্ত থাকেন, একে অপরে নাওয়া-খাওয়া পর্যন্ত চলে। একদা প্রমাণ স্বরূপ সমস্ত সাধুগুরু ও জ্বলন্ত শিবশক্তিস্বরূপ সাক্ষাত ভৈরবী মাতার দিব্যদর্শনেও পর্যন্ত– ফুল ফুটলে যেমন তার সৌরভ আপন মহিমায় আপনি প্রকাশ পায়– তিনিও ঠিক সেইভাবে তাঁর আপন মহিমায় ফুটে ওঠে, বিকশিত হয়ে ওঠেন তাঁরই মানসপটে– আপন সৌরভে অবতার পুরুষ রূপে– অতীত কালের রাম ও কৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহরূপে। তিনি আর অন্য কেউ নন সর্বজনস্বীকৃত ও প্রমাণিত – স্বয়ং রাণী রাসমনীর মন্দিরের কুল পুরোহিত "ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব"। আমরা এবার তাঁর বাণী থেকেই তুলে ধরছি– স্বামী বিবেকানন্দজী কি এবং কে? শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন:

> এমন আধার এ যুগে জগতে আর কখনও আসেনি। কখনও বলতেন, নরেন পুরুষ– তিনি প্রকৃতি– নরেন তাঁর শ্বশুর ঘর। আবার কখনও বলতেন, অখন্ডের থাক। কখনও বলতেন, অখন্ডের ঘরে – যেখানে দেব- দেবী সকলে ব্রহ্ম হতে নিজের অস্তিত্ব পৃথক রাখতে পারেন নি, লীন হয়ে গেছেন– সাতজন ঋষিকে আপন আপন অস্তিত্ব পৃথক রেখে ধ্যানে নিমগ্ন দেখেছি ; নরেন তাঁদেরই একজনের অংশাবতার। কখনও বলতেন, জগৎপালক নারায়ণ নর ও নারায়ণ নামে যে দুই ঋষিমূর্তি পরিগ্রহ করে জগতের কল্যাণের জন্য তপস্যা করেছিলেন, নরেন সেই নর-ঋষির অবতার। কখনও বলতেন, শুকদেবের মত মায়া স্পর্শ করতে পারেনি। কখনও বলতেন, 'নরেন আমি, আমি নরেন'।[১]

আশাকরি এবার আমরা বুঝেছি, কেন আমি তাঁকে ক্ষণজন্মা পুরুষরূপে আখ্যায়িত করেছি।

১। স্বামী সত্যব্রতানন্দ, **রামকৃষ্ণ মিশন, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ**, কলিকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৪ পৃ., ৪

১.২: স্বামী বিবেকানন্দের জীবনপঞ্জি

জন্ম: ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি, ২৯ শে পৌষ ১২৬৯ বঙ্গাব্দ, সোমবার সকাল ৬ টা ৩০ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড। ৩, গৌরমোহন মুখার্জী লেন, কলকাতার শিমুলিয়া পল্লীর সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে। বাল্য নাম নরেন্দ্র নাথ দত্ত (বিলে)। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত, মাতা শ্রীমতি ভুবনেশ্বরী দেবী।

বাল্যকাল: বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন অতীব চঞ্চল, দুর্দান্ত, দুষ্ট, নেতৃত্বদানকারী, বীর, তেজস্বী, প্রখর বুদ্ধিমান, আবার অতি ধীর স্থির, ধ্যানী, ছুঁৎমার্গ বিদ্রোহী, যুক্তিবাদী, বিশ্লেষণধর্মী, অসীম পিতৃ-মাতৃ ভক্তি, কর্তব্যপরায়ণ, পরোপকারী ও দয়ালু।

শিক্ষাকাল: ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতার মেট্রোপলিটন স্কুলে প্রথম পাঠ শুরু করেন। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মেট্রোপলিটন স্কুল হতে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে জেনারেল অ্যাসেমব্লিস্ ইনষ্টিটিউশান (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) থেকে এফ, এ,পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। উক্ত ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দেই অধ্যাপক হেষ্টির নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি বিষয়ে সংবাদ লাভ করেন। উক্ত সালেই নভেম্বর মাসে কলিকাতার সুরেন মিত্রের বাসায় তাঁর প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন লাভ হয়। দ্বিতীয় দর্শন লাভ হয়– ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসের দক্ষিণেশ্বরে। ১৮৮৪ খিষ্টাব্দে জেনারেল অ্যাসেমব্লিস্ ইনষ্টিটিউশন (বর্তমান স্কটিস চার্চ কলেজ) থেকে সুনামের সাথে বি, এ পরীক্ষায় পাশ করেন।

১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর পিতৃবিয়োগ তাঁকে দিশেহারা করে তুলে। বাবার মৃত্যুর পর সংসারের অভাব অনটন লেগেই থাকে। সংসারের অভাবে মায়ের হাসিহীন মুখ দেখে তাঁর অন্তর বিদির্ণ হয়ে যেত। আয়ের কোন পথ নেই । অভাবের পর অভাব আক্রমণ করে তাঁকে দিশেহারা করে তুলে। চাকুরীর জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছেন, কিন্তু কোন উপায় হচ্ছে না। মন যখন অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত ও দুঃখে কাতর হয়ে উঠত তখনই তিনি অনাহূত অপ্রকাশিত এক শান্তির আকর্ষণে দক্ষিণেশ্বরে মাঝে মধ্যে ছুটে যেতেন।

তিনি ভাল গাতক ছিলেন। ঠাকুরকে গান শুনিয়ে মুগ্ধ করতেন। অন্তর্যামী ঠাকুর তাঁকে তাঁর অন্তরের গভীর ভালবাসায় আকর্ষণ করে– অন্তরের সাথে যুক্ত করে নিয়েছিলেন, এ-কারণেই তাঁকে ত্যাগ করার তাঁর কোন উপায় বা শক্তি কোনটাই ছিল না। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্যোগে তিনি একান্তভাবে বাঁধা পড়েছিলেন। যা তাঁর বুঝার বা জানার কোন উপায় বা শক্তি কিছুই ছিল না। সব যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত হয়ে যেত।

ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ ঠাকুর রামকৃষ্ণ নরেনকে প্রথম দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন, সেই হবে একদিন তাঁর ভবিষ্যৎ কর্ণধার। ঠাকুর তাই তাঁকে বড় আদর করতেন। বিশেষ বিশেষ প্রসাদ খাওয়াতেন। দক্ষিণেশ্বরে আসতে নিমন্ত্রণ করতেন। ঠাকুরের ভালবাসায় দিনে-দিনে তিনি এমন মুগ্ধ হলেন যে, শত কষ্টের মাঝেও তাঁকে ভুলতে পারতেন না। কিন্তু সর্বদা একটা চিন্তাগ্রস্ত ভাব নরেনের চোখে-মুখে লেগে থাকত। নরেন, মুখভার করে অধিকাংশ সময় গম্ভীর হয়ে বসে বসে কি যেন ভাবতেন। কি সমস্যা, ঠাকুর একদা জানতে চাইলে নরেন তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দেন, তুমি কি বুঝবে ? তোমার তো আর সংসার নেই যে অভাবের জ্বালা কি তা তুমি বুঝবে ? ঠাকুর মুচ্‌কি হেসে কিছু না বলে সান্ত্বনা দান করে– তাঁর অশান্তি দূর করার চেষ্টা করেন।

ঠাকুর একদিন তাঁকে মায়ের মন্দিরে মা ভবানীর নিকট তাঁর অভাবের কথা জানাতে বললেন। এসবের প্রতি স্বামীজির বিন্দুমাত্র বিশ্বাস পূর্বেও ছিল না এখনও নেই। তিনি যতই উপেক্ষা করেন রামকৃষ্ণদেব ততই তাঁকে মায়ের নিকট তাঁর অভাবের কথা বলার জন্য জেদ করতেন। বাধ্য হয়ে একদিন মন্দিরে ঢুকলেন বটে, কিন্তু টাকাকড়ি ধন সম্পদ না চেয়ে –চেয়ে বসলেন, জ্ঞান বিবেক বৈরাগ্য। এইভাবে তিনবার মন্দিরে ঢুকেও মায়ের নিকট বিবেক বৈরাগ্য ছাড়া তাঁর প্রার্থীত প্রার্থনা কিছুতেই জানাতে পারলেন না। ঠাকুর তাঁকে অনেক গাল মন্দ করলেন এজন্য। এসবই যে সর্বশক্তিমান অন্তর্যামী শ্রীরামকৃষ্ণের খেলা আপাত তা স্বামীজিকে বুঝতে দিলেন না। স্বামীজিও নিরুপায় হয়ে ঠাকুরকে বলতে বাধ্য হলেন, তোমার যদি কিছু করার ইচ্ছা থাকে তবে তুমি নিজেই কর। আমার দ্বারায় এর চেয়ে আর বেশি কিছু হবে না। ঠাকুর এবার মনে মনে খুশি হয়ে প্রাণভরে তাকে আশীর্বাদ করে বললেন, ‘যা আজ থেকে মোটা ভাত-কাপড়ের আর অভাব হবে না।’

সত্যি সত্যি তাঁর সংসারের দারিদ্রতা আর কোনদিন তাঁকে পীড়াদান করেনি। কোন না কোন ভাবে সব অভাব দূর হতে লাগলো। ঠাকুরের কৃপায় স্বামীজী তাঁর সাংসারিক দায়িত্ব কর্তব্যের হাত থেকে মুক্ত হলেন। পরবর্তিতে বুঝেছিলেন, এ তাঁরই কারসাজি।

অধ্যাত্ম জীবনঃ

মা ভবানির নিকট প্রার্থীত বিবেক বৈরাগ্যের প্রার্থনা ধীরে ধীরে তাঁর অন্তর স্পর্শ করতে লাগলো। তিনি দিন দিন ভবঘুরে আনমনা হয়ে পথ চলতেন, মনে মনে কত কি না ভাবতেন, তা তিনিই একমাত্র জানতেন। ১৮৮৬ খিষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর তাঁর অন্তর ঠাকুরের ইচ্ছা পূরণের জন্য অস্থির হয়ে উঠলো। ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ঠাকুরের প্রাণপ্রিয় ত্যাগী গুরুভ্রাতাদের নিয়ে আত্মসন্ন্যাস গ্রহণ পূর্বক নিজে "স্বামী বিবেকানন্দ" নাম ধারণ করেন।

সন্ন্যাসের পর পরিব্রাজক রূপে ভ্রমণ– শাস্ত্রীয় বিধি। এই প্রেক্ষিতে ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবার তীর্থদর্শন জন্য তিনি বরাহনগর মঠ হতে কাশী, অযোধ্যা, আগ্রা, বৃন্দাবন ও হরিদ্বার ভ্রমণ করেন। দ্বিতীয়বার ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে এলাহাবাদ, গাজীপুর, ও হরিদ্বার ভ্রমণ করেন। তৃতীয়বার তীর্থদর্শন জন্য পুনরায় কাশী, হরিদ্বার, মীরাট, আলোয়ার, আজমীর, জয়পুর, জুনাগর, পোরবন্দর মোম্বাই, পুনা, মহীশূর, কোচিন, রামেশ্বর প্রভৃতি পূণ্যধামগুলির মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করে আত্মবিচার করতে থাকেন। এইভাবে ভারতীয় বহুভাবের বহুপ্রকারের কৃষ্টি, সভ্যতা, আচার, আচরণ, ও নানা অপসংস্কৃতি, সংস্কৃতি ও কুসংস্কারের সম্মুখীন হয়ে নানা জ্ঞান নানা অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ভারতের আদর্শ, শিক্ষা, সাহিত্য, দর্শন, বিভিন্ন শাস্ত্রমত, পুরাণ, গীতা, ভাগবত, ভারত ধর্মের মূল গ্রন্থ বেদ, বেদান্ত ও উপনিষদ্ এবং সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষা গভীরভাবে আয়ত্ত ও অধ্যয়ন শুরু করেন।

বিশ্বমহাধর্মসভা সম্মেলন উপলক্ষে ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ৩১ শে মে আমেরিকার উদ্দেশে যাত্রা করেন। বহু কষ্টের সাথে যুদ্ধ করে, বহু পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে অবশেষে মায়ের কৃপায় মহাধর্মসভার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ও কালজয়ী বক্তৃতা প্রদানে বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করে তুলেন। সময়টি ছিল– ১১ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৮ই

সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ। পৃথিবীর কোন মানুষ অতীতে যা জানেনি, যা শুনেনি, আজ তারা এই সন্ন্যাসীর মুখে তা জানলো, শুনলো যে, এই সনাতন হিন্দু বেদান্তধর্ম কত বিশ্বজনীন, উদার ও মহৎ। কোন সংকীর্ণতা স্বার্থপরতা এই ধর্মে নেই। ভোগের চেয়ে ত্যাগের মূল্য এই ধর্মে সর্বোচ্চ অধিকার লাভ করে আছে। কতবড় বিশ্বভাতৃত্ববোধ, সেবাধর্ম, মানবতা ও উদারতা এই ধর্মে বিদ্যমান তা তিনি তাঁর মর্মভেদী বক্তৃতায় প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। এই সনাতন বেদান্ত ধর্মের ছায়াতলে সমগ্র বিশ্ববাসী প্রতি প্রত্যেকের নিকট কত আপনার, কত প্রিয় এবং প্রেমময় সভায় উপস্থিত সবাই অবগত হলেন। এই বেদান্ত কেমন করে এই সমগ্র পৃথিবীকে 'মদাত্মা সর্বভূতাত্মা' রূপে একে অপরকে আবদ্ধ করেছে– অতি আপনার করে। অতি প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে– বর্তমানের সময় পর্যন্ত যখন অধিকাংশই জানতো না যে পৃথিবীর সকল আত্মা এক আত্মা, সর্বভূতের আত্মাই আমাদের আত্মা। আমাদের আত্মাই সর্বভূতের আত্মা। আমরা সবাই এবং বিশ্বের সবকিছু, যা ব্যক্ত ও অব্যক্ত পরিদৃশ্য ও অপরিদৃশ্যমান সকল পদার্থ মিলে মূলে যা কিছু– সব মিলে এই এক চৈতন্যরূপী আত্মশক্তি সত্তারই বিকাশ মাত্র। আমরা বাইরে বহুরূপ বহু আকৃতি প্রকৃতি ও স্বভাব চেতনায় যাবতীয় পদার্থকে আলাদা দেখলেও বা মনে হলেও আমরা সবাই এক সত্য, এক জ্ঞান এবং এক আনন্দরূপী আত্মা বা সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর রূপে এক সর্বশক্তি। বেদান্ত মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, এক চৈতন্য শক্তিই নিখিল বিশ্বের 'একং সত্যং' 'একমেবাদ্বিতীয়ম', তিনি এক; তাঁর দ্বিতীয় নেই। 'আত্মানম্ আত্মনি আত্মনা' অর্থাৎ এক আত্মাকেই আত্মাতে আত্মা বলে দেখা, জানা ও বুঝা। অর্থাৎ 'যস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ' যা কিছু দেখছি অন্তরে বাইরে সবই এক আত্মা বা নিখিল বিশ্ববক্ষাণ্ডের এক সত্তা। ঋষিগণ হাজার হাজার বছর ধরে এই সত্য আবিষ্কার করে এই প্রমাণ করে গেছেন যে, তিনি এই নিখিল বিশ্বব্রক্ষাণ্ডে এক সত্তারূপেই বহুভাবে প্রকাশিত হয়েছেন এই বিশ্বমাঝে বিশ্বরূপে বিশ্বভাবে। আবার বহু রূপে আর যত সব পরিণত হয়েছে একে। যেমন সূর্য, সূর্যমন্ডল ও তার কিরণ মূলতঃ এক সূর্যেরই প্রতিরূপ। কিন্তু কোথাও তাপ আকারে, কোথাও দাহিকা শক্তি রূপে, কেথাও আলোকিত রূপে, বিভিন্নভাবে সর্বভূতে শক্তি যোগাচ্ছেন। স্বামীজি বিশ্বসভায় এই বেদান্তের সূত্র 'তৎ তু সমন্বায়ৎ' সব কিছুর মূলে এক। আমরা সবাই সবার আপন ভাইবোন। সনাতন

হিন্দুধর্মে বেদান্তের প্রমাণ– প্রমাণ করলেন ও দেখালেন যে, আমাদের সবার পিতা পরমেশ্বর রূপে এক ঈশ্বর বা ভগবান। এই সূত্র ধরেই তাই তিনি বিশ্বধর্মসভায় সবাইকে `My dear brothers and sisters. এই অভিনন্দন জানিয়ে অভিভূত করে তুলেছিলেন।

সমগ্র আমেরিকাবাসী যখন তার ভাতৃত্ববোধে ও তাঁর সরল স্বভাবমূলক ভালবাসায় মুগ্ধ তখন তিনি সকলের অনুরোধে নিউইয়র্কে বেদান্তের ক্লাস নিতে বাধ্য হন। বিভিন্ন বক্তৃতা অনুষ্ঠান, যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন সভা সমিতিতে তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও হৃদয়ের উষ্ণতায় মুগ্ধ হয়ে সমগ্র আমেরিকাবাসী তাঁকে প্রেমের বাঁধনে বেঁধে ফেলেন। সময়টি ছিল– ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দ। এইভাবে সারা আমেরিকা ও ইউরোপ জুরে তিনি বছরের পর বছর বক্তৃতা দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। অবশেষে তিনি বিশ্রামোদ্দেশ্যে ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিস যাত্রা করেন।

১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দের শেষভাগে পুনরায় আমেরিকায় পুনরাগমণ করেন এবং সেখানে একটি 'বেদান্ত সোসাইটি' স্থাপন করেন। উক্ত সালেই ইংলন্ডে পুনরাগমণ করেন। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ১৫ই জানুয়ারি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। ঐ সালের ২০শে ফেব্রুযারী কলিকাতার অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। উক্ত সালেই ১ মে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই মিশনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল আর্ত- ক্লিষ্ট- অনাথ -দুস্থ- অসহায়- দরিদ্র-অবাঞ্ছিত-অবহেলিত বালক, যুবক ও বৃদ্ধদের সেবায় নিজেদের জীবনকে উৎসর্গীতকরণ। ভারতের হরিজনপল্লীর মত অনুন্নত অশিক্ষিত জনগোষ্ঠিকে নতুন করে বাঁচার জন্য নানাপ্রকার শিক্ষামূলক আলোর সন্ধান দান। সারগাছি অনাথ সেবাকেন্দ্র স্থাপন তার মধ্যে একটি স্থায়ী অন্যতম প্রতিষ্ঠান।

নারীদের আত্মমুক্তি ও নারীশিক্ষার বিস্তার ও নারীদের জীবনধর্ম ও আদর্শ দানের জন্য ভগিনী নিবেদিতাকে নির্বাচন ও তাঁকে ২৫ মার্চ ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে দীক্ষাদান ও তাঁর ব্রহ্মচারিণী জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তাঁকে নিয়ে নারীদের জন্য একটি আলাদা আশ্রম গঠন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রতিষ্ঠা ও তাঁর শক্তি সঞ্চার জন্য ৯ই ডিসেম্বর ১৮৯৮ খিষ্টাব্দে 'বেলুড় মঠ' নামে কলিকাতায় বহু অর্থ ব্যয়ে সনাম ধন্য বিচিত্র কারুশিল্পে নির্মিত একটি মঠ স্থাপন করা হয়। সারা বিশ্বে এই মিশন ও আশ্রমের

ভাবধারা প্রচারের জন্য একটি 'উদ্বোধন' নামে মাসিক পত্রিকার, ১৪ই জানুয়ারি ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশন কার্য শুরু করা হয় ।

রামকৃষ্ণ মঠ, মিশন ও আশ্রমকে এবং সংগঠনকে সুষ্ঠুভাবে সুপরিচালনার জন্য ৩০শে জানুয়ারি ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে সর্বজ্ঞানী স্বামীজির চিন্তা-চেতনায় 'ট্রাষ্ট-ডীড' নামে একটি শক্তিশালী গঠনতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠা করা হয় । স্বামীজি খুব অল্প সময়ে তাঁর এই অতি সামান্য ৩৯ বৎসর জীবন ধারণ কালে অতি দক্ষতার সাথে যে সকল সাংগঠনিক অসাধ্য সাধন কাজ করে গেছেন তা অকল্পনীয় ও দুঃসাধ্য কাজ বলে বলার অপেক্ষা রাখে না । সর্বশেষ ভ্রমণ ৩০শে মার্চ ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা, এবং এই ঢাকা শহরের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপীঠ বর্তমান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে "আমি কি শিখেছি" এই আলোচ্য বিষয়ের উপর যে কালজয়ী বক্তৃতা দান করেন তা আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে । পরদিন ৩১শে মার্চ পগোজ স্কুলে এক জ্ঞানগভীর বক্তৃতা দান করেন, "যে ধর্মে আমরা জন্মেছি" এই বিষয় বস্তুর উপর । এই বক্তৃতা শ্রবণ করে ঢাকাবাসী মুগ্ধ হয়ে পড়েন এবং অনেকেই তাঁর আদর্শকে বরণ করে তাঁর অনুগত হয়ে ওঠেন ।

অবশেষে চিরবিদায় গ্রহণের জন্য ভারতের সনামধন্য যুগপুরুষ যুগাচার্য বেদান্তবিদ বেদান্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দজী গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তা চেতনা– সর্বধর্ম সমন্বয় এবং অসম্প্রদায়িক ভাবে সবধর্মের সাথে মিলেমিশে সহবস্থান এবং সব ধর্মই যে সত্য এবং সবার স্রষ্টা যে এক ঈশ্বর , কিন্তু এর বিকাশ ঘটাতে হবে 'যত মত তত পথ' এর ভিতর দিয়ে । এ মহাসত্যানুসন্ধানই যে মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও আদর্শ তা পৃথিবীতে বাস্তবায়িত করে গেলেন, বিশ্বে ধর্মের নামে যে মতভেদ, ভেদাভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, হিংসা, বিদ্বেষ, যুদ্ধ ও রক্তক্ষয় এর চির অবসান ঘটানোর জন্য এই কালজয়ী বিশ্ব মহাধর্মসন্মেলন করে ধর্ম যে পৃথিবীর শান্তি র জন্য, এক ঈশ্বরই যে সবার জন্য, বিশ্ববাসীর মনে এটি সুপ্রতিষ্ঠিত করে বিশ্বশান্তি-র জন্য নিজ জীবনকে তিনি বিশ্ববাসীর কল্যাণ উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করে যান । মুগ্ধ করে যান বিশ্ববাসীকে একটি মাত্র মহামন্ত্রে––'বহুরূপে সন্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে

ঈশ্বর’। এই বাণী পৃথিবীতে আজও যেমন অমর ও বর্তমান হয়ে আছে, আগামীতেও আমাদের জীবন পথের পাথেয় রূপে অবশ্য পথ দেখাবে।

১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে ৪ঠা জুলাই রাত ৯ ঘটিকার সময় ভবলীলা সাঙ্গ করে তিনি স্বেচ্ছায় সমাধি যোগে স্ব-মৃত্যুবরণ করেন। সে মৃত্যু যে কত আনন্দের, কত সুখাবহ তা কাউকে বুঝিয়ে বলা মুস্কিল। আমরা যে মৃত্যুর জন্য ভয় পাই, এটি যে সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা, তা আমরা না জানলেও তিনি জেনেছিলেন । যাঁরা মৃত্যুকে জয় করেছেন, তাঁরা অমৃতের সন্তান। তাঁদের যে মৃত্যু হয় না এটা তাঁরা জানেন। এটি যে একটি শুধুই রূপান্তর মাত্র বেদের ঋষিরাও তা প্রমাণ করে আমাদের বুঝিয়েছেন। আত্মার মৃত্যু নেই। আত্মা অজর, অমর, অবিনশ্বর। পরিবর্তন শুধু দেহের হচ্ছে। গীতায় যেমন বলা হয়েছে, জীর্ণবস্ত্র ফেলে যেমন আমরা নতূন বস্ত্র পরিধান করি আত্মাও ঠিক অনুরূপ দেহ পরিবর্তন করেন মাত্র। হিন্দুর সনাতন ভারত ধর্ম যা আজ হতে হাজার হাজার বৎসর পূর্বেই এই বিশ্বপ্রমাণিত সত্যটি আবিষ্কার করে বিশ্বকে জানিয়ে গেছেন। এবার স্বামীজি সেই সত্যটি সবার মাঝে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করে স্বয়ং স্বশরীরে তা দেখিয়ে ও দেখায়ে গেলেন। বনের বেদান্ত কে বনে বা অরণ্যে না রেখে প্রতি ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠা করে গেলেন।

১.৩: কর্মজীবন

জীবন মানেই কর্ম, আর কর্ম মানেই জীবন। অতএব জীবনের সাথে কর্মকে শতভাবে আলাদা করতে চাইলেও আলাদা করা সম্ভব নয়। কারণ জীবনের সাথে যেমন কর্ম জড়িত আবার কর্মের সাথেও অনুরূপ জীবন জড়িত। অর্থাৎ এ-দু’টি যুগপৎ অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত। প্রসঙ্গক্রমে অদ্যাবধি এ লক্ষ্যেই এখানে স্বামীজির জীবন ও ধর্ম আলোচনার পাশাপাশি যুগপৎ কর্মেরও পর্যালোচনা করা হয়েছে। সাধ্যমত তবুও আলোচ্যাংশে আমি স্বামীজির কর্মবিষয়ক ধারণার ক্রমপরিণত রূপকে এই অধ্যায়ে আমার জ্ঞান ও ভাষায় বাকি আর যতটুকু অজ্ঞাত তা ফুটে তুলতে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি মাত্র।

অর্থাৎ বেদকাল হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত কর্মবিষয়ক ভাবনা সমূহ যা বিচিত্র ভাবনাকে সমগ্রভাবে তুলে ধরা যায়নি আমি এখানে প্রধানতঃ সেই বেদান্ত ধারণার প্রচলিত খাতটিকেই বেছে নিয়েছি এবং তারই আলোকে স্বামীজির কর্মকান্ডগুলি এই অধ্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বেদের তিন কান্ডের মধ্যে আরণ্যক কান্ডটি অত্যন্ত দুরূহ। এটি গভীর সাধনার অমৃত ফসলস্বরূপ। স্বামীজি এই আরণ্যক তথা বনের বেদান্তকে আমাদের বাস্তব জীবন-বেদান্তে ফুটে তুলে যে দর্শন দৃষ্টি দ্বারা আলোদান করেছেন তৎমধ্যে অন্যতম আলোকিত রূপটি হল– বহুরূপে সন্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। তাঁর ধর্ম জীবনে আমি বিশ্বাস করি– এটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ কর্মজীবন এবং তাঁর প্রাণের আরাধ্য রামকৃষ্ণ আদর্শিত জীবন-দর্শন।

স্বামীজি এই সহজ দর্শনটিতে আমাদের নিকট এই অর্থে পরিষ্কার করে তুলেছেন যে, ভগবানকে খুঁজতে আর তোমাদের বনে জঙ্গলে যেতে হবে না। বেদান্তের প্রকৃষ্ট রূপ হল জীবই শিব। শিবই জীব। শিবরূপে জীব সেবাই হল– জীব-প্রেম, এবং এই প্রেম বা ভালবাসা লাভই হল ঈশ্বর লাভ। মানুষের দুঃখ-কষ্টে ,অভাব-অনটনে, বিরহ-বিচ্ছেদে তাদের পাশে দাঁড়ান ও তাদের প্রাণে শান্তিদানের সহায়তাই হল যথার্থ ভগবৎ সেবা বা ভালবাসা। পরোপকার দ্বারা দয়াগুণ সঞ্চার করে তাদের আত্মজ রূপে গ্রহণ করাই হল ভগবান লাভ করা। বনে জঙ্গলে গিয়ে সংসার পরিজন ত্যাগ করে, দুঃখের ভয়ে ভীত হয়ে কঠোর তপস্যা ও অরণ্য সাধনার চেয়ে পৃথিবীর সকল মানুষকে নিঃস্বার্থ নিষ্কামভাবে ভগবৎ জ্ঞানে বুকে জড়িয়ে ধরে ভালবাসতে পারলেই জগতের মঙ্গল বেশি। বেদান্ত একারণেই উচ্চারণ করেছেন, “আত্ম মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ”। এই দর্শনটি ছিল স্বামীজির জীবন প্রদীপ। তুমি নিজে মুক্তি না চেয়ে যদি জগতের মুক্তি চাও তবেই এই পাপ পঙ্কিল, জরা ব্যধিগ্রস্ত পৃথিবীর কল্যাণ হবে বেশি। প্রাচীন বেদান্ত দর্শনটি ছিল একটু ব্যতিক্রম, সেখানে আত্মমুক্তির প্রতিই জোর দেওয়া হয়েছে বেশি। তাঁদের অভিমত– আগে তুমি নিজেকে মুক্তিলাভ করাও, অতঃপর জগতের মুক্তির জন্য ঝাপিয়ে পড়। অমূলক কোনটিই নয়, তবে দৃষ্টিভঙ্গি ভেদে যার যেটি পছন্দনীয়। স্বামীজি ছিলেন

বীরসাধক, তাই তিনি অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব আমি মুক্তি স্বাদ এই সাহসী বাণীর আদর্শকেই বরণ করে নিয়েছিলেন ।

মানুষের পথযাত্রার প্রথম লক্ষ্যই হল গ্রাম্যজীবনকে সংস্কার করা । জীবনের প্রথম প্রয়োজন হল স্থূল দেহগেহ সুরক্ষার চেষ্টা, ভোগ্য উপকরণকে সহজলভ্য করা, উন্নত করা । কবিগুরুও প্রার্থনা করেছেন, বৈরাগ্য সে তো আমার মুক্তি নহে, অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব আমি মুক্তির স্বাদ ।... বেদ তাই প্রথম কর্মবিধান সৃষ্টি করেন । এই বেদবাক্যই একমাত্র প্রমাণ করে বেদাচারই হল সভ্যতার প্রথম পদক্ষেপ । তাই ধর্মের লক্ষণ হল–'চোদনালক্ষণো'র্থোধর্মঃ' [জৈমিনী সূত্র,১/১/২] । অর্থাৎ বেদ যে যে কর্ম করতে প্রচোদিত করেছেন তা করাই কর্ম । স্বামীজি এই বেদসাহিত্যের অন্তর্গূঢ় ঋজু কুটিল ও কঠিন অর্থগুলি সাধারণের মধ্যে সহজলভ্য করে তুলেন । তাঁর যে সুবিশাল রচনা গ্রন্থাবলি রচিত হয়েছে এবং তিনি যত্র তত্র যত বক্তৃতা দান ও পত্র বিনিময় করেছেন এর সবগুলিই বেদভিত্তিক কর্মের মর্ম । তিনিই ধর্মকে অবরুদ্ধতার প্রাচীর ভেঙে সোজা পথ সৃষ্টি করে আমাদের দৃষ্টিদান করেছেন । মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে 'ধর্মার্থকামমোক্ষঃ' অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ । জীবনের এই চারিটি শ্রেষ্ঠ কর্মবিধানকে যুক্ত করে দিয়ে চতুরাশ্রমের মাধ্যমে অর্থাৎ– জীবনটিকে চারিটি আশ্রম নামক অধ্যায়ে বিভক্ত করে, অর্থাৎ– জীবনের প্রথম ভিত্তি, কঠোর নিয়ম নীতিতে আত্মগঠন– ব্রহ্মচর্য আশ্রম , অতঃপর গঠিত জীবন নিয়ে গার্হস্থাশ্রমে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করণ ও সুখ ভোগ এবং অর্থ উপার্জন, অতঃপর বানপ্রস্থজীবন, অর্থাৎ ধীরে ধীরে জীবনের অর্জিত বাসনাগুলিকে ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ, অবশেষে সন্ন্যাস আশ্রম, অর্থাৎ– আত্মমুক্তির জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ বা সমস্ত প্রকারের ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ বর্জন বা সম্যক্ উপায়ে সকল কামনা বাসনা ত্যাগ করণ । শুধু আত্মমুক্তির জন্য নয়, নিঃস্বার্থভাবে জনসেবাই যে এ যুগের ধর্ম ও কর্ম এবং তা প্রতিপালন করাই যে প্রকৃত সন্ন্যাসধর্ম ও সন্ন্যাসকর্ম তাও প্রমাণ করে দেখিয়ে গেছেন ।

আমরা দেখেছি– কর্ম বারবার পথহারা হলেও ধর্ম তাকে আবার তার সাথে যুক্ত করেছে । হিন্দুর বহুবার সমাজিক অবক্ষয় হয়েছে । কখনও যাগযজ্ঞ কর্মে, কখনও জাতিভেদ প্রভাবে, ছুঁৎমার্গ কর্ম প্রভাবে, কখনও

ভোগসুখবাদী বা ইহলোকবাদী চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ মতবাদে, কখনও সমাজের অজ্ঞ মূর্খ পন্ডিত ও সমাজপতিদের ভুল কর্মের ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে, কখনও সমাজগঠন কাজে ও সামাজিক নিয়মের কুসংস্কারের কঠোরতা প্রয়োগে। বাল্য বিবাহ, বিধবা বিবাহ, সতীদাহ প্রথা, বেদের তেত্রিশ দেবতাকে তেত্রিশ কোটিতে পরিণত করা, বিভিন্ন সমাজ, গোত্র, বর্ণ, সম্প্রদায় মাধ্যমে ধর্মের উদারতাকে ধুলিসাৎ করে সঠিক কর্মের প্রতি বিমুখ করা– বহুকাল ধরে চলে আসছে। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ যুগে এবার তার অবসান ঘটিয়ে নতুন জীবনের নতুন কর্মের সৃষ্টি হয়েছে।

আধুনিকতার সাথে প্রাচীনতার সমন্বয় করে স্বামীজি এ-যুগে যে কর্মপথ দেখিয়েছেন এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বে তাঁর কর্মধারা প্রচার করে চলেছেন পৃথিবীর সর্বত্র সর্বস্থানে– আশা করা যায়, এটি আগামী বহুবছর মানব সভ্যতার উন্নয়ন কর্মে সহায়ক হবে এবং সহজে ব্যাহত হবে না। জ্ঞান কর্ম ও ভক্তিতে যদিও প্রকৃত অর্থে কোন বিরোধ নেই কিন্তু মহামানবদের সৎ উদ্দেশ্যের সৎ বিধানগুলির অপব্যাখ্যা হওয়ার ফলেই অনেক সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী অতীতেও সৃষ্টি হয়েছে, বর্তমানেও হচ্ছে। যেমন পশুবধের রক্তপঙ্কিল প্রবৃত্তি পথে মানুষ যখন পথ হারাল আত্মমুক্তির, তখন শ্রীবুদ্ধদেব এলেন। জ্ঞানের নবীন ধারা প্রচলন করে, সমগ্র বৈদিক কর্মকে অস্বীকার করে মানব চেতনায় ঔপনিষদিক নৈতিকতার প্রবল আগ্রহ সঞ্চার করলেন। তাঁর নিজজীবনে বিকশিত মানবিক করুণা সমগ্র বেদাচারকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। এর মূলেই ছিলেন কর্মের অপব্যাখ্যাকারী পুরোহিত যাজকগণ। স্বামীজি তাই লিখলেন, [তিনি] “তৎকালিক অবিরত দার্শনিক বিচার, জটিল অনুষ্ঠানপদ্ধতি, বিশেষতঃ জাতিভেদের ওপর অতিশয় বিরক্ত ছিলেন”[২]।

তার প্রমাণও তিনি যথেষ্ট দিয়ে গেছেন। অথচ একবার অনুধাবন করুন, জগতের মধ্যে তিনিই একমাত্র মহাপুরুষ যিনি যজ্ঞে পশুহত্যা নিবারণের উদ্দেশ্যে পশুগণের পরিবর্তে নিজ জীবন বিসর্জনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। একমাত্র তিনিই ছিলেন তৎকালীন কর্মযোগীর আদর্শ।

২। স্বামী অমৃতত্ত্বানন্দ, **স্বামী বিবেকানন্দজীর বাণী ও রচনা**, দিনাজপুরঃ পদ্মা প্রিন্টার্স, ১ম সংস্করণ, ১৯৮০, পৃ.,৩১৮

আর তিনি যে উচ্চ অবস্থা লাভ করেছিলেন, তাতেই বোঝা যায়, কর্ম দ্বারা আমরাও আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে আরোহণ করতে পারি। কিন্তু কর্মের অপব্যাখ্যা, অপপ্রচার , স্বামীজির ভাষায় যা পরিষ্কার করে বলা সহজ হয়, এখানে তাঁর সেই যথার্থ বাণীটি তুলে ধরলেই আমাদের দোষগুলি কিভাবে কত প্রকারে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং তা থেকে কিভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে– আলোচনা সাপেক্ষে তা বুঝতে সক্ষম হব। যথাঃ

> পুরোহিতেরা বিশ্বাস করত ঈশ্বর একজন আছেন বটে, কিন্তু এই ঈশ্বরকে পেতে হলে একমাত্র তাদের সাহায্যেই জানতে হবে। পুরোহিতদের কাছ থেকে ছাড়পত্র পেলেই মানুষ পবিত্র বেদীর কাছে যেতে পারবে। পুরোহিতদের প্রণামী দিতে হবে, পূজো করতে হবে এবং তাদেরই হাতে যথাসর্বস্ব অর্পণ করতে হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে বারবার এই পুরোহিত প্রাধান্যের অভ্যুত্থান হয়েছে, এই মারাত্মক ক্ষমতা লিপ্সা, এই ব্যাঘ্র-সুলভ তৃষ্ণা সম্ভবতঃ মানুষের একটি আদিম প্রবৃত্তি, পুরোহিতরাই সর্ববিষয়ে কর্তৃত্ব করবে, সরল সত্যকে নানা জটিল আকারে ব্যাখ্যা করবে, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক অনেক কাহিনীও শুনাবে, যদি এই জন্মেই প্রতিষ্ঠা চাও অথবা মৃত্যুর পর স্বর্গে যেতে চাও তো তাদের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। যতরকম আচার অনুষ্ঠান আছে সব করতে হবে।[৩]

কর্ম আমাদের জীবন এবং জীবন আমাদের কর্ম হলেও কর্মবাসনা ও কর্মের প্রভাব ও ক্ষমতা যে কি ভয়ানক পরিণতি জীবনে ঘটাতে পারে তা অদ্যাবধি আলোচনা সাপেক্ষে জানতে ও বুঝতে পারলাম। আমরা জানি– ধর্মতত্ত্ব কর্মে প্রযুক্ত না হলে তা শব্দমাত্র, জ্ঞানমাত্র, দর্শনমাত্র। অতএব কর্মকে বাস্তবে পরিণত করাই হল যথার্থ ধর্ম। কর্ম আমাদের চরিত্র গঠনে সাহায্য করে, কর্মবশেই জীবের জন্ম জন্মান্তর প্রাপ্তি। নিষ্ঠাপূর্বক কর্মই ভক্তি দান করে, কর্ম যদি নিষ্কাম হয় তবে প্রকৃত জ্ঞানলাভ ঘটে। কর্মফল ভোগ এই কর্ম মাধ্যমেই হতে পারে। প্রাচীনকালে শাস্ত্রকারগণ সকলেই প্রায় একবাক্যে বলতেন, পূজা, ধ্যান, জপ, প্রাণায়াম, তীর্থযাত্রা, উপবাস, ব্রত, গুরুশুশ্রূষা প্রভৃতি কর্মগুলিই প্রকৃত ধর্ম ও কর্ম। কিন্তু স্বামীজি আবির্ভূত হয়ে জানালেন,

---

৩। স্বামী অমৃতত্ত্বানন্দ মহারাজ, **কর্মযোগ**, দিনাজপুরঃ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ও মিশন, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮, পৃ., ৪

কর্মকে যতদিন না যোগে পরিণত করতে পারবে ততদিন কোন কর্মেই ধর্ম হবে না। কর্মের মধ্যে অবশ্য ভাব থাকতে হবে। যে কর্মের মধ্যে ভাব নেই সেই কর্মের মূল্য অতি অল্প। বর্তমানে নিম্নলিখিত যে সকল কর্মগুলিকে, যেমন– লোক সেবা, স্কুল করা, হাসপাতাল, ডিস্‌পেনসারী চালানো, আর্ত-ক্লিষ্ট- রুগ্ন দরিদ্রের সেবা, অনাথ অসহায় বৃদ্ধদের সেবা। পরাধীনতার শৃংখল হতে দেশকে মুক্ত করা, দেশমাতৃকাকে মায়ের আসন দান করা, এগুলি শুধুই পরহিতকর অথবা রাজনৈতিক বা রাজকার্য অথবা ব্যবহারিক কর্ম হিসেবে গণ্য করলে চলবেনা। এই কর্মগুলি এতকাল সাধনার পরিপন্থী বলে গণ্য হয়ে আসছিল এজন্য কথা উঠেছিল, হিন্দুধর্ম ইহবিমুখ। এর ফলেই আমরা বারবার পরের অধীনতা স্বীকার করে ইহজীবন বা পরজীবনের কোন উন্নতি বিধান করতে পারিনি। স্বামীজি এবার এসে সব রদবদল করে– জাতির জীবনকে নতুন যুগের নতুন ধর্মের এক নতুন কর্মের আলো দেখালেন। তার নাম দিলেন 'নববেদান্ত'। অর্থাৎ কোন কর্মকে অবহেলা করতে হবে না শুধু সেগুলিকে "যোগঃ কর্মসুকৌশলম্" কর্মযোগের কৌশলরূপে ভগবানের সাথে যোগযুক্ত হয়ে অনাসক্তভাবে সব কর্ম তাঁর কর্ম ভেবে, শুধুই পরের উপকার জ্ঞানে প্রতি কর্মে আন্তরিকতার সাথে বা প্রাণের টানে তা প্রতিপালন কর। এরই নাম প্রকৃত কর্ম বা কর্মযোগ।

মানুষ ছাড়া ধর্ম ও নীতি কোনটিই নয়, মানুষকে নিয়েই যত নীতি-নিয়ম, ধর্ম-কর্ম, বাঁচা-বাড়া যা কিছু সব। মানুষের ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, বিবেচনা করেই পথচলা। মানুষ যদি মানুষের পাশে দুর্দিনে এসে না দাঁড়ায়, পরোপকার কর্মকে অপকর্ম বা আপন স্বার্থক্ষুণ্ন বলে ভাবে, দুর্ভিক্ষনিবারণকে যদি নিজের ক্ষতি ভাবে, ত্রাণসেবাকে যদি পরিত্রাণের উপায় বলে না ভাবে, শিক্ষার আলোদানকে যদি নিজের আপন জ্ঞান বা শিক্ষার ক্ষতি হবে বলে মনে করে, মানুষের নিত্য চাহিদা অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থানকে যদি নিজের উন্নতির বাধা মনে করে বা ক্ষতি ভাবে তাহলে কোন্ কর্মকে ধর্ম বলে গণ্য করা হবে ? স্বামীজি তাই ধর্মকে কর্মমুখী করে, কর্মযোগী হওয়ার শিক্ষা দান করে – নিজ জীবনে দেখিয়ে ও দেখায়ে গেলেন। নাক, কান, চোখ, মুখ বুজে শুধু তপ জপ ধ্যান এগুলি জড়ের সাধনা মাত্র। সাক্ষাত নর-নারায়ণ সেবাই হল প্রকৃত কর্ম ও ধর্ম। কারণ কর্মই প্রকৃত ধর্ম। কর্ম ছাড়া জীবন একমুহূর্ত চলতে পারে না। অতএব এ-যুগে কর্মকেই ধর্মের স্থান দান করে

পথ চলাই হবে আমাদের জন্য স্বামীজির মতে প্রকৃত কর্মময় ও ধর্মময় একটি উন্নত মানব জীবন। স্বামীজি এজন্যই বললেন:

> 'Work is worship' কর্মকে শুধু কর্ম মনে না করে– কর্মকে পূজা-জ্ঞান করে কর্ম কর। সব কর্মই ভগবানের কর্ম, তুমি শুধু নিমিত্তমাত্র। কর্ম করা তোমার অধিকার, কর্তব্য কাজ তোমার দায়িত্ব, কর্মফলে তোমার কোন অধিকার নেই। যতটুকু অধিকার ভোগ করছ তা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। প্রকৃত ফলদাতা ভগবান। তুমি এই নীতিতে সন্তুষ্ট থাক। কর্মযোগ সম্পর্কে যুগাবতার রামকৃষ্ণদেব যে বাণীটি এখানে দান করেছেন যথা– "সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা– সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে জানবে যে, তারা আমার কেউ নয়।[৪]

স্বামীজির বক্তব্যের ভাষ্যরূপটি ঠিক তারই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ কর্মের যত ভাল-মন্দ, জয়-পরাজয়- লাভ-লোকসান ইত্যাদি সবকিছু তাঁর উপর অর্পন করে বাকি জীবনটি তাঁর ইচ্ছা ভেবে জীবন-যাপন কর। স্বামীজির মতে এটিই প্রকৃত ধর্ম ও কর্ম।

আমি আমার অভিসন্দর্ভে এই বিশাল চিন্তাবিদ্, কর্মবিদ্, দার্শনিক, জ্ঞানতাপস মহাপুরুষকে আমার সমান্য চিন্তা চেতনা দিয়ে যতটুকু অনুধাবন করেছি তাঁর কর্মজীবন অধ্যায়ে সেটুকুই এখানে প্রতিপন্ন করেছি এবং সবার কল্যাণ মনে করে আপন ধারণা তুলে ধরেছি। জানি না– কার কতটুকু উপকারে লাগবে। যদি উপকারে লাগে তবে আমার গবেষণাকে ধন্য জ্ঞান করব।

অপকার হলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে অনুরোধ জানাব। গবেষণায় যদি অজ্ঞাতভাবে কোথাও ত্রুটি হয়ে থাকে তবে সবটুকু আমার, তাঁর নয়।

৪। ঐ, পৃ., ১১৪-১১৫

ধর্মদর্শনঃ

ধর্মের দুটি রূপ। একটি কঠোর সন্ন্যাসযোগ অবলম্বন, অপরটি ব্রহ্মবিদ্ গুরুর সেবা। স্বামীজি যুগপৎ দুটি পথই তাঁর জীবনে কমবেশি পরখ করে উপলব্ধি করেছিলেন; এর যথার্থতা। স্বামীজির ধর্ম ও কর্ম দুটিই ছিল তাঁর গুরুদেবের ইচ্ছার জন্য তাঁর ইহজীবন দান। স্বামীজি ছিলেন ঠাকুরের মানস পুত্র। তাঁরই কর্মকান্ডারী। ঠাকুর স্বেচ্ছায় তাঁর ধর্মকর্মের ও মুক্তিমোক্ষের সকল দায় দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ঠাকুরের ডানহাত।

ঠাকুর শক্ত করে স্বামীজির হাত ধরে এবং তাঁকে অবলম্বন করেই জগৎকল্যাণে তাঁর মহতি উদ্দেশ্য সাধনে তাঁর সর্বস্ব শক্তি তাঁকে উৎসর্গ করেছিলেন। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন তা বাস্তবায়িত করে গেছেন, তাঁরই মাধ্যমে। ঠাকুরের 'যত মত তত পথ' দর্শনের তিনি ছিলেন জীবন্ত রূপকার। পৃথিবীতে বেদান্ত ধর্ম প্রচার, সর্বধর্ম সমন্বয়ই, অসাম্প্রদায়িকভাবে ধর্মের বিস্তার, জগৎজননীর অংশসম্ভুতা পৃথিবীর সকল নারী জাতিকে মাতৃজ্ঞানে পূজা, দর্শন ও সম্মান দান, জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়ে ধর্মের বিস্তার, বেদান্তের দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের সমন্বই হল তাঁর চেতনার মৌল ধর্মদর্শন। নারদীয় ভক্তি প্রচারই তাঁর মত প্রকাশ, ঠাকুর সমাধিতে উপলব্ধি করলেন, "শিবজ্ঞানে জীব সেবা"। স্বামীজির অন্তরে এই দর্শনটি গভীরভাবে যখন তাঁর প্রাণকে স্পর্শ করল তখন তিনি বিশ্লেষণ করে আর একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলেন– প্রাচীন বেদান্ত সিদ্ধান্ত মতে যেহেতু সর্বভূতে তিনি অবস্থান করছেন তখন– ঠাকুরের সূত্রটিকে যদি 'জীব রূপে শিব সেবা' বা জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'। এই রূপে আদর্শ দান করা যায় তাহলে পৃথিবীর মঙ্গল হবে আরও বেশি। জীবপ্রেম বা জীবসেবা এই দর্শনটিকে বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে পারলে সবার মঙ্গল ছড়িয়ে পরবে দ্রুত। কারণ 'অয়মাত্মা গুড়াকেশ সর্বভুতাশয় স্থিত'। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন নিজেই বলেছেন, হে গুড়াকেশ অর্জুন ! আমি সর্ব জীবে আছি তখন জীবের বা সর্বভূতের শুভ বা মঙ্গল অর্থাৎ শিবময়তা কামনা অন্যায় নয়। এই নব বেদান্তের ধর্মদর্শনকে মানব ও সমাজ গঠনকারী এবং জগৎ আলোড়নকারী চিন্তারাশিকে নিখিল বিশ্বের সকল মানবের মাঝে বাস্তব জীবনে কার্যে পরিণত করাই ছিল স্বামীজির জীবন দর্শন।

স্বামীজি এজন্যই তাঁর এক পত্রে ব্যক্ত করলেন:

> ...আমি আমার স্বদেশবাসীর প্রতি কর্তব্য কতকটা করেছি। এখন জগতের জন্য– যার কাছ থেকে এই দেহ পেয়েছি, দেশের জন্য– যে দেশ আমাকে ভার দিয়েছে, মনুষ্য জাতির জন্য– যাদের মধ্যে আমি নিজেকে একজন বলতে পারি, কিছু করব। যতই বয়স বাড়ছে, ততই 'মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী' হিন্দুদের এই মতবাদের তাৎপর্য বুঝতে পাচ্ছি।... কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি আধ্যাত্মিক – সকল ক্ষেত্রেই যথার্থ কল্যাণের ভিত্তি একটিই আছে, সেটি এইটুকু জানা যে, 'আমি ও আমার ভাই এক।' সর্বদেশে সর্ব জাতীর পক্ষেই এ কথা সমভাবে সত্য। আমি বলিতে চাই, প্রাচ্য অপেক্ষা পাশ্চাত্যই এ তত্ত্ব আরও শীঘ্র ধারণা করিতে পারিবে। কারণ এই চিন্তাসূত্রটির প্রণয়নে এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন অনুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তি উৎপন্ন করিয়াই প্রাচ্যের সমূদয় ক্ষমতা প্রায় নিঃশেষিত।[৫]

"আমরা যেন নাম, যশ ও প্রভুত্বস্পৃহা বিসর্জন দিয়া কর্মে ব্রতী হই। আমরা যেন কাম, ক্রোধ ও লোভের বন্ধন হইতে মুক্ত হই। তাহা হইলেই আমরা সত্য বস্তু লাভ করিব।"[৬] স্বামীজি তাই 'রামকৃষ্ণ আশ্রম ' নামের পাশে স্থান দিলেন, 'মিশন' শব্দটি।

৫। শ্রী প্রণব কুমার সিংহ, সংকলক, **স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী,** দিনাজপুর: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ও মিশন, ১ম সংস্করন, ১৩৯৪, পৃ., ১৪৫

৬। ঐ, পৃ., ১৪৮

১.৪: উপসংহার

আধুনিক যুগের নবরত্ন , সনাতন হিন্দু জাতির গর্ব, শিক্ষিতদের আশীর্বাদ, অশিক্ষিতদের মুক্তি, যুবকদের ঐতিহ্য, জাতীয় জাগরণে যুব-চিত্ত উদ্বুদ্ধকারী, আর্ত-ক্লিষ্ট, রুগ্ন ,অনাথ, অসহায়ের আরাধ্য, বেদান্তের পুরোধা, সনাতন ধর্মের বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্যদানকারী, সমাজের জাতীয়তাবাদ, বর্ণ-বিদ্বেষবাদ, সমাজ ও জাতির কন্টক- ছুঁৎমার্গ, হিন্দুধর্মের ক্ষয়িষ্ণুতা নিবারণকারী, ধর্মের সাথে খাদ্যের বাড়াবারি, ধর্মের বাহুল্য আনুষ্ঠানিকতা, এমন বহু উপকারদানকারী প্রভূত কল্যাণকর ব্যক্তিত্ব স্বামী বিবেকানন্দজীর মত আর দ্বিতীয় কেউ আজ পর্যন্ত এই উপমহাদেশে আবির্ভূত হন নি ।

দেশের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নৈতিক বীর্যে বলশালী কর্তা, অর্থনৈতিক মুক্তিদাতা , অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার অধিকারী, দরিদ্রতা দূরকর্তা, জনজীবনকে কর্মের মাঝে ধর্মদান করা, ভারতবাসীকে আত্মনির্ভরশীল ও আত্মকর্মক্ষম করে গড়ে তুলা, এমন এক অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব স্বামীজি মহারাজ ছিলেন এক অনন্য অসাধারণ মানুষ । তিনি যেন ভূ-ভারতের নবযুগের এক আশীর্বাদকরূপে অগ্রদূত । তাঁর ধর্ম জীবন, কর্মজীবন, সামাজিক জীবন, স্বরাজ স্বাধীনতা জীবন, এত জ্ঞান গভীর দূরদর্শীতাপূর্ণ ছিল যে বলে শেষ করা মুস্কিল ।

উপসংহারে আমি বলতে চাই, আমার অভিসন্দর্ভে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ডানহাত স্বামী বিবেকানন্দজীর জীবন, আধ্যাত্মিকতা, কর্ম ও দর্শন এক সুবিশাল মহাযজ্ঞ । যা তাঁর মত আর একজন কর্মযোগীর পক্ষেই তাঁর জীবন, কর্ম ও ধর্ম পর্যালোচনা সমুচিত, আমার মত সাধারণের পক্ষে এ পঙ্গুর গিরি লংঘন ছাড়া অন্য কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না । আমি তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থী । আমি একজন যুবক হিসেবে তাঁর মত–একজন মহান কর্তব্যপরায়ণ সর্বত্যাগী যুবক হিতৈষীর সকল দায় দায়িত্ব ও চিন্তা-চেতনা সম্বল করে– জীবনে যেন তাঁর ইচ্ছার অনুবর্তি হতে পারি । সাধ্যমত তাঁর কাজে এগিয়ে আসতে পারি । তাঁর মত মানব কল্যাণে নিজ জীবনকে উৎসর্গ করতে পারি । আত্মস্বার্থ ভুলে দেশ জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে পারি, এই প্রার্থনা ।

শ্রীঅরবিন্দ জীবন ও কর্ম

১.৫: ভূমিকা

শ্রীঅরবিন্দের জীবনী লিখা আমার জন্য অকল্পনীয় ও অসম্ভব কাজ। কারণ শ্রীঅরবিন্দ নিজেই তাঁর জীবনী লিখা সম্পর্কে রসচ্ছলে বলেছেন, "আমার শিষ্যদের হাতে ছাপার ঠান্ডা অক্ষরে আমি মরতে চাই না।" তিনি আরও বলেছেন, 'তাঁর জীবনী একমাত্র তিনিই লিখতে পারেন।'[৭] কারণ যোগীদের প্রাকৃত জীবনের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল, প্রকৃত অন্তর্জীবন; তারই কতকগুলি ঢেউ বাহ্য ঘটনা হিসেবে প্রকাশ পায় মাত্র। আর এই ঘটনাবলী নিয়েই আমার মত একজন ক্ষুদ্র গবেষণাকারীর কারবার। যেহেতু আমি তাঁর অন্তর্জীবনের অতলান্তিক প্রদেশে পৌঁছতে অক্ষম, তাঁর প্রকৃত স্বরূপকে ফুটিয়ে তুলতে অপারগ। তখন যতটুকু প্রকাশলাভ এখানে ঘটেছে তা তাঁরই মহতি কৃপা ও আমার গবেষণার সামান্য ফল।

১.৬: শ্রীঅরবিন্দের জীবন বৃত্তান্ত, বাল্য, যৌবন ও শিক্ষাকাল

১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ঈশ্বর চিহ্নিত এই মহামানবটি ব্রাহ্মণমুহূর্তে ভোর সাড়ে চারটার সময় জন্মগ্রহণ করেন কলকাতায়। কাকতালীয়ভাবে সেই ১৫ই আগস্ট (১৯৪৭) তারিখটিতেই ভারত– পরাধীনতার শৃংখল থেকে অর্গল মুক্ত হন, লাভ করেন দেশের সার্বভৌমত্ব ও পূর্ণ স্বাধীনতা। নিঃসন্দেহে তাঁর জন্মলাভের সাথে ভারতভূমির স্বাধীনতার যোগসূত্রটি– সম্ভবত শ্রীভগবানের এক অজ্ঞাত লীলা বলে অনেকেই মনে করেন। তাঁর বাল্য নাম ছিল অরবিন্দ ঘোষ। পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ ছিলেন, কোন্নগরের বিখ্যাত ঘোষ বংশের ছেলে। মাতা স্বর্ণলতা দেবী ছিলেন রংপুরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের রূপে-গুণে অতুলিনীয়া মহীয়সী নারী। কৃষ্ণধন ছিলেন তৎকালীন এম ডি পাশ করা বিখ্যাত একজন বিলেত ফেরত ডাক্তার। চাকুরীতে শেষ পদবী লাভ করেছিলেন 'সিভিল সার্জন' রূপে। তাঁর জনসেবার পদবী স্বরূপ তিনি জনগণের নিকট সুপরিচিত হয়েছিলেন, 'দীনবন্ধুনারায়ণ' বলে।

৭। নীরদবরণ, **শ্রীঅরবিন্দ্রায়ন,** কলিকাতা: শ্রী অরবিন্দ পাঠমন্দির, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৪০৮, পৃ.,২

অরবিন্দ ঘোষের তিরোভাব দিবসটি ছিল– ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ। ১৮৭২ থেকে ১৮৭৭ খ্রিঃ এই পাঁচবছর মাত্র তাঁর পিতা-মাতার সাথে বসবাস, অর্থাৎ বাল্যজীবনকাল। পঞ্চম বর্ষ থেকেই তাঁর জীবনে শুরু হয় তাঁরই পিতার সদিচ্ছায় পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতায় নবদিগন্তের এক নতুন আলো দানের জীবন। ইংরেজি মিডিয়ামে বিদ্যা শিক্ষা লাভ করে যাতে পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতা ও কৃষ্টি সম্পর্কে সহজে অনুধাবন পূর্বক– সুনামের সাথে একটি নতুন সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনের ভারত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারেন, তাঁর পিতার মনে-মনে ছিল অন্তর্নিহিত এই সুপ্ত অভীপ্সা। তিনি এজন্য বাল্যেই সন্তানের স্নেহ, মায়া ও মমতা পরিত্যাগ করে তাঁর প্রবাস জীবনের চিন্তা করে– দার্জিলিং-এর এক মিশনারী বিদ্যালয় লরেটো কনভেন্ট স্কুলে আবাসিক ছাত্র হিসেবে বালক অরবিন্দকে ভর্তি করান। সাত বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৮৭৯ সালে তাঁর পিতার ইচ্ছা মোতাবেক তিনি চলে যান সুদূর বিলেতে তাঁরই সুপরিচিত বন্ধু ডুয়েট দম্পতির তত্ত্বাবধানে। মিঃ ডুয়েট ছিলেন লাতিনে সুপন্ডিত। শৈশবেই শ্রীঅরবিন্দ লাতিন ভাষা কৃতিত্বের সাথে আয়ত্ত করেন।

বারো বৎসর বয়সে ১৮৮৪ খ্রিঃ লন্ডনের বিখ্যাত সেন্ট পলস্ স্কুলে ভর্তি হন। শ্রী অরবিন্দের লাতিন ভাষা জানা থাকায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ড. ওয়াকার সাহেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অরবিন্দকে গ্রিক্ ভাষায় উচ্চ জ্ঞানী করে তুলেন। এই স্কুল থেকেই যাবতীয় পাঠ সম্পন্ন করে ১৮৮৯ খ্রিঃ ডিসেম্বর মাসে শ্রী অরবিন্দ বৃত্তি লাভ পূর্বক কেমব্রিজে কিংস কলেজে ভর্তি হন। অতঃপর তিনি এখানেই মন দিয়ে পড়াশুনা করে ইংরাজী ও ফরাসী সাহিত্য এবং ইউরোপের ইতিহাসে গভীরভাবে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। গ্রিক ও লাতিনে আশি পাউন্ড বৃত্তি লাভ করেন। ইতোমধ্যে ইতালিয়ান, জার্মান স্প্যানিশ ভাষায় সুপন্ডিত রূপে গড়ে ওঠেন। ষোল বছর বয়সে ইংরেজিতে কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। গ্রিক ও লাতিন ভাষাতেও কবিতা লিখে সবার মন কেড়ে নেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পুরস্কারই লাভ করেন। কেমব্রীজে অধ্যয়ন কালে তাঁর সুতীক্ষ্ণ প্রতিভাবান বুদ্ধিদ্বারা তিনি বিখ্যাত কবি রবার্ট ব্রাউনিঙয়ের সুযোগ্য পুত্র অধ্যাপক অস্কার ব্রাউনিঙকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিলেন। তাঁর কৃতিত্বের কথা একদিন চায়ের টেবিলে বসে কেমব্রীজ কিংস্ কলেজের জনৈক অধ্যাপক মুক্ত কন্ঠে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে ব্যক্ত করেছিলেন, “আমি বৃত্তি-পরীক্ষার উত্তরমালা আজ

তের বছর ধরে পরীক্ষা করে আসছি, কিন্তু এত বছরের মধ্যে তোমার (অরবিন্দের) উত্তর পত্রের মত একটাও আমার চোখে পড়ে নি। অপূর্ব হয়েছে তোমার প্রবন্ধটি।"[৮]

সুদীর্ঘ ১৪ বৎসর ইংলন্ডে থেকে পাশ্চাত্য জ্ঞানভান্ডার রপ্ত করে ২১ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৮৯৩ সালে তিনি ফিরে এলেন দেশমাতৃকার সুপ্ত টানে ভারতবর্ষে। ১৮৯৩ হতে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন বরোদায় কর্মরত। দেশমাতৃকার মুক্তি সাধনা তাঁর বিদেশ থেকেই শুরু হয়। কারণ তাঁর জন্মই হয়েছিল তাঁর পূর্বপুরুষদের বিপ্লবের রক্ত থেকে। ১৯০৪ সাল থেকেই ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার গভীরে প্রবেশ করেন। গুরু ছাড়াই যোগসাধনায় মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে তিনি মৃণালিনী দেবীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধা তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন গভীর একাগ্রতার অধিকারী পুরুষ। জীবনভর তিনি ছিলেন, মধুর স্বভাব ,শান্ত, বিনয়ী ও স্বল্পভাষী । সম্পূর্ণ একটি আলাদা জাতের মানুষ। সকল প্রকার বিদ্যার্জন ও জ্ঞানলাভ করা ছিল তাঁর একমাত্র জীবন সাধনা। তিনি ছিলেন, একাধারে কবি, দার্শনিক, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক নেতা, স্বদেশী বামপন্থী স্বাধীনতা আন্দোলনের পূরোধা, ঋষি, যোগী এবং বহুভাষাবিদ ও ভারতের নামী দামী অনেক পত্র পত্রিকার বিচক্ষণ সম্পাদক। যাঁর অভাবনীয় সম্পাদনা শক্তি ও ক্ষুরধার সম্পন্ন লেখনীর আহ্বানে স্বদেশী আন্দোলনে সমগ্র ভারতবাসী একত্রীভূত হয়ে আন্দোলনমুখী হয়েছিলেন। তিনি সবসময় পছন্দ করতেন নিরিবিলি গোপন জীবন-যাপন। সাধারণ ডাল-ভাত, নিরামিষ খাওয়া-পরা, সাদাসিদা অনাড়ম্বর জীবন,

সাধারণ পোষাক পরিচ্ছদ, সারাক্ষণ গভীর উচ্চ-চিন্তায় মগ্ন থাকা, কথা কম বলা ছিল তাঁর স্বভাব। অসম্ভব বিনয়ী, উদার ও পরোপকারী ছিলেন। অপছন্দ করতেন, বাজে গল্প, হৈ-হুলোড়, খেলাধুলা ইত্যাদি, এগুলি ছিল তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। `Plain living and high thinking' ছিল তাঁর জীবন ব্রত।

৮। পৃথ্বীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, **সমসাময়িকের চোখে শ্রীঅরবিন্দ**, কলিকাতা: শ্রী অরবিন্দ সোসাইটি, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৯, পৃ.,৩

বৃটিশদের অধীনে চাকুরী করতে তাঁর মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। তাই তিনি সরকারী সর্বোচ্চ চাকুরী লাভ করেও তা প্রত্যাখান করে– বরোদায় প্রাইভেট একটি কলেজে চাকুরীতে যোগদান করেন। উদ্দেশ্য ছিল– সরকারের বাধ্যবাধকতা ও নিয়ন্ত্রণের কবল হতে নিজেকে মুক্ত রেখে স্বাধীনভাবে দূরে বসে সংগঠন তৈরি করা এবং স্বদেশী যুবকভাইদের আন্দোলনমুখি করে গড়ে তোলা। দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার শৃংখল হতে যেভাবেই হোক মুক্তি দান করা। এই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম সদ্দিচ্ছা।

১.৭: সংসার ও চাকুরী জীবন (কর্মজীবন)

এই দুটি জীবনই ছিল তাঁর জন্য নিরুপায়ের একটি উপায়স্থল জীবন। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর্তব্য কর্মের একটি অংশ বিশেষ। কারণ তাঁর জীবন আর দশজনের মত ছিল না। তাঁর জন্ম হয়েছিল দেশ জাতির কল্যাণের জন্য, নিজের জন্য নয়। এটাই শ্রীভগবানের সদ্দিচ্ছা। এজন্য এই ব্যতিক্রম ধর্মী জীবনটি নিয়ে আপাত তাঁকে সময় অতিবাহিত করতে হয়েছিল একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য। ২৯ বছর বয়সে তাঁকে বিয়ে করতে হল নিরুপায় হয়ে এক নাবালিকা কন্যাকে। এরও পিছনে একটি সুনির্দিষ্ট কারণ ও তাৎপর্য ছিল। ভগবানের ইচ্ছা তিনি সংসার-যোগী হবেন। যদিও এ-দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ তারপরেও ঐক্যস্থাপন নিয়তির একটি ব্যতিক্রম পদ্ধতি।

আমরা জানি– যোগীদের জন্য ব্রহ্মচর্য জীবনই সত্য, সংসার জীবন নয়। কারণ যোগী হতে চাইলে কঠোর সংযমী জীবন-যাপন করতে হয়। কিন্তু তাঁর বেলায় হল এর উল্টোটি। স্বাভাবিকতার পরিবর্তন ঘটায়ে অস্বাভাবিকতার মাধ্যমে জীবন গঠন একমাত্র বিধির বিধানেই সম্ভব। তিনি যা চাবেন তাই হবে, তাঁর ইচ্ছা পরিবর্তন করা মানবের অসাধ্য। তিনি যে সংসারী হয়েও যোগী হবেন অর্থাৎ ‘ বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়, অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব আমি মুক্তির স্বাদ’, কবিগুরুর এই আদর্শ তাঁকে যে প্রভাবিত ও বাস্তবায়িত করবে– নিঃসন্দেহে এটি একটি অসাধারণ কর্তব্য। আমরা পরবর্তিতে একারণেই দেখতে পাই, তাঁর সংসার জীবনটি ছিল নামে মাত্র একটি কর্তব্যের জীবন। দৈহিক সুখভোগের জন্য তাঁর এই জীবন ছিল না। কঠোর

ব্রহ্মচর্য ব্রতপালনই ছিল তাঁর জীবন উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যেই তাঁর সংসার জীবনটিকে ঘিরে তাঁর অনুগামীদের নিকট বিশেষ আলোচ্য বিষয় হিসেবে তেমন কোন প্রাধান্যলাভ করেনি বা গ্রহণযোগ্য বলে উৎসাহিত করেনি।

শ্রীঅরবিন্দ যে সময় বিয়ে করেন, তখন তিনি সরকারী রোষানলের একজন বিরোধী, বিপ্লবী ও বিদ্রোহী নেতা। সরকার তাঁকে আটক করার জন্য যত্রতত্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কারারুদ্ধ করার জন্য স্পষ্ট প্রমাণ খুঁজছেন। তিনি স্থায়ীভাবে এজন্য কোথাও থাকতেন না। অন্ধ কারগার-জীবন থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য এবং ভারতের স্বাধীনতা আদায়ের জন্য স্বদেশীদের সাথে গোপন সাক্ষাৎ, পরিকল্পনা তৈরি, গোপন মিটিং, ইত্যাদি জীবন-যাপন ছিল তাঁর তখন নিত্য সাথী। দাম্পত্য জীবন এজন্য ছিল একটি নামমাত্র জীবন। তাঁর সহধর্মিনী ছিলেন সতী স্বাধ্বী। কোন দিন তিনি তার স্বামীর কাছে স্ত্রীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জোর করেন নি। বরং সবসময় তাঁর কাজে সহায়তা দান করেছিলেন। নিজের আত্মত্যাগ দিয়ে স্বামীর সহকর্মিনী রূপে তাঁর পাশে কর্মনিরত ছিলেন।

এর প্রমাণ খুঁজতে যদি আমরা ইচ্ছা প্রকাশ করি তবে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর স্ত্রীর প্রতি লেখা ১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর পত্রটি এবং অন্যসময়ের আরও কয়েকটি লিখা পত্র কয়েকটি পাঠ করলেই বুঝতে পারব স্বামীর উপদেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাশীলতা ও অনুগামিতা– আমাদের প্রমাণ করে, তাঁদের মধ্যে মতৈক্য ছিল কত উদার ও মহৎ। ভারতের নারীরা যে ভোগী নয়; ত্যাগই যে তাঁদের জীবন কর্ম ও ধর্ম, স্বামীর ইচ্ছাই যে তাদের ইচ্ছা, পতিকে গুরুজ্ঞান করাই যে ভারতীয় নারীর ধর্ম, কায়মনোবাক্যে স্বামীর আদেশ প্রতিপালন ও তাঁর সেবাই যে নারীর ধর্ম, গুরুব্রহ্ম জ্ঞানে স্বামী প্রেমের অধীন থাকতে পারলেই যে নারীর জন্ম সার্থক। এই ছিল ভারতীয় ঋষিদের বেদ বিহিত জাতীয় শিক্ষা। তার প্রমাণ ভারতের ইতিহাসের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ আছে।

সেই সব মহীয়সী নারীদের সামান্য সংসার-সন্তান-সুখ ও ভালবাসার চেয়ে– ভারতের সকল সন্তানকে আপন সন্তান বলে গ্রহণ করাই যে ভারতীয় নারীদের অধ্যাত্ম সাধনা ও ঐতিহ্যগত স্বভাব সাধনা– বর্তমান যুগে সেই আদর্শ অধিকাংশ নষ্ট হয়ে গেলেও সম্পূর্ণ অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়নি আজও। এই ত্যাগ শক্তি শুধু

ভারতমাতার স্বধর্মপ্রাণা মমতাময়ী মাতাদেরই বর্তমান। এই শিক্ষা আর অন্য কোন জাতির মায়েদের মধ্যে এতটা প্রশস্ত কি না আমার জানা নেই। এককালে স্বামীর জন্য স্বেচ্ছায় জীবন দান, স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি– এই পতিপ্রেমী ধর্মপরায়ণা সতী-স্বাধ্বী ভারতীয় মাতারাই তাঁদের আত্মত্যাগের মহিমা ও গভীর ভালবাসার উপমা স্বরূপ স্বামীর জন্য আত্মবিসর্জন ও জীবন দান প্রথম এই পৃথিবীতে দেখিয়ে ও দেখায়ে গেছেন। তারা তাদের সেই সময়ের দাম্পত্য জীবনকে এক পক্ষির দু'টি ডানা বলে উল্লেখ করতেন। পক্ষির একটি ডানা যদি ছেদন করা হয় তবে একটি ডানা নিয়ে বেঁচে থাকা যেমন তার পক্ষে অসম্ভব, স্বামী স্ত্রীর মিলিত জীবনও তদ্রূপ। পতিপ্রাণা মৃণালিনীদেবীর দাম্পত্য জীবনও ছিল অনেকটা সেরকম।

কর্মযোগী শ্রীঅরবিন্দের বাণী থেকেই আমরা জানতে পারবো, তাঁর সংসার ও কর্মজীবনকে তিনি কি চোখে দেখতেন।

শ্রীঅরবিন্দ বলেন, "আমার প্রথম স্বপ্ন ভারতে বিপ্লব সংগঠন; যাতে ভারত হবে স্বাধীন, দ্বিতীয় স্বপ্ন এশিয়ার জনগণের পুনরভ্যুত্থান ও মুক্তি, তৃতীয় স্বপ্ন বিশ্ব মিলন, চতুর্থ স্বপ্ন ভারত জগতকে দেবে তার বহুমূল্য অধ্যাত্ম সম্পদ ও জ্ঞান....সেই কাজ আজ জগদ্‌ব্যাপি সংগঠন হতে চলেছে।"[৯]

শ্রীঅরবিন্দের কর্মযোগ ছিল মূলতঃ জ্ঞানের আলোর দীপশিখায় জীবনের পথ চলা। শিক্ষাকে তিনি তাঁর কর্মের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অসির চেয়ে মসির শক্তিকেই জীবনে আত্মশক্তির স্বরূপ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। অসি যেহেতু সশস্ত্র সন্মুখ ক্ষমতা শক্তি, আর মসি নিরস্ত্র বুদ্ধি শক্তি, তখন বিচক্ষণ প্রজ্ঞাধিকারী শ্রীঅরবিন্দ বুঝেছিলেন, সমগ্র ভারতবাসীকে বিনা রক্তক্ষয়ে সুবিশাল এক জনসমুদ্রের আত্মশক্তিতে সুসংঘবদ্ধ করতে হলে মসি শক্তিকেই প্রাধান্য দান করা উচিত।

৯। শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার, **ঋষি অরবিন্দের যোগ-জীবন ও সাধনা**, কলিকাতা: শ্রী অরবিন্দ সোসাইটি, শ্রীঅরবিন্দ ভবন, ৫ম পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০০০, পৃ., ১৮

এই ক্ষুরধার সম্পন্ন লিখনী দ্বারাতেই বুদ্ধিমান বৃটিশ শক্তিকে কাবু করা যতটা সহজ হবে রক্ত ক্ষয় করে ততটা হবেনা । বরং এতে দেশ, জাতি ও দশের ক্ষতিই হবে বেশি ।

১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী শ্রীঅরবিন্দ বরোদা রাজ্যের রাজকার্যে প্রথম যোগদান করেন । শুরু হল তাঁর প্রত্যক্ষ কর্মজীবন । প্রথমে তিনি বরোদা রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে কিছু কিছু কাজ করার পর পাকাপাকি ভাবে তিনি বরোদা রাজ কলেজের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন । এই সময় তিনি কঠিন জ্ঞান তপস্যায় নিজেকে নিযুক্ত করেন । বেদ, বেদান্ত, গীতা ও অন্যান্য ভারতীয় বৈদিক ধর্মশাস্ত্র সমূহের মূল সংস্কৃত ভাষার সকল গ্রন্থরাজিগুলি নিজের একক প্রচেষ্টায় অধিগত করে– হিন্দুধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বের সাথে পরিচিত হন । তাঁর প্রতিভাশক্তি এত প্রখর ছিল যে, ভারত বর্ষের অনেক জ্ঞানী গুণী ভাষ্যকার ও টিকাকারের ব্যাখ্যার ভুল সংশোধন করে উক্ত সংস্কৃত শ্লোকগুলির প্রকৃত অর্থ সবার মাঝে তুলে ধরেন । তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় বেশ পান্ডিত্য লাভ করেছিলেন । এরই বদৌলতে তিনি বৈদিক সাহিত্যের দ্বার উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছিলেন ।

বরোদায় তাঁর অতি সাধারণ অনারম্বড় জীবন-যাপন,কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি অনাসক্তি উপেক্ষা, যেখানে সেখানে টাকা পয়সা ফেলে রাখা, হিসেব নিকেষ না রাখা, মায়িক সংসার জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীনতা, কঠোর ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন, জীবনে না ছিল কোন বিলাস ব্যসন, না ছিল বিষয় সম্পত্তির উপর কোনপ্রকার বিন্দুমাত্র লোভ লালসা । তাঁর এই ব্যতিক্রম জীবন প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর নিকটতম একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন,

“দেখ ! আমার হিসাব ভগবান রাখছেন, আমার যতটুকু প্রয়োজন তিনিই তা দিচ্ছেন– এবং বাকিটা তিনিই রাখছেন । যে ভাবে হোক তিনি কোনদিন আমাকে অভাবে রাখেন নি– তাহলে কি জন্য আমি অনর্থক চিন্তাগ্রস্ত হব ।”[১০]

১০ । ঐ, পৃ., ২০

সালটি ছিল ১৮৯৯; এই সময়ে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তিতে নিরালম্ব স্বামী, নামে একটি যুবক বরোদায় আসে শ্রীঅরবিন্দের নিকট। উদ্দেশ্য স্বদেশী আন্দোলনে বিপ্লবাত্মক কাজে যোগদানের জন্য। অরবিন্দ তাকে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষার জন্য বরোদার সেনাবিভাগে প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দেন। ১৯০১ সালের ছুটিতে অরবিন্দ, যতিন ও বারিন সহ মেদিনীপুরে বিপ্লব সমিতি সংগঠনের জন্য আসেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি কলিকাতার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার পি, মিত্রের সাথে সাক্ষাত করে বাংলায় বিপ্লবী দল গঠনের জন্য আলোচনা করেন। এবং তাঁকে বিপ্লবী দলের শপথ বাক্য পাঠ করান। এর পর দ্বিতীয় বার মেদিনীপুর গিয়ে শ্রী হেমচন্দ্র দাসের হাতে তরবারি ও গীতা দিয়ে তাকেও শপথবাক্য পাঠ করান। ঐ সময় রাজপুত যুবরাজ ঠাকুর রামসিং এর নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রেও একটি বিপ্লবী দল গঠিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ বাংলার দলের সাথে এই দলের সংযুক্তি স্থপন করেন। এই ভাবে দেওঘরে সত্যেন বোসের সহযোগিতায় আর একটি বিপ্লবীদল তৈরি হয় । এসবের মূলে ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। তিনি বাংলা থেকে সারা দেশে এইভাবে বিপ্লবীদল তৈরি করতে থাকেন। এইভাবে ১৯০৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী হতে ২১শে মার্চ পর্যন্ত তিনি পি, মিত্রের সহযোগিতায় হাজার হাজার বিপবী সদস্য তৈরি করেন।

বারীনের কাগজ যুগান্তরের মাধ্যমে বিপ্লবের আবহাওয়া ছড়াতে থাকে। কুটকৌশলী ক্ষমতাসীন শক্তিশালী বৃটিশদের ভারত হতে তাড়াতে বাধ্য করার জন্য এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত শ্রীঅরবিন্দকে বোমা তৈরির পরিকল্পনা, ভারতে সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য সামরিক শিক্ষা নেওয়া ও অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ এবং জাতির আত্মরক্ষার জন্য খাসিয়াওয়ের ভাই মাধব রাওকে ইউরোপে পাঠান।

এদিকে এই মুহূর্তে ইংরেজ সরকার স্থির করলেন, বাংলাদেশকে ভাগ করে বিপ্লবের গতিরোধ করবে। তবুও বাঙালীকে এক হতে দেওয়া যাবে না। লর্ড কার্জনের নির্দেশে ১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গভঙ্গ আইন (Bengal Partition Act) পাশ করেন। শ্রীঅরবিন্দ এদিকে যতিন, বারিন, অবিনাশ প্রভৃতি কর্মীদের সামনে সহাস্য বদনে মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, এই আইন আমাদের সন্মুখে খুব সুন্দর একটি সুযোগ এনে দিয়েছে। এইবার আমাদের আন্দোলনের গতি আরও বৃদ্ধি পাবে। কারণ যে কাজে যেখানে যত

বাধা, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও গতিরোধ আসে– সেখানেই সৃষ্টি হয় দুর্বার গতি-শক্তির এক নব-সঞ্চার শক্তি। সবকিছু ভেঙে ফেলার অপ্রত্যাশিত এক অভিনব সুযোগ সৃষ্টি, তৈরি হয় একতার বন্ধন শক্তি। এখন আমাদের গোপন বিপ্লবী আন্দোলন আর নয়, প্রকাশ্যে চালাতে হবে বাঙালীদের একতাবদ্ধ হওয়ার আন্দোলন। যেই কথা সেই কাজ। বারিনের যুগান্তর পত্রিকার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লো– বাঙালীকে একতাবদ্ধ হওয়ার আহ্বান। সৃষ্টি হল গণআন্দোলন। সরকারী গয়েন্দা বিভাগের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি তখন সর্বক্ষণ অরবিন্দের প্রতি।

কুটকৌশলী বুদ্ধিমান বৃটিশ সরকার এই আন্দোলনের মূল হোতাকে খুঁজতে থাকলেন। এই মুহূর্তে শ্রীঅরবিন্দের প্রতি শ্রীভগবানের নিকট হতে প্রত্যাদেশ এল, 'আর এগোনোর দরকার নেই। আত্মনিমজ্জিত হও'। শ্রীঅরবিন্দ বৃটিশ সামরিক জান্তাদের হাতে ধরা পড়লেন। আলীপুর কারাগারে তাঁকে আটক রাখা হল। এই আলীপুর কারাগারেই তাঁর কঠোর যোগ তপস্যা শুরু হল। বিষয়টি ঠিক এরকম– মানুষ যতক্ষণ তার আত্মশক্তি প্রকাশ করে ততক্ষণ সর্বশক্তিমানের শক্তি নীরব থাকে। মানুষ যখন নিরূপায় হয়, কোন ক্ষমতা তার থাকেনা, তখনেই ভগবানের প্রতি মানুষ নির্ভরশীল হয়, তাঁর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে, তার শরণাগতি বাড়ে। অর্জুনকে ভগবান যেমন তার আত্মঅহমিকাকে যুক্তিতে পরাস্ত করে অন্ধকার থেকে আলো দেখিয়েছিলেন, তিনিই যে একমাত্র কর্তা এবং অর্জুন যে নিমিত্ত মাত্র ধ্বজাধারী, শত্রু বধ যে তিনি নিজেই পূর্বে করে রেখেছেন বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জুন যখন নিজেই দেখলেন, জানলেন ও বুঝলেন তখন কি তার ক্ষমতার দম্ভ ছিল ? বরং ভগবানের প্রতি এসেছিল পূর্ণ শরণাগতি। বুঝতে পেরেছিলেন নিজের ক্ষমতা ও বুদ্ধি শক্তির সীমাবদ্ধতা।

এই গীতা শিক্ষা থেকেই শ্রীঅরবিন্দ নীরব, নিস্তব্ধ ও নিরস্ত্র হয়ে আর এক পা অগ্রসর না হয়ে প্রভুর সাক্ষাতের জন্য অধীর আগ্রহে তাঁর আদেশ মেনে নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলেন। তাঁর পরবর্তি করণীয় কি উপদেশ আসে তা পাওয়ার আশায় শান্ত মনে জেলে দিন কাটাতে লাগলেন এবং যোগসাধনায় আত্মনিমগ্ন রইলেন। অবশেষে ভগবান ঐ জেলের মধ্যে তাঁকে দর্শন দান করে আদেশ দিলেন, পন্ডিচেরী চলে যাওয়ার। ব্যারিষ্টার দেশবন্ধূ চিত্তরঞ্জন দাসের ভিতর ভগবান বাসুদেব এক অভাবনীয় শক্তি প্রয়োগ করে একাধারে

কয়েকদিন ধরে অনবরত বাগ্মিতায় বিচারককে আইনের যুক্তিতে– অরবিন্দকে নির্দোষ প্রমাণ করে– তাঁকে মুক্ত করেন। এরপর থেকে বাকি কাজ ভগবান তাঁর সারথীরূপে জাতীয় জাগরণের একমাত্র হেতু হয়ে সর্বভূতে তাঁর শক্তি জাগিয়ে তুলে গোপনে তাঁর কার্য চালাতে লাগলেন। ভারতের স্বাধীনতা এনে দিলেন যথাসময়ে বিচিত্রময়ের বৈচিত্র্য মহিমায়, তাঁরই অপরূপ পরিকল্পনায়। যা সাধারণে কেউ জানতে বা বুঝতে পারলনা। যাকে বুঝার দরকার তাকে বুঝিয়ে দিয়ে তার দ্বারাতেই তাঁর বাকি কাজ করে নিলেন। সাধারণের নিকট অরবিন্দকে ভুল বুঝাতেও দ্বিধা করলেন না। তার কারণ একটিই, আন্দোলন থেকে পশ্চাদপদ নীতি শ্রীঅরবিন্দ কেন গ্রহণ করলেন ? কেন দেশবাসীর জীবনকে উপেক্ষা করে নিজের জীবনের ভালবাসাকে বড় করে দেখলেন ? কেন নিজে আত্মগোপন করে সবাইকে বিপদের মুখে ঠেলে দিলেন। এটাই নিয়তির নিয়ম। ভগবান এভাবেই নিজেকে এবং তাঁর কর্মকে প্রচ্ছন্ন থেকে ও রেখে তাঁর কাজ করেন। কিন্তু নিজেকে কারও সামনে তুলে ধরেন না এবং যাকে অবলম্বন করে তাঁর কর্ম করতে চান প্রয়োজন হলে তাকে প্রকাশ করেন নতুবা করেন না। তাঁর ক্ষমতার জোর কতটুকু তাও কাউকে বুঝাতে চান না। মরমীয়াদের ভাষায় এটি যেন ঠিক এরূপ– "মাগো, যে বুঝেছে সেই পেয়েছে, তার মায়ার বাঁধন গেছে দূরে।" অর্থাৎ তাঁকে জানতে বুঝতে চাইলে অগ্রে মায়ার বাঁধন কাটতে হবে। তবেই তিনি আমাদের সন্মুখে আসবেন। এই ছিল তাঁর মোটামুটি সংসার , চাকুরী ও কর্মজীবন পর্যালোচনা।

১.৮: অধ্যাত্ম জীবন ও দর্শন

ভারতের প্রাণ ধর্ম। এই ধর্মের মূল মর্ম– "আত্মমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"। নিজের এবং পরের উন্নয়ন চাওয়াই ভারতের জাতীয় সম্পদ। শাস্ত্রেরও সেই নির্দেশ–তুমি যেমন নিজের মুক্তি চাও, অনুরূপ তোমাকে জগতেরও মুক্তি চাইতে হবে। শুধু 'নিজে বাঁচলে বাপের নাম' এটি সাধারণের প্রবাদবাক্য হলেও ভারতের জাতীয় আদর্শ নয়।

ভারতধর্ম আমাদের শিক্ষাদান করে আসছে– তুমি বিদ্যালাভ করে আগে নিজের পরিচয় জান। অতঃপর আত্মমুক্তির সাধনা কর, নিজে মুক্ত হয়ে তখন বিশ্বের মুক্তির জন্য ঝাপিয়ে পড়, এটাই ভারতীয় দর্শনের মূল মন্ত্র। শ্রী অরবিন্দের জীবন-দর্শন আমাদের সেই প্রমাণই দান করে গেছেন। ভারতবাসীগণ এজন্যই তাঁকে ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্ বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি পরা অপরা দুই বিদ্যাতেই পারদর্শী ছিলেন। তিনি এখানেই ইতি না টেনে বরং আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে দেখিয়ে গেছেন, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ভগবান লাভ বা আত্মশক্তির স্ফূরণ। এই বিদ্যা লাভই হল প্রকৃত বিদ্যা। স্বামী বিবেকানন্দজী , অনির্বাণজী ,ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী, মহাত্মা গান্ধিজী, এঁরা সবাই ছিলেন ভারতের প্রকৃত শিক্ষাবিদ্ । আর কবিগুরু ছিলেন, স্বয়ং স্বশিক্ষক। স্বতঃউৎসারিত চেতনার এক অপূর্ব মহাপ্রকাশ। এঁরাই বর্তমান ভারতের ঋষি। আমরা যতদিন এঁদের আদর্শকে অনুসরণ না করছি ততোদিন আমরা কি পারিবারিকভাবে, কি সামাজিকভাবে, কি দেশ, জাতিগতভাবে মানব জীবনের মূল লক্ষ্য যে কি তা জানতে বা বুঝতে পারবো না।

আত্মার সাধনাই হল অধ্যাত্ম সাধনা। পৃথিবীতে এর থেকে বড় শিক্ষা বা সাধনা আর নেই। ঋষিযুগ থেকে ভারত হাজার হাজার বৎসর ধরে আমাদের ঘুরেফিরে এই বুঝাচ্ছে যে, তুমি শুধু নিজেকে আগে চিন ও জান। শিশুশিক্ষায় আমরা পড়েছি না? "আমি যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে ?" আগে শিশু যদি না জাগে, মা বল্লেই কি সকাল হওয়ার কথা শিশু শুনবে ? ইচ্ছা করে ঘুমালে কেউ কি কাউকে জাগাতে পারে ? অতএব আমি ঠিক, সব ঠিক। আমি আছি বলেই তো সব আছে। আমি নাই তো কিছুই নাই। অতএব আমার অস্তিত্ব প্রমাণ করাই হল প্রকৃত শিক্ষা, সাধনা ও ভারতীয় দর্শন বিদ্যা। এই জগতে আমি আছি বলেই তো সব আছে, যদি আমি না থাকি তবে কি থাকবে, বা কি থাকার প্রমাণ প্রকাশ পাবে ?

শ্রী অরবিন্দ দর্শন এই শিক্ষায় আগে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে তবেই অতিমানস সত্তাকে এই মৃত্যুময় জগতে অমরত্বের আহ্বান জানিয়ে গেছেন। ঘোষণা দিয়েছেন, "Even the body shall remember God."[১১] নিশ্চয়ই এই দেহও একদিন ঈশ্বরকে স্মরণ করবে। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মই মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সে

১১। ঋষি অনির্বাণ, **শ্রী অরবিন্দের যোগে দেহের অমরত্ব**, কলিকাতা: শ্রী অরবিন্দ পাঠমন্দির, দ্বিতীয় মূদ্রণ: ২০০৬, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭০, পৃ.,২

অমৃত হবে। কোথায় হবে? এইখানে? জোর করে সে ভরসা দেওয়া যায় না। তবে কোথায় হবে ? এপারে নয়; ওপারে, লোকোত্তরে।

সেই বৈদিক যুগ হতে কেবল ভারতবর্ষই দৃঢ়তার সঙ্গে বলে এসেছে, 'আমি যে অমৃত চাই, তা চাই এইখানে–এই দেহে। আমি "বিজরো বিমৃত্যুঃ" হতে চাই। জরাতে দেহের অবক্ষয়, আর মৃত্যুতে প্রাণ-চেতনার অবক্ষয়। এই অবক্ষয়ের উর্ধ্বে উঠার সাধনায় প্রাণপাত করতে হবে– এই হল এদেশের অধ্যাত্ম সাধনার আবহমান ইতিহাস। জড় যে প্রাণ আর চেতনার টুটি চেপে রয়েছে, তার বিরুদ্ধে বৈদিক ঋষির এই একটা অদ্ভূত চ্যালেঞ্জ। আমরা এই প্রবল প্রাণধর্ম হতে ভ্রষ্ট হয়েছি, অমৃতত্ত্বের অখন্ড সাধনাকে দৃষ্টির বিকারে খন্ডিত করেছি। তাই আমাদের ধর্মে আড়ম্বর আছে, কিন্তু বলিষ্ঠ প্রাণের বীর্য নাই। "ধর্মো রক্ষতি ধার্মিকম" কিন্তু আমাদের জীবনে যে একথা মিথ্যা হয়েছে, তার প্রমাণ দেখছি চারিদিকেই।

বৈদিক ঋষিদের এই প্রাণোপাসনাকে প্রজ্ঞার আলোকে উজ্জ্বল করে শ্রীঅরবিন্দ আবার আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে আনলেন তাঁর বিখ্যাত Theory of Immortality যা আমাদের এই প্রাণবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। অমরত্বের ভাবনাকে তিনি তিন ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম হল, Spiritual immortality –সব ধর্মে যাকে বলা হয়েছে আত্মার অমরত্ব। ব্রহ্ম ঈশ্বর বা পরমপুরুষ অমৃতস্বরূপ। কিন্তু তাঁর অমৃতত্ব কালাতীত। আর জীব কালের স্রোতে ভেসে চলেছে, সে মৃত্যুর বশ। মৃত্যুই কাল।

জীব যদি তার জীবত্বের উপাধি ছেড়ে ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যায়, সেও অমৃত হবে। কিন্তু তার অমৃতত্ব হবে কালাতীত। কিন্ত এই যে কালবাহিত জীব আর জগৎ, সে কি কোন রকমেই অমৃত নয়, নিত্য নয় ? জীবেরও দেহ মরে কিন্তু তার প্রজ্ঞান ভেসে চলে অমৃতের দিকে এবং কালবাহিত হয়েও সে কিন্তু স্বরূপত অমৃত। জীবের এই ভাসন্ত অমৃতভাগ হল তার চৈত্যসত্তা (psychic being), জন্মজন্মান্তরের ভিতর দিয়েও যে অমৃত। এই অমৃতত্ত্বকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, psychic immortality বা চৈত্যসত্ত্বের অমরত্ব। অমরত্বের শেষ ভাগটি সম্পর্কে বলেছেন, জরা এবং মৃত্যুই দেহের একমাত্র পরিণাম নয়, তার মধ্যেও চলেছে একটা

চিন্ময় বিবর্তন। চৈতন্যই যদি বিশ্বের মূল তত্ত্ব হয় এবং তা যদি হয় সর্বত্র অনুস্যূত, তাহলে দেহও চিন্ময় হবে না কেন ? এই ছিল শ্রী অরবিন্দ দর্শনের মূল সূত্র। তিনি জীবনে এর অনেকখানি বাস্তবায়িত করে গেছেন। বাকি দায়িত্ব আমাদের উপর দিয়ে গেছেন।

তিনি এমন এক ভাগবত শক্তির সন্ধান লাভ করেছিলেন, যেই শক্তি পূর্বের বৈদিক কালের দর্শনের চেয়ে একটু ব্যতিক্রম। এই আলাদা শক্তিটির উপর নির্ভর করেই তিনি এই মাটির পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যে (Kingdom of God) রূপান্তরিত করার প্রত্যাশা ও যথেষ্ট দাবি প্রকাশ করে গেছেন। সংক্ষিপ্তভাবে শ্রী অরবিন্দ দর্শনের এখানেই বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য।

১.৯ উপসংহার: সমস্ত ভারত বর্ষ যখন পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং পরাধীনতার গ্লানিতে নিমজ্জিত তখন চারদিকে শুধু ত্রাহি ত্রাহি ভাব। সমস্ত ভারতবাসী তখন মুক্তির আশায় উন্মুখ। ভারত বর্ষের এমন এক পরিস্থিতিতে মানুষের মুক্তিদাতা হিসেবে আগমন ঘটে ঋষি অরবিন্দের। অরবিন্দের জীবন বিশ্লেষনে দেখা যায় কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্য পুরণের জন্য যেন ভারতবর্ষে তাঁর আগমন ঘটেছিল। তাঁর প্রথম উদ্দেশ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লব সংগঠন করা, অর্থাৎ বিপ্লবের মধ্যো দিয়ে তিনি ভারতের স্বাধীনতা আনয়নে প্রয়াসী ছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল এশিয়ার জনগণের পুনরভ্যূত্থান ও মুক্তি। সমস্ত পৃথিবীর সাথে সেতু বন্ধ রচনা করার ইচ্ছায় তিনি চেয়েছিলেন ভারত যেহেতু অধ্যাত্ম সম্পদে সম্পদশালী সেহেতু ভারত সমস্ত জগতকে দেবে অধ্যাত্ম সম্পদ ও জ্ঞান এবং জগতের বিভিন্ন দেশ থেকে নেবে বিজ্ঞানের জ্ঞান ও কর্মের প্রেরনা এটি ছিল তাঁর তৃতীয় উৎস। তাঁর চতুর্থ উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ব মিলন অর্থাৎ জগৎ ও জীবে সব বিভেদ ভুলে এই ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত করা যে, জীব ও জগৎ একাকার। এ সমস্ত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন বেদান্তের। আর বেদান্তের সহযোগিতায় তিনি যে তাঁর উদ্দেশ্যগুলো মোটামুটি পূরণ করতে পেরেছিলেন তাঁর জীবনী ও বাণী পাঠ করলেই জানা যায়।

শ্রীনিগমানন্দের জীবন ও কর্ম

"ওঁ সচ্চিদানন্দরূপায় ব্রহ্মণে নিগমাত্মনে

নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরুবে বুদ্ধিসাক্ষিণে।

ওঁ নম ভগবতে শ্রীশ্রী নিগমানন্দায় নমঃ নমঃ।"[১২]

১.৯: ভূমিকা

শ্রীনিগমানন্দ সম্বন্ধে কিছু লিখতে যাওয়া আমার পক্ষে স্পর্ধার কথা, এতে সন্দেহ কি ? তবে তিনি আমার জীবনদেবতা। তাই অকৃতার্থ প্রয়াসেরও আছে চরিতার্থতা। মানুষ যাঁর কাছে পায় চরম পথের পরম আলোর সন্ধান তাঁর কথা বলতে তৃষ্ণা জাগে বৈকি? কিন্তু আত্মসমর্থনের পালা থাকুক। সবাই এটুকু অন্তত বুঝবেন যে, শ্রীনিগমানন্দের মহত্ত্বের কোন ছবি আঁকার প্রযত্ন এ নয়– সে অসম্ভব। আমাদের চেষ্টা হোক শুধু তাঁর কথা যা পারি কিছু বলতে– যতটা পারি ব্যক্তিগত ভাবে এ ক্ষেত্রে সেই পন্থাই সবচেয়ে নিরাপদ– যেহেতু যোগসাধন সম্বন্ধে নৈর্ব্যক্তিক কথা বলার অধিকারী আমি নই। তাঁর রচিত পুস্তক, গবেষণাকারী, গুণগ্রাহী সেবক, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, আদর্শগৃহী, ভক্ত-শিষ্য কথা এবং বিভিন্ন পত্রাবলী মাধ্যমে যতটুকু হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছি আমার অভিসর্ন্দভে এ তারই বিবৃত রূপ।

১.১০: শ্রীনিগমানন্দের জীবন বৃত্তান্ত

জন্ম বাংলা ১২৮৭ সাল, ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ, ঝুলন পূর্ণিমা তিথি, রোজ বৃহস্পতিবার। মহাসমাধি- ১৩৪২ সন, ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দ, ১৩ই অগ্রহায়ণ রোজ শুক্রবার। সময় দুপুর ১টা ১৫মিনিট। ৪৬/বি/১, বীডনষ্ট্রিট, কলিকাতা, হাওড়া। পিতা ভুবন মোহন চট্রপাধ্যায়, মাতা মানিক সুন্দরীদেবী, জন্মস্থান রাধাকান্তপুর মাতুলালয়। পিতৃ নিবাস কুতুবপুর। বর্তমানে মেহেরপুর জেলার সাত আট মাইল উত্তরে কাথুলী বাস ষ্ট্যান্ডের

১২। নন্দ দুলাল চক্রবর্ত্তী, **পরমহংস শ্রীশ্রী নিগমানন্দদেব,** দিনাজপুর: শ্রীনিগমানন্দ সারস্বত সেবাশ্রম, ১ম সংস্করণ, ১৪১৪, পৃ.,১

এক কিলো উত্তর পশ্চিমে– নব কলেবরে নির্মিত ত্রিতল ভবন বিশিষ্ট অপরূপ শোভায় শোভা-মন্ডিত শ্রীশ্রী গুরুধাম (কুতুবপুর)।শ্রীনিগমানন্দের বাল্যনাম নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

পিতা-মাতার বহু সাধনা ও তপস্যার ফল শ্রীনলিনীকান্ত। বাল্যকালে তাঁর নির্ভিক চিত্ত, ন্যায় পরায়ণতা, সত্যবাদিতা, দুরন্তপনা, উপস্থিত বুদ্ধি, কর্মানুরাগ, সৎসাহস এবং পিতৃ-মাতৃ-ভক্তির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তকারী ছিলেন। সাত বৎসর বয়সে একদা সন্ধ্যায় চন্ডি মন্ডপে ধুপদীপ জ্বালিয়ে মায়ের চরণে অর্ঘ ও প্রণাম নিবেদন করতে গেলে জগৎ জননী মা বালিকারূপে তাঁকে দর্শন দান করেন। জগৎতারিণী মায়ের এই আর্শীবাদই একদিন বয়ে আনে সিদ্ধসাধক নিগমানন্দ নামে তাঁর মহাজীবনকে।

বাল্যকালেই হন মা হারা ও স্নেহ আদর বঞ্চিত। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র চট্রপাধ্যায় ছিলেন তাঁর জ্ঞাতি দাদু। লেখা পড়ার পাশাপাশি তিনি ছিলেন তাঁর জীবনের এক দক্ষ রূপকার। যুবক কালেই তিনি দাদু বঙ্কিমের ছোঁয়ায় নাটক, উপন্যাস, ছোট গল্প, কবিতা লিখতে শুরু করেন। উপনয়নের পর বেশ আস্তিক ও ধর্মপরায়ণ হয়ে ওঠেন কিন্তু কিছু দিন পর থেকে পৈতা ফেলে দিয়ে ঘোর নাস্তিক হয়ে ওঠেন। এই সময় পিতা ভুবন মোহন তার কুষ্ঠি হতে জানতে পারেন– 'সংসারী হলে তিনি রাজ চক্রবর্তী হবেন, সন্ন্যাসী হলে ভারত বরেণ্য সাধু হবেন "[১৩]। তপস্যালব্ধ পুত্রকে পিতা হাত ছাড়া করতে রাজী না হওয়ায় মাত্র সতের বৎসর বয়সে এগার বৎসর বর্ষিয়া কলিকাতা নিবাসী হালি শহরের শ্রীচৈতন্য বংশোদ্ভূত বৈদ্যনাথ মুখপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা কল্যাণীয়া, সুশীলা, ধর্মপ্রাণা, সতীলক্ষ্মী, অনিন্দ্য সুন্দরী শুধাংশু বালার সাথে বিবাহ দেন।

১.১১: সংসার ও চাকুরী জীবন

নলিনীকান্ত মধ্য ইংরেজী শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ঢাকায় আসেন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য কিন্তু সংসারের অবস্থার দিকে তাকিয়ে সার্ভে স্কুলে (School Survey & Engineering) ভর্তি হন। উদ্দেশ্য ছিল এই সার্ভেয়ারী পাশ করলেই ওভারসিয়ারীর যোগ্যতা অর্জন হবে।

১৩। ঐ, পৃ., ২

সহজেই একটি চাকুরী মিলবে। ঢাকা সার্ভে স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে সার্ভেয়ারী পাশ করেন। দিনাজপুর জেলা বোর্ডের অধীনে প্রথম সার্ভেয়ার পদের জন্য চাকুরীতে নিযুক্ত হন। বেতন অল্প হওয়ায় এই চাকুরী ইস্তফা দেন। সংসারের হাল ধরতে গিয়ে তাঁকে কঠোর বাস্তবতার সাথে লড়াই করে– অনুপমা সুন্দরী স্ত্রীর সান্নিধ্য ত্যাগ পূর্বক প্রবাস জীবন যাপন করতে হয়। মাত্র ৮ সাসের প্রকৃত বিবাহ জীবনের যবনিকা এক স্বপ্নময় সোনালী ভবিষ্যৎ; শুভ সূচনা লগ্নেই মুহূর্তে ধুলিস্যাৎ হয়ে যায় প্রকৃতির এক নির্মম কষাঘাতে।

জেনে রাখা ভাল, কুলপুরোহিত নলিনীর নাম নলিনীকান্ত কেন রাখলেন? নলিনী অর্থ পদ্ম, কান্ত অর্থ সূর্য। অর্থাৎ যিনি সূর্যের মত দীপ্তিমান এবং পদ্মের মত নয়নলোভন। এরই বাস্তব চিত্র ফুটে উঠে শুধাংশু সংযুক্ত রূপচ্ছটায়। শুধাংশু অর্থ চন্দ্র। সূর্য হল জ্ঞানের প্রতীক, চন্দ্র হল ভক্তির প্রতীক। পদ্ম যেমন সূর্যের আলোয় পাপড়ি মেলে এবং সূর্য অস্তে পাপড়ি বুঝে, নলিনীকান্ত ও শুধাংশু বালাও ছিলেন আলো ও আঁধারে সম্মিলিত জ্যোতি ও চন্দ্রিমার এক অপরূপ নৈসর্গিক মহিমা-মন্ডিত জ্ঞান-প্রেমের উজ্জ্বল প্রতীক। নলিনীকান্ত তার প্রাণ প্রিয়াকে কি চোখে দেখতেন তাঁর বাণীই তাঁর সাক্ষ্য।

"প্রেমময়ি! তোমার প্রেম প্লাবনের পলি পড়িয়াই না এ উষর হৃদি সরস হইয়াছে।' তাঁর চোখে শুধাংশু বালা তো সামান্য একটি মানবী মাত্র নন, ছিলেন ব্রহ্মময়ীর একরূপ। প্রায় গান গেয়ে জানাতেন, 'করুণা করিয়া প্রেমে ভাসাইয়া পরাণ গলায়ে যাও।" [১৪]

মাতা ঠাকুরাণী ছিলেন বাইরে শুধাংশুবালা ভিতরে জগৎজননী স্বরূপা। নলিনীকান্তের প্রতি তাঁর অনন্য প্রেম কি যে মধুরারতির প্রকাশ পেত তা সাধারণের জ্ঞানাতীত। নলিনীকান্ত তাই একদা ভিক্ষাপাত্র হাতে তুলে নিয়ে প্রার্থনা জানালেন, 'আমাকে ভালবাসতে শিখাও।' ঠাকুর নিগমানন্দ পরবর্তী জীবনে স্বীকার করেন– 'এমন বুকভরা ভালবাসা আমি জীবনে কোনদিন পাইনি। বাল্যকালে মা মারা গেছেন। স্নেহ, মমতা কি জিনিষ জানতাম না। আজ তোমাকে পেয়ে জীবন আমার ধন্য হল।"[১৫] প্রকৃতির ক্রমবিবর্তন ধারায় সুখ চিরদিন এক রকম থাকেনা। নলিনীকান্তের জীবনেও নেমে এল সেই নিরানন্দের বেলাভূমি।

১৪। ঐ, পৃ., ৮
১৫। ঐ, পৃ., ৮

নারায়ণপুর রাণী রাসমণির ষ্টেট। বর্তমানে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ পশ্চিম দুই মাইল দূরে– তিনি সেটেলমেন্ট কাজের পরিদর্শক পদে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। কিংবদন্তি আছে কেউ বলেন, এখানেই ঠাকুর তাঁর স্ত্রীর ছায়ামূর্তি দর্শন করেন, কেউ বলেন, নলিনী তাঁর স্ত্রীর জীবন্ত ছায়ামূর্তিকে বাস্তব জ্ঞানে প্রত্যক্ষ করে – প্রশ্ন করে অনেক কিছু জানতে চাইলেন কিন্তু শুধাংশু বালা কোন উত্তর না দিয়ে শুধু ব্যথাভরা হৃদয়ে করুণ দৃষ্টিতে এক মমতাময়ীর তীব্র আকর্ষণ নিয়ে তাঁর দিকে অপলক নয়নে তাকিয়েই থাকলেন।

নলিনীকান্ত এই দৃশ্যের অবসান ঘটানোর জন্য যখনেই তাকে ধরতে গেলেন তখনেই তিনি নিমিষেই বাষ্পের মত উড়ে গেলেন। এই অশরিরী ছায়ামূর্তির ভয়ে নলিনী কান্তের গা ছম্ ছম্ করতে লাগলো। ভয়ে চিৎকার দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। চাকর-বাকরগণ তাকে সুস্থ করে তুললেন। ভূতপ্রেত প্রতিবাদী ভয়হীন প্রগতিবাদী নির্ভীক নলিনীও জন্মান্তরীণ সংস্কার থেকে মুক্ত থাকতে পারলেন না। ভয় তাঁকে স্পর্শ করলই। পরদিন সকালে পিতার টেলিগ্রাম আসলো– 'তোমার স্ত্রী মৃত্যু শয্যায়, শীঘ্র বাড়ী চলে আস।' কাল বিলম্ব না করে নলিনী বেড়িয়ে পড়লেন গৃহাভিমুখে। আর নানান চিন্তায় তিনি ঘুরপাক খেতে লাগলেন।

বলে রাখা ভাল, নলিনী ছিলেন কঠোর বাস্তববাদী, যুক্তিতর্কে যতক্ষণ সমাধান না পেতেন ততক্ষণ তিনি নির্বিচারে অন্ধবিশ্বাসে কোন কিছু মেনে নিতেন না। অলৌকিকত্ব তিনি বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু তিনি আপন মনে ভাবতে গিয়ে নিজেই আশ্চর্যান্বিত হলেন এই কারণে যে, মানুষ যদি মরে যায় তবে তার সকল কিছু শেষ হয়ে যায়। কিন্তু মৃত মানুষ কি করে জীবন্ত রূপ ধারণ করতে সক্ষম ? শুধাংশু কি মরে গিয়ে আমাকে দেখা দিতে এসেছিল ? না-না-এ কি করে সম্ভব ? যদি বেঁচেই থাকে তবে এ সময় তার রোগ শয্যায় শায়িত থাকার কথা। কিন্তু মৃত মানুষটি আমার সামনে হাজির হল কিভাবে ? না– আমি যা দেখেছি তা ভ্রম-দৃষ্টি। পাশ্চাত্য দর্শনে মনোবিজ্ঞানীগণ বলেন, বেশীক্ষণ একজনকে চিন্তা করলে তার ভাবময় মূর্তি দর্শন হয়। আমি তো অফিসিয়াল চিন্তায় ব্যস্ত ছিলাম, তার চিন্তা তো করিনি।

যেই হোক; এই বিষয়ে নানা কিছু ভাবতে ও প্রশ্ন করতে গিয়ে কিং-কর্তব্য-বিমুঢ় নলিনী– বাড়ীর কাছে ভৈরব নদীর তীরে পৌঁছলেন। সদ্য কোন মৃতকে অগ্নিদগ্ধ করা হয়েছে কি না চারিদিকে উৎসুক নয়নে ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। কাছেই একজন পরিচিতাকে পেয়ে জানতে পারলেন তাঁর স্ত্রী গতকাল সন্ধ্যার পূর্বে মারা গেছেন। কদম তলায় তার দাহ করা হয়েছে।

এই স্ত্রী-মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই নলিনীর জীবনে নেমে এল গভীর অন্ধকারের মাঝেও এক নূতন আলোর সন্ধান। যেভাবে সেদিন সেই ছায়ামুর্তি দেখা পেয়েছিলেন, তার থেকেও অধিক বাস্তব রূপে তিনি আরও তিন তিন বার তার সাথে সাক্ষাত লাভ ও বাক্য বিনিময় করেন এবং নূতন জীবন গঠনের নির্দেশ প্রাপ্ত হন। পাশ্চাত্য দর্শন ও আধুনিক পন্ডিতদের এবং কঠোর বাস্তববাদী সাহিত্য সম্রাট দাদু বঙ্কিম চন্দ্রের আদর্শ থেকেও তিনি এতদিন যা জেনে জীবন গঠন করেছিলেন কিন্তু বর্তমান সত্য তাঁকে যে নূতন দর্শন দেখালো তা কিছুতেই কোন যুক্তিতেই প্রত্যাখান করতে পারলেন না। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব চললো কিছুদিন ধরে। শুধাংশু বালা তাঁকে পুনঃ বিয়ে করতে বাধা দিয়েছিলেন বলেই তাঁর পুনঃ বিবাহে পিতার চেষ্টা বৃথা হয়। তিনি সব ভুলে থাকার জন্য বর্তমান চাকুরী স্থল বদলি করে অন্যত্র অন্য ষ্টেটে চাকুরী গ্রহণ করেন। যশোর কুমিড়ায় একদা এক রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে তিনি দিব্য জ্যোতিপূর্ণ আজানুলম্বিত দীর্ঘকায় শশ্রুমন্ডিত এক মহামানবের সাক্ষাত প্রাপ্ত হন। তাঁর দিব্য জ্যোতিপূর্ণ আলোচ্ছোটায় সমস্ত ঘরখানি আলোকিত হয়ে ওঠে। একবার মাত্র নলিনী তাঁর দিকে তাকান। এই অবসরে মহাপুরুষ হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, ‘বৎস ! তুমি যাকে খুঁজছো এই নাও তার মন্ত্র।’ সিদ্ধ ব্যক্তির সিদ্ধ মন্ত্র সাধারণ কোন ঝাড়ফুঁক তুক্ তাক্ নয়–

এই মন্ত্র অর্থ হল– একটি ধ্বনি বা শক্তি। শুধুমাত্র অক্ষর নয়। মন্ত্র হল, এক প্রকার পবিত্র শব্দ বা বাক্য, যা ধ্বনির ভিতর দিয়ে শব্দের অর্থ-কে মনের গভীরে নিয়ে যায়। এবং যা উচ্চারণ করলে দেবতার উপাসনা করা বুঝায়,মনন করলে ত্রাণ পাওয়া যায়; মারণ, উচাটন ও বশীকরণাদি ব্যাপারেও ব্যবহৃত হয়। মন্ত্রশক্তি এই লক্ষ্যেই বৈদিক সাহিত্যের অংশ রূপে পরিচয় লাভ করে। বৈদিক গ্রন্থ থেকে যে জন্মান্তরের

কথা আমরা জানতে পাই সেখানেও প্রমাণ করে– মন্ত্রের ক্রিয়াগুলি মানব জীবনের এক জনমের ক্রিয়া নয়, প্রমাণ করে – অজ্ঞাত বহু অতীত সংস্কারের কথা বা বহু জন্মের সংস্কৃত রূপ ।

বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ Nervous System (স্নায়ু তন্দ্র) আবিষ্কার করে উল্লিখিত তথ্যকে পক্ষান্তরে স্বীকার করে যে প্রমাণ দান করেছেন তাহল– যেমন একটি শব্দাঘাতে শিশু কাঁদে আবার একটি শব্দঘাতে শিশু হাসে । এটি কিভাবে সম্ভব ? জ্ঞানহীন একটি শিশুর অন্তর ভয়, আনন্দ ও ক্রোধ এই শব্দ অর্থ কি করে বুঝে ? মস্তিকে পিটুটারী গ্লান্ডে এই সকল কোষগুলি অতীত থেকেই অবস্থিত থাকে বলেই Sensory Nerve এ আঘাত করা মাত্র Motor Nerve দ্বারা এই কার্য সম্পাদিত হয় । সনাতন ধর্মশাস্ত্র এখান থেকেও জন্মান্তরীণ এক অনাকাঙ্খিত সংস্কারের রেশ খুঁজে পায় ।

এছাড়াও বস্তুবিজ্ঞানীগণ আর একটি বিষয় মেনে নিতে পারেন না যে, বিশ্বের সকল দ্রব্য, সকল বস্তু, ক্রিয়াশীল হয় একমাত্র আত্মারূপ আত্মচৈতন্য দ্বারা । তাদের নিকট এটি অবিশাস্য । কিন্তু অধ্যাত্ম বিজ্ঞান প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, চেতনা না থাকলে যেমন প্রাণ থাকেনা, প্রাণ না থাকলে তদ্রূপ দেহে যে কোন শক্তিশালী দ্রব্যগুণেরও ক্রিয়া হয় না । অনুরূপ মন্ত্র শক্তিও জ্ঞাত-অজ্ঞাত ঠিক এই শক্তি পদ্ধতিতেই ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে । মন্ত্রগুলি প্রাণ-শক্তির বীজ বলেই আত্মশক্তিতে এর রূপান্তর দেহমনে ঘটে, তার ফলেই আজও বিষধর সর্পের বিষ বশীভুত হতে দেখা যায় । যেমন বেদের বীজ ‘ওঁ ’ মন্ত্র ঋষিদের ধ্যান নয়নে জাগ্রত হয়ে হৃদয়-তন্ত্রীতে স্পন্দিত হয়ে ফুটে উঠে বলেই বেদে মন্ত্রগুলি ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হয়েছে এবং আজও ক্রিয়াশীল হয়ে ফুটে উঠছে সাধকের জীবনে । নলিনীকান্তের জীবনে উক্ত একাক্ষরী মন্ত্র প্রাপ্তি তারই প্রতিরূপ হয়ে দেখা দিল আজ এবারে ।

১.১২: অধ্যাত্মজীবন

পূর্ব কথায় ফিরে আসি–বিল্বপত্রে রক্ত চন্দনে লিখা জ্যোতির্ময় সেই মহাপুরষের প্রদত্ত উক্ত একাক্ষরী মন্ত্রটি তার হাতে দিতেই তিনি একবার মাত্র তাঁকে দেখেন এবং দেখা মাত্র জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন । বিস্ময়াবিষ্ট ঘোর তমসায় আচ্ছন্নগ্রস্ত নলিনী বাস্তব সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে যখন ভাবতে লাগলেন, ঘরের দরজা জানালা বন্ধ

অথচ এই লোকটি কি করে ঘরে প্রবেশ করলো। বিচারী মন আবার বলতে লাগলো, নিশ্চয়ই এ ভ্রমদৃষ্টি স্বপ্ন মাত্র। কিন্তু রক্ত চন্দনে লিখা তাজা এই বিল্বপত্রের একাক্ষরী মন্ত্রটি আমার হাতে কি করে আসলো ?

নলিনী কান্ত দিশেহারা হয়ে চাকুরী বাকুরী পরিত্যাগ করে সিদ্ধান্ত নিলেন, 'হয় মন্ত্রের সাধন, নয় শরীর পাতন।' মন্ত্রের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পরিব্রাজকের মত ভারতের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। কত প্রতারকের পাল্লায় পড়ে প্রতারিত হলেন। কিন্তু জেদী মন তার জেদের হাল ছাড়লেন না। প্রিয়তমাকে স্বশরীরে ফিরে পাবার আশায় তিনি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলেন। বাস্তববাদী নলিনী কান্ত অলৌকিত্বকে স্থান না দিয়ে আপন মনের বিশ্বাস মতাবেক প্রথমে তাঁর পছন্দনীয় বাস্তবতাকেই গ্রহণ করলেন। মাদ্রাজে থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে যোগদান করলেন। ডঃ এ্যানি বেসান্ত, ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কি, কর্ণেল অলকট্ ও ডাঃ সেনেট প্রভৃতি মনীষীদের সান্নিধ্যে এলেন।

তাঁদের কথামত প্রেতাত্মাকে নিয়ে আসার কৌশল ও পদ্ধতি এক মাস ধরে শিখলেন। অবশেষে এক শুভদিনে তাঁর পত্মীর আত্মাকে এক মিডিয়া মাধ্যমে আকর্ষণ করে এনে কথা বললেন। সত্যিকার তাঁর স্ত্রী কি না প্রমাণের জন্য তাঁর স্ত্রী তাঁকে যে গানটি গোপনে শুনাতেন তা শুনতে চাইলেন। অবিকল সেই কণ্ঠে, সেই সুর, ছন্দ, লয় ও তালে গানটি শুনে তন্ময় হয়ে গেলেন। এ থেকে তাঁর বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল, অবশ্যই তাঁর স্ত্রীকে তিনি ফিরে পাবেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকও যখন প্রেতাত্মা স্বীকার করেন এবং প্রেতাত্মার সাথে কথা বলতে পারেন তখন অলৌকিক ভৌতিক বলে উপহাস করি কি করে ? সনাতন ধর্মশাস্ত্রে আত্মা যে অজর, অমর,অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, জন্মমৃত্যুহীন ধীরে ধীরে তাঁর অন্তরকে স্পর্শ করতে লাগলো।

এর পরেই কলিকাতায় স্বামী পূর্ণানন্দজীর সাক্ষাতে জানতে পারলেন, মহামায়ার সাধনা করলেই এই সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়। সময় হলেই এর উপযুক্ত গুরুও তিনি পাবেন। গুরু খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে বস্তুবাদী নলিনী নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়ে শরীরের যত্ন ভুলে গেলেন। কিন্তু কোথাও উক্ত প্রাপ্ত মন্ত্রের উপযুক্ত গুরুর সন্ধান পেলেন না। অবশেষে মৃত্যু সংকল্প দৃঢ় করে গঙ্গায় ঝাপ দিয়ে জীবন বির্সজনের সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রভাতে হরিদ্বার লোছমন-ঝলার উঁচু পাহাড় থেকে গঙ্গায় ঝাপ দিয়ে মৃত্যু বরণ করবেন স্থির করে গঙ্গার তীরে

শুয়ে পড়লেন। সেদিন কিন্তু মনের কোনে অজান্তে উঁকি দিয়ে উঠেছিল স্বামী পূর্ণানন্দজীর সেই ভবিষ্যত বাণী।

'কন্যা, জায়া, জননী ও বিশ্বজননী একই তত্ত্ব। সময়ে সব জানতে পারবে। যথা সময়ে গুরু পাবে এবং গুরু নির্দেশে সবিষয় তত্ত্ব জানতে পারবে।"[১৬] এই শেষ ভরসাটুকুও আজ শেষ হবার পথে। অবশেষে মৃত্যুই স্থির হল। এক সময় গঙ্গাতীরে ঘুমিয়ে পড়লেন। শেষ রাত্রিতে দেখলেন, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর শির স্বীয় ক্রোড়ে নিয়ে বসে আছেন। ব্রাহ্মণের স্পর্শে তাঁর সমস্ত শ্রান্তি, ক্লান্তি দূর হয়েছে বোধ হল, শরীর মন আনন্দে নেচে উঠছে, তাঁর স্পর্শে পিতৃ-মাতৃ স্নেহ মমতা যেন উথলে উঠছে। মনে হয়েছিল একবার, এই অকৃত্রিম স্নেহ, ভালবাসা ও দয়া হয়তো জীবনে আর কোন দিন পাবো কি না জানিনা। পিতৃতুল্য ব্রাহ্মণ; তাকে বাংলায় নিজের ঘরে ফিরে যেতে বললেন। কলিকাতার বীরভূম জেলার তারাপীঠে অবস্থানরত গুরু বামাখ্যাপার সাথে দেখা করতে বললেন এবং তার মনষ্কামনা সিদ্ধ হবে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

মৃত্যু সংকল্প ত্যাগ করে নলিনী সুদূর উত্তর প্রদেশ ত্যাগ করে বাংলায় ছুটে চললেন– জাগ্রত কৌল প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক গুরু বামাখ্যাপার কাছে। দূর থেকে বালকটিকে তারাপীঠে আসতে দেখেই বামা মন্দিরে মায়ের সঙ্গে কথা বলে সব জেনে নিলেন। এখানে আসার তার উদ্দেশ্য কি ? নলিনী বামার কাছে এলেই বামা স্নেহ, আদর পূর্বক কাছে বসিয়ে বললেন, বাবা, 'তোমার জীবন ধন্য। মায়ের আর্শীবাদে তুমি যে তারা মন্ত্র পেয়েছ, তা সিদ্ধ মন্ত্র। অবিশ্বাস করে ভুল বুঝনা। মায়ের কৃপায় অতি শীঘ্র তোমার মাতৃ দর্শন হবে। আমি তোমাকে মায়ের সাক্ষাত করিয়ে দিব, তাঁর কাছেই তোমার সকল অজানা অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। তোমার প্রার্থিত বিষয় প্রাপ্তি হবে। তোমার মত শিষ্য পেয়ে আমি ধন্য হলাম।"[১৭]

১৬। ঐ, পৃ., ১৫-১৬
১৭। ঐ, পৃ., ১৬

১.১২:ক: তান্ত্রিক গুরু লাভ

তান্ত্রিক পদ্ধতিতে এক শুভক্ষণে শুভদিনে নলিনীকান্ত গুরু কৃপায় রাত্রির তৃতীয় প্রহরে আরাধ্য মন্ত্রের ইষ্টদেবীর দর্শন লাভ করলেন। দেবী দর্শন দান করলেন, ধ্যায় মূর্তিতে নয়– তাঁরই মনোময়ী মূর্তি শুধাংশুবালা মূর্তিতে। এখানে একটি বিষয় জেনে রাখা ভাল, নলিনীকান্ত যে একাক্ষরী বীজ মন্ত্রটি পেয়েছিলেন তা বধুবীজ 'স্ত্রীং'। অর্থাৎ দেবীকে স্ত্রীরূপে দর্শন লাভ। আপন স্ত্রীর আধারে জগদ্ জননীর আবির্ভাব মোটেই সাধারণ বিষয় নয়। যা আর কোন সাধকের জীবনে এমন রূপে এরূপ ঘটনা ঘটেছে কি না আমার জানা নেই। সনাতন হিন্দুধর্ম দর্শনের বৈশিষ্ট্য হল, প্রকৃত পুরুষ না হলে মহাপ্রকৃতি কখনও স্ত্রীরূপ ধরেন না। শাস্ত্রে পড়েছি, যিনি মহামায়া-জগৎজননী, তিনিই শিবের পত্নী হয়েও শিবের জননী। এই মহামায়াই জায়া, জননী ও কন্যা এই ত্রিমূর্তিতে জগতে প্রকাশিতা। একমাত্র শিবকল্পপুরুষের কাছেই এই মহামায়া পত্নীরূপে প্রকাশিত হন। এই

মহামায়াই সাধক নলিনী কান্তকে নিগমানন্দরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। জগদীশ্বরী তাঁর সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে যখন তাঁর বাম পদ সাধকের মস্তকে স্পর্শ করে বর প্রার্থনা করতে বললেন, নলিনী কান্ত তখন জপ সমর্পণ করেন। জগৎ জননী তাঁকে জানালেন, তুমি এই মূর্তি ভালবাস বলেই আমি তোমার মনোময়ী মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছি। নলিনীকান্ত বর প্রার্থনার পূর্বে এই রহস্য জানতে চাইলেন, জায়া কি করে জননী হতে পারে? এবং তুমি যে জগৎ জননী তোমার স্বরূপ আমাকে দেখাও। দেবী অগ্রে তাঁকে বর চাইতে বললেন, নলিনী বললেন, 'তোমাকে আজ যে ভাবে যে রূপে দেখতে পাচ্ছি ইচ্ছে মাত্র যেন তৎক্ষণাৎ সেরূপে সেভাবে দেখি।' দেবী 'তথাস্তু',– তাই হবে। এবার আমার স্বরূপ দর্শন কর। প্রথমে দেবী তাঁর মাতৃ পরিচয় স্বরূপ– তিনি কে, কি তাঁর পরিচয় এসব তথ্য অগ্রে বিস্তারিত জানালেন। নলিনী তাঁর তত্ত্বরূপ দর্শনে এবার উন্মুখ হলে দেবী সেই মুহূর্তে এক অলৌকিক কান্ড ঘটালেন। সাধক দেখলেন, তাঁর প্রতি লোমকূপ হতে বাষ্পের ন্যায় এক প্রকার তরল জ্যোতি নির্গত হয়ে জগৎ আচ্ছন্ন করছে। আবার সেই তরল জ্যোতি; বাইরে কেন্দ্রীভূত বা পুঞ্জীকৃত হয়ে বিদ্যুতের ন্যায় আভাশালী ও কোটি সূর্যের ন্যায় দীপ্তিযুক্ত এবং কোটি চন্দ্র তুল্য সুশীতল

উপলব্ধি হতে লাগল। এই পরম তেজোরাশি উর্ধ্ব, পার্শ্ব বা মধ্যদেশে পরিচ্ছিন্ন হল না। এ আদি-অন্ত রহিত। এই জ্যোতিরাশির হস্তপদাদি অঙ্গ বিশিষ্ট স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক আকারও নেই। নলিনী এই তেজের প্রভায় প্রতিহত হয়ে নেত্র নিমীলন করলেন। অতঃপর যেমন দৃষ্টিপাত করলেন, ওমনি সেই পরম তেজ দিব্য মনোহর রমণী মূর্তিতে আভাসিত হল। তখন তিনি সর্বশৃঙ্গারবেশধারিণী, সর্বকামন্দ্রপ্রদায়িনী, নিখিল-জগৎ-জননী, ভুবন মনোমোহিনী, ব্রহ্মজ্ঞান-বিনোদিনী, স্মেরাননী অকপট করুণাময়ী মূর্তি দেবীকে সন্মুখে দেখে কোন কথা বলতে পারলেন না, পরিশেষে আত্মস্থ হয়ে বললেন, 'কে মা আপনি?' মা বললেন, আমি তোমারই সাধনকৃত মন্ত্রের আরাধ্যদেবী। অতঃপর নলিনী মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। বামা তাকে কোলে করে মন্দিরে নিয়ে গেলেন।

তন্ত্র সাধানায় সিদ্ধ নলিনীকান্ত জীবন ধীরে ধীরে শুধারূপী (স্ত্রী) মহামায়ার কৃপায় কিভাবে পরিবর্তিত হতে লাগলো, এখন আমাদের এটিই আলোচ্য বিষয়। একদিন নলিনীর স্মরণ হল, জগদ্‌জননী মা আমাকে যেদিন তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন দেন সেদিন বর স্বরূপ আমাকে বলেছিলেন, যখনেই আমি তাঁকে স্মরণ করবো তখনিই তিনি দেখা দিবেন। তাই পরীক্ষামূলক স্মরণ করা মাত্র আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। দেখা গেল, নলিনীকান্তের ভিতর থেকেই এক তরল জ্যোতি বের হয়ে বৃত্তাকারে পরিণত হয়ে তাঁরই মনোময়ী স্ত্রীর রূপ ধারণ করল দেবীকে অতি কাছের মানুষ হিসেবে পেয়ে নলিনী নিজেকে ধন্য মনে করলেন। অনেক কথা হল কিন্তু যখনেই তাকে ধরতে গেলেন ওমনি পূর্ব নিয়মে তাঁরই দেহে মিলে গেলেন। এই পাওয়া না পাওয়ার বেদনা ও অতৃপ্তি তাঁর দিন দিন বাড়তে লাগলো। দেখতে চাইলে দেখা পাই কিন্তু ধরতে চাইলে আমারই দেহের ভিতর থেকে বের হয়ে আমারই দেহের ভিতরে হারিয়ে যায়। নলিনীর কষ্টে প্রাণ ফাটে। প্রশ্ন জাগলো, তাহলে 'কোহহং'। আমি কে ? এই আমি– কে, জানতে গিয়ে নলিনীকে বৈদিক সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের আদেশ গুরু বামাক্ষেপার মাধ্যমে দেবী জানালেন।

১.১২:খঃ সন্ন্যাস গুরু সচ্চিদানন্দ পরমহংসের সান্নিধ্য লাভ

শুরু হল, সন্ন্যাস গুরুর অনুসন্ধান। খুঁজতে খুঁজতে এলেন পুরস্কর তীর্থে (রাজপুতনা)। কাছেই একজন বৈদান্তিক সাধু বেদান্ত বক্তৃতা দিবেন জানতে পারলেন। নলিনীকান্তের ইচ্ছা নেই কোন সাধুর কাছে যাওয়ার। কিন্তু যে বাড়িতে উঠেছিলেন সেই বাড়ির গৃহকর্তা নাছোড়বান্দা হয়ে তাঁকে উক্ত ধর্ম সভায় নিয়ে গেলেন। বহু ধর্ম পিপাসু শ্রোতার সামনে এক উঁচু মাচায় বসে এক সাধু বেদান্ত বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তাঁকে দেখা মাত্র নলিনীকান্ত জনতার ভির অতিক্রম করে সেই বেদান্তবিদ্-এর পায়ে পরলেন। স্পষ্ট জানালেন, আপনি আমাকে যশোরে কুমিড়ায় এক শুভক্ষণে জ্যোতির্ময় মূর্তিতে একাক্ষরী মন্ত্র দান করেছিলেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে আপনি সেই ব্যক্তি। আমি আপনার শরণাপন্ন। আপনি আমার তৃষিত তাপিত প্রাণে শান্তি বারি দান করুণ। আমাকে অনুগ্রহ করে আশ্রয় দান করুণ। বৈদিক সন্ন্যাসী সচ্চিদানন্দজী তাঁকে নানা ভাবে তিরস্কার করলেন। বাঙালী মছলিখোর বলে তাকে গালাগালি উপহাস ও উপেক্ষা করলেন। কিন্তু নলিনীকান্ত নাছোড়বান্দা, কিছুতেই তাঁর পাছ ছাড়লেন না। অবশেষে তিনি তাঁকে আশ্রমে নিয়ে গেলেন। শিষ্য রূপে গ্রহণ করলেন।

বলে রাখা ভাল, সন্ন্যাস অর্থ সম্যক্ উপায়ে ন্যাস। যত প্রকার ভোগ বাসনা ও ইন্দ্রিয়গত প্রবৃত্তি আছে সকল কিছু ত্যাগ করার নামই সন্ন্যাস। নিষ্কাম নিঃস্বার্থবান হওয়াই সন্ন্যাসের সাধনা। আত্মজ্ঞান লাভ অর্থাৎ আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করাই হল সন্ন্যাস জীবন। পরের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়াই সন্ন্যাসীর জীবন দর্শন। গুরুর কাজ হল শিষ্যকে সংস্কার মুক্ত করা। এজন্য গুরু দিনের পর দিন কঠোর থেকে কঠোরতর হয়ে তাঁর আত্মপরীক্ষা নিতে শুরু করলেন। সমস্ত স্নেহ- মায়া-মমতা বর্জিত হয়ে তাকে অবহেলা উপেক্ষা তাচ্ছিল্য করে এবং কি চিমটা দিয়ে আঘাত পর্যন্ত করেছিলেন। কঠোর বিধি নিষেধের অনুশাসনে জর্জরিত করা ছাড়াও এবং কি তাঁর আত্মমর্যাদায় আঘাত করা থেকেও বিরত থাকেন নি। নলিনীকান্ত তিন বৎসর অম্লান বদনে আপাত সমস্ত যন্ত্রনা ও অত্যাচার সহ্য করে যখন খাঁটি সোনা হলেন, তখনই গুরু কৃপা লাভ করলেন। গুরু তাঁকে সংস্কার মুক্ত জেনে সন্ন্যাস দান করবেন বলে ঘোষণা দিলেন। নলিনীকান্তের নব জীবন লাভ হবে, খুশিতে তাঁর বুক ভরে গেল। এক শুভ দিনে শুভক্ষণে নলিনীর সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা হল। জন্ম-রাশিগত সংস্কৃত নলিনী নামের

পরিবর্তে গুরু এবার নাম রাখলেন 'নিগমানন্দ'। আজ থেকে তোমার পরিচয় 'নিগম', অর্থাৎ– বেদ বা জ্ঞান। অর্থাৎ নিজের জীবনে জ্ঞানালো ফুটিয়ে অপরের জীবনকেও আলোকিত করণ। এই আনন্দ লাভই হল নিগমানন্দ নামকরণ। তুমি নিজেকে জানতে চেয়েছিলে 'আমি কে'? এই নিগম বা জ্ঞানই তুমি। আর এই জ্ঞান লাভ করে যে প্রেম বা আনন্দে অভিভূত হবে সেই তোমার স্বরূপ নিগমানন্দ জীবন ও দর্শন।

নিগমানন্দ জগৎগুরু শংকরাচার্যের চারিধামের মহাবাক্যবোধ ও মাহাত্ম্য বিচারের জন্য আপাত গুরুর কাছে বিদায় নিয়ে চারি তীর্থ ভ্রমণে বের হলেন– প্রাপ্ত পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা পরিমোক্ষণের হেতু খুঁজতে। কিন্তু চারিধাম ঘুরার পর বেদের চারি মহাবাক্যের অনুভূতি কি? দাবানলের মত তার অন্তর উদীপ্ত করে কে যেন বলে উঠলো– ব্রহ্মকে জেনেছ জ্ঞানে, অর্থাৎ তোমার স্বরূপ জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়েছে। কিন্তু তুমি কে, তা কি তুমি প্রকৃত ভাবে নিজেকে চিনতে পেরেছ ? মানব জীবনে এটাই চরম ও পরম সাধনা, এর পর জ্ঞানলাভের জন্য আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু তিনি এখানেই থেমে থাকেন নি এগিয়ে চলেছেন, আরও যা কিছু আছে অধিক; সব তাঁর জানা চাই। তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে এই জ্ঞানদাতা আত্মাকে এখনও দেখেন নি। মরমিয়াগণের উপদেশ আছে 'যাহা তোমার দেহভান্ডে তাহাই ব্রহ্মান্ডে'। তিনি এই বাণীকে সার করে যুগপৎ ব্রহ্ম আত্মা ও ভগবানের অপরোক্ষ দর্শন জন্য এবার অধীর হয়ে উঠলেন।

শ্রীনিগমানন্দের অবর ব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞান পাকা হলেও ব্রহ্ম যে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'এবং 'সর্বভূতাত্মভূতাত্মা', এই প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞান বাস্তবে সর্বক্ষণ স্থির না থাকার জন্য তিনি বড় মনঃকষ্ট বোধ করতে লাগলেন। অর্থাৎ নির্বিকল্প সমাধি ছাড়া ব্রহ্ম আত্মার যে মিলন সম্ভব নয় অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বুঝলেন। মহাজ্ঞানী শংকরাচার্যের বাণী– 'জীব ব্রহ্মৈব না পরঃ', অর্থাৎ জীব যে ব্রহ্মই, এই বোধে-বোধ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে তিনি গুরু সচ্চিদানন্দজীর নিকট পরাজ্ঞান লাভের জন্য নির্বিকল্প সমাধি প্রার্থনা করলেন। পরম জ্ঞানী ক্রান্তদর্শী গুরু সচ্চিদানন্দজী অন্তযার্মীরূপে তাঁর অন্তর-বাইর দর্শন করে তাঁকে জানালেন, বেদান্তে নির্বিকল্প আনা দুঃসাধ্য এবং সময় সাপেক্ষ। তুমি যোগপথ অবলম্বন করে নির্বিকল্প লাভ কর, তোমার পক্ষে এতেই সুবিধা বেশি। গুরু সচ্চিদানন্দ তাঁকে যোগীগুরু অনুসন্ধানের পরামর্শ দিলেন।

১.১২:গ: যোগীগুরু সুমেরুদাসজী লাভ

আবার শুরু হল মহামায়ার ছলনা ও কঠিন পরীক্ষা। একটির পর একটি অতৃপ্তি তাঁকে প্রলোভিত করতেই লাগলো। দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিগমানন্দের অন্তরে বেজে উঠলো বিশ্বকবির উক্তি– "আর কত দুরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী– বলো, কোন পারে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।" শুরু হল যোগীগুরু অনুসন্ধান। পরিপূর্ণ তৃপ্তি ছাড়া নিগমানন্দও নাছোড়বান্দা। প্রবাদ বাক্যে আছে, 'যে যাহা চায়, সে তাহাই পায়।' পূর্ব জন্মেই যে তাঁর ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী ও সার্বভৌম গুরু হওয়ার সংস্কার বাধা আছে, বাস্তব তো সেই রূপ ধরবেই। কোষ্ঠীগণনা থেকেও তাঁর পিতা একথা জেনেছিলেন। গুরু খুঁজতে গিয়ে তাঁকে কত রকমের ভেল্কিবাজ ভন্ড সাধুর হাতে যে পড়তে হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। কত ঠক্ সাধুর হাতে পড়ে যে কি প্রকার নাজেহাল হতে হয়েছিল তা বর্ণনাতীত। নির্ভিক নিরুদ্বেগ নীরব চিত্ত বলেই তিনি কখনও নিরুৎসাহিত হন নি। পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে একদিন এক হিংস্র প্রকান্ড বাঘের সম্মুক্ষীণ হলেন। মৃত্যু এবার নিশ্চিত। আর এটাই ছিল তাঁর জন্য সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণের চরম পরীক্ষা। মৃত্যু এখানে কার ? দেহের (নিগমানন্দরূপে তাঁর নাম, রূপ ও দেহের) না আত্মার। 'অহংব্রহ্মাস্মি' বেদান্তের এই মহাবাক্য তাঁর সন্ন্যাস মন্ত্র। অর্থাৎ 'আমিই ব্রহ্ম'। তাহলে ব্রহ্মের মৃত্যু কিভাবে সম্ভব ? ভয়ঙ্কর বিপদের সময়ও তাঁর এই বিচার অনুক্ষণ মনে আলোড়িত হচ্ছিল বলেই বাঘটি কিছুক্ষণ চোখে চোখ রেখে শিশুর মত হয়ে– তাঁর গাত্র জিহবা দ্বারা চেটে গতিরোধ ত্যাগ করে লেজ গুটিয়ে চলে গেল। নিগমানন্দের সন্ন্যাস দীক্ষার প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন হল এবং যোগীগুরু লাভে প্রাণ আরও উতলা এবং প্রত্যয় লাভ করল। কেউ বলেন, তিনি জ্ঞানীগুরুর কাছে এই ত্রাটক যোগটি শিখার ফলেই বিপদ থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন।

ঘুরতে ঘুরতে চলে এলেন কোটা অঞ্চল সীমান্তে। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে উঁচু পাহাড়ের ছায়ার আচ্ছাদনে, মূহূর্তে তিনি পথ ঘাট হারিয়ে ফেললেন। এগিয়ে বা পিছিয়ে যাওয়া বা আসার কোন দিকেই কুল কিনারা খুঁজে পেলেন না। সেই গভীর ঘন কালো অন্ধকারে ঢাকা এই অরণ্যে তিনি একটি মাত্র মানুষ আর তাঁকে আক্রমণের জন্য শত শত হিংস্র বন্যপ্রাণী এবং এই সাপদ সংকুল বনভূমি। ভাবতে গিয়ে তাঁর নাড়ীর

গতি থেমে যাওয়ার উপক্রম হল। মহামায়ার এই আরোপিত অবস্থাগুলি এক একটি ছায়াচিত্রের তুলনা সমান। সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য রূপে দাঁড় করাই হল তাঁর কাজ। সম্ভবকে অসম্ভবে, অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করাই তাঁর কৃতিত্ব। বাস্তবতার চরমে না পৌঁছা পর্যন্ত তাঁর পরীক্ষার শেষ নেই। যেহেতু আত্মার মৃত্যু নেই তখন নিগমানন্দের নাড়ী থেমে যাবে কেন ? তাহলে নিশ্চিই তাঁর আত্মবোধ পূর্ণ হয়নি। মহামায়া এই পরীক্ষা গ্রহণের জন্যই তাঁকে এখানে নিয়ে এসে তাঁর খেলা দেখছিলেন। জীবের চিত্তপটে চরম আঘাত উপস্থিত না করা পর্যন্ত জীবের মিথ্যা সংস্কারগুলি নষ্ট হয় না। এখানে নিগমানন্দের প্রতিও মহামায়ার সেই মহাপরীক্ষাই গ্রহণ। কিংকর্তব্যবিমূঢ় নিগমানন্দের সামনে সেই মুহূর্তে নূতন ছায়াচিত্র রূপে অদ্ভূত ভাবে উপস্থিত হল, এক সুন্দরী যুবতী যোগিনী। আদরের সাথে মেয়েটি তাঁর নাম ধরে ডেকে তাকে অবাক ও আশ্বস্ত করে বললেন, আর একটু সামনে এগিয়ে গেলেই একটি কুটির দেখতে পাবে। সেখানে রাত্রি যাপন করে সকাল হলে চলে যেতে পারবে। বলেই যোগিনী অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন। কুটিরে পৌঁছেই দেখলেন কুটিরের সামনে আর এক সুন্দরী যুবতি দাঁড়িয়ে। এই সুন্দরী যোগিনীও তাঁর নাম উচ্চারণ করে তাঁকে ঘরের ভিতরে আসার আহবান জানালেন। বাইরের উপদ্রব হতে রাত্রিটি তাঁর নির্বিঘ্নে কাটলো বটে কিন্তু একজন যুবক সন্ন্যাসীর সাথে একটি যুবতী নারীর রাত্রি যাপন একটি ছোট্ট কুটিরে একই সঙ্গে। আর একটি নূতন বিপদের ছায়া ঘনীভূত হয়ে– তাঁর হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টি করতে লাগল ! পরম করুণাময়কে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর দয়ার প্রতি শ্রদ্ধা বিগলিত অশ্রু বিসর্জন করে এই সান্ত্বনা লাভ করলেন যে, তিনি যখন এমন সুন্দর বন্দোবস্ত করেছেন তখন তিনিই সমস্যার সমাধানও করবেন। তার পরেও সারারাত্রি এপাশ ওপাশ করে রাত্রি কাটালেন।

পরদিন যোগনীর কাছে জানতে পারলেন তারা দুই বোন কাস্মীরের এক ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে এসেছেন। এখানে এসেছেন তারা যোগাভ্যাস করতে। বয়সের কথা জিজ্ঞেস করায় যোগিনী জানান, তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি। নিগমানন্দ অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হলেন যোগের প্রভাব দেখে। নিগমানন্দ তাঁকে যোগীগুরু করবেন বলে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তাঁকে যোগশিক্ষা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। দেখ !

'যোগঃ চিত্ত বৃত্তি নিরোধঃ' । চিত্ত নিরোধ না হলে যোগ হয় না । তোমার মন ও চিত্ত স্থির হয় নি । তোমার চিত্ত এখনও চঞ্চল । গতকাল রাত্রে এই কুটিরে আমি তোমার সাথে থাকায় তুমি সারারাত্রি ঘুমাতে পারনি । এখানেই প্রমাণ হয় না কি, নারী তোমার গুরু হতে পারেনা । কারণ নারীর প্রতি তুমি দুর্বল । এক নারীকে পেতেই তুমি আজ এই পথের পথিক সেজেছো । এদিকে আর ঘুরাফিরা না করে তুমি যে দেশের সন্তান সেখানেই ফিরে যাও । আগে কলকাতা পৌঁছ সেখান থেকেই তোমার যোগীগুরুর সন্ধান পাবে ।

যোগিনী নিগমানন্দের হাতে কিছু টাকা দিয়ে রেল ষ্টেশন্ দেখিয়ে দিলেন । নিগমানন্দ এগিয়ে চলছেন আর পিছনে তিনি দাঁড়িয়ে বিদায় অভিবাদন জানাচ্ছেন । মাঝে মাঝে ফিরে দেখছেন আর তিনি হাত নেড়ে তাঁকে বিদায় জানাচ্ছেন । ষ্টেশনে পৌঁছে গাড়ীর খবর ও কলিকাতার ভাড়া যাচাই করে– হাতের মুঠি খুলতেই দেখলেন প্রয়োজনীয় ভাড়াই তাঁর কাছে আছে, এক টাকাও বেশি নেই । বিষয়টি বুঝে আরও আশ্চর্য হলেন । ট্রেন আসার সংবাদ জানতে মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধান– ফিরে তাকাতেই দেখেন সুবিস্তৃত ফাঁকা এলাকা অথচ মেয়েটি আর নেই । এত তাড়াতাড়ি তার অদৃশ্য হওয়ার কোন কারণ খুঁজে পেলেন না । তাই কৌতুহলবশতঃ আবার ছুটলেন সেই রাস্তা ধরে– সেই কুটিরে । কিন্তু হায় ! কোন কুটির, কোন মেয়ে, কোন বন সেখানে নেই । কি করে এই অসম্ভব সম্ভব হতে পারে ভেবে কুলাতে পারলেন না । ফিরে আসলেন ষ্টেশনে, চলে এলেন কলকাতায় ।

কালিঘাটে পৌঁছলে কয়েকজন সাধু সঙ্গী পেয়ে কামাখ্যা গোহাটিতে এলেন । অতঃপর পরশুরামতীর্থ । রাস্তায় ভীষণ জ্বর ও আমাশায়ে কাতর হয়ে পড়লেন । সাধুদের সঙ্গ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন । সাধুরাও তাঁর খোঁজ খবর না নিয়ে তাঁকে ফেলে চলে গেলেন । কোনভাবে এক পাহাড়ী পল্লীর কাছে গিয়ে পাহাড়ীদের দয়ায় তাদের তৈরিকৃত পাচন খেয়ে– ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন । তাদের দয়া সরলতা পরোপকার ও আতিথেয়তা দেখে তিনি মুগ্ধ হন । ছেড়ে চলে যাওয়া সাধুদের চেয়ে এই অসভ্য পাহাড়ীদেরকেই প্রকৃত সাধু ভাবতে লাগলেন । তিনি এই হাজং পল্লীতে থাকেন, খান আর সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে তন্ময় হয়ে ওঠেন । কত

নদ-নদী সুগন্ধি ফুলে ফলে ভরা গাছ। নরম সবুজ ঘাস, সুনীল আকাশ। তার মনে বিশ্বস্রষ্টার ছাপ গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগলো।

একদা ঈশ্বরের এই অপরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ রহস্যজনক সৃষ্টির চিন্তায় তিনি ডুবে গেলেন। এর পরেই ধ্যানের মানসপটে অতীত জীবনের যত স্মৃতি ছায়া-চিত্রের মত তাঁর চিত্তপটে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। প্রেয়সীর মধুর প্রেম– কামনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল মানসসরোবরে উথাল দিয়ে। বিশ্ব সমুদ্রের স্রোত অন্তঃসলীলা ফল্গুর মত তাঁকে টানতে থাকলো নীচের দিক সংসারস্রোতে। হঠাৎ ধ্যান ভঙ্গ হলে দেখলেন, যেখানকার মানুষ সেখানেই আছেন। অথচ এতক্ষণ স্পষ্ট ভাবে যা দেখেছেন, তিনি জন্মভূমি কুতবপুর বাড়ীতে বিরাজ করছিলেন। বুঝলেন; মায়ার অসাধ্য কিছু নেই। এখনও তিনি খাঁটি সাধু হতে পারেন নি। তিনি যেখানে বসে এই প্রাকৃতিক শোভায় বিমুগ্ধ হয়ে ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন তা হাজং পল্লী থেকে চল্লিশ মাইল দূরে। এতক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকারে ছেয়ে ফেলেছে স্থানটি। রাস্তা চেনার কোন উপায় নেই। পল্লীতে ফিরে যাওয়ারও কোন পথ না পেয়ে বন্য জন্তুদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সন্মুখ প্রকান্ড বট গাছটির উপর এক গভীর গহ্বর দেখে জায়গা করে নিলেন। এই স্থানটি ছিল পরশুরামতীর্থের নিকটবর্তি।

সারারাত্রি ভয়ে ভয়ে কাটালেন। ভোরে বৃক্ষের নীচে তাকিয়ে দেখেন ধুনির আলোতে ঝলমল হয়ে উঠেছে স্থানটি। ধুনি জ্বালিয়ে এক সাধু আপন মনে গাঁজা ডলছেন, নিগমানন্দ নীচে নেমে সাধুর কাছে বসলেন। নিরুপায় হয়ে গাঁজা খেলেন। অতঃপর সাধুর ইসারায় পিছে পিছে মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় ছুটে চলতে লাগলেন। এই সময় নলিনীর দাদু বঙ্কিম চন্দ্রের 'কপাল কুন্ডলা' উপন্যাসের চরিত্রের চিত্রটি মনের মধ্যে ফুটে উঠল। নিশ্চিই ইনি একজন কাপালিক, আমাকে মায়ের চরণে নবকুমারের মত বলিদানের জন্য নিয়ে চলেছেন। ভাবামাত্র নিগমানন্দের গা ছম্ ছম্ করে উঠল। বিশাল লম্বা চওড়া সেই সাধু। গাত্রবর্ণ গলিত-স্বর্ণের মত, সুপ্রশস্ত ললাট, বিস্তৃত বক্ষপট, দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশদাম ঝুলছে কাঁধের নীচে। আজানুলম্বিত বলিষ্ঠ বাহুদ্বয়, আয়ত অপূর্ব চক্ষু উজ্জ্বল ভাস্কর, স্নেহপূর্ণ গোলাপী অধর, সুন্দর স্বর্গীয় দীপ্তি সমন্বিত বদন কমল, এবং মনোহর অবয়ব থেকে ঝরে পড়ছে শিশু সুলভ সরলতা। জীবনে অনেক সাধু সন্ন্যাসী দেখেছেন কিন্তু ইনি

তার ব্যতিক্রম। এতক্ষণ কোন কথা হয়নি উভয়ের মধ্যে। ইসারায় সব কাজ হয়েছে। এবার সাধু বললেন, "বৎস! নিগমানন্দ, তুমি আমাকে বৃক্ষের নীচে হঠাৎ বসে থাকতে দেখায় ভয় পেয়েছিলে না? তুমি কে, কেন চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছ। কেন এই গাছের উপরে গত রাত কাটিয়েছো। আমি সব জানি। আমিই তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি– আমারই যোগবলে। তোমার মনের ইচ্ছা অবশ্য পূরণ হবে।"[১৮] মহাত্মার মনোমুগ্ধকর উৎসাহব্যঞ্জক বাক্যে প্রগাঢ় ভক্তিজন্মে গেল তাঁর। এই যোগী পুরুষের নাম উদাসীনাচার্য শ্রীমৎ সুমেরুদাসজী। যোগীবর ব্রহ্মানন্দগিরিরূপে তাঁর অতীত জীবন এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল কথা যখন তাঁর জীবন-জন্ম-কর্ম ও ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁকে খুলে বললেন, নিগমানন্দ তখন আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁকে গুরুত্বে বরণ করে তার মনোবাসনা ও সিদ্ধিলাভের কৌশল জানতে চাইলেন এবং তাঁর কৃপা প্রার্থনা করলেন।

এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার, আমাদের মত অজ্ঞান জীব জানেনা তার ভিতর কি অব্যক্ত অনন্ত শক্তি সুপ্তভাবে নিহিত আছে। আত্মা এবং দেহের সংযোগেই জীবন। আমরা মনে করি এই আত্মশক্তি দেহগত ও মনোগত বলেই আমরা সকল কার্য সিদ্ধিলাভ করি। কিন্তু এই আত্মশক্তি দেহগত বা মনোগত কোন শক্তি নয়, স্বয়ংসিদ্ধ। আত্মাই সর্বশক্তি, সর্বক্ষমতার অধিকারী এবং সর্বজীবন। অবিদ্যা ও মায়ার কারণেই প্রতি জীব নিজেকে আলাদা মনে করে তার স্বরূপ ভুলে থাকে। আত্মজ্ঞানের অভাবে জীব সর্বশক্তিমান পরমাত্মার সাথে যুক্ত থাকতে পারে না।

যোগপথ সেই কাজটি করে, যার সাহায্যে আমরা আত্মা অনাত্মার জ্ঞান লাভ করতে পারি এবং আত্মা পরমাত্মায় বিলীন হতে পারি। মূলতঃ যোগ হল, আত্মোপলব্ধির পূর্ণ চেতনা। যার আলোয় সে দেখতে পায় সে কিসের জন্য জন্মেছে– জানতে পারে তার আসল স্বাধিকার। যেহেতু যোগের গোড়াকার কথা হল, বাসনা ও অহংকারের অন্ধতা থেকে মুক্তি। ঠাকুরের যোগ-জীবন এই লক্ষ্যেই আদিষ্ট হয়েছিল। একমাত্র সদ্গুরুর কৃপাতেই বা তাঁর যোগশক্তি ও জ্ঞানতরবারি দ্বারা এই কঠিন অজ্ঞান নাশ সম্ভব। সুমেরুদাসজী অতঃপর নিগমানন্দকে পাহাড়ের মাটির নীচে এক সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করে– একটি কুঠিরে নিয়ে গেলেন।

১৮। সত্যচৈতন্য ও শক্তি চৈতন্য ব্রহ্মচারী, **শ্রীনিগমানন্দের জীবনী ও বাণী**, কলকাতাঃ আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, ৯ম সংস্করণ, ১৪০২, পৃ., ২৬

দেখলেন সেখানে অজস্র শাস্ত্রগ্রন্থ সাজানো আছে। সেখানে থেকেই ভিক্ষাবৃত্তি ও আলু,কচু, ফল মূল খেয়ে দীর্ঘ ৬ মাস তিনি তাঁকে হাতে কলমে হঠযোগ, লয়যোগ, রাজযোগ, নেতি, ধৌতি, নারীশোধন, প্রাণায়াম, আসন, মুদ্রা ইত্যাদি শিখালেন। সবিকল্প ও নির্বিকল্প সমাধি কিভাবে লাভ করতে হয় তার কৌশল শিক্ষা দিলেন। শ্রীনিগমানন্দের শরীর ক্ষীণ দুর্বল হয়ে পড়ায় তিনি তাকে লোকালয়ে গিয়ে ভাল ভাল খেয়ে শরীর সবল করার উপদেশ দিলেন। কারণ সমাধি অভ্যাস করতে চাইলে দেহে ও মনে প্রচুর বল প্রয়োজন।

তিনি প্রথমে পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামের জমিদার রায় সারদা প্রসন্ন সিংহ মজুমদার মহাশয়ের গৃহে আশ্রয় লাভ করেন। এখানেই তিনি সমাধির ক্রিয়া ও অভ্যাসগুলি জীবন্ত ভাবে নিজ জীবনে ফুটে তুলতে লাগলেন। মনঃসংযম ও প্রাণায়াম দ্বারা জড় দেহকে লঘু এবং প্রাণবায়ুকে নিরোধ করে আপানবায়ুতে সংযোগ পূর্বক– নাক, মুখ, পথের স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়া সুষুম্না (Spinal cord) পথে পরিচালিত করার শিক্ষা করতে লাগলেন। অষ্টাঙ্গ যোগের সমস্ত ক্রিয়াগুলি অভ্যাস করে বিজ্ঞান ভূমিতে উপনীত হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলেন। তাঁর যোগবিভূতি এই সময় স্বাভাবিক ভাবে যত প্রকাশ পেতে লাগলো ততই জনসমাগম তাঁর সাধন কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। সাধন বিঘ্নতার ভয়ে একদিন তিনি উক্ত গৃহ ত্যাগ করে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেলেন। এই জমিদার বাবুর বাড়ীর একটি যুবতি মেয়েও তাঁকে বেশ জ্বালাতন করেছিল। ঘুরতে ঘুরতে গৌহাটি শহরের অতিরিক্ত জেলা শাসক যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস বাবুর বাড়ীতে কাকতালীয়বৎ স্থান পেলেন। এই বিশ্বাস দম্পতি ছিলেন অপুত্রক। পরা-অপরা বিদ্যায় পারদর্শী, তত্ত্ব জিজ্ঞাসু, যুক্তিবিচারক। বিশ্বাস বাবু বহু পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর তাঁকে আশ্রয় দিয়ে পুত্রের ন্যায় বাৎসল্যভরে স্নেহ আদর করতে লাগলেন।

এখানেই তিনি প্রথম চব্বিশ ঘন্টার জন্য একদিন সমাধিতে বসলেন। প্রথমে স্থুল প্রাণক্রিয়া (শ্বাস-প্রশ্বাস) কে যোগ প্রণালীতে এর স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধকরে সুষুম্না পথে পরিচালন পূর্বক আত্মার সাথে পরমাত্মার যোগসংস্থাপন নীরিক্ষে সমাধি লাভ করে স্ব-দেহে ফিরে আসলেন। কয়েকদিন বিশ্রামের পর তিন দিনের জন্য সমাধিতে বসবেন সংকল্প করলেন। সমাধি কিভাবে ভাঙ্গতে হয় তা বিশ্বাস দম্পতিদ্বয়কে বুঝিয়ে

দিলেন। এই পদ্ধতি ধৈর্য, বিশ্বাসের সাথে না করলে তাঁর দেহের মৃত্যু হবে তাও জানালেন। তিন দিন সমাধি পূর্ণ হল। বাইরের শ্বাসক্রিয়া সব বন্ধ। অথচ শরীর সুন্দর ও জ্যোতির্ময় হয়ে আছে। হৃদস্পন্দন বন্ধ, অথচ বেঁচে আছেন। এই অসম্ভব, অবাস্তব ও অলৌকিক কান্ড বিশ্বাস বাবু জীবনে প্রথম দেখলেন। এই সমাধি লাভের মুদ্রাটি হল 'খেচরীমুদ্রা যোগ।' অর্থাৎ ব্রহ্মতালুতে জিহ্বা উলটিয়ে সংস্থাপন পূর্বক স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়াকে বন্ধ করে প্রাণবায়ুকে আপানবায়ু দ্বারা আকর্ষণ পূর্বক মূলাধার পদ্মের সুষুম্না পথ দিয়ে বায়ুকে প্রাণরূপে দর্শন করে– সহস্রাধারে উর্ধ্বপথে পরমাত্মার সাথে মিলন করাই হল সমাধি সাধন। সমাধি ভঙের পর সাধকের আরষ্ট জিহ্বাকে, দুধে সলতে ভিজিয়ে কণ্ঠ ও তালুতে ধীরে ধীরে নাড়া দিয়ে সরস করণ এবং ঘি দ্বারা জিহ্বা মালিশ ক্রিয়ার ফলে শ্বাসক্রিয়াকে স্বাভাবিক পর্যায়ে চালু করা শিখানো পদ্ধতি বিশ্বাস দম্পতি মন্ত্র মুগ্ধের মত কান্না বিজড়িত কণ্ঠে ভগবান্‌কে স্মরণ পূর্বক বারংবার উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে লাগলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই নিগমানন্দের দেহে চৈতন্যরূপী আত্মা ও প্রাণ ক্রিয়া সংস্থাপন হল। এই তিন দিনের সবিকল্প সমাধিতে তাঁর আত্মা প্রাণময়, মনোময়, ও বিজ্ঞানময় কোষগুলির সকল বন্ধন ছিন্ন করে আনন্দময় পথে যাত্রা করলো। এবারের সাধনা আনন্দময় কোষে গমন ও অতিক্রম। সাত দিনের সমাধি। ফিরতেও পারেন নাও পারেন। এই সংকল্পের কথা যজ্ঞেশ্বর বাবুকে সবিষয় জানালেন। যদি সাত দিন পরেও সমাধি ভঙ্গ না হয় তবে ধৈর্য হারাবেন না। প্রাণবায়ু দেহে ফিরে না আসা পর্যন্ত প্রদত্ত পদ্ধতিটি চালাতেই থাকবেন। যজ্ঞেশ্বর বাবু অতি আদরের এই নবীন সন্তানরূপ সন্ন্যাসীকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসে ফেলেছিলেন। তাই তিনি তাঁকে এই সমাধিতে না বসতে অনুরোধ জানালেন। 'যদি তুমি ফিরে না আস তবে আমরা এই অপুত্রক দম্পতি কাকে নিয়ে বাঁচবো'? এই সম্পর্কে শ্রী নিগমানন্দের উত্তর ছিল–

'এ জগতে মানুষ যে কোন সুখ ভোগ করে– যে চরম তৃপ্তি অনুভব করে, সেই সুখ কোটিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেও সমাধিলব্ধ আনন্দের তুলনায় তা তুচ্ছ। ভাষায় সে আনন্দের স্বরূপ বুঝিয়ে দেওয়া মুশকিল। একবার যে সেই আনন্দ পায়, জগতের অন্য কোন সুখের প্রলোভনই তাকে আকর্ষণ করতে পারেনা। মদের নেশাার মত সে তো আরও পাবার জন্য পাগল করে তুলে।' শ্রীনিগমানন্দের সাত দিনের সমাধিতে বসার উদ্দেশ্যই

হল অপরোক্ষ দর্শন। আনন্দময় কোষে গমন ও অতিক্রম পূর্বক চির শান্তি তথা ব্রহ্মানন্দ লাভ। বিশ্বাস দম্পতি তাঁর ইচ্ছাকে দমন করতে না পেরে সকল প্রকার সমাধি প্রস্তুতি গ্রহণ পূর্বক নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে অতি গোপনে এই সাধনায় বসলেন। দম্পতিদ্বয় পালাক্রমে সারাক্ষণ দেহ পাহারা দিতে থাকেন আর দিন গুণেন। যেই কথা সেই কাজ। সত্যি সাত দিনের নির্ধারিত সময় অতিক্রম হল কিন্তু দেহে চেতনা নেই। আসন ভঙ্গ পূর্বক হাত পা সোজা করে উল্লিখিত শিখানো পদ্ধতি অনুসরণ করতে লাগলেন কিন্তু কোন উপায় হচ্ছে না। তাঁর দেহ মুখ অপূর্ব জ্যোতিতে ফুটে উঠেছে। তাঁকে স্পর্শ করে আনন্দ ও সুখে বিশ্বাস দম্পতির হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠছে কিন্তু তাঁকে দেহে ফিরে পাচ্ছেন না। যজ্ঞেশ্বর বাবু নিরাশ হয়ে স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে জানালেন, তিনি আর এই দেহে ফিরবেন না। মৃণালিনী দেবী এই কথা শুনতে রাজী নন। তিনি তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ ডাক্তার বিধান বাবুকে কলিকাতা থেকে গৌহাটিতে তার বাসায় নিয়ে আসলেন। তিনি বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানালেন, সন্ন্যাসী অনেক আগেই মৃত, এবং এও মন্তব্য করলেন, ‘সাত দিন পরেও দেহ যখন জ্যোতির্ময় ও তাজা হয়ে আছে এবং কোন পচন ধরেনি তখন দেহে যদি কখনও প্রাণ ফিরে আসে তবে জানবেন, এ চিকিৎসা শাস্ত্রের ব্যতিক্রম পদ্ধতি।’ এই বলে তিনি বিদায় নিলেন। শ্মশানস্থ করার জন্য যজ্ঞেশ্বর বাবু মন স্থির করলেন কিন্তু মৃণালিনী দেবী প্রদত্ত পদ্ধতিতে মনোবলকে চরম ভাবে দৃঢ় করে বারংবার চেষ্টা চালাতে লাগলেন, আর ভগবানের কাছে মায়ের একমাত্র সন্তানের মৃত্যু যন্ত্রণা সইতে না পেরে– শোকে হাউ মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর প্রাণ ভিক্ষা চাইতে লাগলেন। হঠাৎ ঠাকুরের বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী কেঁপে উঠল। ধীরে ধীরে হৃদ-স্পন্দন, নারী-স্পন্দন শুরু হল এবং ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মিলন করলেন। ঠাকুরকে বুকে জড়িয়ে ধরে মা মৃণালিনী দেবী বার বার সন্তানের চিবুকে চুম্বন দান করতে লাগলেন এবং আনন্দাশ্রুতে বুক ভাসতে লাগলেন। প্রায় ১৫/১৬ দিন লাগলো সুস্থ হতে। এর মধ্যে বিশ্বাস বাবু একদা জিজ্ঞাসা করলেন,

"স্বামীজি কেমন বোধ হচ্ছে? কি করে বুঝাই? যে আনন্দ পেয়েছি সে আনন্দ কিরূপ তা প্রকাশ করতে পারছিনা। মনে হচ্ছে আনন্দ-সাগরে ডুব দিয়ে উঠেছি, জগৎটা যেন নূতন বোধ হচ্ছে। এর চেয়ে বেশি বলতে পারছিনা।"[১৯] তবে ঠাকুর তাঁর স্বীয় উপলব্ধি কিছুদিন পর বিশ্লেষণ করেছিলেন এইভাবে:

> যোগ শাস্ত্রে দেখে থাকবে বাহ্যবিরাট ব্রহ্মান্ডে যা কিছু আছে এই দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মান্ডেও সেই সব রয়েছে; এই সাত দিন সমাধিমগ্ন থেকে ব্রহ্মান্ডের সাত স্তরের এক এক স্তরের এক একদিন অবস্থান করে, সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খুঁজে তাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান আমার লাভ হয়েছে। চক্রের পর চক্র, স্তরের পর স্তর ভেদ করে ব্রহ্মালোকে উপনীত হয়ে বিশ্বব্রহ্মান্ডের যা কিছু সব আমার দেখা– শেষ হয়ে গেছে। পরন্তু অপার আনন্দ সত্ত্বার অনুভব নিয়ে ফিরে এলাম।[২০]

নিগমানন্দ জ্ঞানী ও যোগীগুরু উভয়ের কাছে জেনেছেন, শেষ সমাধি নির্বিকল্প (Indeterminate) সমাধি। 'ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি', যেখান থেকে এসেছি সেখানেই মিলে যাওয়া। কোন সংকল্প থাকবেনা। যেমন নুনের পুতুল যদি সমুদ্র মাপতে যায় তবে তার পুতুলত্ব থাকবে কি? সে সমুদ্রে লীন হয়ে যাবেই। বেদান্ত বলেছে, 'ন পুনরাবর্ততে'– এখানে পৌঁছা যেমন কঠিন, কিন্তু পৌঁছলে আর ফিরে আসা সম্ভব নয়– 'সমবলীয়তে'। দেহে ফিরে আসার আর কোন উপায় থাকেনা। তিনি এসব জেনেও সংকল্পে দৃঢ় হয়েছেন নির্বিকল্পে যাবেন। মৃত্যু ভয়হীন দৃঢ়সংকল্পী নিগমানন্দের দুর্নিবার আকাঙ্খা তিনি নির্বিকল্প সাধানায় বসবেনই।

বেদান্ত পথে নির্বিকল্প সাধনা তাঁর চাই-ই। 'তত্ত্বমসি'– 'আমি সেই, সেই আমি'। 'অয়মাত্মাব্রহ্ম', আমার আত্মাই ব্রহ্ম, 'অহং ব্রহ্মাস্মি,' আমি ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নই,'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' জ্ঞানই ব্রহ্ম। বেদান্তের এই মহাবাক্যগুলি এই প্রমাণই করে। অতএব তিনি সিদ্ধান্তে স্থির হলেন, আত্মার শেষ অবস্থান কি তিনি জানবেনই। একদা কামাখ্যাদেবীর মন্দিরে চলে এলেন। মাতা ভুবেনশ্বরীকে দর্শন পূর্বক মন্দিরের সেবায়েৎ নিত্যানন্দ স্বামীজীকে শুধু বললেন, তিনি আজ নির্বিকল্প সমাধিতে বসবেন। স্বামীজী বাধা দিয়ে বললেল, তুমি জান, এই সমাধি হতে কেউ ফিরে না।

১৯। লীলা নারায়ণী দেবী,**বাংলার সাধনা ও শ্রীনিগমানন্দ,** কলিকাতা: জনা প্রেস, ৯ম সংস্করণ, ১৩৯৫, পৃ., ৬৯
২০। পূর্বোক্ত, সত্যচৈতন্য ও শক্তি চৈতন্য ব্রহ্মচারী, **শ্রীনিগমানন্দের জীবনী ও বাণী**, পৃ.,২৬

কেন আত্মমুক্তির জন্য অধীর হচ্ছ। তার থেকে জগৎ স্রষ্টার জগৎমঙ্গলময় কল্যাণকর কর্ম করা অনেক বড় কাজ নয় কি? নিগমানন্দ জীবনের চিন্তা অনেক আগেই ত্যাগ করেছেন। তিনি কারও উপদেশ শুনতে অভ্যস্থ নন। তিনি বেদের 'পুরুষ সূক্তের' পুরুষ হয়ে থাকতে চান। তিনি চিনি খেতে চান না তিনি চিনি হতে চান। কথা না বাড়ায়ে তিনি ভুবনেশ্বরী মায়ের মন্দিরের পশ্চিম দিকে দ্বারভাঙা রাজার বাঙ্গলোর পেছনে অর্থাৎ উত্তর দিকে যে সরু জঙ্গলি রাস্তটি চলে গিয়েছে সেই রাস্তা ধরে খানিকটা গেলে একটি প্রকান্ড চ্যাটালো পাথর দেখা যায়। ঐ পাথরের উপরই আসন নির্দিষ্ট করে নিলেন। নদীর ওপারে উত্তর দিকে নাগরাজ হিমাচলের পাদদেশ পর্যন্ত সমতল ক্ষেত্র। উত্তরে লখিম পুর জেলা ঐ খানেই অবস্থিত। কামাখ্যা ধাম হতে হিমাচল পর্যন্ত দৃশ্য অতীব নয়ন-মুগ্ধকর এবং অনন্তের ভাবদ্যোতক। ঠাকুর এখানেই বেদান্ত সাধন প্রক্রিয়ামতে নিদিধ্যাসনে বসে প্রাণায়াম সাহায্যে প্রথমে আমিত্বের প্রসার ঘটাতে শুরু করলেন। এই ভাবে ধীরে ধীরে বিশ্ব আমিত্বে আপনাকে বিলীন করে দিলেন। তাঁর মন উর্ধ্ব জগতে উঠতে থাকলো আর একটার পর একটা জ্যোতির সাক্ষাত পেতে লাগলেন। স্পষ্ঠ দেখতে লাগলেন, এক একটি বদ্ধ দরজা যেন তাঁর সামনে খুলে যাচ্ছে। যতই উপরে উঠছেন ততই জ্যোতিগুলি আরও উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে লাগলো। পরিশেষে উর্ধ্ব লোকের সপ্তভূমি অতিক্রম করে মহাশূন্যে অনন্ত জ্যোর্তিলোকে ডুবে গেলেন– নির্গুণ নির্বিশেষে। কতক্ষণ এই অবস্থায় থাকলেন মনে নেই হঠাৎ ফিরে আসার জন্য মন সংকল্পিভূত হল। কিন্তু কি করে ফিরবেন কোন পথ নেই। তাঁর শ্রীমুখ থেকেই এখন শুনবো পরবর্তি ঘটনা কি ঘটল?

> এবার তো আর কিছু বলতে পারছিনা 'ফুরাইল বাক্ মোর'। ভাবটা মনে আসছে কিন্তু তোমাদের বুঝাতে পারছিনা। ...না আর বলতে পারলাম না। তারপর যে কি অবস্থা হল তা বুঝাবার মত ভাষা নেই। কতক্ষণ এরূপ ছিলাম জানিনা। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ একটা দৃঢ় সংকল্প জাগলো– 'আমি গুরু'। মুহূর্ত মধ্যে এই 'অনন্ত জ্যোতি', কেন্দ্ররূপী একটি বিন্দুর আকার ধারণ করল। তার উর্ধ্বে আর কিছুই নাই। সেই বিন্দুই আমি; ওই কেন্দ্রবিন্দুই গুরু (ব্রহ্ম)। আর ওই গুরুই (ব্রহ্মই) আমি। এই গুরু সত্তা (কালাতীত ব্রহ্ম) ছাড়া আর কোন সত্তাই আমার থাকলো না। ঠাকুরের ভিতর এখন থেকে শুধু 'আমিই গুরু'– এই ভাবটিরই অনুরণন চলতে লাগলো। [২১]

২১। ঐ, পৃ., ৪০

উপনিষদে একেই বলা হয়েছে 'নীলং পরকৃষ্ণম্' আদিত্যের শুক্লজ্যোতি সদ্ব্রহ্ম এবং পরঃকৃষ্ণ জ্যোতি অসৎ বা জ্যোতির্ময় অব্যক্ত– মহাশূন্যতায় অনুভব অসৎ ব্রহ্ম। নিগমানন্দেরও সমভিব্যক্তি তাই:

> হঠাৎ দেখি ঘোর অন্ধকার, এই অন্ধকার রাজ্যে কেমন করে এলাম জানিনা। এখন বের হই কেমন করে? বের হওয়ার পথ তো কিছু নেই। জানিনা পরমেশ্বরের কি ইচ্ছা। কিছুক্ষণ পরে দেখি, কতকগুলি ছিদ্রবিশিষ্ট একটা জালের মত জ্যোতির্ময় পদার্থ জ্বল জ্বল করছে। ঠিক তার মাঝখানে একটা ছিদ্রের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ল, সেটা ক্রমে বড় হতে লাগল, আমি তার মধ্য দিয়ে গলে গেলাম। কিন্তু গলে পড়বার সময় গর্ভযন্ত্রণার মত বোধ হল। এইরূপে ক্রমশঃ নির্গুণ হতে সগুণে আসতে লাগলেন। তাঁর সত্য প্রকৃতি লোকগুলি ফুটে উঠতে লাগল। শেষে যখন ভূলোকে এসে পড়লাম তখন সমগ্র পৃথিবীটা আমার দৃষ্টির মধ্যে এসে পড়লো। হঠাৎ ভারতবর্ষটা দৃষ্টিতে পড়ল। অন্যান্য দেশ মহাদেশগুলিও বেশ দেখতে লাগলাম। তারপর আসাম দেশ, কামাখ্যা পাহাড়, ব্রহ্মপুত্র নদী আর পাহাড়স্থ বৃক্ষলতা আমার দৃষ্টিতে এল। ক্রমশঃ মন্দিরটি দেখতে দেখতে নিজের দেহটা হঠাৎ দৃষ্টিতে পড়ল। আমি ওমনি দেহের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু কোন মুহূর্তে কি করে যে দেহে ঢুকলাম তা বুঝতে পারলাম না। আর বের হওয়ার সময় যে কিরূপে বের হয়েছি তাও বুঝতে পারিনি। দেহে ঢোকার পর জ্ঞান হল আমি অমুক। কিন্তু নিরোধ সমাধির সংস্কার এতটুকুও ম্লান হল না।[২২]

সার্থক হল শ্রীনিগমানন্দের অপরোক্ষানুভব। তিনি নিজ হাতে এই উপলব্ধির একটি চিত্র অংকন করেছিলেন। চিত্রটি নিম্নরূপ। তাঁর ব্রহ্মোপলব্ধি সত্য হল গুরুদত্ত বৈদিক সন্ন্যাসে। অপার আনন্দ নিয়ে তিনি কামাখ্যা পাহাড় থেকে নেমে এলেন। এবং ভুবনেশ্বরী মায়ের মন্দিরে গেলে স্বামী নিত্যানন্দজীর সাথে পুনঃ দেখা হল। স্বামীজি দেখামাত্র বললেন, 'তোমার যে আজ অপূর্ব জ্যোতিমূর্তি দেখছি, তা কেমন করে হলো ?' স্বামী নিত্যানন্দ তাঁর নিকট নির্বিকল্প সমাধির কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হয়ে পুলকিতান্তঃকরণে বললেন, 'তুমিই ধন্য।' শাস্ত্রবাক্য আজ তোমাতে প্রত্যক্ষ। 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন। অপারসম্বিৎসুখ-সাগরেহস্মিন। লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ।' আজ থেকে তোমার কুল-শীল-জন্ম ও জন্মভূমি পবিত্র ও পুণ্য হল। অপার সুখ সাগরে অবগাহন করে তোমার জীবন ধন্য হল।

২২। ঐ, পৃ., ৪১

এই সমাধির পর হতে বিশ্বের সব কিছুর মধ্যে তিনি নিজেকে দেখতে লাগলেন, 'সর্বভূতাত্মমাত্মবৎ'। সারা দেহখানি তাঁর দিব্য জ্যোতিতে ভরা, থম থম করছে যৌবনের উজ্জ্বল দীপ্তি। যেদিকে হাঁটছেন সেদিকেই জ্যোতি ঘিরে থাকছে তাঁকে। ভিতরে সারাক্ষণ একটা আনন্দের দ্যূতি, তাঁকে অভিভূত করে– তাড়িত করতে লাগলো, কিন্তু এর উৎস খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

আবার সন্ন্যাস সাধনার আকাশবৎ তাঁর শূন্য-চিত্তের এই আনন্দকে মুহূর্তে উপহাসচ্ছলে বিচার এসে উড়িয়েও দিত। এমতবস্থায় তিনি একদিন ভাবলেন জ্ঞানীগুরু সচ্চিদানন্দজীর সাক্ষাত দরকার। এই চরম সাধনার পরেও কেন এমন বোধ হচ্ছে জানা দরকার।

গুরুর আশ্রম পুষ্কর অভিমুখে যাত্রা করলেন। আশ্রমে যাবার জন্য তিনি প্রথমে কলিকাতা এলেন এবং এখানে জানতে পারলেন উজ্জয়িনীতে এবার কুম্ভমেলা। কুম্ভে বহু সাধু সমাগম হয়, হয়তো গুরুদেবের সাথে দেখা হতেও পারে। সৌভাগ্যক্রমে তাই হল। এখানেই তিনি 'পরমহংস' উপাধি লাভ করেন। যা পরিবর্তিতে আলোচনা করা হয়েছে। এই সময় তিনি একদিনের জন্য কাশীর বারানসীতে অবস্থান করেন। নিগমানন্দ আগেই শুনেছেন কাশীর বারানসীতে কোন নবাগত অভুক্ত থাকেন না। কারণ স্বয়ং মা অন্নপূর্ণা এখানে বিরাজিত। এ কথা মনে পড়াতেই তাঁর অবজ্ঞার হাসি চিত্তপটে ফুটে উঠল। কারণ; তিনি এখন ব্রহ্ম, দেব দেবীর মাহাত্ম্য তাঁর কাছে কি মূল্য ?

১.১২:ঘ: প্রেমিক গুরু লাভ

দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য পরীক্ষার জন্য তিনি দশাশ্বমেদ ঘাটে বসে গঙ্গা দেখতে দেখতে ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন। স্মরণে নেই তিনি অভূক্ত অনাহারী। অন্নপূর্ণাকে পরীক্ষার জন্য এখানে এসে বসে আছেন। সন্ধ্যা হয় হয়, এ সময় এক বৃদ্ধা মহিলা নিগমানন্দকে বসে থাকতে দেখে– কাছে এসে জানায়– 'বাবা এই ঠোঙাটি ধর তো, গঙ্গায় ডুব দিয়ে এক্ষুণি আসছি।' বলে তড়িৎ গতিতে চলে গেলেন। নিগমানন্দের যখন ধ্যান ভঙ হল তখন অনেক রাত্রি। প্রকৃতিস্থ হয়ে নিগমানন্দ বৃদ্ধার ঠোঙা দেখার দায় আবছা আবছা স্মরণে এলে ভাবলেন,

দেবীর কোন পরীক্ষা নয় তো? আবার মনে এও হতে লাগলো– এখন তো আর তার ফিরে আসার সুযোগ নেই। দেখি তো কি আছে এর মধ্যে? খুলে দেখেন, বর্ধমানের টাটকা আটটি সীতা ভোগ। তিনি খুবই ক্ষুধার্ত ছিলেন, বিচার বিবেচনা আর বেশি না করে পূর্ণতৃপ্তি সহকারে সীতাভোগগুলি খেয়ে ক্ষুধা মেটালেন। যাই হোক, যেই দিক, স্থানের মাহাত্ম্য সত্য হলেও হতে পারে। এপর্যন্তই চিন্তা ত্যাগ করলেন। রাত্রিতে কোথায় যাবেন? নিকটেই একটি নোংরা ঘরে রাত্রিটুকু কাটার জন্য বিশ্রামের জায়গা করে নিলেন। মাঝরাতে স্বপ্ন দেখলেন, বিশ্বেশ্বরী বিশ্বের সমস্ত যৌবন ভার বক্ষে নিয়ে সেই দেবী অন্নপূর্ণা পবিত্র দীপ্তিতে সারা ঘর আলোকিত করে, অসীম করুণায় মধুর সৌরভ ছড়িয়ে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'তুমি কি এখনও বুঝতে পারনি, আমি অন্নপূর্ণা স্বয়ং তোমাকে বৃদ্ধা-বেশী বুড়ি রূপে খাওয়ালাম। তুমি বেদে ও গুরুর কাছে শুনোনি– 'সাধাকানাং হিতার্থায় ব্রক্ষাণ, রূপকল্পনা।' সাধকের হিতের জন্যই ব্রহ্ম নানারূপ ধারণ করে থাকেন। তুমি তত্ত্বজ্ঞানে জেনেছ, সত্য বলতে একটিই বস্তু। হয় এক, নয় বহু। আধুনিক বিদ্বান দার্শনিকগণ বলেন, বহু দেবতা স্বীকার করলে এক ঈশ্বর যুক্তিতে টিকেনা। আবার বহুর মূল্য দিতে গেলে একের মূল্য হারাবেই। আবার একের প্রাধান্য দিতে গেলে বহু অন্তর্হিত হবেই। অতএব এক এবং বহু পরস্পর বিরোধী। এটি যেমন এক অর্থে সত্য, ব্যাপকার্থে কিন্তু ভিতরে এক সত্যেরই এসব বিভূতি। 'একং সত্য' যদি বহুর মধ্য দিয়ে আপনাকে প্রকাশ না করে তবে তা একটি নিরেট শব্দ মাত্র নয় কি? যেমন একটি সুতোতে বহু রকমের ফুলের মালা, দেখতে মনোহর নয় কি ? যেমন অগ্নি– তাপ,কিরণ,সূর্য একই বস্তু-শক্তি, কিন্তু নাম রূপ আকৃতি প্রকৃতি শুধু আলাদা। দেবীর মর্মার্থ বাণী তোমার ভিতর বাইর যুগপৎ ঋষিদৃষ্টির মত– তন্ত্র, জ্ঞান ও যোগ সাধনা করে যদিও এই নিখিল বিশ্ব উপলব্ধি হয়েছে, কিন্তু বাস্তবায়িত হয় নি। বাস্তবতার সাথে মেলামেশা না করলে ভাবের সত্যটি যথার্থ হয় না।

> ভালবাসাই যে ভগবান্, এবং ভগবানের সাধনাই যে ভালবাসার সাধনা। এই সত্যটি উপলব্ধির জন্যই আমি তোমাকেকাশীতে নিয়ে এসেছি। তুমি প্রেমিক গুরুর অনুসন্ধান করে প্রেম সাধনায় সিদ্ধি লাভ কর, তখনেইবুঝবে মানুষ প্রকৃতি ও ব্রহ্মের মধ্যে কি সম্বন্ধ এবং সম্পর্ক ? তুমি এখনও পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করনি। নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম যে

> সাকার ও সগুণে এসে লীলা করতে পারেন তোমার এই জ্ঞান না থাকায় তুমি আমাকে চিনতে পারনি ।[২৩]

এই বলে দেবী অন্তর্হিত হলে নিগমানন্দের স্বপ্ন ভঙ হল । ভাবতে লাগলেন, নিজের স্বরূপ জানলাম, নিজের ভিতর সব কিছুকে দেখলাম । আত্মা পরমাত্মায় মিলন দেখলাম । এখনও আমার সাধনা সিদ্ধ হয় নি । এর শেষ দেখার জন্য দৃঢ় সংকল্পী নিগমানন্দ এবার প্রেমিক গুরুর ভাবনায় মনোনিবেশ করলেন । হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে যায়, একদা জ্ঞানী গুরু সচ্চিদানন্দ সঙ্গে কেদারবদ্রির পথে প্রেমসিদ্ধা গৌরিমার সাথে তাঁর দেখা হয়েছিল । গৌরিমা সেদিন গুরু সচ্চিদানন্দকে বলেছিলেন, 'এই বাচ্চা তোমার যেদিন নির্বিকল্প সমাধি লাভ করবে তখন আমার কাছে তাঁকে পাঠিয়ে দিও ।' অতীত স্মৃতি রোমন্থন ও স্মরণে আসার সাথ সাথ নিগমানন্দ ছুটলেন হিমালয়ে গৌরিমার সান্নিধ্য লাভ প্রত্যাশায় । অবশেষে সাক্ষাত করলেন । সাধন সিদ্ধা গৌরিমা তাঁর আগমন দেখেই মর্ম উপলব্ধি করলেন । এখানে প্রেম কি ? প্রেমের সাথে জগতের, জীবের ও ঈশ্বরের কি সম্বন্ধ ও সম্পর্ক ? আলোচিত বিষয়টি আলোচনার পূর্বেই তা জেনে রাখা ভাল । নইলে নিগমানন্দের সাথে জগৎ জননীর ও তাঁর মনোময়ী মূর্তি রাণীর (শুধাংশু) প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত প্রেমলীলা বুঝতে আয়াস সাধ্য হতে পারে ।

উপনিষদে আছে, 'আনন্দং ব্রহ্মেতি-ব্যজনাৎ', ব্রহ্মের আরেকটি স্বরূপ হল, আনন্দং ব্রহ্মম্, ব্রহ্ম আনন্দময় । এই আনন্দকে উপলব্ধি করার জন্যই তাঁর জগৎ ও জীব সৃষ্টি । তিনি 'একোহপিসন বহুধায়ো বিভাতি', তিনি যেমন এক তেমনি আবার বহু । উপনিষৎ তাই জানালেন, 'একাকী নৈব রেমে'– একা একা আনন্দ হয় না বলেই তিনি নিজেকে বহুরূপে সৃষ্টি করেছেন । এই বহুরূপকে আঁকড়িয়ে ধরে রাখার জন্যই তাঁর ভাব জগতের এই জগৎ লীলা । এই রস ও লীলা না থাকলে তাঁর আনন্দ স্বরূপত্ব কেউ জানতো না । যদিও এক দৃষ্টিতে জগতে আনন্দ বা সুখ অতিসামান্য সেই তুলানায় দুঃখের অংশ অনেক বেশি ।

২৩ । ঐ, পৃ., ৪৭

এই দুঃখের জ্বালায় জীব তাঁকে ডেকে তৎক্ষণাৎ সাড়া পায় না বলেই তাঁকে ভুলে থাকে। কিন্তু জীব জানেনা যে, 'অয়মাত্মাব্রহ্ম'। 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং'–। আমার আত্মাই ব্রহ্ম। আমার আত্মারূপ ঈশ্বরই সর্বজীব ও জগৎ। উপনিষদ্ও বলেছেন, 'সর্বম্খলিদং ব্রহ্ম'। 'জীব ব্রহ্মৈব না পর:'। এমন কোন পদার্থ, প্রাণ বা স্থান নেই যেখানে ব্রহ্ম ছাড়া। আর জীবতো ব্রহ্ম ছাড়া নয়ই। অন্যান্য ধর্ম শাস্ত্র বলেন, ঈশ্বর এই জগৎ জীব সৃষ্টি করেছেন। তাই তাঁর নাম সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্ম বলেন, ঈশ্বর স্রষ্টা নন, তিনি সৃষ্ট হয়েছেন। তিনি এক বহু হয়েছেন। অতএব জীবের দুঃখ কষ্টের জন্য জীব ঈশ্বরকে দায়ী করবে কেন? ঈশ্বরই সুখ ভোগ করছেন। ঈশ্বরই দুঃখ ভোগ করছেন। আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি-আমি বা অহংকার-আমি মূলতঃ এই 'আমি'-ই হল আমাদের 'প্রকৃত আমি বা ঈশ্বর আমি', দেহাস্থিত নাম রূপ আমি প্রকৃত আমি নয়। ঈশ্বরের এই আমি জ্ঞান 'কোহং' লাভ করাই হল প্রকৃত আত্মস্বরূপ 'আমি জ্ঞান' লাভ। বেদ এই শিক্ষাই দান করেছেন। গীতা, উপনিষদ্ ব্রহ্মসূত্র এই প্রস্থানত্রয় শাস্ত্রও এই শিক্ষাই দান করেছেন। আমরা জীবত্বের ক্ষুদ্র অহংকার অভিমান বশতঃ নিজেকে কর্তা ভাবি বলেই স্বরূপ ভুলে থাকি। বিশ্ব অন্নদাত্রী মাতা অন্নপূর্ণা এই শিক্ষা দান করার জন্যই নিগমানন্দকে প্রেম সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে বললেন। প্রেমই হল পূর্ণ অভিজ্ঞান। প্রেমের মাধ্যমে যে আত্মস্বরূপ লাভ– সেই হল প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভ। আত্মজ্ঞানে মুক্তি হলেও প্রেম কিন্তু মুক্তির চেয়েও বড়। ভালবাসা জীবনের সবচেয়ে প্রেরণাদায়ক শক্তি। প্রেমহীন জীবন অন্তঃসারশূন্য।

একদা ঠাকুর তাই বলেছিলেন, 'সুন্দরী মেয়ে এ জীবনে কম দেখিনি, কিন্তু রাণীর মত কাউকে দেখিনি।' মূলতঃ এ রাণী ঠাকুরের অচিন্তনীয়, অজ্ঞাত, অকল্পনীয়, অপ্রাকৃত প্রেমের রাণী। যদিও সাধারণ দৃষ্টিতে এটি মন ও মুখের কথা। কিন্তু এ অনেক সত্যকথা, যেমন হঠাৎ অজান্তে মুখ থেকে অনেক সত্য কথা সাধারণ ভাবে বের হয়ে যায়, এও তদ্রূপরূপে প্রকাশ পেয়েছে। ঠাকুর একদিন বেদের পুরুষ-সুক্তের মুক্ত পুরুষ হবেন। তাঁরই আনন্দ; আনন্দ শক্তিরূপে মাতা ঠাকুররাণীর রূপের মাঝে প্রকাশ পাবেন। যেমন অগ্নি ও তার দাহিকা-শক্তি। দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নির যেমন মূল্য নেই। ব্রহ্মনিগমানন্দেরও জীবন বিবৃতি এখানে সেই। ভিতরে তিনি অর্ধনারীশ্বর। কিন্তু বাইরে তিনি পুরুষ, আর জগৎ জননী তাঁরই অন্তরঙ্গা। আসলে মাতা

ঠাকুরাণীর মর্ত্যবিগ্রহ ছিল সিদ্ধভাবতনু। মহাদেবীর ভাব-কান্তি প্রতিবিম্বিত হয়েছিল– ওই আধারে। তাই তাঁর মরদেহ ভস্মীভূত হলেও বস্তুত তা অপ্রাকৃতধামের সত্ত্বতনুতে পরিণত হয়েছে। তারাপিঠে মহাবিদ্যা তারাদেবী তাই শুধাংশুবালার রূপ ধারণ করে শ্রীশ্রী ঠাকুরকে দর্শন দেন ও বলেন, 'তোমার মনোময়ী মূর্তিতে এসেছি।'

প্রেম সিদ্ধা গৌরিমা এই সিদ্ধিই লাভ করেছিলেন। ভিতরে তিনি জগৎজননী বাইরে তিনি গৌরিমা। যেমন ঠাকুর ছিলেন বাইরে নলিনী ভিতরে নিগমানন্দ। তথ্য ও তত্ত্বের মিলনে তত্ত্বতঃ। এরই নাম ভাব-সাধনা। বেদান্তের সাধনা। ভাবতে ভাবতেই তৎস্বরূপ লাভ করা। ব্রহ্মকে দর্শন করা ও তাঁকে পাওয়া যুগপৎ না হলে প্রাণের হাহাকার মিটেনা। শুধাংশু মরে গিয়েও শুধাংশুকে লাভ করা। ইনিই ঠাকুরের ভগবান্ বা সগুণব্রহ্ম। এজন্যই ঠাকুর বলেছিলেন, 'পর অবর সব– পরাবর ব্রহ্মই হয়ে গেলাম।' এই লক্ষ্যেই প্রেমসিদ্ধা যোগমায়া গৌরিমা ঠাকুরকে স্পর্শ মাত্র তাঁর ভিতরে প্রেমের বন্যা, আনন্দের লীলা লহরী বইয়ে দিলেন। তিনি প্রেমবশে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ (ইষ্ট) স্ফুরে।' সর্বত্র তিনি পুরুষোত্তম রূপে নিজেকে দেখতে থাকলেন। আর তাঁরই আহলাদিনী শক্তি রাধারূপে সুধাকে ভালবাসতে পেরে নিজেকে ধন্য হলেন। এরই নাম আরোপ সাধনা। ঠাকুরের ভাষায়– "এ যেন মানুষের ভিতর ভগবান্‌কে দেখতে যাওয়া নয়, ভগবান্‌কেই মানুষ ভাবে দেখা।"[২৪]

যাকে বাইরে পেয়েছি তাকে অন্তরে পাওয়া। স্মরণ রাখা কর্তব্য– প্রেম সাধ্য বস্তু নয়, অর্থাৎ প্রেম কোন সাধনায় সিদ্ধ হয় না। প্রেম সিদ্ধ হয় মহতের কৃপায়। এজন্যেই প্রেম স্বয়ং সিদ্ধ। প্রেমের গুরু গৌরিমার মহতি কৃপাতেই তাঁর অন্তরে প্রেমের স্ফূরণ হয়। এই প্রেম লাভ করার পরেই ঠাকুরের দিব্য দৃষ্টির দ্বার উন্মোচিত হয়। বিশ্ব জগৎ তাঁর সামনে প্রেমময়ী রূপে ফুটে ওঠে। ঠাকুরের বাণী এখানে লক্ষণীয় 'আমি জগৎ জননীকে বুকে করিয়া তোমাদের (শিষ্যদের) হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছি।' একমাত্র শিবসাযুজ্য উপলব্ধিতেই এটি সম্ভব। অন্য কোন ভাবে এ বক্তব্য সম্ভব নয়।

২৪। স্বামী সত্যানন্দ, **অভয় বাণী**, কলিকাতা: আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, ৭ম সংস্করণ, ১৪১২, পৃ.,২৯

পূণ্যময়ী গৌরিমার প্রেমভক্তির অনুপ্রবিষ্ট তেজ এভাবেই সার্থক হল। নিগমানন্দ এখন যতই প্রেমের বিষয় চিন্তা করতে থাকেন, ততই ঈশ্বরের মধুর প্রেমের ভিতর মিশে যেতে থাকেন। যতই তিনি ভগবানের জন্য পাগল হতে থাকেন ততই তাঁর প্রতি অনুরক্তিতে গলে যেতে থাকেন। নিগমানন্দ এতদিনে বুঝলেন, শুধাংশু কে ? ভগবান্‌কে না চেয়ে কেন তাকে চাইতে হৃদয় মন আকৃষ্ট হয়েছিল ? ব্রহ্ম হলে হবেনা ভগবান্‌ও হওয়া চাই। এতদিনে বুঝলেন, কেন তাঁর সাধনা সিদ্ধ হয়নি ? এখন জগতের প্রতি ধুলিকণা তাঁর কাছে অমৃতময়। 'প্রতি কঙ্কর প্রতি শিলা এক শঙ্কর পরমেশ।' ফুল দেখলেই তিনি মনের আনন্দে অজান্তে নাচতে থাকেন। সর্বত্রই দেখতে থাকেন শাশ্বত সৌন্দর্য। প্রভাত সূর্যের নির্মল কিরণ, বর্ষার কৃষ্ণ মেঘরাশি। মাঝ রাতের উজ্জ্বল তারা, কাননের সুন্দর সুন্দর ফুল, অসীম আকাশে ওড়া পাখীদের কলকাকলি এবং শান্ত পর্বতশ্রেণী তাঁকে সৌন্দর্যের দেবতার কথা মনে করিয়ে পাগল করে তুলে। তিনি প্রেমানন্দে বিগলিত হয়ে হারিয়ে ফেললেন– নিজের বাহ্য প্রকৃতি, আচার নিয়ম শুচিতা ও বাধ্যবাধকতা। সর্বত্রই দেখেন তাঁর মনোময়ীমূর্তি রাণীকে। ভাবের তনু ধারণ করে রাণী আসেন তাঁর কাছে। কত কথা, কত ভালবাসা, 'শেষ হয়েও যেন হল না শেষ'। এত দিনে মনে হল যা চাইছি আজ তাই পেয়েছি। এই ভাব সম্বরণের জন্য মাতা ঠাকুরাণী অন্যান্য দিনের মত না এসে এক বর্ণনাতীত, অবাকপূর্ণ, রহস্যময় ঘটনা ঘটালেন আজ। গারোহিল যোগাশ্রমে ঠাকুর শুয়ে আছেন হঠাৎ অনুভব করলেন তাঁর অধিষ্ঠাত্রীদেবী একটি ছোট ফুট ফুটে বালিকা রূপে তাঁর বিশাল বক্ষে শুয়ে আছেন।

ঠাকুর বাৎসল্য ভাবে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। সন্তান হারা স্নেহচ্যুত পিতার এ যেন কত আদরের সন্তান স্নেহ-প্রীতি ও আকূতি। কিছুপর দেখলেন এই মেয়েই ক্রমে তাঁরই প্রিয়তমা পত্মীতে পরিবর্তিত হলেন। শেষে তাঁর প্রিয় জননী মানিক সুন্দরী দেবীর আকার ধারণ করলেন। ঠাকুরের বিরক্তি ও অসহ্যবোধ হতে লাগল। ঠাকুরের মাঝে এই ভাবের তারতম্য ঘটানোর জন্যই জগৎ-জননীর এই খেলা-খেলা। তিনিই যে যুগপৎ কন্যা, জায়া ও জননী এই তথ্যের নিরেট সত্য ভাবনা স্থাপন দ্বারা বুঝাতে চাইলেন,–

তোমার প্রেম পলি যেন শুধু শুধাংশু রূপেই নিবদ্ধ না থাকে। জগৎময় তোমারই আত্মবোধে আত্মীয় ও প্রিয় হয়ে ওঠে। নাম, রূপ ও আকৃতি মূল্যহীন। নামরূপ বাইরের বস্তু, আত্মা অন্তরের বস্তু। আত্মারই প্রকাশমান দীপ্তি বা বিভূতি এই নাম রূপ। তুমি আত্মজ্ঞানে আমার মত সবাইকে ভালবেসে কোল দাও। শুধু আমাকে (শুধাংশু রূপকে) নিয়ে ব্যস্ত থেকো না। আমি যেমন তোমার মনোময়ীরূপে, আবার কন্যা, জায়া, জননী ও ত্রিভুবনেশ্বরী-জগৎ-জননী রূপেও। আবার আমি জড় এবং চেতন সবকিছুতে। আমিই ব্রহ্ম, আমিই ব্রহ্মময়ী মা ও প্রেমিকা।

জড় ও চেতন নিয়ে আধুনিক পন্ডিতদের যত যুক্তি, মত ও বিচার তাতে আলোচিত এ দুটি বিষয় পরস্পর বিরোধী আলাদা তত্ত্ব। ক্রান্তদর্শী বৈজ্ঞানিক ঋষিগণ কিন্তু এ নিয়ে কোন মতবাদ বা মতবিরোধ করেন নি। তাঁরা জানতেন, আমি ও আমার দেহ, এখানেও সেই তত্ত্ব নিহিত। একই অখন্ড সত্তার এ দুটি সুমেরু ও কুমেরু। এপিঠ ও ওপিঠ। দুইয়ের মধ্যেই বইছে শক্তি প্রবাহ– যা জড়ের মধ্যে প্রাণ ও চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে ক্রমশ তাকে চিন্ময় করে তুলছে। অতএব 'জড়, শক্তি ও চৈতন্য তিনের সমাহারে যে অখন্ড তত্ত্বটি পাই; তাই হল বিশ্বের মূল'। ঠাকুরের ভাবজগতের সাথে বস্তুজগতের এক মহাবিপ্লবের সমন্বয় সাধিত হল। ঠাকুরের মাঝে ঋষিদৃষ্টি অন্তর বাইর একাকার ও জীবন্ত হয়ে গেল।

মাতা ঠাকুরাণী ঠাকুরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, তুমি নির্বিকল্প সমাধিতে একমাত্র গুরুসত্তা বা গুরুবোধ নিয়ে ফিরে এসেছ। তুমি এখন সার্বভৌম গুরু। সংসারের ত্রিতাপদগ্ধ আর্ত-ক্লিষ্ট-রুগ্ন-পীড়িত মানুষের প্রাণে দুঃখের অবসান ঘটিয়ে জ্ঞানসুখের জন্য জ্ঞানের আলো দান কর, দূর কর তাদের জীবনের অন্ধকার, মুক্ত কর তাদের পার্থিব বন্ধন থেকে। আমি তোমার সঙ্গেই আছি। তোমার প্রিয় প্রতি ভক্ত শিষ্যের মাঝেই আমাকে দেখতে পাবে। তুমি নিমিত্ত ও সাক্ষী স্বরূপ যে বোধ তোমার হয়েছে এই বোধে অবস্থান করে– আমাকে দিয়ে জগতের কাজ করিয়ে নাও। আমি মাধুর্য ভাবে তোমার সাথে সারাক্ষণ আছি ও সহায়তা করবো বলে প্রতিজ্ঞা করছি। ঠাকুরের সাথে ঠাকুরাণীর এই অভিব্যক্তিগুলি গারোহিল যোগাশ্রমে হয়েছিল। ব্রহ্মময়ি জানেন, শুধাংশুবালা যে মিথ্যা নয়, ছায়া নয়, তাঁরই এক প্রতিরূপ ব্রহ্মের বিবর্ত– বিলাস, একথা তত্ত্বত জানার জন্যই

নিগমানন্দের জীবনে তিনি একের পর এক অধ্যায় তৈরি করে নির্বিকল্পে নিয়ে আসেন। এবং নির্বিকল্পের পর এই প্রেমসিদ্ধি অভিজ্ঞতা দান করে– যুগপৎ ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবানে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ঠাকুর ও ঠাকুরাণী আজ মহাভাবে লিপ্ত। তারই ফলশ্রুতি রূপে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান ও লাভ।

ঠাকুর এবার বললেন, গুরু যদি সাজতেই হয় তাহলে বল, আমার আশ্রিত শিষ্য ভক্তগণ তিন জন্মে মুক্তি পাবে? দেবী বললেন, 'তথাস্তু'। যারা আমার বিরোধীতা করবে– তারাও মুক্তি পাবে তো ? দেবী 'অবশ্য পাবে'।'আর যারা তোমাকে জীবন দিয়ে এই জীবনেই ভালবাসবে তারা এই জীবনেই এই দেহেই মুক্তি লাভ করবে। দেবীর ত্রিসত্য প্রতিশ্রুতি ও গুরুগিরির আদেশ নিয়ে ঠাকুর প্রেমে গদ গদ হয়ে গুরু সচ্চিদানন্দজীর সাক্ষাত প্রয়োজন অনুভব করেন। সময়টি ছিল বাংলা ১৩১২ সাল, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ। এলাহাবাদে– তখন চলছে কুম্ভমেলা প্রস্তুতি। ঠাকুর কুম্ভ মহামেলায় যোগদান করলেন। এই মহতি বিশাল সাধু সংঘে শৃংঙ্গেরী মঠের জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সর্বসম্প্রদায়ের সাধুদের সভাপতি উত্তম পুরুষ আচার্য শংকরাচার্যজী এবং গুরু সচ্চিদানন্দজী ও অন্যান্য সাধুবৃন্দ তাঁকে বহু পরীক্ষা পূর্বক 'পরমহংস' উপাধি দান করেন। গুরু সচ্চিদানন্দজী এখানেই তাঁর কাছ থেকে সন্ন্যাস প্রদত্ত দন্ডটি গ্রহণ করে গঙ্গায় বিসর্জন ও তাঁকে গুরুদায় মুক্ত করেন। অতঃপর গুরু দক্ষিণা স্বরূপ তাঁরই প্রতিষ্ঠিত গদি তাঁকে প্রদান করতে চাইলে তিনি তার পরিবর্তে বাংলায় গুরুগিরি ভার গ্রহণে স্বীকৃত হন। ঠাকুরের জীবন দর্শন পরিচয়ে তাঁর অমূল্য বাণী আরও জানতে পাই ঠাকুর নিজ মুখেই উচ্চারণ করেছেন, "আমি অবতার নই, আমি সদ্‌গুরু। অবতারের মত পথকে সাধারণের মাঝে সুপ্রতিষ্ঠা করাই আমার কাজ।"[২৫]

এছাড়াও তাঁর পরিব্রাজকাচার্য উপাধি লাভের স্বীকৃতীর পশ্চাতে 'দূর্গম পথস্তাৎ'– অর্থাৎ 'দূর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার'-সম সমগ্র ভূ-ভারতের উল্লেখযোগ্য ও উল্লিখিত দুর্গম দূরহ পূণ্যক্ষেত্রসমূহ যেমন হৃষিকেশ, হরিদ্বার, ব্রহ্মকুন্ডঘাট, হরকীপ্যারী, কণখল, কেদার, বদরীনারায়ন, দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, শ্রীনগর, কিরাত অর্জুনের যুদ্ধস্থান, কর্ণপ্রয়াগ ইত্যাদি নানা স্থান ও বহু ধর্মশালা, আশ্রম, চট্টি, মঠ, সঙ্গমস্থল এবং বহু তীর্থক্ষেত্র পরিভ্রমণে ভূয়সী কৃতিত্ব ও অপার আনন্দ লাভ– আমাদের আরও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করে।

২৫। পূর্বোক্ত, সত্য চৈতন্য ও শক্তি চৈতন্য ব্রহ্মচারী, **শ্রীশ্রী নিগমানন্দের জীবনী ও বাণী**, পৃ., ২২৫

তাঁর নিম্নলিখিত অভয় আশ্বাসবাণী আমাদের সবচেয়ে ধন্য ও কৃতজ্ঞ করে– "কে কোথায় পাপী-তাপী, পচা-গলা ধসা আছে সব নিয়ে আয় আমার কাছে, আমি তাদের মুক্ত করবো। তাদের মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি মুক্ত হব না।"[২৬]

বলে রাখা ভাল, প্রেমসিদ্ধা গৌরিমার নিকট হতে সিদ্ধিলাভের পর ঠাকুর যখন ফিরে আসেন এ সময় প্রেমসিদ্ধ ঠাকুরের প্রেমের অবস্থাটি ছিল অতিরিক্ত মদ্যপানে বিবশ তুনু মাতালের মত। প্রেমের নেশায় টলতে টলতে ঠাকুর যজ্ঞেশ্বর বাবুর বাসায় এসেছিলেন। এখানে তিন মাস ঠাকুর বাহ্যজ্ঞান শূন্য ছিলেন। নির্গুণ সগুণের মাঝখানে এই ভাবলোক প্রাপ্ত হয়ে ঠাকুর প্রকৃত স্বরূপ লাভ করে বিশ্ববরেণ্য সদ্‌গুরু হলেন। বিশ্বাস দম্পতিকে ঠাকুর খুব ভালবাসতেন এবং প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতেন। তার প্রমাণ একদা ঠাকুরের বাণীতেই পাই।

যজ্ঞেশ্বর, বিশেষতঃ তার স্ত্রী, আমার জন্য যা করেছে,তাতে আমি চিরকাল তাদের কাছে ঋণী থাকব। তবে তারা পরে যখন আমার শিষ্যত্ব স্বীকার করে দীক্ষিত হল, তখন আমি অনেকটা আশ্বস্ত হলাম। গুরু সচ্চিদানন্দজী ঠাকুরকে দিয়ে এদেরকে প্রথম দীক্ষা দান করিয়ে ঠাকুরকে গুরুত্বে প্রতিষ্ঠা পূর্বক গুরু শক্তি অর্পন পূর্বক গুরুদায় থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন। তারপর হতে ঠাকুর জীব-জগতের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেন। এবং একের পর এক এক-এ মুক্তি মোক্ষের ভার গ্রহণ করে শিষ্যেত্বে বরণ করে নেন।

পরবর্তিতে যোগীগুরু সুমেরুদাসজীকর্তৃক প্রথম প্রতিষ্ঠিত ময়মনসিংহের তুরা পাহাড়ে গারো পর্বতে 'গারোহিল যোগাশ্রম' নামে ঠাকুরের এই ভাবের আশ্রমটি থেকেই ব্রহ্মময়ীর নির্দেশে যোগীগুরু পুস্তক প্রকাশ ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে জগৎহিতকর কল্যাণময় কর্মে আত্মনিয়োগ শুরু করেন। বিদ্যালয়টির শিক্ষক নিজেই নিযুক্ত হন। বালকদের ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠা; জীবন গড়ার মূল ভিত, এই চিন্তা করেই– এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরবর্তিতে 'ব্রহ্মচর্য সাধন' পুস্তক রচনা করেন। এখান থেকেই শুরু হল তাঁর সরস্বতী নামা সন্ন্যাসীর মহিমা ও কৃতিত্ব। তিনি হলেন আজ হতে 'ঠাকুর নিগমানন্দ'। শ্রীশ্রী নিগমানন্দের তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ

২৬। পূর্বোক্ত, স্বামী সত্যানন্দ, **অভয় বাণী**, পৃ.,৩১

সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে আমরা পাঠক সমাজে একটি গোপনীয় সত্য উল্লেখ করে ঠাকুরের জীবন কাহিনী সমাপ্ত করতে চাই।

শ্রেষ্ঠ দর্শন বেদান্ত দর্শন বলেন, এক আত্মাই আছেন বিশ্বজুড়ে। সবই তাঁর আত্মশক্তির স্ফুরণ। তিনি এক, তিনিই বহু হয়েছেন। যাঁরা কট্টর অদ্বৈতবাদী তাঁরা 'বহু' স্বীকার করেন না। যাঁরা কট্টর দ্বৈতবাদী, তারা 'এক' স্বীকার করেন না। কিন্তু বেদান্ত বলেন, 'সত্তায় স্থিতি, চৈতন্য-দীপ্তি, শক্তিতে স্ফূরতা এবং আনন্দ এই হল একং ব্রহ্মের স্বরূপ। বহুকে বহুরূপে দেখা গেলেও তিনি বহু নন। বহুরূপে প্রকাশিত নন। প্রকাশিত এক আত্মবস্তু দ্বারা।

সত্য সত্যই তিনি নিজেকে বিভক্ত করেন না। বিভিন্ন বৈচিত্র্যকে কেবল মাত্র প্রকাশ করে দেন। এখানে বহুত্ব মূলতঃ এক নিবিড় ঐক্যে তাঁরই একক-রূপ প্রকাশ করেছে মাত্র। তিনি এক, কখনও বহু নন। তবে বহু হন বিচিত্র পরিণামের ভিতর দিয়ে। সোজাসুজি হন না। যেমন এক সূর্য সারা জগতকে আলোকিত করে। আলোর প্রকাশ বৈচিত্র্যরূপে দেখা গেলেও আসলে সূর্য বহু হয় নি। সূর্য মন্ডল, সূর্য কিরণ, ও সূর্যের তেজ কি এক সূর্য থেকে পৃথক ? শ্রুতি এজন্যই ব্যক্ত করেছেন, একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি। আরও ব্যক্ত করেন তিনি 'অনরণীয়ান্ মহতোমহিয়ান' তিনি সবচেয়ে বড়। সবচেয়ে ছোট– বলেই তাঁর এই দ্বিধা বৈশিষ্ট্য। এক কথায় তাঁর স্বরূপ তিনি যুগপৎ সৎ-চিৎ-আনন্দ ও শক্তি স্বরূপ বলেই– বহু মনে হয়। তিনি নিজেকে মায়া দ্বারা আবৃত করে রেখেছেন। নির্বিকল্পে এই সত্যটি উপলব্ধির জন্যই শুধাংশুবালা তাঁর প্রেমকে সত্যে রূপায়িত করার লক্ষ্যেই তাঁকে স্বরূপে আনন্দবোধে বোধিত ও প্রতিষ্ঠিত করে জগতে ফিরে আসার সংকল্প সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি যে শুধুই তাঁর শুধাংশু বা ছায়া নয়; তিনি যে ব্রক্ষময়ী, ব্রহ্মের বিবর্ত বিলাস, তত্ত্বতঃ এটি জানানোর জন্যই এই প্রেমের লীলা। এরই সূত্র ধরে– গোপনীয় সত্যটি ঠাকুরের মুখেই পরিবর্তিতে জানতে পাই:

> আমি তার রূপে নয়, গুণে মুগ্ধ ছিলাম। প্রায় সারারাত বসে আমার সেবা করত। আমি বললে শুয়ে পড়ত। আবার ঘুমালে উঠে সেবা করত, যখন বিদেশে থাকতাম চুলে তেল দিত না, ময়লা কাপড়ে থাকত। আমি বাড়ি এসে কারণ জিজ্ঞাসা করলে 'বলত কার জন্য করব'? আরও একটি

কারণ ছিল, ঠাকুর একদা বন্ধুবর যদুকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কখনও যদি তোর বৌদিকে আগের মত আবার ফিরে পাই তবে ফিরব, নইলে এই শেষ। জগৎজননী শুধাংশু তাঁর এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যই তাঁকে নির্বিকল্প থেকে ফিরে এনে প্রমাণ করে দেখালেন ও জানালেন, ‘আমি যেমন ওখানে আবার এখানেও।’[২৭]

এই লক্ষ্যেই স্থূলে, সূক্ষ্মে ও কারণে ধর্ম-পত্নী, মানসী এবং প্রিয়া স্ত্রী হয়ে যিনি সদ্‌গুরু নিগমানন্দের দিব্যজীবনের শাশ্বত সঙ্গিনী, তাঁকে অচিন্ত্য-ভেদাভেদে অন্বিত গুরুব্রহ্মেরই বৈভব প্রকাশ ছাড়া অন্য কিছু ভাবা চলে কি ? আমাদের মত অধম অধিকারীদের ঠাকুর মহারাজ এজন্যই তাঁর ব্যক্ত ব্যক্তিরূপ; তথা তাঁর প্রকট বিগ্রহের ধ্যান পূজাদি করতে বলেছেন। সে ক্ষেত্রে তাঁর দিব্য-জীবনও আমাদের অনুধ্যানের বিষয়। আর সেটি করতে গেলেই ঠাকুরাণীর কথা মনে পড়া অনিবার্য। ঠাকুরের জীবন চরিত্রে এজন্য শুধাংশু চরিত্রই বেশি উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

১.১২:ঙ: অধ্যাত্ম জীবনে জাগতিক কর্ম সম্পাদন

শ্রীনিগমানন্দের জীবন শ্রীমাতা ঠাকুরাণীরই লীলা প্রকাশ। তিনিই তাঁকে ঘুরে ফিরে এই মর্ত্য জগতে অমৃতের সন্ধান দানের জন্য এবারে লীলা করালেন। এই লীলার একমাত্র সূত্র হর-গৌরির মিলন। জ্ঞান-প্রেমের মিলন। মরমীয়াদের চর্যাপদেও এর সূত্র খুঁজে পাই– ‘কি রূপ হেরিনু মধুর মুরতি পিরিতি রসের সার। হেন লয় মনে এ তিন ভুবনে তুলনা মিলেনা তার।’ সত্যিই তিনি অপরূপ, অতুলনীয় এবং পরমভাগ্যবান্‌। ভারত ধর্মের শ্রেষ্ঠ সাধন – তন্ত্র, যোগ, জ্ঞান ও প্রেম এই সার্বভৌম চতুর্বিধ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে নির্বিকল্পে পৌঁছে ‘আমি গুরু’ এই উপলব্ধি প্রাপ্তিপূর্বক শ্রীনিগমানন্দ সেই নির্গুণ নিরাকারব্রহ্মের প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হলেন, পৃথিবীর যত পাপী-তাপী, আর্ত-ক্লিষ্ট-রুগ্ন ,অসহায়, অনাথ, দরিদ্র ও দুস্থ এবং জ্ঞানহীনদের জ্ঞান দান করে সবাইয়ে আশ্রয়দান কর। সবাইকে মুক্তি দান কর, সবার মঙ্গলের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দাও।

২৭। পূর্বোক্ত, নন্দ দুলাল চক্রবর্ত্তী, **পরমহংস শ্রীশ্রী নিগমানন্দদেব**, পৃ.,২

তুমি এখন অনন্ত শক্তির অধিকারী । তুমি যা বলবে, যা করবে, তাই হবে। কোন অসাধ্য অসম্ভব বলতে আর তোমার নিকট কিছু থাকল না। তুমি আজ হতে পূর্ণ স্বাধীন। "আত্মমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" এই হল ভারতীয় সাধনার অন্যতম সাধনা। আগে নিজে মুক্ত হও অতঃপর জগতের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ কর, এটাই একমাত্র খাঁটি ও সত্য পথ। এটাই বেদান্তের চরম ও পরম শিক্ষা।

তাঁর কর্মজীবনের প্রথমেই তিনি অনুভব করলেন, ভারতের এই অধঃপতিত জাতিকে পুনুরুদ্ধার করাই তার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। তাদের ব্যবহারিক জ্ঞানদানের পাশাপাশি অধ্যাত্ম জ্ঞান দান করাই হল তাঁর সার্বিক দায়িত্ব। কারণ আত্মমুক্তিই হল মানব জীবন ধারণের প্রথম কাজ। তিনি যেহেতু গুরুগিরির 'চাপরাশ' নিয়ে ঈশ্বরের নিকট হতে এই দেহে ও জগতে ফিরে এসেছেন বেদান্তের শেষ স্তর সেই নির্বিকল্প থেকে। তখন দীক্ষা দিয়ে ঘরে-ঘরে পতিতদের উদ্ধারে ব্রতী হওয়াই তাঁর জীবনধর্ম বলে প্রথম বোধ করলেন। জগদ্দীশ্বরীরও আদেশ ছিল এটাই। এই ভাবে ত্রিশ বৎসর ধরে আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠনে, তাঁর অনুগতদের তৈরি করে এবং তাদের মুক্তি মোক্ষের পথ দেখায়ে, সংসার সাগর সমরাঙ্গনের মায়া মোহ থেকে মুক্ত করে, মানুষকে প্রকৃত মানুষরূপে তৈরি পূর্বক– মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব ও ব্রহ্মত্ব লাভ যে এই জীবনেই সম্ভব তা প্রমাণ করে, জগতের বাস্তবমুখী আর যত কল্যাণকারী কর্তব্য কর্ম আছে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সম্পৃক্ত থেকে বাকি জীবন অতিবাহিত করে গেছেন।

কর্মজীবনে প্রত্যাগমন করেই এই লোকোত্তর অমৃত পুরুষ সদগুরু নিগমানন্দ শ্রীভগবানের নিকট থেকে জগৎ কল্যাণের নির্দেশনা প্রাপ্ত হয়ে পৃথিবীতে নেমে এসে তাঁর কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে একটা মানসিক চিন্তাধারার রূপরেখা তৈরি করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে হল– মঠ, আশ্রম প্রতিষ্ঠা, সংঘস্থাপনের সাথে প্রচার বিভাগ খোলা, মাসিক পত্রিকা প্রকাশ, বেদান্তের ভিত্তি মজবুত করণের জন্য ঋষিবিদ্যালয় স্থাপন, শ্রীগৌরাঙ্গ অনাথ আশ্রম, ছাপাখানার জন্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, বিদ্যাদানের জন্য স্কুল কলেজ ও রোগ নিরাময়ের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল নির্মাণ, অসহায় নির্যাতিত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের 'বৃদ্ধাশ্রম' নাম দিয়ে আশ্রমে রেখে তাদের সার্বিক দায় দায়িত্ব গ্রহণ, সমাজে পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ অসহায় দুস্থ নিপীড়িত নির্যাতীত শিশুদের 'অনাথ আশ্রম' নাম

দিয়ে তাদের সার্বিক দায়-দায়িত্ব যেমন– অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত দান ছিল তাঁর কর্মজীবনের একমাত্র আদর্শ ও উদ্দেশ্য। এছাড়াও তাঁর জীবন প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানলব্ধ পাঁচখানি অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ পৃথিবী বিখ্যাত। যেখানে তিনজন ভক্ত শিষ্য থাকবে সেখানে একটি ধর্মসংঘ স্থাপন করণ, প্রতি বছরে জেলাভক্ত সম্মিলন, বিভাগীয় সম্মেলন, এবং দেশব্যাপী সার্বভৌম ভক্ত সম্মিলনী আহ্বান করে ধর্মশিক্ষা দান, পরস্পরকে ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধকরণ। প্রাচীন ঋষিযুগের আদর্শ– ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রম শিক্ষাদান এবং ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতর্বর্গ ফল লাভে ধর্মমতের উদ্বুদ্ধকরণ প্রদান ছিল– তাঁর কর্মজীবনের প্রধান কর্তব্য কর্ম। তাঁর রচিত জগৎবিখ্যাত অমূল্য মানবজীবন গঠনের পাথেয় স্বরূপ আলোচিত অমূল্য উক্ত পাঁচখানি অভিজ্ঞতালব্ধ মহা মূল্যবান সাধনগ্রন্থ যা ধর্মজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার হিসেবে জগৎ বরেণ্য স্বীকৃতি লাভ করেছে তার ভূয়সী প্রশংসার প্রমাণ তিনি নিজেই লিপিবদ্ধ করে জানিয়েছেন, “মৎপ্রণীত পুস্তক কয়েকখানি পৃথিবীর সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ের ধর্মসম্বন্ধীয় সকল অভাব পূর্ণ করিবে।”[২৮]

মানব কল্যাণে চতুঃসাধনসিদ্ধ পরমহংস শ্রীনিগমানন্দ সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক রূপে নিজেকে আত্ম প্রকাশ করেন। তিনি বেদের নির্দেশনা চর্তুবাদ যথা– ব্রহ্ম ও ঈশ্বরবাদ, শাস্ত্রবাদ, গুরুবাদ এবং জন্মান্তরবাদ এই চারিটি দর্শনের ভিতেরে প্রবেশ করে প্রত্যেকটির সত্যতা উপলব্ধি করে সারাজীবন এর মাহাত্ম্য প্রচার করে যান। তাঁর স্থাপিত আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠকে মূল শক্তিকেন্দ্র করে বাংলাকে পাঁচ ভাগে বিভক্তি পূর্বক পাঁচটি বিভাগীয় আশ্রম গঠন করে তাঁর অর্জিত শক্তি বিকেন্দ্রিকরণ পূর্বক দেশ জাতির কল্যাণে তা উৎসর্গ করেন।

তাঁর জন্মভূমিকে প্রাতঃস্মরণীয় করে রাখার জন্য সেখানে একটি ঋষি বিদ্যালয় অনুকরণে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ছাত্রাবাস স্থাপন করেন। বিনামূল্যে যাতে সবাই সৎ শিক্ষা লাভ করতে পারে সেই ব্যবস্থা দান করেন। এজন্য তৎকালীন চল্লিশ হাজার টাকা খরচ করে তা প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয় মানুষদের নিরোগ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করে তুলার জন্য সেখানে উক্ত এলাকাবাসীদের জন্য একটি দাতব্য

২৮। পূর্বোক্ত, লীলা নারায়ণী দেবী, **বাংলার সাধনা ও শ্রীনিগমানন্দ দেব**, পৃ., ৬৪

চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। প্রচলিত বিদ্যার সাথে ঋষি আশ্রমভূক্ত ঋষিবিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিভাগীয় আশ্রমগুলিতে অন্ন বস্ত্র, শিক্ষা ও বাসস্থান জন্য মানবের যা নিত্য প্রয়োজন তা তিনি সকলের মঙ্গলের জন্য সকল সুযোগ সুবিধা লাভের নিমিত্ত আশ্রমগুলিতে সার্বজনীনভাবে প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত রাখেন। আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন গঠনই যে প্রকৃত মানব জীবন গঠন এবং বনে জঙ্গলে না গিয়েও যে ঘরে বসে আদর্শ গৃহস্থ সেজে ভগবান লাভ করা সম্ভব তা তিনি শতশত ভক্ত শিষ্যদের মাঝে তাঁর প্রত্যক্ষ কর্ম অনুভূতি ও বাস্ত বতা এবং বাণী দান করে তাদের হাতে পোঁছে দেন। নিজ হাতে তাদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলে উদ্ধার করে– তাদের জীবনের দিশা দেখিয়ে ও দেখায়ে গেছেন। বালকের ব্রহ্মচর্যই যে মানব জীবনের মূল ভিত্তিভূমি তা তিনি বিশেষভাবে 'ব্রহ্মচর্য-সাধন' নামে একখানি গ্রন্থ লিখে প্রচার ও প্রকাশ করেন। তিনি আর্যঋষিদের ভাবধারাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা দান করতেই এবার ভারত-ভূমিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তাঁর কর্মজীবনের সামান্য মাত্র তথ্য এখানে তুলে ধরে আমি এটুকু বুঝাতে চেয়েছি যে, তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থে ভারতবর্ষের একজন অন্যতম জনক্যাণকারী অধ্যাত্মবাদী সাধূ মহাপুরুষ। মহাজ্ঞানী অদ্বৈতবাদী মহাপুরুষ জগৎগুরু আচার্য শংকরাচার্যের বারশত বৎসর পরে বাংলার সর্বধর্মসমন্বয়ক পরমহংস ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পর স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেবই এই ভারতভূমিতে বাংলায় সর্বপ্রথম বেদান্ত পথে নির্বিকল্প সমাধি ব্যুত্থিত পুরুষ। অদ্যাবধি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ সেই নির্বিকল্পভূমিতে আজ পর্যন্ত পোঁছতে সক্ষম হন নি। "অবতারের মত পথকে সাধারণের মাঝে সুপ্রতিষ্ঠা দান করাই হল সদ্‌গুরুর উদ্যম।" নিগমানন্দ এই বাণীকে প্রতিষ্ঠা দানের জন্য সারাজীবন তৎপর ছিলেন।

স্বামী নিগমানন্দজী তাঁর এই বাণী মাধ্যমেই অস্প্রাদায়িক ভাবে ধর্মের বিস্তার দান করে জগতবাসীকে সাম্প্রদায়িকতার হিংসা বিদ্বেষ হতে মুক্ত রাখতে জীবনভর সচেষ্ট ছিলেন। সৎশিক্ষা বিস্তারের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। সংঘ প্রতিষ্ঠা মাধ্যমে জগতের মানুষকে ভবালবাসার একতার বন্ধনে সারাজীবন আবদ্ধ করে রাখতে প্রয়াসী ছিলেন।

ভক্ত সম্মিলনী সৃষ্টি করে আমরা সবাই যে এক স্রষ্টারই সৃষ্টি, আমরা যে সবাই ভাই-ভাই, আমরা যে কেউ কারও পর নই, আমরা যে সবাই সবার আপন, ব্যবহারিকভাবে আমরা আলাদা মনে হলেও অধ্যাত্ম ভাবে বা আত্মিকভাবে আমরা কেউ কারও পর নই। এই শিক্ষা দান করতেই তিনি জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে বুকে তুলে নিয়ে নিজে 'আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়' এই বাণীর যথার্থতা দান করে গেছেন।

একজন মহামানবের কর্মজীবন কখনও বলে শেষ করা সম্ভব নয়। কারণ তাঁদের স্থূল ও সূক্ষ্ম দুইভাবে কর্মজীবনকে ভাগ করা হয়। স্থূলটি আমরা যথাসাধ্য ব্যাখ্যা দিলেও তাঁর অন্তর্দৃষ্টির অন্তরালে যে কর্মপ্রবাহ তা আমাদের মত সাধারণের পক্ষে জানা বা ব্যাখ্যাদান করা সম্ভব নয়। এক কথায় তাঁদের সমস্ত জীবনটাই পরের জন্য নিজের বলতে তাঁদের কিছই নেই। এজন্য অদ্যাবধি যত মহামানবগণ এই ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁরা কেউ নিজের জন্য জন্মগ্রহণ করে আপন স্বার্থে লিপ্ত হননি। বরং পরের জন্য আপন জীবন বিপন্ন করেও আত্মবলিদান থেকে পশ্চাদপদ হননি। তাঁদের কর্মজীবন আমাদের চিরদিন স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবে এবং আজও আছে। পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন তাঁরাও অমর হয়ে থাকবে। তাঁদের স্মৃতি অনুসরণ করে মানুষ তাদের জীবন ধন্য করবে। ইতিহাস তাঁর জীবনকে সাক্ষি দিবে। আমাদের শ্রী নিগমানন্দ হলেন তাঁদের মধ্যে একজন।

১.১২:চ: পরম সত্তা দর্শন

মানুষের জানার বিষয় তিনটি। প্রথমটি নিজেকে জানা, দ্বিতীয়টি ঈশ্বরকে জানা ও পাওয়া এবং শেষটি হল– সেই আলোকে জগৎকে জানা। এই জানার জিজ্ঞাসা এবং পাওয়াই হল দর্শন। জানার ভিত্তিটি এরকম– নিজের জানার অনুভূতি না থাকলে অন্য জানা যেমন অসম্ভব, এই লক্ষ্যে নিজেকে জানালাম, তারপর সেই জ্ঞানকে ভিত্তি করে তাঁকে জানালাম এবং পেলাম। এখানেই শেষ মনে হলেও প্রকৃত শেষ আরও একধাপ উপরে, তাহলো ঐ জ্ঞান আর বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে জানতে হবে, সেই ভূমার এই জগৎ ও জীবকে। আমার অবস্থানকে অস্বীকার করে আমি আমার বা অন্য আর কারুর সিদ্ধান্ত দিতে পারি না। এই ত্রিবিধ উপলব্ধিই হল পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ বিজ্ঞান, পূর্ণ দর্শন। এটাই হল নিগমানন্দ দর্শন।

আমাদের যে জানা বা জ্ঞান, যাকে আশ্রয় করে আমরা বড়াই করি, সিদ্ধান্ত দেই, এ যেন ঠিক এমন– সূর্যের কাছ থেকে ধার করা চাঁদের আলোর মত। চাঁদের নিজস্ব আলো না থাকলেও সূর্যের আলোকেই সে ভাবে তার আলো। যেমন প্রাণের প্রবেগে ঝোঁকের মাথায় সংসার করি– প্রথমটায় তার মধ্যে দোষের কিছু দেখতে পাই না। এর স্বাভাবিক আনন্দটিকেই বড় করে দেখি। কিন্তু এই প্রবেগ একদিন মন্দীভূত হয়, জরা ও ব্যাধি এসে দেহকে আক্রমণ করে, মৃত্যুর বিভীষিকা সামনে প্রদর্শন করে– তখন কি মনে হয়, আমি সংসার-সুখকে যে এক সময় বড় ও আনন্দের উৎস বলে জেনেছিলাম তার সত্যতা কতটুকু, এই বিবেচনায় আসে না কি ? সংসার সত্যটি প্রত্যক্ সত্য নয় মোহ অথবা পরাক্ এবং এ পর্যন্তই স্বীকৃত। যতদিন মোহে অভিভূত থাকা যায় ততোদিনেই এটি সত্য, যথার্থ, কর্তব্য এবং ধর্ম। মোহ শেষ হলেই সে সংসারের দোষগুলি স্পষ্ট দেখতে পায়। আর দোষানুদর্শনের ফল রূপে তখনেই কর্তব্য ও আসক্তি শিথিল হয়ে যায়। স্ত্রী পুত্র পরিবারকে আর তখন তেমন করে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতে ইচছা করে না। মনের বৈরাগ্য তখন ইন্দ্রিয়েও সংক্রামিত হয়। যে ইন্দ্রিয়গুলি এক সময় প্রবল সঞ্চারশীল ছিল আজ তারা অকেজো। দম্ভ নিয়ে মাথা উচিয়ে আর চলতে পারে না। সে মাথা যেন কোথাও লুটিয়ে পড়তে চায়–। বিষয়ভোগ এখন আলুনি লাগে। শান্তি অন্য কোথাও; এই মনে হয়। 'হেথা নয় অন্য কোন খানে'। অর্থ্যাৎ আমার দম্ভ ও শক্তি এই পর্যন্তই। এক কালে যাদের আমি উপেক্ষা, অবহেলা, দুর্বল, শক্তিহীন ও তুচ্ছ জ্ঞান করেছিলাম তারাই এখন আমাকে শাসাচ্ছে। আমি ভয়ে জড়সর। তাই মাথা লুকাতে চাই কোন নির্বাণ আশ্রয় দানকারী দিশারীর কাছে। তাঁর পায়ে স্থান চাই – প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন আর সেবার আকূতি নিয়ে। বিলিয়ে দিতে ইচ্ছা হয় তাঁর স্নেহাকর্ষণে নিজেকে তাঁর শ্রীচরণকমলে।

শ্রীনিগমানন্দ তাঁর দর্শনে বলেন, এই শুরু হওয়া নবদর্শনটি হল তোমার নতূন জন্ম, যথার্থ জীবন। এখন থেকে তোমার অভ্যস্ত প্রাকৃত জীবন পিছনে পড়ে রইল। সংসার যেমন ছিল তেমনই আছে, কিন্তু তোমার ভিতরটি গেল বদলে। এই বদলে যাওয়াই হল সত্যানুসন্ধান। এই অনুসন্ধানই হল জ্ঞান, সত্যপ্রাপ্তি

হল বিজ্ঞান, সত্যের আলোকে জীবন যাপন হল দ্রষ্টা বা স্বাক্ষিস্বরূপ জীবন। আমার সব, আমি সবকিছুতে, কিন্তু আমি কোন কিছুতে লিপ্ত নই। এই হল 'নিগমানন্দ দর্শন'।

নিগমানন্দ তাঁর দর্শনে বলেন, হয়– স্ব-স্বরূপানুসন্ধান কর আত্মশক্তিতে, নয়– পথের দিশারী বা আদর্শ রূপে যিনি তোমার ব্রহ্মবিদ্ গুরু, সেই আচার্যোপাসনা দ্বারা তোমার স্বরূপ জ্ঞান লাভ কর। সংসারের দাবদাহ স্ত্রী পুত্রের অসদাচারণ তোমাকে যত বিরক্ত বিব্রত করবে বিবেককে ধাক্কা দিবে, উচিত অনুচিত বিবাদ বাঁধবে, কর্তব্য অকর্তব্যের দাবি শক্তি বৃদ্ধি পাবে তখনেই জ্ঞান ফুটে উঠবে, ধর্ম-অধর্ম শিক্ষা লাভ অনুসন্ধান ঘটবে তখন অবশ্যই তোমার বাইরের জগৎটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বার ভারটা অনেকটা থাকবেনা জনসঙ্গেও তেমন রুচি হবেনা। দিনে দিনে এখন তোমার আপন স্বরূপ স্পষ্ট হচ্ছে, ফুটে উঠছে, আর তোমাকে বুঝিয়ে তৈরি করছে, এই হল মানুষের নিজেকে জানার বিষয়ে প্রকৃতির বিধানে একটি বিশেষ প্রয়াস। শ্রীনিগমানন্দ দর্শনের এই হল, 'নিগম সূত্র'; যার প্রথম অংশ 'চিত্তশুদ্ধির' নামান্তর।

শ্রীনিগমানন্দের জীবন দর্শন; এই সূত্র ধরেই উত্থিত হয়েছিল। স্ত্রী মৃত্যুতে বৈরাগ্য নেমে আসলো। এই বৈরাগ্য চিত্তশুদ্ধিরূপে বিবেক নামে উপস্থিত হল। পরিচয় পেল তার নিজ স্বরূপের সাথে। জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ আলাদা। অর্ন্তদৃষ্টিতে জ্ঞানের সাধনায় যিনি জ্ঞেয় তিনি ব্রহ্ম। আবার তিনি জ্ঞানও। তাহলে আমার জ্ঞান দিয়েই আমি তাকে পাই জ্ঞান রূপে। তখন তাঁর জ্ঞানে আমার জ্ঞান মিলিয়ে গেলেও অবশিষ্ট থাকে জ্ঞান। তাহলে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানে পার্থক্য নেই। সূর্য্যোদয়ের আগে পূর্বাকাশে শুকতারা দেখে মনে হয় না কি, এবার সূর্য্য উঠবে ? শুকতারা যে ভোরের আকাশের পূর্বাভাষ। এই শুকতারাই যেন বলছে– 'আজ্যোতিরেতি'– ওই যে আলো আসছে। কিন্তু শুকতারার আলো সূর্যেরই আলো। সূর্য উঠলে পর শুকতারা তাঁর আলোতে মিলিয়ে যায়। যতক্ষণ সে বলতে পারছিল 'ওই যে আলো আসছে' ততক্ষণ তার কাছে আলো 'সৎ' অর্থাৎ অস্তি, আছে। যখন ওই আলোতে সে মিশে গেল তখন সেও নেই, অতএব তার দেখা সেই আলোও নেই। এবার তার দিক থেকে ঐ আলো নিশ্চয়ই 'অসৎ' অর্থাৎ নাস্তি নেই। অর্থাৎ অসৎ রূপে তিনি তখন অসীম। সেখানে চোখ যায় না, বাক্ যায়না, মনও যায় না, ইন্দ্রিয়াতীত বোধ। কিন্তু 'আলো' তো মিথ্যা

নয়। শুকতারার দৃষ্টি মিথ্যে হতে পারে, আলো মিথ্যে হতে পারে না। তাহলে ঐ আলো আসলে যে কি বলা যায় না। তার কি যে নাম, কি যে রূপ, কেউ চিনে না জানে না। সে অনির্বচনীয়।

ব্রহ্মকে আমরা আমাদের জ্ঞানের দিক থেকে মাপতে পারি না। ব্রহ্মও অনির্বচনীয়। কিন্তু তবুও 'বোধে বোধ' হয় কিন্তু প্রকাশ করে বলা যায় না। বোবার মিষ্টি আস্বাদনের মত। শ্রীনিগমানন্দ দর্শনও এই সনাতন সত্যকে চারটি কোটিতে দেখে এর সত্যতা উপলব্ধি করেছেন। যথা– 'সৎ', 'অসৎ', 'সদাসৎ' (সৎ ও অসৎ একসঙ্গে) এবং 'সৎ'-ও নয় 'অসৎ'-ও নয়। অর্থাৎ 'নসৎ নাসৎ'– তিনি যে কি তা বলা যায় না। বোধেও তার কুল মেলে না। তাঁর ইতিও কোন প্রকারে করা যায় না। কারণ

'পূর্ণমদ্ পূর্ণমিদং'– পূর্ণের সাথে পূর্ণের যোগ, গুণ, বিয়োগ, ভাগ যাই করি না কেন 'পূর্ণমেবাবশিষ্যতে' পূর্ণই থাকে পূর্ণের অবশিষ্ট হয়ে, পূর্ণের শেষ হয় না। এ যেন 'শেষ হয়েও হল না শেষ'। দৃষ্টিভঙ্গি ভেদে যে উক্ত চারটি কোটিতে সেই সত্য সনাতনকে আমরা দেখে বিরোধ সৃষ্টি করি সেই দৃষ্টিভ্রম আমাদের, তাঁর নয়। তিনি সৎ, তিনি অসৎ, তিনি সদাসৎ আবার তিনি কিছুই নন এমন। শ্রী নিগমানন্দ দর্শন সার্বভৌম ঐ চারিটি কোটিকেই যোগ, জ্ঞান, তন্ত্র ও প্রেম এই সার্বভৌম চারিপথের কেন্দ্রবিন্দু নির্বিকল্পের মহাসমাধিতে পৌঁছে বোধে-বোধ লাভ পূর্বক আত্মপ্রত্যয় নিয়ে ফিরে এলেন এই মর্ত্যভূমিতে। ফিরে এসে বললেন, আমিই সেই, সেই আমি।

কিন্তু ব্যবহারিক দশায় তিনি সবসময় ঈশ্বর শরণাগতির আদর্শই প্রকাশ করে গেছেন। নিজেকে দেখান নি, দেখিয়েছেন ব্রহ্মকে, সদাসৎকে। তিনি কোথাও অনন্তের ইতি টানতে বলেন নি। কারণ তাঁর ইতি টানলে তিনি সীমিত হয়ে যাবেন। যেহেতু তিনি অনাদি, অসীম, অনন্ত ও অফুরন্ত। এই শংকর মতকেই তিনি তাঁর আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অসীম ও অনন্ত যে– সসীম ও সীমিত হন এও তাঁরই মহৎ ইচ্ছায়। তাঁরই বেদবাণীতে তিনি নিজেই প্রমাণ করেছেন, 'অনোরণীয়ান মহতোমহীয়ান্' তিনি নিজেই বড়; নিজেই ছোট সাজেন, এটিই অসীমের অনন্ত ভাব অনন্ত মহীমা। বরং বলতে পারি– তিনি আছেন এটি প্রমাণের জন্যই তাঁর এতটুকু অনুগ্রহ ব্যক্ততা। শ্রীনিগমানন্দ দর্শন এই দর্শন লাভেরই পক্ষপাতি। তাঁর লক্ষ্য শংকরের মতের প্রতি

অর্থাৎ অদ্বৈতানুভূতির প্রতি। এই অনুভূতিকে আশ্রয় করে বাঁচতে চেয়েছেন প্রেম ভক্তি তথা গৌরাঙ্গ পথে। শ্রীনিগমানন্দ এই লক্ষ্যেই তাঁর দর্শনের নাম দিলেন 'শংকরের মত ও গৌরাঙ্গের পথ'। শংকর জ্ঞানের প্রতীক, গৌরাঙ্গ ভক্তির প্রতীক। একটি অদ্বৈত, অপরটি দ্বৈত। এই দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয় তিনি যুক্তি তর্কের মধ্য দিয়ে যতটুকু বিরোধ মিটা যায় তাঁর চেয়ে অধিক রূপে সত্য দর্শন করার প্রতিই জোর দিয়েছেন বেশি। কারণ দর্শন সর্বদা জীবের অমৃতস্বরূপ স্মৃতিই জাগ্রত করে তুলে। বস্তু বিশ্লেষণের চেয়ে দর্শনই অধিক সত্য এই অবাধিত। এই সম্পর্কে সিদ্ধসাধক স্বামী নিগমানন্দজী বলেন:

> জ্ঞান চাই কিন্তু সেই জ্ঞানকে প্রেমে পরিণত করতে হবে। নিছক শুষ্কজ্ঞানে কিছু হয় না- জ্ঞানেরও প্রয়োগ চাই। জ্ঞানীই জগতের প্রকৃত সেবক। কোন কিছুতেই আবদ্ধ করতে পারে না, এই সংস্কার– এই বল প্রাণে আছে বলেই জ্ঞানী অকুণ্ঠ চিত্তে সকলের সেবা করে যেতে পারেন। তোমরা জ্ঞানলাভ করেছ বুঝব তখনই, যখন তোমরা অপরের দুঃখ-দৈন্যে বিচলিত না হয়ে থাকতে পারবে না। শংকরের জ্ঞান বলতে আমি পুঁথিগত জ্ঞান বুঝি না। জগতের অবিদ্যা দূর করবার দরুন শংকরাচার্যের মত যাদের প্রাণে আকূলতা আসবে, বুঝব তারাই শংকরাচার্যের জ্ঞান লাভ করেছে।[২৯]

জ্ঞান লাভ করার পরও তোদের জীবনে নিত্য লোকের ভাব ফুটে উঠুক– এই আমার আশীর্বাদ। ভগবানকে তোমরা এই জীবনে (আমার মত) এই দেহ-মন দিয়েই উপলব্ধি করতে পারবে। জ্ঞান বলতে তো আমি মানস কোন ক্রিয়াকে বুঝি না; প্রাণকে শীতল করে , পরিপূর্ণ আনন্দে মাতিয়ে তুলে যা, তাকেই বলি আমি জ্ঞান।[৩০]

পুঁথিগত জ্ঞানীর অভাব নেই। তাঁরা কি জগতের অবিদ্যা মালিন্য দূর করতে সক্ষম ? অবিদ্যাকে দূর করা যায় যে জ্ঞানের আলোকে, সেই জ্ঞানের দীপ্তিতে তোমাদের অন্তর উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক। আমার শেষ কথা হল, তোমরা শংকরাচার্যের ন্যায় জ্ঞান লাভ কর, কিন্তু শংকরাচার্যের প্রাণ, মনের বল, সাহস,–এইগুলিই হল আসল। জ্ঞানলাভ করে যদি এই দৈবী গুণগুলিই নিস্প্রভ হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু জীবনের কোন সার্থকতা হল না। শংকরের মত জ্ঞানী এবং গৌরাঙ্গের মত হৃদয়বান্ হও তোমাদের নিকট আমি এই চাই।[৩১]

২৯। ঐ, পৃ.,৭৮
৩০। ঐ, পৃ., ৭৯
৩১। ঐ, পৃ., ৮০

অন্যত্র এই বিষয়ে স্বামী নিগমানন্দের সহজ ভাবার্থ ছিল– পন্ডিতদের মতে যদিও জ্ঞান-ভক্তি পরস্পর বিরোধী, কোন মিল নেই। কিন্তু এই দু'টি দর্শনকে একত্রিভূত করাই ছিল শ্রীনিগমানন্দ দর্শনের বৈশিষ্ট্য। শ্রী নিগমানন্দজী উদাহরণ স্বরূপ বলেন, দুধ ও মিশ্রি দুটি পরস্পর আলাদা বস্তু। কারও সাথে কারও মিল নেই। একটি কঠিন ও শুষ্ক , অপরটি তরল, সরস ও কমল। এই দুধরূপ তরল, কমল ও সরস দ্রব্যটিতে যদি শুষ্ক কঠিন ঐ মিশ্রিকে মিশাই তবে অবশ্য এক পর্যায়ে গলে মিশে গিয়ে সুস্বাদু ও সুপেয় হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অথচ উভয়ের গুণের কোন পরিবর্তনও হবে না। দুধ দুধের স্বাদে এবং মিষ্টি মিষ্টির স্বাদে অবিকৃত ও অপরিবর্তনীয় থাকবে। উভয় আপন আপন অবস্থানে সক্রিয় থাকবে অথচ কোন বিকৃতরূপ ধারণ করবে না। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে– এই কঠিন শুষ্ক বস্তুটিকে নিগমানন্দ বুঝিয়েছেন জ্ঞান।

যেমন বিচার যুক্তি ও বিশ্লেষণে এই জ্ঞান একসময় এত নীরস হয় যে দেখতে ঠিক যেন মিশ্রির মত শক্ত ও শুষ্ক দেখায় কিন্তু ভিতরটি রসে ভরা থাকে, শুধু প্রকাশ পায় না, এ-ই।

অতএব জ্ঞান-ভক্তি বাইরে আলাদা মনে হলেও এ যেন হাতের এপিঠ ওপিঠ। উদাহরণ স্বরূপ তিনি এই উভয় বস্তু দুটিকে ভ্রাতা-ভগ্নির সাথে তুলনা করে অন্যত্র আরও একভাবে বুঝিয়েছেন– যেমন; ভগ্নি বিনা বাধায়, বিনা সংকোচে অপরিচিত যে কোন বাসায় প্রয়োজনে নিঃসংকোচে অন্দরে প্রবেশ করতে পারে, ভাই কিন্তু তা পারে না। কারণ সে পুরুষ মানুষ, তাকে হঠাৎ দেখলে পরিবারের সদস্যগণ অপ্রস্তুত হয়ে পড়বেন। ক্রোধান্বিত হয়ে অঘটনও ঘটাতে পারেন। ভগ্নির বেলায় কিন্তু এই সুযোগ নেই। কারণ সে সহজ, সরলা, কমলা ও দুর্বল।

বোন তারপরেও মনেমনে এই সাহসে ভর করে থাকে যে, তার ভাই এই বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে তাকে পাহারা দিচ্ছে। অতএব কোন কিছু হলেই ভাই এগিয়ে আসবে, ভয় কিসের ? শ্রীনিগমানন্দ এই জ্ঞান-ভক্তিকে সমাধিতে আলাদা রূপে দেখেন নাই। বরং শংকর গৌরাঙ্গ রূপ জ্ঞান ও ভক্তিকে একই পিতার সন্তান রূপে দেখেছেন। তাঁর জীবন দর্শনের বৈশিষ্ট্য এখানেই।

১.১২.ছ-উপসংহারঃ এ অংশের উপসংহারে পৌঁছানোর পূর্বে স্বামী নিগমানন্দের এ পথে অগ্রসর হওয়ার প্রেক্ষাপটকে একটু সামনে আনতে হয়। নিয়তির নির্মম পরিহাস নিগমানন্দের পরমাসুন্দরী, পতি পরায়ণা, সর্বগুণে গুণান্বিতা সতী স্ত্রী শুধাংসু বালার অকাল মৃত্যু হয়। প্রিয়া বিরহে প্রিয়তমের প্রাণ হাহাকার করে ওঠে। এই সুন্দর পৃথিবী তাঁর নিকট মরুভূমির মত হয়ে যায়। তিনি দিকবিদিক জ্ঞানশূণ্য হয়ে পড়েন। তিনি ভেবে কুল পাচ্ছিলেন না কী করবেন। এমন সময় তাঁর স্ত্রী তাঁকে ছায়া মূর্তিতে দর্শন দেন। একবার নয় তিন বার। প্রথমত ঘটনাদৃষ্টে তাঁর মত বস্তুবাদী যুক্তিবাদী সমালোচকের মন টলেনি এবং তিনি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন নি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস মৃত মৃতই। মৃতের পক্ষে কথা বলা কোনভাবেই সম্ভব নয়। যেহেতু জীবনের এ পর্যায়ে তিনি পরকাল ও জন্মান্তর স্বীকার করতেন না। তখন এই ঘটনাকে তিনি অসম্ভব বলে মনে করতেন। এই জটিলতা নিরসনে তিনি ভারতের বহু তীর্থ স্থানে গমন করেন। মাদ্রাজে গিয়ে বিদেশী বিদ্বান পন্ডিতদের সহায়তায় মিডিয়া প্লানচেটের মাধ্যমে সত্যতা যাচাইয়ে প্রেতাত্মাকে আনয়ন করার জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তাঁর স্ত্রীর প্রেতাত্মাকে আনা হয়। তখন তাঁর মনে হয়, আত্মা বা প্রেতাত্মা বলতে কোন পদার্থ হয়তো বা আছে। তাঁর আশা যখন তবুও সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ হল না তখন তিনি সত্য সন্ধানে সাধু সন্নাসীর পথ অবলম্বন করলেন। সত্য আবিস্কারে পশ্চাদপদ হলেন না। এই পথে অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে অবশেষে তিনি স্বীয় স্ত্রীকে জীবন্ত রূপে পেলেন। মহাশক্তি মহামায়া কন্যা জায়া জননী রূপে তাঁকে দর্শন দিয়ে ভারত ধর্মের সত্যতা প্রমাণ করেন, তিনি আত্মার নিশ্চয়তার প্রমাণ পেলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি অন্যতম সদগুরু রূপে ভারত ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হলেন। জ্ঞান ও যোগ সাধানায় সিদ্ধ হয়ে তিনি নির্বিকল্প ভূমিতে তথা যেখানে পৌঁছলে সাধক কোনভাবে আর মর্ত্যে ফিরে আসতে পারেন না সে পর্যায়ে উপনীত হন। পরে অবশ্য পরমেশ্বরের অসীম ইচ্ছায তিনি সসীমে অর্থাৎ নিজ দেহে ফিরে আসেন তাঁর আদেশে একমাত্র জীব জগতের উদ্ধার কল্পে, আর্ত-ক্লিষ্ট-রুগ্ন-দরিদ্র-দুস্থ অনাথ-অসহায়দের সহায় নিমিত্তে। দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে তিনি আহ্বান জানালেন, "কে কোথায় পচা ধসা গলা দীন দরিদ্র পাপী তাপী আছিস চলে আয় আমার কাছে, তোদের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত আমিও মুক্ত হব না।"

তিনি কঠোর সাধনা করে এই অসাধ্য লাভ করেছিলেন এবং ভারতে একজন খ্যাতনামা দুঃসাহসী সিদ্ধ পুরুষ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলেন। তিনি একযোগে ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবানে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সারা জীবন জ্ঞান-প্রেমের সাধনা করে গেছেন্ 'শংকরের মত গৌরাঙ্গেরপথ' ছিল তাঁর দর্শন। বাহ্যত জ্ঞান ও প্রেমে বিরোধ হলেও সূক্ষ্মভাবে উভয়ে এক। একে অপরের উপর নির্ভরশীল। তিনি সমন্বয়বাদী ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন। সৎশিক্ষা বিস্তার ও জীবসেবা ছিল তাঁর ব্রত। তিনি তাঁর শিষ্যদের তিন জন্মে মুক্তি দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও নিগমানন্দের শিক্ষা চিন্তাঃ

২.১ঃ বিবেকানন্দের শিক্ষা চিন্তা ও একটি পর্যালোচনা

বিবেকানন্দের শিক্ষা চিন্তার বিশ্লেষণে তাঁর সামাজিক ধ্যান-ধারণার কিছুটা অবতারণা অপরিহার্য বলে মনে হয়। আরও সুস্পষ্টভাবে বলতে গেলে বিবেকানন্দের সামাজিক ধ্যান-ধারণার পরিপ্রেক্ষেতেই তাঁর শিক্ষা চিন্তার পর্যালোচনা করতে হবে।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা যাকে– পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা বললে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না – তা অবশ্য বেশি দিনের পুরনো নয়। এ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় ষোল খ্রিষ্টাব্দের ধর্মসংস্কারের পরে। ইউরোপে তার আগে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। প্রত্যেককে তার উপলব্ধি ও আত্মবিকাশের ক্ষমতানুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হত। অর্থাৎ ঠিক সামাজিক প্রয়োজনে শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করা হত না এবং ঢালাও শিক্ষা প্রসারের কোন ব্যবস্থাও তখন ছিলনা। শিক্ষকের কাজ ছিল প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয়তা ও সামর্থ নির্ধারণ করে তাকে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলা। সে সময়ও অনেকের মধ্যে এই শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে সংশয় ছিল। খোদ ভল্টেয়ার একে বিচার-বিহীন নব শব্দ বা বিচার-বিহীন প্রয়োগবিদ্যা বলে অভিহিত করে ছিলেন।

একই ব্যবস্থাভুক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে সকলের একই ধরণের বোধদয়ের প্রচেষ্টার – সূত্রপাত মধ্যযুগের শেষ ভাগে কিমিরা শাস্ত্রের মধ্যে নিহিত ছিল। এবং এই ব্যবস্থার পথিকৃৎ হিসেবে সতের শতাব্দীর বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্ মারইভিয়ার বিশপ জন অ্যামোস ক্যামেরিয়াসের নাম উল্লেখ করতে হয়। তিনিই প্রথম সাত কিংবা বারো পর্যায়ের আবশ্যিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন। তিনি বিদ্যালয়সমূহকে প্রত্যেকের জন্য সবকিছু শেখাবার কলা-কৌশল বলে বর্ণনা করে বহুল পরিমাণে জ্ঞান উৎপাদনের এক খসড়া তৈরি করেন। সে খসড়া অনুশারে উৎকর্ষমূলক চিন্তা যে সুলভই হবে তাই নয়, ব্যক্তি মানবের পূর্ণ বিকাশও সম্ভব করবে। কিন্তু ক্যামেনিয়াস মূলতঃ ছিলেন একজন অপরসায়ণবিদ্ নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করাই ছিল তাঁর ব্রত।

মানুষের ক্ষেত্রে তিনি চেয়েছিলেন তার সত্তার উদ্‌গতির মাধ্যমে তাকে উন্নত করতে। ক্যামেরিয়াস তার লক্ষ্য সাধনে সমর্থ না হলেও শিল্পবিপ্লব এক অদৃশ্য নতুন পণ্যের উৎপাদন সম্ভব করে। এরই নাম জনশিক্ষা। (Mass education) এর লক্ষ্য হল বৈজ্ঞানিক ইন্দ্রজাল দ্বারা পরিবেশের উপযোগী নব মানব গোষ্ঠি গড়ে তোলা কিন্তু জনশিক্ষার জন্য বরাদ্দের পরিমাণ দিনদিন যতই বৃদ্ধি করা হোক না কেন, দেখা গেল যে, সংখ্যা গরিষ্ঠ ছাত্রই উচ্চতর শিক্ষার পক্ষে অনুপযুক্ত এবং ফলে নবসৃষ্ট পরিবেশের অনুপোযুগী বলেই ছাত্রসংখ্যা ছাঁটাই করা চলতে লাগল।

শিক্ষার এই নতুন ধারা বিদ্যালয়কে শুধু অপরিহার্যই করে তুলল না বিদ্যালয়ের ছাপ যোগাড় করতে অপারগ ব্যক্তিদের দারিদ্রকেও যৌগিক প্রক্রিয়ায় বাড়িয়ে তুলল। প্যাসকেলের বিচারে যারা বিদ্যালয়ের গন্ডির বাইরে আসতে বাধ্য হল তারা শুধু নিজেদের হেয়জ্ঞান করতেই শিখল। সমাজের মূল্যবোধ যান্ত্রিক প্রক্রিয়া – কবলিত হয়ে মানুষকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করল। জীবন বেদের প্রয়োজনীয় সংস্কার দ্বারাই এই শৃংখল ছিন্ন করা সম্ভব। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা এই উদ্দেশ্যের অভিমুখেই প্রসারিত। এই শিক্ষাচিন্তা বা শিক্ষাতত্ত্বের সাথে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত রয়েছে তার সামাজিক ধ্যান ধারণা।

বিবেকানন্দের শিক্ষা চিন্তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তা অত্যন্ত মহৎ ও গভীর। তাঁর এই শিক্ষা তত্ত্বের মহত্ব ও গভীরতা বুঝতে চাইলে সেগুলোকে পর্যায় ভিত্তিক আলোচনা করতে হবে। এক্ষণে সেই চেষ্টায় ব্রতী হলাম।

প্রথমত পশ্চাৎপট: বিবেকানন্দের মতে শিক্ষা ব্যবস্থাটি সব সময় সামাজিক ধ্যান-ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট। এই সমাজিক ধ্যান-ধারণার মধ্যে তাঁর বর্ণচক্র তত্ত্বই সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। বিবেকানন্দ ছিলেন হিন্দু কল্প তত্ত্বে বিশ্বাসী। এই তত্ত্বানুসারে তাঁর বক্তব্যটি বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্যঃ

এই জগৎ তরঙ্গায়িত চক্রাকারে চলিতেছে। তরঙ্গ একবার উঠিল সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছিল, তারপর পড়িল, কিছু কালের জন্য যেন গহ্বরে পড়িয়া রহিল। আবার প্রবল তরঙ্গাকার ধারণ করিয়া উঠিবে। এইরূপে তরঙ্গের উত্থান ও পতনের পর পতন চলিতে থাকিবে। সমগ্র ব্রহ্মান্ড বা সমষ্টি সম্বন্ধে যাহা সত্য, উহার প্রত্যেক অংশ বা ব্যষ্টি সম্বন্ধেও তাহা সত্য। মনুষ্য-সমাজের সকল ব্যাপার এই রূপে তরঙ্গ গতিতেই চলিতে থাকে, বিভিন্ন জাতির ইতিহাসও এই সত্যেরই সাক্ষ্য দিয়া থাকে।[১]

মানবজীবনে এই চিরন্তন চক্র চার অঙ্কের এক নাটক সৃষ্টি করে চমৎকারিতার দিক দিয়ে যাকে অতুলনীয় বলা চলে। "স্বামী বিবেকানন্দের মতে এই নাটকের শেষ অঙ্ক কিন্তু এখনও মঞ্চস্থ হয়নি। চার অঙ্কের বর্ণ চতুষ্টয়– ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র পর্যায়ক্রমে মূল ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রথম পর্যায়ে সমাজকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে ত্যাগ ও সংস্কৃতির প্রতীক ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ আদর্শচ্যুত হওয়ার পর প্রতিষ্ঠিত হয় ক্ষত্রিয়ের শাসন। আবার ক্ষাত্রধর্মচ্যুত ক্ষত্রিয়ের অপসারণ করে তাদের স্থানাধিকার করে বৈশ্যগণ। বৈশ্য শাসন শোষণেরই নামান্তর। সুতরাং একদিন এরও ঘটে অবসান। তবেই সমগ্র সমাজে প্রবর্তিত হয় শূদ্র বর্ণের আধিপত্য।[২]

এই সমাজ বিবর্তন নাটকের শেষ অঙ্ক এখনও অবশ্য অভিনীত হয়নি। তবে বিবেকানন্দ এর এমন চিত্র অংকন করেছেন, যেন তিনি এর চুড়ান্ত মহড়ায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানেন সমাজ বিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি কি? কিন্তু হার্বার্ট স্পেন্সারের মতো এই বিবর্তনের প্রতিটি পর্যায়ে ক্ষয় ও অবলুপ্তির সুস্পষ্ট সূচক বিবেকানন্দের কাছে প্রতীয়মান হয়নি।বরং তিনি এর মধ্যে দেখেছেন সমাজ বিবর্তনের ধারা – যে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজ বিকশিত হয়ে ওঠে। বর্ণ- শাসন বিকৃত হয়ে উঠলে তা অপসারিত হবেই। সুতরাং বিকাশ ও অগ্রগতি কি একই কথা নয় ? বিবেকানন্দের মতে মানব জীবনযাত্রা ভ্রান্তি থেকে সত্য নয়, নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে, কিন্তু তাই বলে তিনি ব্যক্তির জন্য নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নির্দেশ করেন নি। কেননা তা করলে যে তার নিজেরই নয়া বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়কেই অস্বীকার করা হত। আসলে তিনি যা করতে চেয়েছিলেন,

১। স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, **স্বামীজির বাণী ও রচনা**, কলিকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ৮ম খন্ড, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৮৪, পৃ., ২৭০
২। পূর্বোক্ত, ৬ষ্ট খন্ড, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৮৩, প., ২২২

তাহল পরম কারণমূলক পদ্ধতিকে (Teleological process) তরান্বিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজকে নবযুগ প্রসবের বেদনা থেকে যথাসম্ভব মুক্ত করা। এই মুক্তি মন্ত্রের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন সমাজের সৌভাত্রমূলক কাঠামোয়। যে কাঠামো বৈদান্তিক শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমেই গড়ে তোলা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে প্লেটো এরিষ্টটলের কথা। তাঁরাও শিক্ষার মধ্যে সন্ধান পেয়েছিলেন বিপ্লবের প্রতিরোধ ব্যবস্থার।

শিক্ষা বলতে বিবেকানন্দ কী বোঝান?

বিবেকানন্দের মতে শিক্ষার সংজ্ঞাঃ বিবেকানন্দের মতে সমাজ সংস্কারের সাথে শিক্ষা শব্দটি অঙ্গাঙ্গি ভাবে যুক্ত। সমাজের সৌভাতৃত্বমূলক কাঠামো গড়ে তোলা অর্থাৎ সমাজের মধ্যে প্রকৃত অর্থে মৈত্রী বন্ধন সৃষ্টিকে সমাজ সংস্কার বলে অভিহিত করা যেতে পারে। সংস্কার বলতে স্বামীজি অন্তরাগত সম্প্রসারণের পথে সকল প্রতিবন্ধকের অপসারণই বুঝেছিলেন, উপরিতলগত কিছু কিছু রদবদল নয়। এই দিক দিয়ে সংস্কার স্থান কালের আপেক্ষিক হতে বাধ্য তবুও কিন্তু মূলতঃ সংস্কার হল জেহাদেরই নামান্তর। অর্থাৎ বৈষম্য, অন্যায়, ভেদাভেদ জ্ঞান, আত্মকেন্দ্রিকতা বিশেষাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রবণতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে জেহাদ।

সামগ্রিকভাবে এই সংস্কার কার্য শিক্ষা ব্যবস্থার উপরেই নির্ভরশীল, যেহেতু শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত সমাজ কেন্দ্রিক, সেই হেতু এই শিক্ষাকে সামাজিক শিক্ষা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। বিবেকানন্দ শিক্ষা ও ধর্মের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, " শিক্ষা হচ্ছে মানুষের ভেতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ "[৩]। এখন অলডাসহাক্সলির অনুসরণে ঐশী শক্তিকে যদি সেই পূর্ণাঙ্গতা, সেই শিবময়তা বলে মেনে নেওয়া যায়, তবে শিক্ষা ও ধর্ম দাঁড়ায় সম্পূর্ণ একাত্মবোধক– বলা যায় একই বিকাশ ধারায় দুটি পৃথক দিক। উভয়েরই উদ্দেশ্য মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের বিকাশ ঘটা সম্ভব। কিন্তু স্বামীজি সম্পূর্ণভাবেই বুঝেছিলেন যে,

৩। স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজ, **স্বামীজির বাণী ও রচনা**, কলিকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়, ৮ম খন্ড, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৮৪ সাল, পৃ., ৪০০

শিক্ষার এই অতিধারণ (Super concept) জনসাধারণ ঠিক উপলব্ধি করতে পারবে না। উপরন্তু ধারণাটির বহুল প্রচারের ফলে ব্যক্তিমন অন্তরাভিমুখী হয়ে ব্যক্তির সামাজিক দিকটার বিনাশ ঘটাবে, এমন সম্ভাবনা রয়েছে। এই কারণে তিনি শিক্ষার একটি সংজ্ঞাই নির্দেশ করেছেন। যথা– "যে অনুশীলন দ্বারা ইচ্ছাশক্তির প্রবাহ ও অভিব্যক্তি নিয়ন্ত্রনাধীনে আসে ও ফলপ্রসূ হয়, তাকেই বলা হয় শিক্ষা।"[৪]

বিবেকানন্দের মতে শিক্ষার বৈশিষ্ট্যসমূহ

প্রথমতঃ শিক্ষাদ্বারা ব্যক্তির মধ্যে সুপ্ত ইচ্ছাশক্তির উদ্বোধন করে তার প্রবাহ সংঘটিত করতে হবে। ব্যক্তি কোন স্বয়ং চলযন্ত্র নয়, শুধু প্রতিবন্ধকাধীন বলে সে যন্ত্রবৎ আচরণ করে। অতএব শিক্ষার লক্ষ্য হল মানুষ গড়া, ধর্মের উদ্দেশ্যও একই।

দ্বিতীয়তঃ ইচ্ছাশক্তির প্রবাহ ও অভিব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কি উদ্দেশ্য ? নিশ্চয়ই সমাজ কল্যাণের উদ্দেশ্যে । কারণ সমাজ বহির্ভূত ব্যক্তির অস্তিত্বও কল্পনা করা যায় না।

তৃতীয়তঃ শিক্ষা হল অনুশীলন, যার দ্বারা মানুষের অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী উভয় প্রকৃতিরই সমন্বয় সাধন সম্ভব। সুতরাং শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই উন্নয়ন মার্গ।

ধারণাটির সংক্ষিপ্তসার পাওয়া যায় স্বামীজিরই একটি উক্তিতে। প্রশ্নাকারে উক্তিটি হল – "যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর সাধারণকে জীবন সংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্র বল, পরার্থ তৎপরতা সিংহ সাহসিকতা এনে দেয় না সে কি আবার শিক্ষা ?"[৫] কিন্তু ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে এই চুড়ান্ত সমন্বয় স্বামীজির নিকট পর্যাপ্ত বলে মনে হয়নি। বোধহয়, তাঁর সন্দেহ ছিল যে, কালক্রমে সমাজের স্থলে ব্যক্তি প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তার ফলে আপামোর জনসাধারণ অবহেলিত হতে বাধ্য। সুতরাং তিনি জনশিক্ষাকেই অগ্রাধিকার প্রদর্শন করেছেন এবং এর সমক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে বলেছেন যে, জাতি ও সমাজের স্বাস্থ্যের পক্ষে এই শিক্ষা অপরিহার্য। একখানি পত্রে তিনি লিখেছেন,

৪। Swami Gombhirananda, **The Complete Works of Swami Vivekananda**, Calcutta: Vo IV, Advaita Ashrama, 8th edition 1962, P., 490

৫। পূর্বোক্ত, রঙ্গনাথানন্দ, **স্বামীজির বাণী ও রচনা**, পৃ., ১০৭

> যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যা বুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারত বর্ষের যে সর্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ একটি– রাজশাসন ও দম্ভবলে দেশের সমগ্র বিদ্যা বুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়– তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া।[৬]

অতএব স্বামী বিবেকানন্দ কল্পিত সামাজিক শিক্ষা মৌল প্রকৃতিতে জনশিক্ষারই নামান্তর। কিন্তু আবার প্রকৃতিগত দিক থেকেই এই জনশিক্ষা ক্যামেনিয়াস কল্পিত জনশিক্ষা থেকে ইউরোপে ধর্ম সংস্কারের পর–প্রবর্তিত জনশিক্ষা থেকে বহুলাংশে পৃথক। বস্তুত উভয়ের মধ্যে সাদৃস্য খুঁজে পাওয়াই মুস্কিল। এখন স্বামীজির এই শিক্ষা চিন্তারই বর্ণনা করা যাক। অর্থাৎ শিক্ষা বলতে বিবেকানন্দ কি বুঝেন ?

২.২: শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি: আমরা দেখেছি যে, স্বামীজির মতে প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মানুষ গড়া। অতএব প্রকৃত শিক্ষা কখনই তথ্যাধিক্য ভিত্তিক হতে পারে না। কারণ এ ধরণের শিক্ষা তোতা পাখিরই সৃষ্টি করে ক্রমে তাদের যন্ত্রবৎ করে তোলে। এ শিক্ষা কেরানিকুল সৃষ্টি কার্যে সার্থক হতে পারে – কিন্তু কোন কিছু মহৎ বা কল্যাণকর সৃষ্টি করতে সমর্থ নয়। অতএব বিবেকানন্দের মতে যে শিক্ষা আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, মানুষ গঠনকারী, চরিত্র গঠনকারী, ধ্যান-ধারণার সমন্বয় না হয়ে পারে না। পরিপূর্ণ অবস্থায় দেহ, মন ও আত্মার পূর্ণ সংগতি সাধনে সমর্থ না হলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ আখ্যা দেওয়া যায় না। গ্রীক্‌দের আদর্শ ছিল সুন্দর দেহাভ্যন্তরে ছিল একটি সুন্দর মন। স্বামী বিবেকানন্দ এর সঙ্গে একটি তৃতীয় উপাদান মানুষের আত্মা যোগ করেছেন এবং তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থায় তাকেই আদ্যতা (Primacy) প্রদান করেছেন। এরই ফলে এমন ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, আধ্যাত্মিক সম্প্রসারণই স্বামীজির কল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য।

৬। Bipin Pal, **The Complete Works of Swami Vivekananda,** Calcutta: Udbadhan Karjaloya, Vo IV, 5th edition, 1964, P., 482

বলহীনের পক্ষে যখন আত্মার উপলব্ধি সম্ভবপর নয় তখন বস্তুগত উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে বৈকি? তাছাড়া বুভুক্ষ জনগণকে ধর্মজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া তাদের অপমান করারই সামিল। অতএব স্বামীজিকে যে চিন্তাটি বিশেষভাবে বিব্রত করেছিল তাহল কি করে জনগণের মধ্যে অন্ন সংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিতরণ করা যায়।

এই বাস্তবধর্মী জ্ঞান বা শিক্ষার মধ্যে থাকবে মনের বলিষ্ঠতা গঠন ও আত্মার উদ্বোধনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান। এই শিক্ষাই হল মানুষ গড়ার শিক্ষা। বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন, মানুষ এইভাবে গড়ে উঠলে তার মধ্যে সমাজ চেতনা দানা বাঁধতে বাধ্য।

শিক্ষা পদ্ধতি: স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম মৌলিক ধারণা হল, কেউ কাউকে শেখাতে পারে না। যিনি এক নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চাইছেন তাঁর পক্ষে এই রকম ধারণা পোষণ অসঙ্গত মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই ধারণা স্বামীজির জীবনে বেদ বেদান্ত প্রসূত। বেদান্ত অনুসারে জ্ঞান মানুষের অন্ত র্নিহিত। সুতরাং শিক্ষা উপলব্ধি বা জাগরণ ছাড়া আর কিছু নয়। গাছের চারা যেমন সৃষ্টি করা যায় না, তেমনি কাউকে কিছু শেখানও যায় না। যা করা যায় তাহল উপলব্ধির পথে সহায়তা করা।

এই উপলব্ধি বা মনোবিদ্যামূলক পদ্ধতির সঙ্গে বর্তমান দিনের হিউরিষ্টিক পদ্ধতির বিশেষ সঙ্গতি আছে। শেষোক্ত পদ্ধতিতে ছাত্রকে স্বয়ং জ্ঞান আরোহণ করতে হয়, শিক্ষক তত্ত্বাবধান করেন মাত্র। শিক্ষা ব্যাপারে প্রাচীন গ্রীকদেরও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অনুরূপ। অতএব ভিকিনসনের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, প্রাচীনরাও আধুনিক। তা স্বামীজির শিক্ষা তত্ত্বে পরিস্ফূটিত হয়ে তার দর্শনের অন্যতম শাশ্বত উপাদান হয়ে রয়েছে। বিবেকানন্দ আরও মনে করতেন যে, শিক্ষা পদ্ধতি অবশ্যই জনগণের সহজাত গ্রহণ শক্তির আপেক্ষিক হবে। জাতীয় চরিত্র বিরোধী কোন শিক্ষাই কার্যকর হতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভারতের ক্ষেত্রে রুজি রোজগার সংক্রান্ত শিক্ষার ব্যবস্থা ধর্মের মাধ্যমেই করা সম্ভব। অন্য কোন পদ্ধতি জনমনকে প্রভাবিত করতে পারবেনা। ভারতের ক্ষেত্রে যাকে জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতি বলে অভিহিত করা যেতে পারে তার সন্ধান স্বামীজি পেয়েছিলেন, গুরুকুল

পদ্ধতিতে। (যে পদ্ধতি প্রাচীন গ্রীসে প্রবর্তিত ছিল)। গুরুকুল পদ্ধতির মূল কথা হল গুরুর সঙ্গে একত্রে বাস। পদ্ধতিটির উৎকর্ষ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন,

> শিক্ষকের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ব্যতীত প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব নয়। ... বিশ্বাস, নম্রতা এবং শ্রদ্ধা ছাড়া আমাদের মধ্যে কোন রকম সম্প্রসারণই কল্পনা করা যায় না। যে সব দেশ ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে এই সম্পর্ক গড়ে তুলতে ও বজায় রাখতে সমর্থ হয়নি সেখানে শিক্ষক কথকেরই ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং সেখানে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হয় শিক্ষকের ভাষণ মস্তিষ্কে ভরে নিয়ে যেতে। তারপর অবশ্য আর কিছু করা যায় না।[৭]

মানুষ গড়ার পক্ষ্যে বিশেষ কার্যকরী বলে বিবেকানন্দ বিশ্বজনীনভাবে এই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছেন।

ধর্মীয় ভিত্তি: একই উদ্দেশ্য তাঁকে সকল সমাজের ক্ষেত্রেই শিক্ষার ধর্মীয় ভিত্তি নির্দেশ করতে প্রণোদিত করেছে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, অন্ততঃ কার্যকারিতার দিক দিয়ে স্বামীজির দৃষ্টিতে শিক্ষা ও ধর্ম সম্পূর্ণ অভিন্ন। উভয়েরই লক্ষ্য মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার উপলব্ধি। এই প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার একটি উক্তি বিশেষ ভাবে মনে পড়ে, " স্বামীজির কাছে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন এমন কোন কিছুই ছিল না।"[৮]

প্রশ্ন উঠতে পারে ধর্ম কি অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে ? আপাত দৃষ্টিতে তা অবশ্য পারে না। কিন্তু মানুষকে নির্ভর করে তুলে অমৃত জীবনের সন্ধান দিতে পারে। এর ফলেই আসে ত্যাগ ও সেবার প্রেরণা। ভয় শূন্যতার ফলে বিবেক জাগ্রত হয়, বিমুক্ত ব্যক্তি তখন অযৌক্তিক সামাজিক বিধি নিষেধের অপসারণে অগ্রসর হয়। অতএব স্বামীজি এই বিমুক্তি করণ কার্যকে কেন শিক্ষার ভিত্তিস্থল প্রদান করেছেন তা অনুধাবন করা মোটেই কঠিন নয়। অন্য এক দিক দিয়ে দেখলে তাঁর মতে ধর্ম হচ্ছে শিক্ষার মৌল উপাদান।

---

৭. Swami Nirvedananda, **Swami Vivakananda India and Her Problems**, Calcutta: Advita Asrama, 2nd edition, 1970, Pp.,15-16

৮. K C Lahiri, **The Complete Works of Swami Vivekananda**, Calcutta: Udbadhan Karjaloya, edition, 1964, P., 47

২.৩: শিক্ষা সম্পর্কে বিবেকানন্দের মতের পর্যালোচনা

প্রথমত: বিবেকানন্দ মনে করেন, "শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যাপক ও ফলদায়ী করে তোলবার জন্য মৌল উপাদানের পরিপূরক হিসেবে অন্যান্য উপকরণ অবশ্য প্রয়োজন। এ হল অন্যতম আপেক্ষিকতার সমস্যা। ভারতের পক্ষে যা প্রয়োজন তা হল বেদান্ত ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমন্বয়, মূল প্রেরণার জন্য ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা এবং আত্মবিশ্বাস।"[৯]

এছাড়াও অপার অভিনিবেশ, (Concentration) ভোগ বাসনা শূন্যতা এবং প্রকৃতির সাথে আত্মিক যোগাযোগ স্থাপন।

দ্বিতীয়ত: স্বামীজি ছিলেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান। কারণ তাঁর সুন্দর বিশ্বাস ছিল যে, এর মাধ্যমেই সমাজের পরিভৌত ভিত্তি (Meterial base) শক্ত করে গেঁথে অভাব থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করা সম্ভব। সুতরাং চিন্তার পর্যায় বিচারে স্বামীজি নির্দেশিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের স্থান ধর্মেরও ঊর্ধ্বে। কারণ উদর পূর্তি হলে তবেই ধর্ম সাধনের কথা চিন্তা করা যেতে পারে। কিন্তু উদর পূর্তির পরেই মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হবার সম্ভাবনা সম্ভব। শিক্ষা তখন ভোগ বাসনাতেই ইন্ধন যোগাতে পারে। এই জন্যই তিনি আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞান ও ধর্ম স্বামীজি কল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার যৌথ ভিত্তি।

তৃতীয়ত: ব্রহ্মচর্যের অর্থ হল ব্রহ্ম সাহচর্যের প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা বিশুদ্ধতার রূপই গ্রহণ করে। সর্বক্ষেত্রে চিন্তা, বাক্য ও কার্যে বিশুদ্ধ হতে হবে। সহজ সংজ্ঞা দিয়ে বলা যায় ব্রহ্মচর্য হল বৃত্তি নিচয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য আত্মসংযম অনুশীলন। ব্রহ্মচর্যের ফলে প্রবল সক্রিয়তা ও প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তি উৎপন্ন হয়।

---

৯. Sister Nibvedita **Notes of Some Wondering With Swami Vivekananda,** Calcutta: Udbanhon Ofice, 5th edition, 1967, P., 7

অকল্পনীয় বলিষ্ঠতা ও নৈতিক চেতনারও উদ্ভব ঘটে। আবার মনোনিবেশ এবং ভোগবাসনা শূন্যতা ব্রহ্মচর্যেরই বৈশিষ্ট্য বা উপাদান। এই দুই উপাদানের আবির্ভাবের ফলে দেহ ও মন পরস্পরের সঙ্গে ভারসাম্যে উপনীত হয়। ফলে মানুষের অন্তর্নিহিত জ্ঞানের নির্গমনের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। জ্ঞানের মধ্যেই মিলে পরম সুখের সন্ধান। অজ্ঞতা দূর্দশারই সামিল। জীবনের জ্ঞানালোকে মৃত্যুভয় দূর হয়।

> যে পদ্ধতি দ্বারা ব্যক্তি এই জ্ঞানালোকে অবস্থান করতে পারে তাকেই বলা হয় অভিনিবেশ। রসায়ণবিদ্ গবেষণাগারে বসে তার সামগ্রিক মানসিক শক্তি প্রয়োগ করেন পরীক্ষাধীন উপাদান সমূহের যাতে তাদের সুপ্ত প্রকৃতি সফল রহস্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে। জ্যোতির্বিদ্ দূর্বীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে মনোসংযোগ করেন সূর্য তারকা নভোমন্ডলের উপর তাদের রহস্য সন্ধানের জন্য। অনুরূপভাবে বিশ্বের সকল রহস্যদ্বারই ছাত্রের কাছে খুলে যাবে। যদি তার জানা থাকে কিভাবে আঘাত করতে হয়। আঘাতের শক্তির প্রাবল্য একমাত্র মনোনিবেশ থেকেই আসতে পারে।[১০]

কিন্তু মনোনিবেশের সঙ্গে থাকা চাই বিচ্ছিন্ন করার ক্ষমতা। কোন বিষয়ের উপর মনঃসংযোগ করাই যথেষ্ট নয়। প্রযোজন মত পর মুহূর্তে মন সরিয়ে নিয়ে অন্য বিষয়ের উপর স্থাপিত করার ক্ষমতাও থাকা চাই নচেৎ মনোনিবেশ শিক্ষার্থীর জন্য নতুন শৃংখল রচনা করতে পারে।

শিক্ষা সম্পর্কে স্বামীজির নির্দেশ হল, "প্রকৃতি থেকেই শিক্ষা লাভ কর। (let nature be their teacher)। প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ফলে এই পরিদৃশ্যমান জগতের পশ্চাতে চিরন্তন সত্তার সাথে সাক্ষাৎকার সম্ভব হয় এবং এই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা।"[১১]

সুতরাং তিনি বিদ্যায়তন সমূহের পারিপার্শ্বিক কাঠামো গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

পাঠ্যক্রম ও শিক্ষার বাহন ঃ বিবেকানন্দের মতে, মানুষ গড়া শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যক্রম বিশেষ ব্যাপক, দেহ মন আত্মার সমন্বিত উন্নয়নের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই এর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য এর মধ্যে স্বামীজি যা অপরিহার্য বলে নির্বাচন করেছেন তাহল শরীর চর্চা, ধর্ম, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিদ্যা, কান্তিবিদ্যা (Aesthtics) যুগোত্তীর্ণ প্রাচীন সাহিত্য এবং ভাষা। তিনি মনে করতেন এদের মধ্যে অনুপাত অবশ্যই বিশেষ সময়ের প্রয়োজনানুসারে নির্ধারিত হবে।

১০। ঐ, P.,130
১১। ঐ, P., 369

শরীর চর্চার উদ্দেশ্য হল একদিকে শরীর এবং অপরদিকে মন প্রাণের মধ্যে ভারসাম্য আনয়ন। ভগ্নি নিবেদিতার অনুসরণে বলা যায়, "যে প্রাণ শক্তিকে এতদিন দেহপীড়নে ব্যয় করা হয়েছে তাকে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে পেশীয় অনুশীলনেই নিয়োগ করা উচিত বলে স্বামীজি মনে করতেন।"[১২]

প্রথমত: আগেই বলা হয়েছে যে, ধর্ম ও বিজ্ঞান হবে এই সব শিক্ষা ব্যবস্থার যুগল ভিত্তি। বিজ্ঞান শিক্ষার পরিপূরক হবে প্রযুক্তি বিদ্যা। প্রযুক্তি বিদ্যার মধ্যে আমাদের মত দেশের ক্ষেত্রে স্বামীজি দেখেছিলেন স্বয়ং নিয়োগদাতা আত্মনির্ভরশীলতার প্রশস্ত মার্গ। এর দ্বারা শিল্প প্রসারের মাধ্যমে বহু লোককে চাকুরীর উমেদারি থেকে বাঁচানো যেতে পারে বলে স্বামীজি মনে করেন। কান্তিবিদ্যা হল চারুকলা ও উপযোগবাদের সমন্বয়, যার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের উন্নয়ন পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় ছন্দ সৃষ্টি করা সম্ভব। জাপান এই সৃজনকার্য অতিসত্তর সম্পাদন করতে সমর্থ হয়েছে। তাই ঐ দেশের পক্ষে দ্রুত অগ্রগতিও সম্ভব হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: কালোত্তীর্ণ প্রাচীন সাহিত্য পাঠ লোককে জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করে জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমে জনগণের অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ জ্ঞান সংস্কৃতিভিত্তিশীল হচ্ছে ততক্ষণ জনগণ যে, উন্নীত অবস্থাতেই থাকবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই।

তৃতীয়ত: মাতৃভাষাই হবে জনশিক্ষার বাহন। স্বামীজি এই মত স্বীকার করতেন। তিনি এও মত প্রকাশ করতেন যে, শিক্ষার জন্য একাধিক ভাষা আয়ত্তে থাকা প্রয়োজন। এই ব্যবস্থা ছাড়া ধর্ম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা এবং কালোত্তীর্ণ প্রাচীন সাহিত্যের চর্চা কি করে করা সম্ভব ? দৃষ্টান্ত স্বরূপ, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার সার্থক অনুশীলন তো পাশ্চাত্য ভাষার মাধ্যমেই সম্ভব। এই জন্য স্বামীজি ভারতে ইংরাজি ভাষা চর্চার সুপারিশ করেছিলেন। আর যদিও তাঁর অভিমত ছিল যে, প্রচীন গ্রন্থভুক্ত মহান ধ্যান ধারণা সমূহকে জনগণের ভাষাতেই জনসমক্ষে উপস্থাপিত করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংস্কৃত শিক্ষারও নির্দেশ দিয়েছেন।

১২। পূর্বোক্ত, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, **স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা**, পৃ., ৬

কারণ সংস্কৃত শব্দের ঝংকারেই জাতিকে মর্যাদা ও শক্তি সামর্থ প্রদান করবে বলে স্বামীজি মনে করতেন। বুদ্ধ, কবির ,রামানুজ, শ্রী চৈতন্য এবং অন্যান্য প্রেরিত মহাপুরুষরা তাঁদের বাণী তৎকালীন প্রচলিত ভাষাতেই প্রকাশ করেছিলেন। ফল কিন্তু স্থায়ী হয়নি। মহান শিক্ষকগণের মহাপ্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ শিক্ষারও অবলুপ্তি ঘটেছিল।

পরন্তু জনগণ সংস্কৃতের মত প্রাচীন ভাষার চর্চা উপেক্ষা করলে ফল দাঁড়ায় কতিপয়ের বিশেষাধিকার। এর দরুন সৃষ্ট হয় এক নতুন কৃত্রিম ও জাতিভেদ প্রথা। অতএব কার্যত: স্বামীজি তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ত্রিভাষা ফর্মূলার নির্দেশ করেছেন; দেখা যায়।

চতুর্থত: স্ত্রীশিক্ষা: স্বামীজি নির্দেশিত স্ত্রীশিক্ষা ব্যবস্থ্যা পুরুষদের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে কিছুকটা পৃথক। কারণ দ্বিবিধ: (i) নারীকুলের সমসা অনেকটা ভিন্ন প্রকৃতির। (ii) গৃহস্থালির উৎকর্ষ বহু পরিমাণে স্ত্রীলোকদের উপর নির্ভরশীল।

সমাজভেদে নারীদের বিশেষ সমস্যারও প্রকারভেদ ঘটে থাকে। বিবেকানন্দ মনে করেন আমাদের মত দেশে সমস্যা হল অবরোধ প্রথার, পরাধীনতার এবং পরনির্ভরশীলতার। বিদ্যাসাগর নারী সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে, স্বামীজী কিন্তু সমাধান সূত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন স্বাবলম্বন ও পারস্পারিক সহায়তার মাধ্যমে। এর জন্য নারীর পক্ষে যা প্রয়োজন তা হল নারীকে নারী আকারে গড়ার শিক্ষা। যে শিক্ষা তাদের মধ্যে নির্ভিকতা এবং সাবলম্বনের ভাব গড়ে তুলবে। অতএব স্বামীজির মতে, স্ত্রীশিক্ষার পাঠ্যক্রমে থাকবে ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং কিছু ইংরেজি।

সুশৃংখল গৃহস্থালীর পক্ষে এর উপর আরও কিছু প্রয়োজন। সুতরাং তিনি শিক্ষা সূচীর তালিকায় যোগ করেছেন রন্ধনবিদ্যা, সূচীশিল্প, গার্হস্থ বিজ্ঞান ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজির এই সকল নির্দেশ প্রায় এক শতাব্দী আগে ঘোষিত হয়েছিল, যখন গার্হস্থ্ বিজ্ঞান বা সন্তান সন্তদির পরিচর্যা স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ পাঠ্যক্রমভুক্ত হয়নি। এতেই বুঝা যায় তিনি কত বেশি দূরদর্শিতার অধিকারী হয়েছিলেন।

২.৪: উপসংহার

স্বামী বিবেকানন্দ পরিকল্পিত শিক্ষার ব্যাপকতা মনে করিয়ে দেয় মিলটনের Treatise on Education এর কথা। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জন্য তাঁর পিতা জেমস মিল যে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন তাও মনে না পড়ে পারে না। আবার শরীর চর্চা , কান্তিবিদ্যা ও কালোত্তীর্ণ প্রাচীন সাহিত্যের পাঠ্যক্রমভুক্তি শিক্ষা ব্যবস্থার জিমন্যাষ্টিক, সংগীত এবং কাব্যের উপর প্লেটো প্রদত্ত গুরুত্বের সাথে তুলনীয়। এদের প্রয়োজন হল ব্যক্তি মানবের মধ্যে বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্য এবং প্রয়োজনীয় ছন্দসৃষ্টি । তবে স্বামীজি পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক বেশি মাধূর্যময় এবং পরিধিতে ব্যাপকতর। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হল বেদান্তের ধারণা অনুসারে মানুষ গড়া অর্থাৎ সমাজ ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গতা বা পরম উপলব্ধি সম্ভব করা। স্বামীজির বিশ্বাস ছিল যে, সকলেই এই পরিপূর্ণতায় উপনীত হতে পারে।

কেউ কেউ হয়তো তাঁর এই শিক্ষা পরিকল্পনার কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন। আবার কেউ কেউ হয়তো ভাবতে পারেন যে, বর্তমান দিনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজি নির্দেশিত প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ গুরুগৃহে বাস সংক্রান্ত নির্দেশের উল্লেখ করা যেতে পারে – অধিকাংশ শিক্ষার্থী যখন এতই গরীব ও অসহায় যে তাদের পক্ষে ক্ষেত খামারের কাজ ফেলে বিদ্যালয়ে যোগদানই সম্ভব নয়। তখন কি করে আশা করা যায় যে, সে গুরুগৃহে বাস করবে, অথবা বর্তমান অবস্থায় আবাসিক বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করবে ? পাঠক্রম সম্পর্কেও বলা যায় – এ অতি দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা। উপরন্তু এতে শিক্ষার্থীর সমস্ত সময় ব্যয়িত হবে। শুধুমাত্র আদর্শ সমাজের পক্ষেই এ ব্যবস্থা করা সম্ভব। অন্যথায় এ শিক্ষা মাত্র কতিপয়ের জন্য নির্দিষ্ট অভিজাত শিক্ষা হতে বাধ্য।

আসলে কিন্ত স্বামীজি তার পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা শুরু থেকে বিশ্বজনীন ভাবে প্রবর্তনের সুপারিশ করেন নি। তাঁর নিকট সংখ্যা বা পরিমাণের বিশেষ গুরুত্ব কখনও ছিল না। তিনি যা চেয়েছিলেন তা হল আগে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক সৃষ্টি করতে। যে শিক্ষক সম্প্রদায় সম্প্রসারণ সেবার মাধ্যমে প্রয়োজনীয়

পরিমাণে সামাজিক শিক্ষার প্রসার সম্ভব করেন। সুতরাং ভগিনী ক্রিষ্টিন যর্থাই উক্তি করেছেন, "স্বামীজি পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা হল, নতুন সমাজের জন্য নতুন শিক্ষক গোষ্ঠি সৃষ্টির প্রচেষ্ঠা মাত্র।"[১৩]

একমাত্র পরিকল্পিত সমাজ ব্যবস্থার পক্ষেই উন্নয়ন যাত্রা সম্ভব, এবং এই পরিকল্পনার মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার নির্দিষ্ট স্থান থাকতে বাধ্য। শিক্ষাপদ্ধতিকে যদি কাম্যরূপে রূপদান করা যায়, তবে শিক্ষারূপ তীর্থ যাত্রা পথে সকল প্রতিবন্ধক অপসারিত হতে বাধ্য। স্বামীজির আশা ছিল, একবার আন্দোলনের সূচনা করা সম্ভব হলে তার পরবর্তি পর্যায় সমূহের কাজ আপনা থেকেই সম্পাদিত হত। এই হল তাঁর আদর্শের উদ্ভবে বিশ্বাস। সুতরাং একে এক অন্যতম উদ্ভবতত্ত্ব বলেও আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এর মধ্যে যদি কিছু ইচ্ছাপূরণ বা অলীকতার উপাদান থেকে থাকে , তবে প্লেটো হতে মার্কস্ – সকল আদর্শবাদীর সকল আদর্শের মধ্যেই এই ত্রুটি লক্ষ্য করা যাবে।

১৩। Sister Kristin **Concerns of Swami Vivekaananda His Eastern and Western Admirers**, Calcutta: Adviata Ashrama, 5th edetion, 1961, P., 223

২.৫: শ্রী অরবিন্দের শিক্ষা ও একটি পর্যালোচনা

২.৫.১: ভূমিকা

শিক্ষা সংজ্ঞার মূল অর্থ হল মানব সত্তার স্ফূরণ, আর জীবন হল শিক্ষার স্থল। অতএব জীবনই হল শিক্ষা, শিক্ষাই হল জীবন। দু'টি হল যুগপৎ পরস্পর সম্পূরক। অর্থাৎ 'যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি' এই নীতিই হল জীবনের রীতি। লক্ষ্যহীন জীবন যেমন শিক্ষার অঙ্গ হতে পারে না অনুরূপ শিক্ষাহীন জীবন, জীবন বলে গণ্য হয় না। অতএব জীবন মানেই শিক্ষা, আর এই শিক্ষাকে জীবন সংগ্রামের প্রতি কাজে– কাজে লাগিয়েই জীবন পথে অগ্রসর হওয়া এবং বাস্তবায়নে ব্রতী থাকা। শিক্ষার উদ্দেশ্য জীবনের কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সম্পৃক্ততা নয়, সমগ্র জীবনটাই একটি শিক্ষা।

শিক্ষা শুধু ছকবাঁধা নিয়মের অধীনে কতকগুলি পুস্তক নিয়ে শিক্ষাকেন্দ্রের একটি গন্ডীর মাধ্যমে মান, সম্মান, অর্থ ও প্রতিষ্ঠার আশায় পরীক্ষার পর পরীক্ষা দিয়ে, পাশের পর পাশ সার্টিফিকেট নিয়ে, নিয়মিত যাতায়াত মাধ্যমে কঠোর ব্রতে ব্রতী হওয়াই এর প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল জীবন-বিজ্ঞান। অর্থাৎ জীবন সম্পৃক্ত শিক্ষা সংক্রান্ত যত জ্ঞান ও বিজ্ঞান। শরীর যেহেতু জীবন গঠনের সাথে সংযুক্ত তখন শারীরিক শিক্ষা অর্জনও শিক্ষার জন্য একটি লক্ষ্যণীয় বস্তু। শরীর গঠন না করলে যেমন প্রাণের জোর মিলে না, ঠিক প্রাণশিক্ষাকে জীবনে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে না পারলে ব্যবহারিক বিদ্যার সাফল্যতা জীবনের কোন কজে সুফল বয়ে আনে না। প্রাণের সাথে মনের বিশেষ যোগ বলেই শিক্ষায় মনসংযোগ করতে চাইলে চাই– মনের তীব্র একাগ্রতা। কারণ প্রবাদ আছে– মন করে তো মেরে কুত্তা শের মারে গা, লেকিন নেহি মারে গা।

একটি অস্তি চর্মসার কুকুরও তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করে জানাচ্ছে– যদি সে মনে করে তবে তার পক্ষে একটি বাঘ মারা কোন অসম্ভব কার্য নয়। কারণ মনের জোরের উপর আর কোন জোর নেই। মানুষ ইচ্ছা করলে এই মন দিয়েই সে অধরাকেও ধরতে পারে, অসীমকেও তার ভালাবাসার সীমায় আটকে রাখতে পারে। এই শিক্ষা দিয়ে মানুষ যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাজটি করতে পারে সে শিক্ষা হল, আন্তরাত্মিক ও আধ্যাত্মিক

শিক্ষা শক্তি লাভ। যার মাধ্যমে জগৎশিক্ষক রূপে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক হওয়া যায়। তাঁকে পেলে (জগৎ শিক্ষককে) আর কোন না পাওয়ার বেদনা থাকে না। পৃথিবীর কোন পাওয়াই সেই পাওয়ার নিকট কোন কালে যেমন নিঃশেষ হয় না তেমনি কোন প্রাপ্তিই তাঁর চেয়ে অধিক প্রাপ্তি বলে গণ্য হয় না। এই চিরস্থায়ী পাওয়ার শিক্ষাই হল প্রকৃত শিক্ষা।

শিক্ষার সার সংক্ষেপ হিসেবে শিক্ষকশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, শিক্ষার দিশারী শ্রীঅরবিন্দ প্রাচ্য পাশ্চাত্য সববিষয়ে কৃতিত্বের সাথে পড়াশুনা করে শিক্ষা সম্পর্কে এই শেষ শিক্ষা লাভটির কথাই বিশ্বে প্রচার করে গেছেন সমধিক বেশি। এবং কি নিজের জীবনে তার প্রমাণ স্থাপন দ্বারা – ভারতবাসীর নিকট তাঁর জীবনকে শিক্ষার স্বার্থে উৎসর্গপূর্বক দেখিয়ে ও দেখায়ে গেছেন– শিক্ষা বলতে মূলতঃ কি বুঝায়, এবং তিনি কি বুঝেছিলেন।

শিক্ষার নিগূঢ় তত্ত্বে অধিরহণ করলে একটি বিষয় বেশ সুস্পষ্ট হয় যে, শিক্ষায় সবচেয়ে যে জিনিষটি সবার থেকে বেশি দরকারী তাহল– আত্মজ্ঞান ও আত্মসংযম। জীবনে যত জ্ঞানই অর্জন করিনা কেন মূলে আত্মজ্ঞানই হল প্রধান। আর আত্মসংযম হল সেই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। এই পৃথিবীতে একমাত্র যে উদ্দেশ্যে আমাদের জন্ম, যাকে বলতে পারি এই পৃথিবীতে আমাদের ব্রত– তাহলে নিয়মিতভাবে এবং নিরন্তর নিজের ভিতরে জীবন-সত্যের বিপরীত বা বিরোধী সবকিছুকে বহিষ্কার ও বিলোপ করতে হবে। ক্রমে ক্রমে এই শিক্ষাই আমার সত্তার সমস্ত দূরত্ব দূর করে যত উপাদান আমার অন্তরের চৈত্যপুরুষকে কেন্দ্র করে ধরে আছে তার উন্মোচন হবেই। একটা আত্মবিরোধশূন্য অখন্ড সত্য শক্তি যেভাবে আমার অন্তরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপন মহিমায় জেগে আছে অনাদিকাল থেকে তা আপন ইচ্ছায় আপন মহিমায় অবশ্য তা জেগে উঠবে তাঁরই আপন উদ্ভাবনায়। সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি না।

তবে আমরা যে শিক্ষার জন্য এত দৌড়ঝাপ করছি সেদিন তা শুধু আমার বাঁচা বাড়াকে রক্ষা করেই ক্ষান্ত থাকবেনা, অবশ্য আহ্বান জানাবে– তুমি ঐ অন্ধকার ত্যাগ করে আলোতে চলে এস, চলে এস অসত্য থেকে সত্যের পথে। চলে এস যা জানার জন্য জীবনে এত কিছু করলে সেই জীবনে তোমার একমাত্র যে ভয়– মৃত্যু, তা থেকে অমৃতের পথে। তোমার আত্মজ্ঞান ও আত্মসংযম তোমাকে সেই শিক্ষা দিয়েই জানাচ্ছে,

তোমার সবচেয়ে বড় শিক্ষা ও বড় জ্ঞান হল নিজেকে চেনা বা নিজেকে জানা। আমি যেদিন এটি সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারব, শিক্ষা আমার সেদিনেই যথার্থ সার্থক হবে। তখন তুচ্ছ ভাত কাপড় অর্জনের শিক্ষালাভ আমাদের লক্ষণীয় বিষয় বস্তু হিসেবে গণ্য হবে না, শিক্ষাবিদ্ শ্রীঅরবিন্দ শিক্ষা বিষয়ে এই উপদেশই দান করে গেছেন।

২.৫.২: শ্রী অরবিন্দের মতে শিক্ষা কী ?

শ্রীঅরবিন্দের মতে শিক্ষার পরিপূর্ণতা সম্বন্ধে বলতে গেলে বক্তব্য বিষয়টি এই দ্বারায়– শিক্ষার পরিপূর্ণতা লাভ করতে চাইলে জন্মের আগে থেকেই এর প্রস্তুতি শুরু করা উচিত। দুই প্রক্রিয়ায় এর বিস্তার ঘটে, প্রথমটি মায়ের গর্ভে শিশুটির অবয়ব গঠন থেকে এবং দ্বিতীয়টি ঘটে– মায়ের নিজের সম্বন্ধে, তাঁর নিজের উন্নতি নিয়ে। অর্থাৎ মা যে আকাঙ্খা ও সংকল্প নিয়ে যে জাগতিক এবং পারিপার্শ্বিকির মধ্যে বাস করে; তার উপর। মায়ের শিক্ষা যা দরকার তাহল– মায়ের সব চিন্তা চেতনা যেন সর্বদা সত্য, সুন্দর ও নির্মল হয়। তাঁর প্রতিটি অনুভব যেন সৎ ও মহৎ হয়। তাঁর পারিপার্শ্বিক জাগতিক পরিবেশ যেন সুসামঞ্জস এবং মহান সরলতায় পরিপূর্ণ থাকে। মায়ের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়টি হল, তাঁর শিশুটিকে গড়ে তোলার জন্য চাই তাঁর সুনির্দিষ্ট ইচ্ছাশক্তি।

শ্রীঅরবিন্দের চেতনার ধারায় শ্রীমায়ের মতে শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করতে চাইলে শিশুর সত্তাকে পাঁচটি প্রধান বৃত্তি অনুযায়ী পাঁচটি প্রধান বিভাগে ভাগ করে দেখা উচিত।

যথা– প্রথম শিশুর শারীরিক, অতঃপর– প্রাণিক, মানসিক, হৃদয়াত্মিক এবং আধ্যাত্মিক। শ্রীমা বলেন,–

"সাধারণত, শিক্ষার এই পর্যায়গুলি ব্যক্তির ক্রমপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমান্বয়ে চলে একের পর একটি করে, তবে তার অর্থ এই নয় যে, একটির স্থান অন্যটি এসে অধিকার করবে, বরং সবকটিই একসঙ্গে চলবে– একে অন্যকে পরিপূর্ণ করে, জীবনের শেষ পর্যন্ত।"[১৪]

১৪। শ্রীমা, **'শিক্ষা'** পন্ডিচেরীঃ শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৯১, পূর্নমূদ্রণ, ২০০৬, পৃ.,৮

আলোচিত বিষয়গুলির উপর শ্রীমা যে ভাবে বিবৃতি দান করে পর্যালোচনা করেছেন আমি সেই বিষয়গুলি নিজের ভাষায়, নিজের আঙ্গিকে এখানে তুলে ধরারর চেষ্টা করেছি মাত্র। শিক্ষার প্রথম অঙ্গ শিশুর শরীরগঠন ও পুষ্টিবিজ্ঞান শিক্ষাকেই তুলনামূলক প্রধান্য দান করেছি বেশি।

প্রাচীন ঋষি শাস্ত্র আয়ুর্বেদ, (চরক সংহিতা, ১/১৫)-এ উল্লেখ আছে– "ধর্মার্থকামমোক্ষাণাম আরোগ্যং মূলমুত্তমম্ ।" অর্থাৎ মানব জীবনকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটি প্রধান স্তর হিসেবে ভাগ করে – এর প্রাপ্তিকে শাস্ত্রকারগণ চতুবর্গ ফললাভ হিসেবে মূল্যদান করেছেন। এই চতুবর্গ ফল লাভের জন্য ঋষিগণ প্রধান অঙ্গ হিসেবে শরীরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দান করেছেন । কারণ শরীর ঠিক না থাকলে না হবে– ধর্ম, না হবে– অর্থ, না হবে– কামনা বাসনা চরিতার্থ এবং না হবে মুক্তি ও মোক্ষ। অতএব শরীর ধারণ ও রক্ষণ মানব জীবনের বনিয়াত। এই শিক্ষাকেই তিনি বলেছেন, শারিরীক শিক্ষা।

আমরা যেহেতু বর্তমানের আধুনিক শিক্ষায় জীবনের শুরুতেই এনালাইজ করতে শিখেছি এবং বিনা বিচারে বিশ্বাসকে হারিয়ে ফেলেছি। বিচার হীন বিশ্বাসকে এজন্য গুরুত্ব দিতে আমাদের মন সায় দেয় না। যদিও বুঝতেছি শরীর পীড়াগ্রস্ত ও অকর্মণ্য হলে জীবনের কোন কার্যই সাধন হয় না। কিন্তু শরীর রক্ষার মূল সূত্র যে বীর্য রক্ষা, বর্তমান শিক্ষা আমাদের সেই অতীত শিক্ষা সম্পর্কে হয়ত জানেনও না বা ঐ জাতীয় কোন পাঠ্য পুস্তকও পাঠ্যসূচি হিসেবে জাতীয় শিক্ষা নীতিতে স্থান দানের প্রয়োজন মনে করেন না। এতে যে জাতীয় শিক্ষার গৌরব হানি ঘটেছে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার কদর বেড়ে আমাদের সন্তানদের বিপদমুখী করে তুলেছে তা আমরা মোটেই পর্যালোচনা করি না। আমাদের বলবীর্যবান শিশু বালকগণ একারণেই বজ্রাহত তরুর ন্যায় অকালে যে ঝড়ে পড়ছে, পাশ্চাত্য প্রভাবে দিশেহারা হয়ে তাও মনে আনি না যে, আমরা নিজেই নিজেদের পায়ে কুঠার মেরে অনাহুত অজ্ঞাত কষ্টভোগ করছি।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের শরীর রক্ষা বিজ্ঞানের ফলাফলকে মূল্যদান করে– মাছ মাংস ডিম তেল চর্বিজাতীয় ইত্যাদি প্রাণীজ খাদ্যকে শরীর গঠনের সুষম খাদ্য হিসেবে বা একমাত্র ভিটামিন জাতীয় খাদ্যতালিকায় উক্ত খাদ্যগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে শরীরকে রক্ষার কথা আধুনিক বিজ্ঞান বিশেষভাবে প্রচার করে যেভাবে আজ যে

শিক্ষা দান করছেন তাতে অবস্থার উন্নতি না হয়ে যে অবনতিই হচ্ছে বেশি তা আমরা অনেক দেরীতে হলেও এক্ষণে কিছুটা বুঝতে পারছি। দেশের এক তৃতীয়াংশ লোক এর ফলস্বরূপ ডায়াবেটিক, হার্টডিজিজ, কিডনি ডিজিস, ব্লাডপ্রেসার ইত্যাদি দূরারোগ্য ব্যাধিগুলি অধিকহারে তাদের জীবনের যথাযথ স্বাভাবিক সিষ্টেমকে ব্যতিক্রম ঘটায়ে জীবনীশক্তিকে অকালে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

ফলে অকাল মৃত্যুর করালগ্রাস আমাদের উপর জোর-জোবরদস্তি প্রভাব বিস্তার করছে। অসময়ে আক্রমণ করে বিব্রত করে তুলছে। যা তাদের বিধান– তারাই আজ রক্ষা করতে অপারগ।

জলবায়ুভেদে এই দেশ যে উষ্ণপ্রধান, এবং প্রাণীজ জাতীয় খাদ্যগুলিও যে উষ্ণগুণ সম্পন্ন এজন্য স্থান কাল পাত্র ও অবস্থাভেদে এর ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আমরা মোটেই তা আমল দেই না। বরং বেশি করে এগুলিকে দৈনন্দিন সার্বজনীন খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করছি। কিন্তু বীর্য রক্ষা করতে জানলে ও শিখলে যে, লবন ভাত ও সাধারণ প্রকৃতিজাত শুধু উদ্ভিদ জাতীয় খাদ্যতেই এই শরীর রক্ষা ও মনোগঠন করা যথেষ্ট সম্ভব তা বর্তমান বিজ্ঞান তলিয়ে দেখেন নি।

আমাদের জীবনে এই দেহে এই মনে ঈশ্বর যে শক্তি ও সামর্থ দান করে জগতে পাঠিয়েছেন– একটি সুন্দর সুষ্ঠু জীবন গঠনে তাতেই যথেষ্ট, আলাদাভাবে বাড়তি শক্তি সামর্থের জন্য বাড়তি কোন উত্তেজক খাদ্যের নিষ্প্রয়োজন বলে প্রাচীন ক্রান্ত-দর্শী ঋষিগণ মনে করতেন, এবং এর যথেষ্ট প্রমাণও তাঁরা দান করে গেছেন। আমরা আমাদের ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তিকে না জেনে অপব্যবহার করে থাকি বলেই বাড়তি খাদ্যকে সহায়ককারী খাদ্য হিসেবে নিরূপায় ও বাধ্য হয়েই গুরুত্ব দেই বেশি। আর একারণেই আমরা আপাত ভালবোধ করলেও পরবর্তিতে শারিরীক দুর্বল ও অকর্মণ্য হয়ে পড়ি। এবং তখনেই ডাক্তারবাবুগণ দ্রুত আরোগ্যলাভের জন্য উক্ত উত্তেজক খাদ্যগুলি খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করতে উপদেশ দান করেন। ভিটামিন জাতীয় ঔষধ ও প্রাণীজ খাদ্যকে ভিটামিন খাদ্য বলে খেতে উপদেশ দান করেন। কিন্তু ক্ষণিক শক্তি যে ক্ষণিকেই শেষ হয়; তা আমলে নিতে জানিনা বা পারিনা বলেই "যথা পূর্বং তথা পরং" হয়ে পড়ি।

শরীর বিদ্যার মূল শিক্ষা যে অযথা শুক্র নষ্ট না করা, এবং সংযমপূর্ণ জীবন-যাপন করা, এবং দুই-একটি সন্তান লাভের জন্যই বিবাহ ও নারীর ঋতু রক্ষা করা ছাড়া যে দারপরিগ্রহ করা অন্যায়– আমরা এই শিক্ষাকে আজ কেউ আমলে নেই না। পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য যে শুধু মাসে একবার নারীর ঋতুরক্ষা করা, সৃষ্টি রক্ষার জন্যই যে শুধু এই বিধান অব্যাহত রাখা এবং নারীদেরকে নারীর মর্যাদা ও মাতৃত্বদান করা, আমরা আজ এই শিক্ষাকে দূরে সড়িয়ে দিয়ে তাদের ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহার করছি। রমণীত্বকে দূর করে জননীত্ব লাভ করাই যে নারীর জীবন ধর্ম এবং এ জন্যেই যে তাদের জীবন ধারণ ও জন্মলাভ করা, শ্রী অরবিন্দ তাঁর স্ত্রীকে যে পত্রখানি পাঠিয়েছিলেন তাতেই তার প্রমাণ বর্তমান। আমরা এই পত্র থেকেই শিক্ষা নিতে পারি আমাদের জীবনে করণীয় কি এবং আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন গঠনে দাম্পত্য জীবন লাভে আমাদের কর্তব্য কি ?

আমরা অতীত ভূলে আজ বর্তমান শারীরিক শিক্ষার মূল– কামচরিতার্থতাকেই আমাদের জীবনে শ্রেষ্ঠ কর্তব্য কর্ম বলে গ্রহণ করেছি। রিপুর তাড়নায় নৈতিকতা এবং সংযমতাকে ভুলে বর্তমানে পাশবিক জীবন-যাপনকেই সার করেছি। কাম চরিতার্থকেই বিবাহের হেতু বলে জীবন যাপনে ব্রতী হয়েছি। সংসারধর্ম অর্থ যে সংসারে সৎশিক্ষাদান, কর্মময় জীবনে এজন্য যে শ্রমদান, তার সার্থকতা যে নীরোগ, সবল, বীর্যবান একটি সুস্থ্য শরীর গঠন তা ভুলে অসংযমনীয় অন্যায় পথে পা বাড়িয়ে আপন কর্মফলে– আজ হা-হুতাস করে মরছি।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বিবাহিত জীবনে নিজেই তার শিক্ষক সেজে আপন আচরণ শিক্ষাদান পূর্বক তাঁর জীবনকে মানব সমাজে উপহার স্বরূপ দান করে গেছেন। তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবী তার উপযুক্ত প্রমাণ। শ্রীঅরবিন্দ ২৯ বছর বয়সের যুবক হয়েও মাত্র ১৪ বর্ষিয়া একটি নাবালিকাকে বিবাহ করেছিলেন। আমরা জানি তিনি যোগী ছিলেন, ঈশ্বরলাভ ছিল তাঁর জীবনের মর্মমূল। যোগীদের অবশ্য ব্রহ্মচর্যজীবন-যাপন করতে হবে। শুক্রক্ষয় তাঁদের জন্য শাস্ত্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ। শ্রীঅরবিন্দ মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য ভোগের সিংহাসনে বসেও কি প্রকার ত্যাগ ও সংযমজীবন যাপন করে গেছেন, তাঁর সমগ্র জীবনটিই আমাদের নিকট একটি শিক্ষা। তাঁর সহধর্মিনী মৃণালিনীদেবী এর জ্বলন্ত উদাহরণ।

প্রাণিক শিক্ষা হল, সকল শিক্ষার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। প্রাণ হল দূর্দমনীয়, স্বৈরাচারী, প্রভুত্বকামী এক অত্যাচারী দেহ ইন্দ্রিয়ের রাজা। কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে অনেক সামর্থ, শক্তি, উৎসাহ এবং কার্যকরী সক্রিয়তা। আমাদের প্রধান কাজ হল গুণগুলি দিয়ে দোষগুলি দূর করা। কিন্তু পাশ্চাত্য হওয়া প্রাণকে তার সংযম শক্তি ফিরিয়ে না দিয়ে বরং দূর্দমনীয় অত্যাচারী করে তুলতে সাহায্য করছে বেশি। আমরা জানি জীবনের লক্ষ্য সুখী হওয়া। সুখী হতে চাইলে যে প্রথমে ত্যাগী হয়ে ত্যাগকে বরণ করতে অভ্যাস ও অধ্যবসায় করতে হয় তা আমরা আজ মেনে নিতে পারি না। ত্যাগের পরেই ভোগ, এটিই আর্যঋষিদের বিজ্ঞান সম্মত সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ ত্যাগপ্রতিষ্ঠ ভোগই হল প্রকৃত ভোগ। ভোগ করে ত্যাগ কখনও জীবনের যে কোন শিক্ষালাভে সুপ্রতিষ্ঠা দান করতে পারে না। এর পরের শিক্ষা হলঃ

মানসিক শিক্ষা, যা মনের নিয়ন্ত্রণ দ্বারা উর্ধ্বতর জীবনের রূপান্তর ঘটায়। একমাত্র মনোজয়ী শিক্ষার্থীই পারে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উন্নতি ঘটাতে। মনোশিক্ষা আমাদের দেহমনের একাগ্রতা শক্তি বৃদ্ধি করে। এবং সকল কাজে মনঃসংযোগের সামর্থ দান করে। একবার মনঃসংযোগ শিক্ষা অর্জন হলে– প্রসার, ব্যাপৃতি, ঐশ্বর্যদায়ক বৃত্তির অনুশীলন, উচ্চতর পরম জ্যোতির্ময় আদর্শ লাভ, অবাঞ্ছনীয় চিন্তাবলী বর্জন, উর্ধ্বলোকের আগত প্রেরণা, ক্রমবর্ধমান ধারণ-সামর্থ ও শক্তি বৃদ্ধি করে। এর পরেই আসে–

হৃদয়াত্মিক শিক্ষা, অর্থাৎ উপরোক্ত গুণগুলি যখন মানব হৃদয়ে স্থান লাভে সমর্থ হয় তখন হৃদয়– দয়া, ক্ষমা, সরলতা, উদারতা, শ্রদ্ধা, বিনম্রতা, ভক্তি, বিশ্বাস, নির্ভরতা ও শরণাগতির একটি উজ্জ্বল অন্যতম স্থানে পরিণত হয়। মানব মনের হৃদয় নামক স্থানটি এমনিই একটি উৎকর্ষ বিধায়ক শিক্ষাশক্তি ও অন্যতম ক্ষেত্রঃ যেখানে অনাহুত কোন এক জ্যোতির্ময় সত্তা অজান্তে উর্ধ্বলোক থেকে এসে জায়গা করে বসে। তখন যে শিক্ষাশক্তি হৃদয় ও মনে অর্জন হয় এবং নব নব সৃজনশক্তির উদ্ভাস ঘটে তখন বর্তমানের এই ব্যবহারিক শিক্ষা অর্জনের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা হয়ে ওঠে না, হয়ে ওঠে স্বতঃস্ফূর্ত এক শিক্ষা শক্তি।

এই শিক্ষাকেই ভারতীয় জাতীয়শিক্ষা 'ধর্ম ' নামে যার খ্যাতি বিশ্বনন্দিত– যে বিদ্যা বা শিক্ষাকে বলা হয়েছে বেদান্ত বা উপনিষদ্ বিদ্যা শিক্ষা। আর্যভাষায় যাকে বলা হয়, আধ্যাত্মিক শিক্ষা। অর্থাৎ "তুমি শূন্য

হও,আমি পূর্ণ করে দিব" । কোন চাইতে হবে না, অনুশীলন করতে হবে না । ক্ষেত্র প্রস্তুত হলে যেমন আকাশ থেকে বীজ বৃষ্টির সাহায্যে মাটিতে পরে চারা জন্মায়, এই শিক্ষাও সেইভাবে জীবনের রূপান্তর ঘটিয়ে সেই শুধ্যাত্মার হৃদয়কে এক নতুন শিক্ষার আলোকে আলোকিত করে তুলে ।

শ্রীঅরবিন্দ পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে এবং প্রাচ্যের সকল সংস্কার ও প্রভাব মুক্ত হয়ে– তাঁর জীবনকে তাঁর পিতা যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে প্রয়াসী হয়ে উঠেছিলেন এবং যে কারণে তাঁর চিন্তা চেতনা বাস্ত বায়িত করে তুলতে পারে নি তার মূল কারণটি ছিল– তাঁর অন্তরস্থ দেবতার অত্যাগ্রহ তাঁরই উপযুক্ত আধারকে পাওয়ার লোভ সম্বরণ করতে না পারা । মানব তার সকল কামনা বাসনার ক্ষুদ্র স্বার্থগুলি ত্যাগ করে যখনেই আপন অন্তরকে শূন্য ও মুক্ত করতে পারে তখনেই সেই পবিত্র শূন্য আসনটি অন্তরস্থ হৃদয় দেবতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা– মনুষ্যত্ব লাভ; বিবেক সিংহাসন হয়ে গড়ে ওঠে ।

অধ্যাত্ম শিক্ষা নামে তখন সমস্ত হৃদয় জুড়ে অন্তরস্থ আত্মাই প্রধান শিক্ষক হয়ে উপস্থিত হন । 'আমি' ও 'আমার' নামক অহংকারী ক্ষুদ্র লোভী কর্তাটি তখন নিস্তেজ হয়ে পড়ে । সেই সন্ধিক্ষণেই শিক্ষা তার প্রকৃত রূপ ধারণ করে । পথ দেখায় তার স্নেহের পবিত্র মানুষটিকে । একেই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন অতি মানবীয় শিক্ষা শক্তি । জীবনের এই রূপান্তর ঘটানই হল– শ্রী অরবিন্দ মতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ।

২.৫.৩: অরবিন্দের মতে শিক্ষার বৈশিষ্ট্যসমূহ

শিক্ষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দজী আমাদের যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন তা সম্পূর্ণ এক নতুন শিক্ষা । অত্যন্ত অভিনব শিক্ষা । তাঁর রচিত বিদ্যালয়ের নাম "শ্রী অরবিন্দ আন্তর্জাতিক শিক্ষা কেন্দ্র" । এই শিক্ষা কেন্দ্রে তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল– ছাত্ররা পূর্ণস্বাধীনভাবে শিক্ষা গ্রহণ করবে । অভিসন্দর্ভে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরার । নিম্নে ক্রমবিন্যাসাকারে তা তুলে ধরলাম ।

প্রথমত: শ্রী অরবিন্দ মতে শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্য হল, স্বভাবের রূপান্তর । যদিও এ-কাজটি অত্যন্ত দুরূহ প্রায়ই ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়; তবুও এটা সত্য যে, প্রত্যেকের স্বভাবের দু'টি ধারা বা দু'টি প্রবণতা ব্যক্তি বিশেষে

বিদ্যমান। এক আলোর দিক অপরটি অন্ধকার দিক। এই অন্ধকার দুরীকরণের জন্য চাই আমাদের প্রবল ইচ্ছাশক্তি এবং সংগ্রামী হয়ে ওঠা। সাথে নিজেকে গড়ে তোলা। শুরু হয় এখান থেকেই জীবনের প্রথম শিক্ষা।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা সম্পর্কে তিনি আরও ব্যক্ত করেছেন, শিক্ষার জন্য প্রথমে যে চেতনা আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয়, তার একটি হল ইন্দ্রিয়গত পুষ্টিসাধন ও তার ব্যবহার, দ্বিতীয়টি হল– প্রকৃতিকে জানা ক্রমে তার উপর নিজের কর্তৃত্ব অর্জন, শেষে চাই তার রূপান্তর। এই রূপান্তর হল আপন আন্তর রূপান্তর। অর্থাৎ আন্তর্জাতিকভাবে দেহান্তর্গত সকল জাতি বা রাষ্ট্রের জন্য যে শিক্ষা গুরুত্ব বহন করে।

তৃতীয়তঃ শিক্ষা সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ আরও বলেনঃ

> একটা কথা মনে রেখ কিন্তু, এই স্কুলের পড়াশুনা ও নিয়মকানুন অন্যান্য স্কুল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে পরীক্ষার কোন বালাই নেই, ডিগ্রী দেওয়া হয় না। কারণ প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য নিজেকে জানা, আত্মজ্ঞান লাভ করা। আর আমাদের সাধারণ শিক্ষায় হয় কেবল অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা। শিক্ষকমন্ডলী সবাই সাধক সাধিকা। ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের ভাই বোন, সকলে এক ভগবতী জননীর সন্তান। তারা এক সঙ্গে খায় দায়, বেড়াতে যায়, খেলাধুলা করে। কোন বকাবকি নেই, শাস্তি দেওয়া নেই, ভয়ের সম্বন্ধ নেই।[১৫]

> শ্রীমা বলেনঃ **চতুর্থতঃ** প্রত্যেক শিক্ষককে যোগী হতে হবে। পুঁথিগত বিদ্যা নয়, শিক্ষকের জীবনই হবে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এখানে শিক্ষা উপলব্ধির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে, পাঠ্য বিষয়ে ছাত্রদের যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হয়। স্বাধীনতার অনুকূল হাওয়ায় আমাদের আত্মা জাগে, বাড়ে সৌন্দর্যে, জ্ঞানে, শক্তিতে, আনন্দে । কোন কোন বিষয় ভাল না লাগলে সেগুলি না পড়বার অধিকার ছাত্রদের আছে। তবেই শিক্ষকদের সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি থাকে যাতে স্বাধীনতার অপব্যবহার না হয়।[১৬]

১৫। নীরদবরণ, **শ্রী অরবিন্দায়ন**, কলিকাতাঃ শ্রীঅরবিন্দ পাঠ মন্দির, ষষ্ঠ সংস্করণ, তৃতীয় মূদ্রণ, ২০০২, পৃ.,৯২
১৬। ঐ, পৃ., ৯৬

পঞ্চমত: আশ্রমের উদ্দেশ্য যেমন নতুন জাতি গঠন করা, স্কুলে চলে তেমনি তার শিক্ষাদীক্ষা। নতূন জাতি গঠনের ভিত্তি গাঁথা হবে এই স্কুলের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার মাধ্যমে । এই স্কুলে যারা শিক্ষা পাবে তারা দেখবে যে মানুষে মানুষে দেশে দেশে জাতির মধ্যে কোন ভেদ নেই। সব মানব জাতি এক, ভাই ভাই। আজকাল জাতির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব রেষারেষি চলছে, সৃষ্টি করছে অশান্তি, যুদ্ধ, তা একদিন লোপ পাবে। শ্রী অরবিন্দ চেয়েছিলেন এমনই একটি শিক্ষা ব্যবস্থ্যা।

শ্রী অরবিন্দের এই নতুন শিক্ষা পদ্ধতি বিশ্বে বিরল। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর ছত্রদের নিজের স্নাকোত্তর ডিগ্রী দান করেন। তিনিই তাদের কর্মসংস্থান করেন। দেশ বিদেশ থেকে বহু ছাত্র-ছাত্রী তাঁর আন্তর্জাতিক স্কুলে পড়া শুনা করে। এত ছাত্র যে; ভর্তি করাতে পারেন না। বিশ্বে এটি একটি নতুন শিক্ষা পদ্ধতি। অত্র বিদ্যালয়ে বহু ভাষা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়। যাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সে তার অর্জিত শিক্ষা দান করতে পারে এবং আত্মকর্মক্ষম হতে পারে। খেলা ধুলা, নাচ-গান, কবিতা আবৃত্তি, নাট্য গীতি, কারিগরি শিক্ষা, অস্ত্রবিদ্যা, স্বার্থমুক্ত রাজনীতি বিদ্যা, কুটির শিল্প বিদ্যা, বস্ত্র শিল্প বিদ্যা, আশ্রমে তৈরি দ্রব্যগুলি থেকে অন্য বহু বিপনীকেন্দ্র বিক্রির উদ্দেশ্যে তাদের গ্রাহকদের চাহিদাতেই নিয়ে যান, এই প্রতিষ্ঠান থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান সম্মত উন্নত নানা প্রকার উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণ করা হয়। কস্‌মেটিক, পারফিউম এবং বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য, কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য, বস্ত্র ইত্যাদি উৎপাদিত দ্রব্যগুলি ভারত বর্ষের অন্য আর সকল উৎপাদিত বিপনন কেন্দ্র হতে উৎপাদিত পণ্যগুলির চেয়ে গুণে মানে স্বাদে গন্ধে ও ব্যবহারে যে সর্বশ্রেষ্ঠ তা প্রমাণ করে দেখানো হয়েছে। অরবিন্দ আশ্রম তৈরি উৎপাদিত দ্রব্যগুলি কত উন্নত ও মান সম্পন্ন, দেশ বিদেশের বাজারে আজ তা রপতানি দ্রব্যরূপে প্রমাণ দান করছে। এগুলির গুণগতমান ও উপাদান এবং এগুলি যে সকল প্রকার ভেজালমুক্ত শুদ্ধ পবিত্র এবং সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদেয় তা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা। পৃথিবীকে বা দেশ জাতিকে সুশিক্ষায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে ব্যবসা-বাণিজ্য, খাদ্যদ্রব্য, অন্ন বস্ত্র বাসস্থান এবং শিক্ষা সর্ববিষয়ে মানুষকে আগে মানুষরূপে রূপান্তর করে গড়ে তুলতে হবে। আর এই সর্বচ্চো শিক্ষার নাম হল– অধ্যাত্ম শিক্ষা। এই শিক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদেরকেই শ্রীঅরবিন্দ স্বাধীন শিক্ষা

প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাকোত্তর ডিগ্রী দান করা হয়। এই তৈরিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আশ্রম স্কুলে শিক্ষক হিসেবেও গ্রহণ করা হয়।

তিনি যেমন সাধনার উপলব্ধিতে দেখেছেন এবং চেয়েছেন তেমনি জীবন্ত রূপায়িত করে গেছেন, তাঁর মতে পন্ডিচেরী হবে- একটি অরোভিল (উষানগরী)। যা শ্রীঅবিন্দ আশ্রম থেকে এই স্বর্গপুরী ষাট কিলোমিটার দূরে। তিনি চেয়েছেন, এই স্থানটিকে একটি স্বর্গধামে রূপান্তর দান করতে। এই শহরটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-কেন্দ্র রূপে গড়ে উঠুক। শহরটি দিব্য আলোয় ভরে উঠুক। এই দেহ এই শরীর সব দিব্যভাবে রূপান্তরিত হয়ে গড়ে ওঠে– এখানের মাটি স্বর্গভূমিতে রূপান্তরিত হোক। সবার ভিতর দিব্য আলোক ছড়ে পড়ুক। সবাই শান্তি সুখে বসবাস করুক। অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে এটি একটি নতুন আঙ্গিকে নতুন রূপে রূপান্তরিত সত্য সুন্দর উষানগরীর শহর রূপে রূপদান করুক। এই মর্ত্যেই অমৃত দান করুক। রূপান্তরিত হয়ে উঠুক সবকিছু। ভূলোক রূপান্তরিত হয়ে উঠুক দ্যূলোকে।

২.৫.৪: শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মতের পর্যালোচনা

ব্যবহারিক বিদ্যার সাথে আন্তরাত্মিক বিদ্যার যে একটি অন্তর্নির্হিত অভিনব যোগসূত্র আছে শ্রী অরবিন্দ চেয়েছেন তা প্রত্যেক জীবনে ফুটিয়ে তুলতে। তিনি যখন প্রকৃত বিদ্যাগুরু রূপে নিজেকে উপলব্ধি করলেন তখন জানলেন, প্রকৃত শিক্ষাগুরু হলেন আপন আপন অন্তরের প্রতি অন্তরাত্মা। তিনিই মানব জীবনের প্রথম শিক্ষাদাতা। যা মানব তার আপন অন্তর হতেই প্রথম তার সাড়া পান তার কি করণীয়। তারপর এগিয়ে আসে সাহাহ্যদাতা হিসেবে অনেক কিছুই। যেমন বিপদে পড়লে বাঁচার উপায়টি প্রথম নিজের বিবেকরূপে জানিয়ে দেয় এই অন্তরাত্মাই। শ্রীঅরবিন্দ চেয়েছেন, শিক্ষকরূপে প্রত্যেক আত্মায় এই অন্তরাত্মার জাগ্রত চেতনার উন্মেষ। অর্থাৎ আপাত জীবনের যে অজ্ঞান অন্ধকার তার এক জীবন্ত দিব্য রূপান্তর।

তাঁর বাণী তার প্রমাণ, যথা – “জীবনের এই এক বিশেষ শিক্ষা যে, এ জগতে মানুষকে সব কিছুর কাছেই ঠকতে হয়– শুধু ভগবানের কাছে কখনও ঠকতে হয় না, যদি সে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের দিকে দাঁড়ায়...আর ঐ দিকে ফেরাই জীবনের একমাত্র সত্য।”[১৭]

১৭। নরায়ণ প্রসাদ, **শ্রী অরবিন্দ আশ্রম জীবন কথা,** কলকাতা: শ্রীঅরবিন্দ কর্মীসজ্ঞ ট্রাষ্ট মাতৃমন্দির, ২য় সংস্করণ, ২০০৫, পৃ., কভারপাতার শেষ অংশ।

এই আন্তরাত্মিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুরুকেই তিনি জীবনে গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। এই শিক্ষাকেই একমাত্র সত্য শিক্ষা বলে অভিহিত করেছেন। বাকি সকল শিক্ষা একসময় ঠকিয়ে চলে যায়। অতএব এই আন্ত রাত্মিক শিক্ষা জীবনটি হল, অমর জীবন। যেন অন্তহীন কাল, সীমাহীন দেশ, চির উন্নতিশীল পরিবর্তন, ঠিক যেন এই রূপময় বিশ্বের মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন গতিপ্রবাহ, সত্য শিক্ষাদাতা অন্তরাত্মাই হলেন তার নিয়ন্তা। তাঁর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি বিশ্লেষণাত্মক উপলব্ধি– যোগসাধনা শিক্ষার সর্বশেষ প্রাপ্তি ফলও ছিল– 'এই দেহ অবধি ভগবানকে স্মরণ করবে'।

এই সত্য শিক্ষাটি ছিল– তাঁর জীবন সাধনার সাবিত্রী মহাকাব্যের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট একটি ছত্র- "Even the body shall remember God ."[১৮] তারপর এখানেই স্তব্ধ হয়ে থাকবেনা ছড়িয়ে পড়বে এই পৃথিবীর মাটিতেও তাঁর দিব্যদ্যূতি। এই পৃথিবীলোকও হবে দ্যুলোকে রূপান্তর। অর্থাৎ অরবিন্দের এই দিব্যানুভূতির এটি একটি নতুন শিক্ষা যা তিনি তাঁর ভাষায় বুঝিয়েছেন, "This earthly life becomes the life divine."[১৯]

তিনি জীবনে এই শিক্ষাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা বলতে বুঝিয়েছেন। পৃথিবীর বুকে এই শিক্ষাকে জাগ্রত করে তুলতে হবেই, এই দৃঢ়তাই ছিল তাঁর সারা জীবনের অন্তর্যোগ সাধনা। এই ইচ্ছাটিকে বলবতী করতেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন স্থুল ও সূক্ষ্মের যুগপৎ মহামিলন রূপে বহুমুখী শিক্ষা পরিকল্পনা ও নানা কর্মপন্থার মাধ্যমে বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা। বাস্তবে এর প্রভাব প্রতিষ্ঠায় তিনি অনেকাংশে সফলমুখীও ছিলেন, এখনও তার গতিপথ অবলুপ্ত হয় নি বরং চলছে অবিরাম গতিতে আরও উন্নত ধারায় যুগের সাথে তাল মিলিয়ে। উপরোক্ত বাণী দুটির সূত্রকে শ্রীমৎ অনির্বাণজী; শ্রী অরবিন্দ পাঠমন্দিরে সভাপতি রূপে অরবিন্দের রজত জয়ন্তিতে তাঁর অনুসারী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষা দিতে গিয়ে একদা বলেছিলেন,

"আজ যে পাঠমন্দির তারুণ্যে উপনীত হয়েছে, সে হবে একদিন প্রৌঢ়। কিন্তু কোনদিন সে মরবে না। ...এই বাণী ধ্বনিত হচ্ছে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বর্ষের পর বর্ষ, এই পাঠ মন্দিরে যাকে বলতে পারি তাঁরই বাণীপীঠ।"[২০]

১৮। পূর্বোক্ত, অনির্বাণ, **শ্রী অরবিন্দের যোগে দেহের অমরত্ব**, পৃ.,১
১৯। ঐ, পৃ.,২
২০। ঐ, পৃ.,৩

একমাত্র এই মহাযোগী শ্রীমৎ অনির্বাণজীই শ্রীঅরবিন্দের অন্তরের এই গভীর যোগরহস্য অধিগত হয়েছিলেন। তিনিই ধরতে পেরেছিলেন, শ্রী অরবিন্দ কি শিক্ষা দিতে এই ধরাধামে আধুনিক যুগের ঋষিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তার শিক্ষার মূল বিষয়টি কি ছিল। জীবের মধ্যে শাশ্বত চৈতন্যের যে প্রবাহ চলছে, তাকে অপরা প্রকৃতির সমস্ত নূন্যতা ও সংকীর্ণতা হতে মুক্ত করতে হবে, তারপর তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আত্মার স্বাতন্ত্র্যে এবং মহিমায়। শ্রী অরবিন্দ শিক্ষা বলতে এই বুঝিয়েছেন। এদেশের দর্শনে এবং জীবন-সাধনায় তাঁর শিক্ষার মূল সূত্রটি ছিল– আত্মপ্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ– জীবের ব্রহ্ম হয়ে যাওয়া।

শ্রী অরবিন্দের এই শিক্ষাবিষয়ক চিন্তা চেতনাকে আরও সুদৃঢ় করতে শ্রীমা এলেন এর পরিপূর্ণতা দান করতে। তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনসাথী রূপে। তাঁর অধ্যাত্ম চিন্তা চেতনাগুলি নিজ দায়িত্ব বলে তুলে নিয়েছিলেন নিজ জীবনে। আশ্রমে আবাসিক ছেলেমেয়েদের আত্মগঠনে নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন। শিক্ষা শুধু যে একমুখী একঘেয়েমী হবে তা ঠিক বলে তিনি মনে করেন নি। শিক্ষা হবে বহুমুখী বহুধারায় সুসম্প্রসারিত। প্রধান লক্ষ্য থাকবে– শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শরীর শিক্ষা।

তাছাড়াও থাকবে– প্লেগ্রাউন্ড, স্পোর্টস্ গ্রাউন্ড, ষ্টেডিয়াম, সুইমিং-পুল, টেনিস গ্রাউন্ড, যুডো ও যুযুৎসু, যোগব্যয়াম, যান্ত্রিক ও ফ্রিহ্যান্ড ব্যায়াম এবং বুলেটিন অব ফিজিকাল এডুকেশন, গ্রন্থাগার, গান বাজনা, নাটক, নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদি নানা কর্মপদ্ধতি।

আরও থাকবে যেমন– কুটির শিল্প বিভাগ, বস্ত্রবিভাগ, লন্ড্রিবিভাগ, সূচী শিক্ষা বিভাগ, কটেজ ট্রেনিং বিভাগ, সাবান, হার্পাগণ, গন্ধজাত, হস্তজাত, কাগজ, ওয়ার্কসপ, দর্জি, ফটোগ্রফি, অভ্যর্থনা, অনুসন্ধান, প্রসপেরিটি, রেডিও, শ্রীঅরবিন্দ বুকস্ ডিষ্ট্রিবিউশন, সুবিশাল ছাপাখানা ইত্যাদি এমন আরও অনেক কর্মসূচী। যা মানব জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয়। এর সাথে থাকবে ধ্যান, আত্মসংযম, আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম ইত্যাদি। সবার থেকে মূল্যবান যে বিষয়টির গুরুত্ব দান করা হবে তাহল– ব্রহ্মচর্য রক্ষা। ছেলেমেয়ে একসাথে খেলাধুলা লেখাপড়া খাওয়া দাওয়া, বসবাস বিশ্রাম, সব যথাযথ থাকবে কিন্তু নিয়মমাফিক দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য কাজের জন্য বাজে চিন্তার সময় একমুহূর্ত পাবে না বা কোন প্রকারে সুযোগ দেওয়া হবে না। ব্যায়ামের সময় ছেলে-

মেয়ে একসাথে হাফপ্যান্ট ও গেঞ্জি পরবে। একে অপরকে দেখে ব্যায়াম ও শরীর কসরত করবে , কিন্তু কুদৃষ্টি থাকবে না, জীবন গঠন হবে উন্মুক্তভাবে কিন্তু কামভাব কারও মনকে স্পর্শ করতে বা রূপদান করতে পারবে না। অথবা সুযোগ দেওয়া হবে না। এই ছিল শ্রীমায়ের ছেলেমেয়েদের প্রতি জীবনগঠনে কঠোর সংবিধান। এর একটু ব্যতিক্রম হলেই প্রতিষ্ঠান থেকে চিরবিদায় নিতে হবে। দ্বিতীয়বার কোন সুযোগ হবে না।

এই আন্তর্জাতিক বিদ্যালয়ে দেশি বিদেশী বহু ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করে। এখানে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল নিজেকে জানা ও চেনা। মূল কথা আত্মজ্ঞান লাভ করা। পৃথিবীর সব দেশ, জাতি, সংগঠন, শিক্ষা ও কর্মপদ্ধতি, নিঃসংকোচে স্বীকার করতে বাধ্য যে, আমি আছি সব আছে, আমি নাই কিছুই নাই। অতএব এই আমি-কে উদ্ধারই হল শিক্ষার মূল উৎস। এই অভিনব শিক্ষা বিষয়ক কর্মপদ্ধতিটি শ্রী অরবিন্দের একটি ব্যতিক্রমধর্মী চিন্তা ও চেতনা। পৃথিবীর মাঝে এই রূপান্তর ঘটা এমন করে আজ পর্যন্ত কারও দুঃসাহস হয়নি। ভারতবর্ষে অনেক মনীষীই এই কাজটির প্রতি দৃষ্টি দান করেছেন কিন্তু কেউ পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করতে পারেন নি। শ্রীমা ও শ্রী অরবিন্দ সেটাই করে দেখিয়ে গেছেন। কারণ এই পৃথিবীকে দিব্যধামে রূপান্তরিত করতে চাইলে এইভাবেই এর বিকাশ ঘটাতে হবে। শ্রীঅরবিন্দের মানস দৃষ্টিতে এটাই ফুটে উঠেছিল। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মতের পর্যালোচনাগুলি এই দিক্ নির্দেশনাই দান করে। আমি আমার অভিসন্দর্ভে শ্রী অরবিন্দ গবেষণায় আমার বুদ্ধি বিবেচনা মতে এই বুঝেছি। সাধ্যমত সেগুলিই উপস্থানা করতে চেষ্টা করেছি।

২.৫.৫: উপসংহার

বিবর্তনের অগ্রদূত মহাযোগেশ্বর শ্রীঅরবিন্দদেব মানব জাতির জন্য এক অসম্ভব নব প্রেরণার দিব্যশক্তির জীবন্তরূপ। সাধারণ দৃষ্টিতে তাঁকে দেখা ও শিক্ষালাভ করা নিঃসন্দেহে একটি দূরূহ বিষয়। তিনি আধুনিক বিশ্বের এক বিস্ময়কর মহাশক্তিধর মহামানব। অথচ তিনি এমন মহাজ্ঞানী বলেই মহাজ্ঞানের পরিচয় স্বরপ আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীনতম শাশ্বত সত্য প্রকাশিত বেদ উপনিষদ্ ও গীতার সার সত্যতত্ত্ব– এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্য হতে যে বিশ্বপ্রকৃতির প্রকাশ এবং মানুষ

প্রাণী ও বস্তুজগতের প্রকাশ, ঈশ্বর যেমন সত্য ও তাঁর সৃষ্টি বাহ্যিক জগত ও মানুষ প্রাণী সবই সত্য। এই উপনিষদ্ মন্ত্রকে ভীত স্থাপন করে, তিনি তাঁর গবেষণালব্ধ যে সারসত্য আবিষ্কার করে জগৎবাসীকে উপহার দিয়েছেন, তা আজ পর্যন্ত এত ব্যাপকভাভোবে আর কেউ এ পথ দেখাতে সক্ষম হন নি। তাঁর উপলব্ধ সত্যটি হল– সত্য হতে কখনও অসত্য সৃষ্টি হতে পারে না। সত্যের উচ্চ নীচ ভাব হতে পারে কিন্তু সত্য সত্যই। সত্যের কোন রূপান্তর নেই । সত্য স্বয়ং সমহিমায় স্বপ্রকাশ।

বিংশ শতাব্দীর অত্যাধুনিক এই দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণাত্মক বিশ্বে তাঁর দিব্যসত্যের – যে চারিটি পথের দিক্‌নির্দেশনা তিনি দান করেছেন তা পর্যলোচনা করলেই বুঝবো তিনি এ-যুগের কি প্রকার শিক্ষাগুরু ছিলেন। তাঁর প্রথম অভিজ্ঞান হয়েছিল– আমাদের নিম্ন প্রকৃতিকে উচ্চভাবে পরিবর্তিতকরণ বাধ্যতামূলক। এর নাম দিলেন বিবর্তন। এই বিবর্তনের পথে নিম্ন সাধারণ মনকে উচ্চতর ভাবে পরিবর্তিত করতে হবে। একে বললেন– বিবর্তন পদ্ধতি।

ভারতীয় বেদ উপনিষদে বিশেষ করে যোগশাস্ত্রে যার নামকরণ করা হয়েছে– 'যম' সাধন। এই যম অর্থ হল, আমরা সর্বতোভাবে সত্যনিষ্ঠ হব। হিংসা, দ্বেষ, মাৎসর্য্য পরিপূর্ণরূপে ত্যাগ করবো, সর্বদা অন্তরের পবিত্রতা রক্ষা করবো, মনের এই বিবর্তণ সাহায্যেই অবশ্য একসময় আমরা উচ্চতর আদর্শে উপনীত হব। দ্বিতীয় বিবর্তণ পদ্ধতি হল–আমাদের কলুষিত এই দেহ মনকে ভগবৎ অস্তিত্বে পরিবর্তিত করতে হবে। দেহের এই উর্দ্ধতরভাবের পরিবর্তনকে ভারতীয় শাস্ত্রে এর উল্লেখ করা হয়েছে– 'নিয়ম' সাধন নামকরণে। এর জন্য চাই– নিয়মিত স্নান, প্রক্ষালন, গাত্রমার্জনা, শুদ্ধবস্ত্র পরিধান, মিতাহার ইত্যাদি এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে সাধারণ মনুষ্য দেহও ভগবৎ সত্তার দিকে অগ্রসর হতে পারে। তৃতীয় বিবর্তণ হল– সমস্ত জীবনটিকে পবিত্র আধারে পরিবর্তিত করতে হবে। তখনেই সেই শুচি, শুদ্ধ ও পবিত্র মনে সচ্চিদানন্দের আলো বিচ্ছুরিত হবে। চতুর্থটি হল– সংবেদনশীল হতে হবে, মনকে আনন্দ ও জ্ঞানে পরিণত করতে হবে।

এর অর্থ এই নয় যে, পার্থিব সত্তা এই দেহ-মনকে পরিত্যাগ করে স্বর্গের জন্য তৈরি হতে হবে। এই পৃথিবীর বুকেই দিব্য পরিবর্তন আনতে চাইলে বরং এই দেহ প্রাণ-মনের দিব্য পরিবর্তন ঘটাতে হবে। নইলে

মানুষের সত্তা অন্যস্তরে অন্যসত্তায় চলে যাবে। এই শিক্ষা মানবজাতির জন্য এক অভিনব শিক্ষা। এই শিক্ষা যে মানব জীবনে সর্বোতভাবে আয়ত্ত করা যায়– ব্যক্তির প্রচন্ড প্রচেষ্টা ও আন্দোলন দ্বারা তা শ্রী অরবিন্দ জীবনেই আমরা সুস্পষ্ট দেখতে পাই।

আমি আমার অভিসন্দর্ভে এই বুঝাতে চেয়েছি যে, এই মনেই মুক্তি, এই মনেই বন্ধন। আমার চাওয়া যদি সত্য হয়, পাওয়া তবে আমার তৎক্ষণাৎ হবেই। কিন্তু আমাদের চাওটাই ভূল। কারণ আমরা চাইতেই জানি না। আমাদের যত চাওয়া সব অসত্য ও নশ্বর চাওয়া, চাওয়া হতে হবে শাশ্বত এবং অবিনশ্বর। আর এই কারণেই আমরা প্রতিনিয়ত না পাওয়ার বেদনায় ভুগি। এই দোষ আমাদের। লক্ষ্য নির্ধারণ সঠিক না হলে শত পরিকল্পনা ভেস্তে যাবেই। এই শান্ত সুন্দর পৃথিবীকে মানব প্রকৃতিজাত হিংসা বিদ্বেষ ও ক্ষুদ্রস্বার্থ পরিবেষ্টিত করে– আজ যেভাবে ঈশ্বরের মহান সত্য সুন্দর সৃষ্টিকে অশান্ত পরিবেশে পরিপূর্ণ করে তুলেছে: এর হাত থেকে মুক্তি পেতে চাইলে এবং আমরা যদি সত্যিকার শান্তিলাভ করতে চাই– তবে

আমার মতে শ্রীঅরবিন্দ শিক্ষা সাধনা ও চেতনা প্রতি মানব জীবনে গ্রহণ ও বরণ করা উচিত বলে আমি মনে করি। আমি এই লক্ষ্যেই আমার অভিসন্দর্ভে তাঁর শিক্ষা সাধনা ও চিন্তা চেতনাকে সাধ্যমত ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি।

২.৬: স্বামী নিগমানন্দের শিক্ষা ও একটি পর্যালোচনা

২.৬.১: ভূমিকা

সাধারণ অর্থে শিক্ষার আভিধানিক অর্থ ‘অভ্যাস’। যা বারবার অধ্যয়ন চর্চা দ্বারা আত্তীকরণ করে সেই বিষয়ের জ্ঞানার্জন ও প্রতীতির জন্মদান। আচার-ব্যবহারিক, হৃদয়ভিত্তিক ও ‘বোধে-বোধ’ এই ত্রিবিধ শিক্ষার ভূমিকা মানব জীবনের হৃদয়স্থ হয় আপনার অগোচরে আপন ভাবে। শিক্ষা দান ও শিক্ষা গ্রহণ যুগপৎ দুটি অনুকূল হৃদয়ের আত্মিক অনুভূতি, পরস্পরের আকূল আকূতিতেই আকর্ষিত হয় পরস্পর আত্মচেতনায়। যিনি

দেন তিনিও বুঝেন, আর যিনি নেন তিনিও জানেন– কি দিলাম আর কি নিলাম। প্রকৃত অর্থে শিক্ষা মূলতঃ হৃদয়বোধের এক অহেতুক, আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত অনুভূতি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে আবির্ভূত নিগমানন্দ ভারত চেতনার শ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি। তিনি শুধু প্রাচ্য পথিকই নন, প্রতীচ্যেও তাঁর দীপশিখা কম বেশি প্রজ্জ্বলিত ছিল। বিদ্যাকে আর্যশাস্ত্র পন্ডিতগণ পরা ও অপরা এই দুই বিদ্যা নামে অভিহিত করেছিলেন। অপরা বিদ্যা সামাজিক ধ্যান ধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই প্রচলিত। যা পাশ্চাত্য শিক্ষা বললে অত্যুক্তি হবে না। পরা বিদ্যা হল, মানব জীবনে যা পূর্ব থেকেই পূর্ণ প্রকাশরূপে ছিল যাকে বলে সহজাত প্রবৃত্তি। সেই পূর্ণকে বারবার অভ্যাস বা অধ্যয়ন চর্চা দ্বারা ফুটিয়ে তোলাই হল এই পরা বিদ্যা।

'যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি'। এই দৃষ্টান্ত দ্বারাতেই তার প্রকাশ ঘটানই হল– মানব জীবনটা যেন সমগ্র জীবনটাই একটি শিক্ষা। জীবনের শেষ আছে কিন্তু শিক্ষার শেষ নেই। শিক্ষার মত অমূল্য সম্পদ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। আমরা যতদিন বাঁচি ততদিন শুধু শিক্ষার জন্যই উন্মুখ থাকি। জানার ইচ্ছার যেমন শেষ নেই শিক্ষার আগ্রহেরও তেমনি কমতি নেই। মানুষ সারাজীবন শুধু একটার পর একটা নতুন নতুন শিক্ষা নিতেই পছন্দ করে বেশি। অতি প্রয়োজনীয় আহারের আগ্রহের চেয়েও জানা বা শিক্ষার আগ্রহ তুলনামূলক বেশি। নতুন কিছু একটা অনুসন্ধান পেলে মানুষ নাওয়া-খাওয়া পর্যন্ত ভুলে যায়– যতক্ষণ না– তা; তার প্রাপ্তি হয়। চাওয়ার যেমন শেষ নেই তেমনি পাওয়ারও তৃষ্ণার ইতি নেই।

আমরা সবাই শিক্ষার্থী, কেউ শিক্ষক নই। যারা আমরা শিক্ষক বলে নিজেকে দাবি করি মূলতঃ আমরা প্রকৃত শিক্ষক নই। আমরা সবাই এই জগৎ শিক্ষাঙ্গনে শিখতে এসেছি। যা কিছু শিখাচ্ছি তা শিখিয়ে শিখাচ্ছি। কেউ স্ব-শিক্ষক হই নি। আমাদের অন্তর্নির্হিত জ্ঞানই হল যথার্থ শিক্ষক। যতদিন আমরা আমাদের এই জ্ঞানকে আবিল মনের অবরুদ্ধতার প্রাচীর ভেঙ্গে আমাদের অন্তরের সৃজনশীল জ্ঞানের উন্মেষ ঘটাতে না পারব ততদিন আমাদের শিক্ষা চলবে। জানার আগ্রহ অনিঃশেষ থাকবে।

স্বশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই যে সুশিক্ষিত এবং এই সুশিক্ষকই যে প্রকৃত শিক্ষকস্থানীয় তার প্রমাণ বাঙালীর প্রখ্যাত শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ, নিগমানন্দ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল

ইসলাম। এঁরা কমবেশি সবাই ছিলেন স্বয়ং স্বশিক্ষিত প্রতিভাবান সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব। এঁরা তাদের জ্ঞানালো আমাদের দেহ-মন-প্রাণকে তাঁদের স্বতঃউৎসারিত স্বজ্ঞান সূর্যের কিরণের স্নিগ্ধতা দিয়ে স্বচছ কাঁচের ভিতর দিয়ে যেমন রবিরস্মি সহজেই গতায়তি করতে সক্ষম, তাঁরা ছিলেন তেমনি এক একজন যথার্থ শিক্ষক এবং শিক্ষক হিসেবে সেই স্ব-স্বরূপ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এমন ব্যক্তিত্বরাই পারেন আপন ইচ্ছাশক্তি দ্বারা একজন শিক্ষার্থীর প্রাণে সেই উদ্ভাবনী বিদ্যা প্রদান ও প্রয়োগ করতে। সেদিন শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয় বুঝতে পারেন, সবার মনের সাথে আমার মন, সবার বোধের সাথে আমার বোধ, পরস্পরের একাকারের স্বাদ আনন্দের হিল্লোল রূপে কিভাবে প্রতিভাত হয়ে প্রকাশ লাভ ঘটা সম্ভব।

ভারতীয় আর্যঋষিগণ এই 'বোধে-বোধ' শিক্ষাকেই বলেছেন প্রকৃত শিক্ষা। বিশ্ব বরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দজী ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন অন্যতম শিক্ষক। মানব মনের পূর্ণ শিক্ষারূপ শান্তির একমাত্র রহস্য আমরা তাঁর জীবন-দর্শন থেকে লাভ করতে পারি। বর্তমানের সৃজনশীল শিক্ষা বলতে আজ এই বিদ্যালাভকেই উদ্বোধিত করতে শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের বোদ্ধাদের জাতীয় শিক্ষার মানদন্ড রূপে তাঁদের মাথার উপর 'মরার উপর খাড়া' হয়ে দাঁড়িয়েছে। সকল শিশুর ভিতর সৃজনশীলতার খনি আছে কিন্তু কিভাবে শুধু সেই খনি থেকে তার সৃজনী শক্তি নির্গত হবে সেই উদ্ভাবনী শক্তি শিক্ষককে সর্বপ্রথম হৃদয়বোধে আয়ত্তিকরণ, আত্মজাগ্রত করণ এবং ইন্ধন দান করাই হল প্রকৃত শিক্ষা দান। শিক্ষার্থীকে নিজের অর্জিত বোধ ও প্রতিভা দ্বারা তার প্রতিভা সম্পর্কে বুঝাতে, প্রমাণ করাতে এবং উৎসাহিত করতে হবে– তোমার ভয়ের কিছু নেই পাশ ফেইলের চিন্তায় তুমি ব্যস্ত হয়ে প্রতিযোগী হয়ে গড়ে না ওঠে বরং ব্যস্ত হয়ে ওঠ তুমি জগত-জীবকে কি দান করতে পারবে। যে অসীম সুপ্ত ইচ্ছাশক্তি তোমার ভিতর ঘুমিয়ে আছে তাকে তুমি কিভাবে জাগ্রত করতে পারবে । অথবা কার ছোঁয়ায় তা জাগ্রত হতে পারে সেই শিক্ষা গ্রহণই হল তোমার জীবনের প্রকৃত শিক্ষা। প্রতিযোগিতা– শিক্ষার কোন উন্নত উপায় নয়। বরং এই চিন্তা প্রকৃত শিক্ষাকে বাধাগ্রস্ত করে। দেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এই বিষয়ে সচেতন হতে হবে। জীবনের লক্ষ্য একবারেই ঠিক করতে হয়, এর জন্য পরিকল্পনা বারবার পরিবর্তন করতে হলেও আপত্তির কোন কারণ নেই। এ জন্য কোন যায় আসে না। যায় আসে শুধু

লক্ষ্য স্থির না হলে। শিল্প, কলা, সাহিত্য, সঙ্গীত, রসায়ণ, পদার্থ যে শিক্ষাই তোমার অন্তরে স্বতঃপ্রেরণারূপে আপনি জেগে উঠবে এবং তোমাকে উৎসাহ যোগাবে তোমার অন্তরে অজানা সঙ্কেত রূপে বুঝবে– তোমাকে সেই সত্য আবিষ্কারের জন্যই প্রাণ নিবেদন করতে হবে, অধ্যবসায় করতে হবে অবশ্য– একান্ত আপন মনে।

স্মরণ রাখতে হবে, লক্ষ্য বারবার বিচ্যুত হলে শত পরিকল্পনা ভেস্তে যাবেই। শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া চাই জ্ঞানলাভ। আত্মসচেতনতা দ্বারা জগতের সবকিছুকে আত্মীকরণ করা। এই লব্ধ জ্ঞানই মানবকে দিতে পারে পূর্ণ শান্তিলাভ। এই লব্ধ শিক্ষাশক্তি দাঁড়াই একজন শিক্ষার্থী দেশ জাতির মঙ্গল বয়ে আনতে পারে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি এই মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে সব ধরণের সুযোগ সুবিধা দ্বারা তাদের দেশে স্থান দিয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে তাদের মেধা ক্রয় করে নিচ্ছে।

কারণ তারা জেনেছে, বুঝেছে যে– শিক্ষার মূল তত্ত্ব হল তাদের উদ্ভাবিত মেধা। তাদের অন্তর্নির্হিত বোধ ও তীক্ষ্ণ প্রতিভাশক্তি। একটি দেশকে ও একটি জাতিকে যদি সমৃদ্ধশালী করতে চাই তবে শিক্ষার্থীর প্রতিভা ও মেধার বিকাশ জাগ্রত করার জন্য তাকে তিলে তিলে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। এবং সেই মেধা ও প্রতিভাকে মূল্য দিতে হবে যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে। কোনভাবেই শিক্ষার্থীর মনের উপর জোর খাটা যাবে না। দৃষ্টি রাখতে হবে সেদিকেই বেশি। শিক্ষার্থীকে অনুকরণশীল নকল বিদ্যাশিক্ষার প্রতিযোগিতায় উৎসাহী করা থেকে বিরত রাখতে হবে।

প্রাচীন কালে শিক্ষা কোন সময় স্বার্থভিত্তিক ছিল না। শিক্ষা সে সময় ছিল স্বার্থের বিপরীত বরং পরকল্যাণার্থে নিবেদিত। শিক্ষার মূল লক্ষ্য স্বার্থ লাভ– যে দেশ জাতির এই প্রত্যাশা, সে জাতি– স্বশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত জাতি নয়। একজন ডাক্তারের মূল লক্ষ্য মানবসেবা। কিন্তু ডাক্তার হয়ে তিনি হলেন, মানবচোষা। কারণ একটিই– প্রথম শিক্ষাদাতা তার গুরু পিতামাতা, দ্বিতীয় গুরু– দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও যথার্থ নীতি নির্ধারণের কর্মকর্তাদের ব্যর্থতা, তার শিক্ষাদাতার শিক্ষার দিক্‌নির্দেশনা ও জীবনধারা, তৃতীয় তার পরিবার যারা তার সরল শিশুমনকে জীবনের শুরুতেই কলুষিত করে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর ছিল। দেশের উদ্দেশ্য যদি জ্ঞানী মানুষ গড়া হয় তবে সেই মেধাবী শিক্ষার্থীর সকল দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। পিতামাতাদের–

তার সন্তানকে দেশ জাতির কল্যাণে উৎসর্গ করতে হবে। ত্যাগনিষ্ঠা দ্বারা নিজেকে এবং তাকে গড়ে তুলতে হবে। অথবা উভয়ের এই গুণ থাকতে হবে। জীবন পরিচালনার জন্য সরকারকে শিক্ষার্থীর পরিবারের জন্য প্রয়োজনে সম্মানীভাতার ব্যবস্থা করতে হলেও করতে হবে। স্বার্থ কোনদিন শিক্ষার মানদন্ড বজায় রাখতে পারেনি, পারবে না। স্বার্থ দিয়ে শিক্ষার মান বজায় রাখা যাবে না। শিক্ষা যেহেতু জাতির মেরুদন্ড তখন শিক্ষার মান উন্নত ও সীমাবদ্ধ রাখতে হবে জ্ঞানসাধনায়। প্রাচীন কালে শিক্ষাগুরু ঋষিগণ এই নীতি অবলম্বন করেই পৃথিবীকে সমৃদ্ধশালী করেছিলেন। স্বামী নিগমানন্দজী এজন্যই জানালেন,

"আমি অন্য কোন আন্দোলন বুঝিনা। চাই শুধু শিক্ষার প্রসার। আপামোর জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোল। শিক্ষাই মনুষ্যত্ব জাগাবে। এই আমার আশা ও আশীর্বাদ।"[২১] অর্থাৎ তিনি এই বিষয়ে জেনে শুনে ও বুঝেই এই মনুষ্যত্ব বা জ্ঞানলাভের প্রতি আগ্রহ জন্মানোর জন্যই আপামোর সবাইকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে জীবনভর সংগ্রম করে গেছেন এবং সকলের প্রতি এই মহান আহ্বান রেখে গেছেন।

শিক্ষার অর্থ কোনভাবেই সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হবে না। শিক্ষা একটি মুক্ত উদার সম্পদ। শিক্ষা কেবল বুদ্ধির সূক্ষ্মতা সম্পাদনেই ব্যয়িত হবে না। শিক্ষার প্রকৃত অর্থ আত্মশক্তির উদ্বোধন। এই শক্তি কেবল বুদ্ধিগত আত্মস্বার্থ পরিপূরণের জন্যই ব্যক্তি জীবনে পরিচালিত হওয়া উচিত না। বরং জীবনভর জীবনের সকল বিভাগে এর বিস্তার থাকা আবশ্যক। আমরা যদি মানুষের মত মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারি, তবেই বুঝব আমাদের ভিতর শিক্ষার সুফল কিভাবে বিস্তার ঘটা সম্ভব ? কিন্তু এটা কখনই উচিত হবেনা যে, নিজ জাতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি ও সত্তাকে মূল্যহীন মনে করা বা আমাদের জন্মগত অর্জিত শিক্ষা সংস্কৃতিতে অবহেলা ও উপেক্ষা করে অপরের ভাষা শিক্ষা সাহিত্য ও দর্শনকে আপন করে গ্রহণ করা। স্বামী নিগমানন্দজী এজন্যই তাঁর বহুল প্রচারিত পত্রিকা 'আর্য্যদর্পণ'-এ সাবধান করে দিয়ে জানালেন, "সম্প্রতি ইংরাজী বিদ্যার বহুল আলোচনা হওয়াতে হিন্দু সমাজে এক্ষণে এই সংশয়ী জনগণের সংখ্যা বিস্তর বাড়িয়া গিয়াছে। এই সংশয়ী জনগণকে হিন্দুধর্মে প্রতিষ্ঠিত করা এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য "[২২] ।

২১। সত্যচৈতন্য ও শক্তি চৈতন্য, **শ্রীনিগমানন্দ উপদেশামৃত**, যোরহাট: আসামবঙ্গীয় সারস্বত মঠ, চতুর্থ সংস্করণ, ভক্তসম্মিলনি, ১৪১৫, পৃ., ১৪৬

২২। স্বামী জ্ঞানানন্দ সরস্বতী, **শতবার্ষিকী আর্যদর্পন স্মরণিকা**, হালিশহর, কলকাতা: আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, প্রথম প্রকাশ, ১৪ই জানুয়ারী, ২০০৮, পৃ.,২৪

অর্থাৎ তিনি একজন আদর্শ বাঙ্গালী হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করে– তাঁর প্রথম পত্রিকা প্রকাশের ভূমিকায় এই সার সত্য বাণীটি উদ্ধৃতি দ্বারা সেই সত্যটিকেই প্রমাণ করে গেলেন আমাদের মাঝে। বাঙ্গালী হিসেবে আমরা যেহেতু ধর্মভীরু এবং আমাদের জন্ম , কর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সবই যখন ধর্মভিত্তিক তখন ইংরাজী ভাষা ও বিদ্যা আমরা অবশ্য জানবো শিখবো বহুল জ্ঞান লাভের জন্য কিন্তু আপন জাতীয় কৃষ্টি সভ্যতা ও ঐতিহ্যকে উপেক্ষা অবহেলা করে নয়।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, ধর্মহীন শিক্ষা আমাদের কোনদিন জাতীয় শিক্ষা মধ্যে গণ্য ছিল না। কারণ ভারতীয় শিক্ষার মূল মন্ত্র ছিল– আগে জীবন গঠন, শরীর মনকে বলশালী করণ, হৃদয়ে দৃঢ়তা স্থাপন, তবেই হবে শিক্ষার মূলতঃ গড়াপত্তন। ভারতীয় সংস্কৃতি এজন্যই জানিয়ে গেছেন, শিক্ষার মূল ভিত্তি যেহেতু বাল্যকাল, তখন এই সময়টি হতে হবে অবশ্য ব্রহ্মচর্যময় গঠিত জীবন। ব্রহ্মচর্য অর্থ নিয়মতান্ত্রিক একটি সুষ্ঠু সংকল্পময় গঠিত জীবন। বালকের বীর্য রক্ষার জীবন। বীর্যশক্তি বা মনোবল হল শিক্ষার মূল চাবিকাঠি। স্বামী নিগমানন্দজী এই লক্ষ্যেই ছাত্রদের জন্য 'ব্রহ্মচর্য-সাধন' নামে একখানি মহামূল্যবান পুস্তক প্রণয়ন করে দেশবাসীকে জানালেন,

"সংসার মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিবার ইচ্ছা থাকিলে সর্বাগ্রে দৈহিক উন্নতি আবশ্যক। কারণ জীবন রক্ষা না হইলে সকল শিক্ষাই বৃথা। কিন্তু সেই শিক্ষা কিসে রক্ষা করিতে হয় তাহা অধিকাংশ লোক জানে না, অথবা জানিবার তাদৃশ ইচ্ছাও নাই –

ইহাই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আজকালকার যুবকগণ শিক্ষা ও সংসর্গদোষে বৃদ্ধ সাজিয়া গুপ্তভাবে সেনগুপ্ত মহাশয়দিগের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া পরিশেষে চিত্রগুপ্তের নিকট এজাহার দিতে হাজির হইতেছে। প্রিয় পাঠকমহাশয় ! আজ আমাদের ভেকত্ব ঘটিয়াছে। কারণ শাস্ত্র বলছেন যে,

"গুণিনি গুণজ্ঞো রমতে নাগুণশীলস্য গুণিনী পরিতোষঃ।

অলিরেতি বনাৎ কমলং নহি ভেকস্ত্বেকবাসোহপি চ ॥"[২৩]

২৩। পূর্বোক্ত, পৃ., ২৪

– "গুণিগণই একমাত্র গুণিগণের আদর বুঝিয়া থাকেন, যেমন পদ্ম যে কি পদার্থ– তা ভ্রমরই যথার্থ বুঝে– ভেক পদ্মের নিকট বাস করিয়াও তাহার গুণপনা বুঝিতে পারে না।" অতএব ছাত্র জীবনে ব্রহ্মচর্যই (বীর্যধারণই বা মনোবল সঞ্চয়ই) মানব

জীবনের একমাত্র জীবনীশক্তি ও শিক্ষাশক্তি। মানবজীবনের সকল শক্তির উৎস এই বীর্য শক্তি। স্বামী নিগমানন্দজী একারণেই তাঁর ব্রহ্মচর্য সাধন পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে জানালেন,

> আমাদের জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কর্তৃপক্ষকে আমরা জাতীয় বিদ্যালয় সমূহে দুই একজন ধর্মযাজক নিযুক্ত করিয়া সুকুমারমতি কুমারগণের কোমল হৃদয়ে ধর্মবীজ বপনের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করি। কারণ যদি পুত্রের উপর অর্থ যশের কামনার জন্যই বিদ্যা শিক্ষা হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রচলিত বৈদেশিক শিক্ষার সঙ্গে আমাদের শিক্ষার গৌরব কি থাকিল ? শিশুকে যদি সৎশিক্ষা না দিয়া বহু রাক্ষসী বিদ্যার আলোচনা করা হয়, তাহা হইলে উক্ত শিশু যে, ভবিষ্যতে রাক্ষসভাবাপন্ন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।[২৪]

আমার গবেষণা পর্বে আমারও এই সিদ্ধান্ত যে, একজন মানুষকে যদি প্রকৃত শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে চাই– তবে তার ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য পালনই সর্বরোগপ্রতিষেধক সর্বদুঃখবিনাশক তথা ভারতের পুনরুত্থানের একমাত্র বীজমন্ত্র।

ছেলে ভাল হোক এটি আমাদের সকলের প্রাণের ইচ্ছা, পিতা পুত্রের সুখের জন্য সম্পত্তি রেখে যায় কিন্তু সম্পত্তি রক্ষার জন্য যে সকল বিদ্যা ও জীবন-সম্পদ অর্জন প্রয়োজন তা রক্ষার প্রকৃত শক্তি কি তা অন্বেষণ করি না। ধর্মহীন শিক্ষাই হল এর ধ্বংসের অন্যতম কারণ। স্বামী নিগমানন্দদেব একারণেই জানালেন,

> আজকালকার প্রাচ্য কি পাশ্চাত্যভিমানীগণের মধ্যে দুই একজন মহৎলোক ব্যতীত কেহ মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে বা দুই একখানা মূল গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইতেছেন না। থাকুক মূলগ্রন্থ – প্রণয়ন করা বা মৌলিকত্ব নিরূপণ করা, আর্যঋষি প্রণীত তত্ত্বগুলি বুঝিবার শক্তিও অনেকের নাই। এককথায় বলিতে গেলে প্রকৃত জ্ঞান উপার্জন জন্য শিক্ষা গ্রহণ আজকাল আমাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।[২৫]

২৪। স্বামী অখণ্ডানন্দ সরস্বতী, **শ্রীশ্রী নিগমানন্দ গ্রন্থসম্ভার,** কুতুবপুর, মেহেরপুরঃ শ্রীশ্রীগুরুধাম প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২২, পৃ., ২৪

২৫। ঐ, পৃ., ৬

শিক্ষাবিষয়ক স্বামী নিগমানন্দের সর্বশেষ উপদেশের মূল্যবান সারমর্ম হল– প্রকৃত শিক্ষালাভ করতে চাইলে ছাত্র, অভিভাবক ও শিক্ষক সকলেরই সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। ছাত্রদের প্রয়োজন, বিশেষ সোৎসাহ ও সৎসাহস এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। অভিভাবকের প্রয়োজন, প্রকৃত মানুষ গড়ে তুলা। শিক্ষকের প্রয়োজন, শিক্ষার্থীর অভাবটি ধরিয়ে দেওয়া। বর্তমানে এর কোনটিই নেই বললেই চলে। বরং দেখতে পাই এর উল্টোটা ঘটছে। যে বিদ্যালোভী বালক বিদ্যাচর্চার জন্য পাগল থাকা আবশ্যক সে এখনেই শুক্রব্যয়ী ও অর্থপিচাস। যে যুবক একজন সৎ চরিত্রবান আদর্শ গৃহী হওয়া আবশ্যক সে এখন পরস্বাপহারী। যে বৃদ্ধ– যার অবলম্বন একমাত্র ভগবৎচরণ সান্নিধ্যলাভ, সে এখন সংসারের অক্টোপাশে পরিপূর্ণরূপে আবদ্ধ এবং এক ফোটা সংসার মধুলোভে ব্যতিব্যস্ত। স্বামী নিগমানন্দ একারণেই তাঁর দূরদৃষ্টিদ্বারা ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান দিব্যদৃষ্টিতে দেখে জানালেন:

"বর্তমান সমাজ এখন কুশিক্ষায়, কু-আচরণে বিশেষ করে সুকুমারমতি বিদ্যালয়ের বালকগণ– পর্যন্ত শুক্রব্যয়ী। বালক হইতে প্রৌঢ় পর্যন্ত সকলেই ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য বৈধ এবং অবৈধ উপায়ে শুক্রক্ষয় ও অর্থগৃধ্নূ হইয়া জীবনের সুখ নষ্ট করিয়া বজ্রদগ্ধ তরুর ন্যায় বিচরণ করিতেছে এবং তাহাদের উৎপাদিত সন্ত ানগণ আরও নিবীর্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া জীবনের নানাবিধ দুর্জয় রোগযন্ত্রনা ভোগ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে।"[২৬]

অতএব ছাত্রদিগের প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষার মূল মন্ত্র বা উৎকৃষ্ট তপস্যা হল ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা। অর্থাৎ পঁচিশ বৎসরকাল যে বিদ্যা শিক্ষা বয়স– এই সময়টি "বীর্য ধারণং ব্রহ্মচর্যম্" মূলে যে কঠোর জীবনব্রত তা রক্ষা করা। এর প্রমাণ পাই বুদ্ধি বীরত্বে পরাক্রমশালী এজীবনে যাঁরা অতুলানন্দ লাভ করে– জগৎবাসীকে তাঁদের মহিমা ও সাহসিকতা দেখিয়ে গেছেন তাঁরা হলেন, মহাভারতের বিখ্যাত বীর আবাল্য ব্রহ্মচারী ভীস্ম, ইন্দ্রজিৎ, জগৎ বিখ্যাত বিজয়ী বীর পরশুরাম, রামানুজ লক্ষণ এবং এযুগের মহাবীর স্বামী বিবেকানন্দজী, নিগমানন্দজী, প্রণবানন্দজী ইত্যাদি এমন আরও অনেকে। এর প্রমাণ পাই ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাভারতে।

২৬। ঐ, পৃ., ২৯

ভগবৎ অংশে জন্মলাভ করেও মহাবীর লক্ষণকে পর্যন্ত চৌদ্দ বৎসর ব্যাপী বীর্যধারণ করতে হয়েছিল ইন্দ্রজিৎকে বধ করার জন্যে। অতএব বীর্যই বল, বীর্যই বিদ্যাবুদ্ধি, বীর্যই শক্তি, বীর্যই জীবন দিশারী।

এই বীর্য সঠিকভাবে রক্ষা হলে প্রতিটি বালক দেখতে পাবে তার দেহের সৌন্দর্য, মুখাবয়বের লাবণ্য, দৈহিক বল, ইন্দ্রিয়গণের স্ফূর্তি, বুদ্ধি, স্মরণশক্তি এবং ধারণাশক্তি। স্বামী বিবেকানন্দজী জীবনভর তাঁর যুবক ভাইদের নিকট এই বীর্যশক্তিই প্রত্যাশা করে গেছেন। মনুষ্যত্ব লাভের জন্য যুবসংঘ সৃষ্টি করে বুঝালেন যে, এই যুবকরাই দেশ জাতির ভবিষ্যৎ।

২.৬.২: শ্রীনিগমানন্দের মতে শিক্ষা কী?

স্বামী নিগমানন্দ ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাকেই শিক্ষা বলতে প্রতিপন্ন করতে প্রয়াসী ছিলেন। তিনার মতে মানব জীবনে যা কিছু অর্জন; জীবনের শিক্ষার প্রথম ধাপ– এই ধর্মকে ধরেই, ধর্মকে প্রত্যাখান করে নয়। ধর্ম বলতে তিনি ধর্মের আনুষ্ঠানিকতাকে গুরুত্ব না দিয়ে বরং ধর্ম বলতে বুঝাতে চেয়েছেন, জীবনের মর্মমূলে যে সত্যম্ শিবম্ সন্দরম্ প্রতি হৃদয়ে বিরাজিত সেই সুপ্ত সত্যকে যে বিদ্যা দ্বারা জাগ্রত করে জীবন পরিচালনায় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় অথবা মানব হৃদয়ের ঐশীশক্তির বিকাশ করণ যে বিদ্যায় অর্জিত হয়, প্রকৃত শিক্ষা বলতে তাকেই বুঝাতে ও জাগ্রত করতে আগ্রহী ছিলেন।

বর্তমানে বিদ্যার ডিগ্রীলাভকেই বিদ্যার্জন বলা হয়। বি,এ, এম,এ পাশ করাকেই বিদ্যার্জন স্বীকার– স্বামী নিগমানন্দজী প্রাধান্য দান করেন নি। ব্যবহারিক বিদ্যালাভে বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ও প্রখর হয়, বিচার জ্ঞান লাভ হয়, ভুল ত্রুটি বুঝতে সহজ হয়। এজন্য প্রাথমিক পর্যায়ে এই বিদ্যার গুরুত্ব অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু সর্ববিদ্যা বিশারদ সর্বজ্ঞানে গুণান্বিত অন্তরস্থ সত্তা অভিজ্ঞানে– যে প্রজ্ঞা বা বিশুদ্ধ বুদ্ধি বিকশিত হয় তা অর্জন করতে হয় শুধু সেই সত্তারই কৃপা করুণা ও অনুশীলন দ্বারায়। পৃথিবীতে যত মহামানব আবির্ভূত হয়েছেন যেমন– রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীষু,শংকর, মোহাম্মদ, গৌরাঙ্গ এবং কি এযুগে ঋষি কবি রবীন্দ্র নাথ, নজরুল ইসলাম এঁরা কেউ ব্যবহারিক ডিগ্রীধারী শিক্ষাবিদ্ ছিলেন না। পাশ্চাত্যের যেমন সক্রেটিস, প্লেটো, মিলটন, এরিষ্টটল

প্রভৃতি স্বজ্ঞানীগণ এঁরাও ছিলেন সহজাত শিক্ষাবিদ্ । আমরা আজ এদেঁর ভুলে গেলেও ইতিহাস এর চিরকাল সাক্ষি হয়ে আছে ও থাকবে। পৃথিবীতে অদ্যাবধিও এঁরাই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বুদ্ধিবিদ্ শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষা বিশারদ। এঁদের শিক্ষার আদর্শকে অবলম্বন করে আজ পর্যন্ত আমরা প্রেরণা লাভ পূর্বক সামনে এগিয়েই চলছি। পিছিয়ে পরিনি অদ্যাবধি।

সনাতন হিন্দুধর্মে মানবজীবনটিকে চারিভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা- বাল্য, যৌবন, পৌঢ় ও বার্ধক্য। এদেরকে আবার চারি আশ্রমে বিন্যাস করা হয়েছে যথা- ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্ত এবং সন্ন্যাস। এই চারি আশ্রমকে আবার চারি বর্গে সংযুক্ত করা হয়েছে যথা- ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। জীবনের আয়ুকাল নির্ধারণ করা হয়েছে একশত বৎসর। প্রতি পঁচিশ বছর করে জীবনের এক একটি শিক্ষাকাল ধরে- ঋষিগণ যে জ্ঞান উপদেশ ও আচরণ শিক্ষা দান করে গেছেন যা মানব জীবন গঠনের উপযুক্ত কাল হিসেবে অতীত থেকে আজ পর্যন্ত কিছু হলেও এর কার্যক্ষমতা বহাল তবিয়তে আজও বিদ্যমান আছে। স্বামী নিগমানন্দজী এই অন্তর্গুঢ় শিক্ষাকেই মানব জীবনে মূল্যদান করে গেছেন।

তিনি ধর্মের মধ্য দিয়ে এই অধঃপতিত জাতিকে উঠিয়ে তুলতে চেয়েছেন। আরও চেয়েছেন এদের মধ্যে সেই ঋষি যুগের মহান আদর্শগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে। সে-যুগের ঋষিদের মত মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ দান - আত্মার স্বরূপ জ্ঞান দান করতে। তিনি সাধনা করে এই জ্ঞান লাভ করেছেন যে, এই বিদ্যা অর্জনের পর পৃথিবীতে আর কোন শ্রেষ্ঠ বিদ্যা নেই। ব্যবহারিক বিদ্যা লাভে জীবনের গতি নির্ধারণ হয় কিন্তু শক্তি গড়ে ওঠে অধ্যাত্ম বিদ্যায়। পাশ্চাত্য জগৎ যেমন শুধুমাত্র ব্যবহারিক বিদ্যায় ঐহিক উন্নতি লাভ করছে কিন্তু অধ্যাত্ম জ্ঞানে পরাঙ্মুখ, ভারত কিন্তু পাশ্চাত্যের অপরা বিদ্যা লাভ ছাড়াও তার আপন জাতি সত্তার যে সংস্কৃতিগত ও কৃষ্টি সভ্যতাগত পরা অধ্যাত্ম বিদ্যাশক্তি তার জীবনের মর্মমূলে বিধৃত, যা জগতে আজও কমবেশি প্রভাব বিস্তার করে আছে- নিজের এবং অপরের মধ্যে; তা অধিগত করে- এমন কি যুগপৎ আলোচিত সম্পদের উভয়ের মধ্যে তা আদান-প্রদান পূর্বক বর্তমানেও যে জাতিকে জাগ্রত ও সম্পদশালী করে

গড়ে তুলছেন এবং তুলেছেন। এটিই ভারতীয় শিক্ষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং জাতীয় ঐতিহ্য। ভারত এজন্যে আজও জ্ঞানে বিজ্ঞানে মহীয়ান।

স্বামী নিগমানন্দ চেয়েছেন,'সৎশিক্ষা বিস্তার'। এর মাধ্যমে তিনি প্রত্যাশা করেছেন– আর্ত-ক্লিষ্ট-রুগ্ন-অনাথ-দরিদ্র-নর-নারায়ণের সেবা, যাতে সমাজে দেশে ও জাতিতে এর সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরের দুঃখ, কষ্ট, ব্যথা ও বেদনায় যেন আমাদের হৃদয় ব্যথিত হয়, ক্ষুদ্রত্ব নীচত্ব হিংসা দ্বেষ ভুলে গিয়ে সবাই যেন একমন একপ্রাণ হই, জগতের মঙ্গলার্থে সংঘবদ্ধ হয়ে যাতে আপন অপেক্ষা পরের জন্য অধিক খেটে মরতে পারি, সবাইকে ভাতৃজ্ঞানে জড়িয়ে ধরে অসাম্প্রাদায়িকভাবে জীবন-যাপন করতে পারি, আগে পরের কাজ করে, যেন পরে– নিজের কাজ করি, আপন অপেক্ষা পরকে যেন বেশি ভালবাসতে শিখি।

স্বামী নিগমানন্দজী এই শিক্ষাকেই 'সৎশিক্ষা বিস্তার' শিক্ষা বলে মনে করতেন এবং এ কারণেই আমাদের শিক্ষিত করতে আগ্রহী ছিলেন। এই লক্ষ্যেই তিনি বিশ্ববিবেক বিধৃত বাণী দান করে জানান–

"আমি অন্য কোন আন্দোলন বুঝিনা। চাই শুধু শিক্ষার প্রসার। আপামর জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোল। শিক্ষাই মনুষ্যত্ব জাগাবে। এই আমার আশা ও আশীর্বাদ।"[২৭]

শিক্ষার্থী শিশুর মনুষ্যত্ব ও বিবেক জাগ্রতকরণকেই তিনি যথার্থ শিক্ষা বলতে মনে করতেন। শিক্ষাকে লক্ষ্য করে তিনিই উপলব্ধি করেছিলেন, জীবনে প্রকৃত শিক্ষা লাভ ঘটাতে চাইলে জীবনের গোড়াতে জল ঢেলে সিঞ্চন শুরু করতে হবে। কারণ– বর্তমান শিশুই জাতীর ভবিষ্যৎ মেরুদন্ড। এই শিশুদের আত্মগঠনে ক্রান্ত দর্শী অপরোক্ষ দার্শনিক মহাজ্ঞানী নিগমানন্দদেবের আদর্শানুপ্রাণিত অনুগামী শিষ্যবর্গ বিখ্যাত দার্শনিকপ্রবর যোগী, পরা-অপরা বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী, বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ বেদমীমাংসক, শ্রীঅরবিন্দের পৃথিবী বিখ্যাত Life Divine গ্রন্থের একমাত্র অনুবাদক, সত্যলাভকারী, সরস্বতীর বরপুত্র– স্বামী নিগমানন্দের মানসপুত্র শ্রীমৎ অনির্বাণজী এবং পরা অপরা বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী, নারী শিক্ষা ও সংঘের পথপ্রদর্শিনী মানস কন্যা লীলানারায়ণী দেবী, ভারতবিখ্যাত যোগীশ্রেষ্ঠ ও যোগশ্রেষ্ঠ শিক্ষক স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী, কবিশ্রেষ্ঠ স্বামী

২৭। পূর্বোক্ত, সত্যচৈতন্য ও শক্তি চৈতন্য, **শ্রীনিগমানন্দ উপদেশামৃত**, পৃ., ১৪৬

সিদ্ধানন্দ সরস্বতী, বেদান্তবিদ্ স্বামী সত্যানন্দজী ইত্যাদি আরও অনেকে এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন স্ব-শিক্ষিত সুশিক্ষক, মহাগুণী ও মহাজ্ঞানী ব্যক্তিত্ব। এঁরা সবাই স্বামী নিগমানন্দজীর শিশুপালন ও শিশুশিক্ষার আদর্শকে যথার্থ আদর্শ শিক্ষা বলে মনে করতেন এবং শ্রীনিগমানন্দের শিশুমঙ্গল চিন্তাকে সারাজীবন লালন করে গেছেন।

বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ অনির্বাণজী তাঁর 'শিক্ষা' পুস্তকে শিক্ষা বিষয়ক যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় তুলে ধরে মূলতঃ ব্যক্ত করেছেন, শিক্ষককে হতে হবে একজন আদর্শ মায়ের মত। যে মা নাকি শত শিক্ষকের সমপর্যায়ভুক্ত। মায়ের স্নেহ মমতা শাসন সোহাগ একটি শিশুর জন্য যত বেশি প্রয়োজন বা গ্রহণের অধিকার রাখে অন্য কারো পক্ষে তা গ্রহণ ও প্রদান সম্ভব নয়। শিক্ষক ট্রেনিং-এ যদি মেয়েদের মায়ের ভুমিকায় এবং পুরুষদের পিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার জীবন্ত প্রশিক্ষণ দান করা যেত তবে শ্রী নিগমানন্দের শিশুমঙ্গল আদর্শ আরও বাস্তবায়িত হত। শিশুদের আপন পিতা-মাতার মত সেবাসহানুভূতি আদর যত্ন নির্ভরতা নিশ্চয়তা ও শাসন সোহাগে জীবন গড়ে তুলতে তাদের কোন সমস্যায় পড়তে হতো না। শ্রীনিগমানন্দদেব এই শিশুমঙ্গল আদর্শকে প্রাচীন ভারতের ঋষি আশ্রম বা গুরুকুলে শিক্ষাসংযুক্ত ব্রহ্মচর্য ব্যবস্থার মাধ্যম হিসেবেই এই মহতি আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছিলেন। তাঁর সেবা কার্যের প্রধান আদর্শ সদ্শিক্ষা বিস্তারের চেতনা– জনকল্যাণে প্রথম তাঁর মনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। তারই নমুনা দেখতে পাই– তাঁর গার্হস্থাশ্রমে অবস্থানকালীন সময়ে বাড়ীর পার্শ্বস্থিত স্থাপিত বিদ্যালয়ের অবৈতনিক শিক্ষক হিসেবে শিক্ষাদান প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে। পরমহংসত্ব অর্জন ও সত্যলাভ করার পরেও শিক্ষার প্রতি অনুরাগ তাঁর প্রাণ থেকে মুছে যায়নি। অশিক্ষিত কিছু শিশুবালকদের শিক্ষাহীনতা ও অশিক্ষা কুশিক্ষা দেখে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। স্থানটি ছিল– ময়মনসিংহের গারোহিল তুরা পাহাড় সন্নিকটস্থ কোদালধোয়া নামক স্থানে, তিনি তখন সেখানে যদিও প্রকৃতির প্রেমে পাগলপাারা হয়ে অবস্থান করছিলেন, তবুও সেখানের শিশুদের শিক্ষা বিমুখতার অজ্ঞানতা দেখে– উক্ত এলাকার হাজং পল্লীর অসহায় নিরক্ষর শিশুদের মানসিক দৈন্যতা দেখে মানবিক উদ্দেশ্যে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কারণটি ছিল 'বিদ্যাদান', এটি এমনই একটি দান যা জ্ঞাত না থাকলে একজন মানুষের

জীবনের সকল চাওয়া ও পাওয়াই বৃথা হয়ে ওঠে। ধর্ম কর্ম তো দূরের কথা। একারণেই তিনি জীবনে শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন। ঠিক এই লক্ষ্যেই শিক্ষার জন্য তিনি নিজেকে বারবার পরকল্যাণে আত্মসমর্পণ করেন। সরকার বাহাদুর স্থাপিত উক্ত বিদ্যালয়টির উত্তম রেজাল্ট ও গুণমুগ্ধ শিক্ষার্থীদের পরিদর্শন করে অতীব মুগ্ধ হন। এর প্রাপ্তি ফলস্বরূপ তিনি উক্ত বিদ্যালয়ে সরকার বাহাদুর কর্তৃক ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন। সরকারের নিকট হতে উপহার স্বরূপ ছাত্রবৃত্তি অনুমতি লাভ তাঁর জীবনে এটিই প্রমাণ দান করে যে, সত্যিকার অর্থে তিনি ছিলেন একজন বড়মাপের মহান শিক্ষানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী সুশিক্ষক। শিক্ষাকে তিনি যে কত বড় সম্মান ও ভালবাসা দান করে গেছেন তা বলে বুঝানো আমার পক্ষে অসম্ভব। তাঁর শিক্ষাকার্যক্রম এখানেই শেষ হয় নি, বরং সর্বসিদ্ধিলাভের পর যখন তিনি জন্মভূমি পরিদর্শন করতে আসেন তখনও দেখেন এলাকায় শিক্ষার দূরাবস্থা।

অতঃপর জন্মভূমি কুতুবপুরেও উক্ত শিক্ষা সেবাদর্শকে অব্যাহত রাখার নিমিত্তে শিক্ষানুরাগী বিদ্যোৎসাহী স্বামী নিগমানন্দজী একটি আবাসিক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করে এলাকার উন্নয়নে ব্রতী ছিলেন। উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য অনেক জমি দান করেন। ছাত্ররা যাতে আশ্রম কর্তৃক আবাসিক সকল সুযোগ সুবিধা লাভ করে নির্বিগ্নে পড়াশুনা করতে পারে তৎজন্য তৎকালীন চল্লিশ হাজার টাকা খরচ করে এর প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত করেছিলেন। গরীব দুস্থ অসহায় যারা তারা বিনামূল্যে অন্ন-বস্ত্র-খাদ্য পুস্তকাদি সবকিছু পাবে। পড়ার খরচ জন্য বৃত্তি পাবে। পিতামাতাগণ সাধ্যানুপাতে জোগানদাতা হিসেবে তাদের সন্তানদের সহযোগিতা প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সাহায্য করতে পারবেন, বিদ্যালয়টির সুরক্ষা ও সংরক্ষণে এই ছিল তাঁর ট্রাষ্টিদের প্রতি প্রতিনির্দেশ। এ বিষয়ে তিনি একটি ট্রাষ্টডিডও করে যান। অর্থাৎ কোনভাবে যেন কোন ছাত্র শিক্ষা বঞ্চিত না হয়। শিক্ষকগণ ছাত্রদের নীতি বিদ্যা, দর্শন বিদ্যা, শরীর বিদ্যা, ধর্ম বিদ্যা, শিল্প, সাহিত্য চর্চা, নাট্য, কলা, নন্দনতত্ত্ব এবং বিজ্ঞান বিষয়ক আধুনিক ভৌত প্রভৃতি বিদ্যা শিক্ষার সাথে প্রচলিত শিক্ষাও অকাতরে দান করবেন। শিক্ষকদের বেতন স্বামী নিগমানন্দ তাঁর এষ্টেট হতে ট্রাষ্ট কমিটির মাধ্যমে যোগান দেওয়ার নির্দেশ দান করে যান। সম্ভবত দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত নিদর্শনের স্বাক্ষি রূপে স্বাধীনতা

যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত স্থাপিত এই বিদ্যালয়টির স্মৃতিচিহ্ন স্ব-চোক্ষে অনেক দেখেছেন। পরবর্তিতে দেখি এই সম্পত্তি এ্যানিমি প্রপারটিতে পরিণত হয়। এটি অন্যত্র অন্যনামে হস্তান্তর হয়ে বর্তমানে বিদ্যালয়টির পূর্ব নামকরণ 'শ্রীনিগমানন্দ সারস্বত মন্দির' নামের পরিবর্তে 'নজরুল ইসলাম উচ্চ বিদ্যালয়' নামে কাথুলিতে এটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে বলে জানা যায়।

সত্যলাভকারী মহৎ প্রাণ মানবের মহৎ ইচ্ছা এবং তাঁর শাশ্বত সত্য দৃষ্টি কখনও কোনদিন বিনষ্ট বা নিঃশেষ হয় না । সময় কালের তারতম্যে পুনঃ একসময় জাগ্রত হয়ই হয়। শততম বর্ষ পরে বর্তমানে শ্রীনিগমানন্দের শাশ্বত ইচছা ও সনাতন দৃষ্টি আবার আমরা দেখতে পাই তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত 'দিনাজপুর শ্রীনিগমানন্দ সারস্বত সেবাশ্রম' গড়নূরপুর নামক স্থানে। এই আশ্রমে ঠাকুরের ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে তাঁরই নামে ও তাঁরই অনুকল্পিত আদর্শে একটি উচ্চ বিদ্যালয়, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি অনাথ আশ্রম, একটি বৃদ্ধাশ্রম, একটি আধুনিক দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল, একটি আধুনিক প্যাথলোজি বিভাগ, হোমিওপ্যাথ বিভাগ, একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং গবেষণামূলক জ্ঞানদানের জন্য একটি বৃহৎ লাইব্রেরী ও গ্রন্থরচনা কার্যক্রম হিসেবে অত্র আশ্রম অন্তর্ভূক্ত ও প্রকাশিত এযাবত ত্রিশখানি জ্ঞান ও গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ আমাদের ধন্য করেছে। বিদ্যালয় দুটিতে সরকার অনুমোদিত প্রচলিত বিদ্যাশিক্ষা ছাড়াও অতিরিক্ত শিক্ষা হিসেবে ছুটির দিনে অর্থাৎ প্রতি শুক্রবারে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের দেবভাষা জ্ঞান অর্জনের জন্য সঠিক সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ ও সংস্কৃত শাস্ত্রের শিক্ষা ও জ্ঞানদান, গীতাপাঠ, বেদপাঠ ও বেদান্তজ্ঞান দান, শরীর রক্ষার জন্য যোগবিদ্যা শিক্ষাদান, আসন, মুদ্রা শিক্ষাদান এবং এসব ছাড়াও নীতি যুক্তি বিচার বিশ্লেষণ জন্য মাঝে মঝে ডিবেটিং সভার আয়োজন এবং ছাত্রদের নৈতিকতা শিক্ষাদানকে বিশেষভাবে গুরুত্বদান করা হয়ে থাকে। অন্যন্য ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীরাও তাদের ইচ্ছামত তারা একযোগে শিক্ষা নিতে পারে অথবা আলাদাভাবে তাদের নির্দেশনা মোতাবেক অতিরিক্ত এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

ধর্মের সাথে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণই যে প্রকৃত শিক্ষা এবং মানবজীন গঠনের প্রকৃত ভূমিকা, স্বামী নিগমানন্দজী কঠোর সাধনা করে জেনে বুঝেই সবাইকে এই পরামর্শই দান করে গেছেন। আমাদের জাতীয় কৃষ্টি সভ্যতা যেহেতু এই ধর্মকে ধারণ করেই হাজার হাজার বৎসর ধরে আজও দেশকে সুরক্ষা দান করে আসছে তখন আমরা কিসের জন্য এই চিরন্তন সত্যকে উপেক্ষা করে পরের শিক্ষাকে নিজ শিক্ষা বলে মেনে

নিব এবং দাবি তুলব ? অতএব মনুষ্যত্ব লাভই হল একমাত্র উপযুক্ত শিক্ষা। স্বামী নিগমানন্দজী একারণেই শিক্ষানুরাগী ছিলেন। কারণ প্রকৃত শিক্ষাই একজন মানুষকে একমাত্র প্রকৃত মনুষ্যত্ব দান করাতে পারে। আর এই মনুষ্যত্বই মানুষকে তার জীবনের উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাতে পারে। সে দেবমানবে পরিণত হতে পারে।

২.৬.৩: শ্রী নিগমানন্দের মতে শিক্ষার বৈশিষ্ট্যসমূহ

স্বামী নিগমানন্দজীর শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলিকে আমি আমার অভিসন্দর্ভে ক্রমবিন্যাসাকারে সুসজ্জিত করে এই অধ্যায়ে তুল ধরে– এই প্রতীয়মান করতে চেয়েছি যে, স্বামী নিগমানন্দ শিক্ষাকে কি প্রকার সম্মান দান করতেন, তিনি অবৈতনিক শিক্ষক সেজে এবং নিজ উদ্যোগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করে জগতবাসীকে তার প্রমাণ দান করে গেছেন। তিনি জেনেছিলেন শিক্ষার আলো আপামোর সবাইকে দান করতে না পারলে ভারতের দুর্দিন কোনদিন মুক্ত হবে না। জাতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা উন্মোচিত হবে না। পরাধীন ভারত কোনদিন স্বাধীন হবে না। তাঁর শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলেই আমরা বুঝতে পারব তিনি

একটি সচেতন ভারত গড়ে তুলতে কি প্রকার প্রয়াসী ছিলেন। উপযুক্ত শিক্ষা লাভের জন্য শিক্ষার মূলেই যে একটি শিশু, এবং সেই শিশুশিক্ষার মূলে উপযুক্ত পদ্ধতিতে বারি সিঞ্চন করে দেখিয়েছেন শিক্ষার আলো সর্বব্যাপি ফুটার জন্য প্রতিটি শিশুর জীবনে কি কি প্রয়োজন। যার সাহায্যে শিশুটি শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই একটি আলোক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জীবন লাভ করতে পারে। স্বামী নিগমানন্দজী তাঁর রচিত 'ব্রহ্মচর্য-সাধন' পুস্তকে যে ভাবে অধ্যায় বিন্যাস করে দেখিয়েছেন আমি আমার অভিসন্দর্ভে এর মূল সারগর্ভগুলি পুনরুল্লেখ করে দেখিয়েছি মাত্র।

প্রথমতঃ শিক্ষার শুরুতে সর্বপ্রথম চাই ব্রহ্মচর্য রক্ষা। অর্থাৎ আপন মনোবল বা বীর্যকে সুরক্ষা করা। যা মানব জীবনের ধীশক্তিকে সুরক্ষিত রাখে। জীবনের অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করে। নিঃস্বার্থ ও পরোপকারী হওয়ার উপযোগী করে গড়ে তুলে।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা লাভের জন্য জীবনের শুরুতে যা প্রয়োজন, যেমন– প্রথম দেহরক্ষা, তারপর সৌন্দর্য, দৈহিক বল, ইন্দ্রিয়গণের স্ফূর্তি, বুদ্ধি, স্মরণশক্তি, ধারণাশক্তি এবং রোগমুক্তি।

তৃতীয়তঃ সুসন্তান জন্মদান, এজন্য পিতামাতাদের কঠোর ব্রত পালন, সংযমশক্তি অর্জন, দৈহিক স্ফূর্তির অন্যায় ফসলরূপ অপরিকল্পিত সন্তান উৎপাদন, বৈধ বেশ্যাবৃত্তির বৈবাহিক জীবনের পুণ্যফল, অকর্মণ্য অক্ষম সন্তান জন্মদান, মানব জীবনের বৈশিষ্ট্য নয়। চাই– লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র যেমন একটি পূর্ণচন্দ্রের পূর্ণাবির্ভাবে মলিন দশা প্রাপ্ত হয়, জগতে আনতে হবে এমন একটি আলোকিত সুসন্তান। এমন একটি সুপুত্র লাভই বিবাহের উদ্দেশ্য। নতুবা কামের ছলনায় ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় বৈবাহিক জীবনকে কলূষিত করা স্বামী নিগমানন্দ গৃহস্থ জীবনের কর্ম বলে পছন্দ করতেন না।

চতুর্থতঃ সন্তানকে স্পষ্ট করে বুঝাতে হবে– ছাত্রজীবনে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা বীর্যধারণ করা। এই বীর্য অষ্টাঙ্গ প্রকার মৈথুন বর্জিত হতে হবে (যথা–কাম বা রতিবিষয়ক কোন শ্রবণ, কীর্তন, কেলি, দর্শন, গুহ্যভাষণ, সংকল্প, তৎবিষয়ে অধ্যবসায় এবং ক্রিয়ানিষ্পত্তি।) এই অষ্ট মৈথুন হতে দূরে থাকতে হবে। জীবনের প্রথম ২৫ বছর এই কঠোর অনুশাসনে ছাত্রজীবনকে গড়ে উঠাতে হবে।

পঞ্চমতঃ প্রাপ্তি ফলস্বরূপ দাঁড়াবে– জীবনের ভিত যে সপ্তধাতুর পূর্ণ সক্রিয়তা– তার বাস্তবায়ন। এই সপ্ত ধাতু হল– খাদ্য গ্রহণের ৫দিন পর শরীরে তৈরি হয় প্রথম যে রস, এই রস হতে ৫দিন পরে গড়ে উঠে– রক্তে, এইভাবে– ৫দিন পর পর মাংস, মেদ, মেদ হতে অস্থি, অস্থি হতে– মজ্জা, মজ্জা হতে এইভাবে পঁয়ত্রিশ দিনে তৈরি হয় এক বিন্দু বীর্য বা শুক্র। রস হতে শুক্র পর্যন্ত এই সপ্তধাতুর তেজকে বলা হয় 'ওজঃ' ধাতু। এই ওজঃধাতুই হল ব্রহ্মশক্তি বা জীবনী শক্তি। শাস্ত্রভাষায় বলা হয় ব্রহ্মতেজ।

পাশ্চাত্য পন্ডিতগণ এই ওজঃপদার্থকে বলেছেন,"Human magnetism"। অতএব জীবনের এই মহামূল্যবান সম্পদ যেন কোনভাবেই নষ্ট না করে যাতে সুরক্ষা পেতে পারে– স্বামী নিগমানন্দ সেই শিক্ষাই দান করে গেছেন এবং শিক্ষা বিষয়ে এই পদার্থ রক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে গেছেন।

ষষ্ঠত: এই ব্রহ্মচর্য রক্ষার প্রতিষেধক ও প্রধান সহায় হল– প্রাত:কৃত্য:- অর্থাৎ ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ। এর পর স্নানবিধিঃ-– এর অর্থ যখন খুশি তখন স্নান করা চলবে না। প্রত্যূষে অথবা সকাল ৯টার মধ্যেই অবশ্য স্নান করতে হবে। প্রতিদিন বেলা ১২টা, ৩টা, ৬টা এবং রাত্রি ৯টায় প্রত্যহ গাত্র পরিষ্কার রাখতে হবে। হোমবিধি বা প্রার্থনা ঃ– প্রতিদিন নিয়মিত ত্রিসন্ধ্যা পালন করতে হবে। আহারবিধিঃ– আহার অর্থ যা খুশি তা আহার করা নয়। শরীর ও মনের জন্য যা উপাদেয় তাই আহার বলে গণ্য হবে। সাত্ত্বিক আহারই সর্বশ্রেষ্ঠ আহার বলে স্বামী নিগমানন্দ ঘোষণা করেছেন।

সপ্তমত: কৃত্যচিন্তাঃ- এই বিষয়ে নিগমানন্দজী তাঁর গ্রন্থে নিত্য দিনের জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন, নিম্নে সেগুলি চলিত ভাষায় উল্লেখ করে দেখান হল। (১) ‘কোনরূপে কাহারও অন্তঃকরণে বেদনা দিও না। (২) মিথ্যা কথা বলিও না। (৩) যথাসাধ্য মৌন অবলম্বন করবে। কিন্তু কথা না কহিলেও সহাস্যভাব রক্ষা করবে। (৪) পরদ্রব্য অপহরণ করিও না। (৫) স্বীয় অবস্থায় সর্বদাই সন্তুষ্ট থাকবে। মনের সন্তোষ বিধান জন্য (ক) সর্বজনের কল্যাণ কামনা করবে; জগতের সবাইকে আত্মীয় মনে করবে। কাহারও সুখ বা সমৃদ্ধি দেখলে আনন্দিত হবে। (খ) কাহারও দুঃখ দেখিলে করুণার্দ্র হবে। (গ) কাহাকেও পুণ্যকার্য করতে দেখলে হর্ষ প্রকাশ করবে। (ঘ) কাহাকেও পাপ কার্য করতে দেখলে উপেক্ষা করবে। অর্থাৎ দেখেও দেখবে না, শুনেও শুনবে না, তৎবিষয়ে চিন্তাও করবে না।

(৬) স্বীয় মৃত্যুর কথা স্মরণ রেখে ধৈর্য বা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করবে; অপকারীর অপকার করতে চেষ্টা করবেনা।

(৭) দেবগণ সতত তোমার রক্ষা বিধান করছেন, কেহই তোমার অপকার করতে সমর্থ নহে, এই বিশ্বাসে নিহিত থাকবে। যা তোমার আপাততঃ অপকারী বলে বোধ হবে, পরে তাই তোমার পরম ইষ্ট সাধক হবে, এতে দৃঢ় বিশ্বাস করবে। কদাপি দেবগণের আশ্রয় ত্যাগ অর্থাৎ শুভশক্তি ত্যাগ করে অশুভশক্তি শয়তানের মনভুলানো কথায় মুগ্ধ বা বশীভূত হয়ো না। কখনও সহিষ্ণুতা পরিত্যাগ করে ক্রোধের বশীভূত হইও না।

অষ্টমত: মর্মার্থ: যদি তুমি অন্যের চাকর হও, তবে প্রভুর কার্যকে স্বীয় কার্য মনে করে সর্বান্তঃ করণে তাহা সুসম্পন্ন করতে চেষ্টা করবে। যে ধর্ম সাধনের ইচ্ছা করে, সে যে-কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, সেই অবস্থাতেই ধর্মসাধন করতে পারে। এই সংসার অনিত্য এখানে কামনার বস্তু কিছুই নেই; সুতরাং নিষ্কাম বা উদাসীন ভাবেই স্বীয় জড়দেহকে যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত করবে। বাগানের মালি যেমন প্রভুর জন্য বৃক্ষের ফলাদি রক্ষা করে এবং স্বয়ং স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকে, তুমিও তদ্রূপ এই সংসার উদ্যানে আপনাকে ভগবানের মালি মনে করে স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকবে। ফলতঃ সাংসারিক কার্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য– এই ষড়রিপুর দমনে বদ্ধপরিকর হবে। সর্বদা কুপ্রবৃত্তিগুলির প্রতি তীক্ষ্ণ মানসদৃষ্টি রাখবে। এ সকল দুর্বৃত্তির অধীন হইলে উন্নত দেবতারা তোমাকে পরিত্যাগ করবেন এবং শয়তানগণ অর্থাৎ ভূত, প্রেত, পিশাচাদি নিকৃষ্ট দেব যোনিগণ তোমাকে বশীভূত করে নরক যন্ত্রনা প্রদান করবে– এই কথা নিয়ত স্মরণ রাখবে।[২৮]

সদাচার: এর প্রথম লক্ষণীয় দিক হল– গুরুজনদের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিনয়াবনতা একজন শিক্ষার্থীর প্রধান অবলম্বন। কারও সাথে একাসনে বসবাস অহিতকর। কারণ সঙ্গদোষ খারাপ দিকে ধাবিত করে। নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত অন্য সময় গৃহ মধ্যে থাকা অনুচিত। কারণ নির্মল বায়ু সেবন শরীরের জন্য হিতকর। বাক্‌সংযম, শ্রুতিসংযম অভ্যাস বাঞ্ছনীয়। বাক্ সংযম রাখতে পারলে পরনিন্দা পরচর্চা করে যে চিত্তশুদ্ধি নষ্ট হয়, তা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। শ্রুতিসংযম করলে পাপ কথা বলতে ও শুনতে হয় না।

সায়ংকৃত্য: সন্ধ্যাকালে সারাদিবসের ন্যায়-অন্যায় কাজগুলির পর্যালোচনা করতে হয়। জীবনসন্ধ্যা নেমে আসা যেমন সবার জন্য বাধ্যতামূলক এজন্য সন্ধ্যাকালে আত্মচিন্তা করতে হয়। মরণ যে নিশ্চিত এই কথা স্মরণ করে সৎচিন্তা ও সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করতে হয়। নিগমানন্দজী বিশেষ করে এই উপদেশগুলি শিক্ষার্থীদেরকে স্মরণ রাখতে বলেছেন। সন্ধ্যায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা প্রতিটি শিক্ষার্থীর বাধ্যতামূলক হওয়া চাই।

২৮। পূর্বোক্ত, স্বামী অখন্ডানন্দ সরস্বতী, শ্রীশ্রী নিগমানন্দ গ্রন্থ সম্ভার, ব্রহ্মচর্য সাধন অধ্যায়, পৃ., ৩৬

রাত্রিকৃত্যঃ শয়নের সময় ঈশ্বরের নাম স্মরণ, পরিস্কৃত শয্যায় একাকী শয়ন, রাত ৯টার মধ্যে খেয়ে ১০টার মধ্যে ঘুমান, ভোর ৪টার মধ্যে শয্যা ত্যাগ বাঞ্ছনীয়। উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পালন করলে একটি আদর্শ শিক্ষাজীবন গঠন হবে নিগমানন্দজী এই বিশ্বাস করতেন।

২.৬.৪: শিক্ষা সম্পর্কে শ্রীনিগমানন্দের মতের পর্যালোচনা

স্বামী নিগমানন্দজী প্রাচীন গুরুগৃহের শিক্ষা ব্যবস্থাকেই তাঁর জীবন দর্শনে মূল্যদান করে গেছেন সারাজীবন। বর্তমান শিক্ষাকে তিনি যে একেবারে উপেক্ষা করেছেন তা নয়। তবে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার অত্যধিক অর্থমুখীকরণ ক্ষুদ্রস্বার্থসিদ্ধির আপন অভিপ্রয়াসকে তিনি সম্মান জ্ঞাপন করেন নি বা স্বীকার করে নিতে পারেন নি। কারণ শিক্ষা হল একটি অন্তর্নিহিত আদর্শ বিদ্যা। শিখে শিখাও, এটিই শিক্ষার বিধান। তবে বিদ্যাব্যবসায়ী হয়ে নয়, শিক্ষাব্রতী হয়েই শিক্ষাদানের এবং শিক্ষা গ্রহণের ভূমিকাকে সচল রাখতে হবে। এই ছিল তাঁর শিক্ষা সম্পর্কীয় মতামত।

উনিশ শতকের শেষপাদেও শিক্ষা ব্যবস্থার যে ছবি পাওয়া যায় তাতেও এ-ধারণা অসঙ্গত নয় যে, সে সময় ছেলেরা যে শিক্ষা পেত তার মধ্যে ফাঁকি ছিল না। কারণ সেময়ের শিক্ষাবিদ্ হিসেবে যাঁরা নন্দিত ব্যক্তিত্ব রূপে পরিচিত ছিলেন তাঁরা আর অন্য কেউ নন সর্বজন পরিচিত শিক্ষাব্রতী– স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাধিকানাথ মুখপাধ্যায়, অক্ষয় কুমার দত্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের ‘সদ্ভাবশতক’ তৎকালীন নামকরা স্কুল পাঠ্যপুস্তক ছিল। বাংলা ব্যাকরণের বেলায় রাজা রামমোহনের বাংলা ব্যাকরণখানি এত সুন্দর ছিল যে, তৎকালীন স্কুল ইনস্পেক্টর বিদ্যাসাগর মহাশয় শিশুপাঠ্য হিসেবে স্বীকৃতি দান করেছিলেন তবু নিজের শিশুপাঠ্য বাংলা ব্যাকরণের পাণ্ডুলিপিখানি পুস্তক রূপে সংযুক্ত করে নি। কারণ তিনারা ছিলেন সুন্দরের পূজারী। সুন্দরের মূল্যদানই তাঁদের স্বভাব। সেময় ছেলেরা যেটুকু শিক্ষা পেত তার মধ্যে কোন খাদ ছিলনা। শিক্ষাব্রতীগণ রীতিমত খেটেখুটে যত্নসহকারে পাঠ্যপুস্তক লিখতেন। শিক্ষার ভিত্তি সেকারণেই তখন

বড় মজবুত ছিল। আজকের মত সে সময়ও বিদ্যালয়ে বাংলা, ইংরাজী, অংক, ভূগোল, ইতিহাস ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ইত্যাদি মোটামুটি সবই পাঠ দেওয়া হত।

সে সময়েও ইংরাজী শিক্ষা, হাতের লেখা, ডিকটেশান ব্যবস্থার প্রভাব যে আজকের মত ছিল না– ঠিক তা নয়, কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য ছিল– মাতৃভাষার প্রসার ও প্রচার। মাতৃভাষার প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হত। ছেলেরা যাতে অল্পবয়স থেকেই মাতৃভাষাকে রপ্ত করতে সক্ষম হয়। কারণ সহজাত জ্ঞান মানুষ তার মাতৃভাষা থেকেই অধিক পেয়ে থাকে। মাতৃভাষার রক্ষক বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয়ের পাঠ্যপুস্তকই তখন ছেলেদের মনে প্রভাব বিস্তার করত বেশি। সেসময় পরপোকারী সত্যনিষ্ঠ অত্যন্ত দয়াবান মাতৃভক্ত ঈশ্বরচন্দ্রের নামে কত গল্প যে লোকের মুখে মুখে ফিরত ! মনে হয় সে থেকেই নলিনীর (নিগমানন্দের) চিত্ত আজ এই মহৎ ব্যক্তিত্বের শিক্ষারূপ নিয়ে জগৎবরেণ্য হয়েছেন। তিনিও বেশ কয়েকখানি মূল্যবান পুস্তক রচনা করেন এবং সাহিত্য পুরস্কারও লাভ করেন। অক্ষয়কুমার দত্তের বহুল আলোচিত ‘চারুপাঠ’ নলিনীর মনে একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। অক্ষয় দত্তের প্রসিদ্ধ রচনা ‘বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধ বিচার’ পুস্তকখানি নলিনের মনে সৃষ্টি ও স্রষ্টার বিচার বিষয়ে প্রভূত দাগ কেটেছিল। দাদু বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর জীবনের প্রথম বস্তুবিচারক, বিশ্লেষক এবং জীবন দিক্‌নির্দেশক পুরোদস্তুর দার্শনিক। এসব থেকে যতদূর মনে হয়, নিগমানন্দ প্রথম জীবনে নাস্তিক থেকেও পরবর্তিতে তাঁর আস্তিকে রূপান্তর সম্পূর্ণ এক অভাবনীয় নিদর্শন– যা আমরা তাঁর জীবন-দর্শন পর্যালোচনা করলেই সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারি। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মতবাদ এখানেই প্রমাণ করে যে, তিনি একজন সুশিক্ষকের দাবিদার হিসেবে শিক্ষার অন্তর্নিহিত অর্থ যে, সদ্‌গুরুর নিকট বসে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্টিকরণ এবং গুরুশক্তিকে অন্তরে আশ্রয় দিয়ে যে গভীর প্রার্থনা ও জ্ঞানাহারোণ এই প্রাচীন শিক্ষাই ছিল তাঁর মতে প্রকৃত শিক্ষার স্বরূপ উন্মোচন।

শিক্ষার সুদূরপ্রসারী জ্ঞান একদিক থেকে বা একভাবে হয় না। বহুমুখী চিন্তা-চেতনারই ফলশ্রুতি হল প্রকৃত শিক্ষা। নিগমানন্দের শিক্ষা জীবনটি এ থেকে ব্যতিক্রম নয়। অনেক পরিবেশ পরিস্থিতির উপর নির্ভর

করেই নিগমানন্দের শিক্ষা জীবন এবং কর্মময় জীবন গড়ে উঠেছিল। সনাতন হিন্দুধর্মে এর পরেও আর একটি শাশ্বত লব্ধপ্রতিষ্ঠ উপমা আছে তাহল– প্রারব্ধ কর্মফল। শাস্ত্রে বলা আছে– 'প্রারব্ধ নিশ্চয়াৎ ভুঙক্তে'। পূর্বজন্মে যার জীবনে যে কর্মফল লিপিবদ্ধ হয়ে আছে পরবর্তিতে সেই ফল তাকে ভুগতে হবেই বা তার জীবনে ফলবতী হবেই। কারও উপায় নেই নিয়ন্ত্রণ করার। নিগমানন্দজী যে এবার এই জীবনে মানবের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের যথার্থ শিক্ষক হবেন তার নমুনা তিনি নিজেই উদ্ধৃতি স্বরূপ বলে গেছেন তাঁর বাণীতে যথা – "আমি সাধারণ মানুষ; পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি জীবন অতিক্রম করে জন্মজন্মান্তরের সাধনার পর এই জন্মে ভগবানকে লাভ করেছি, ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে"[২৯]।

জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে যখন সনাতন হিন্দু ধর্ম বহু সাধনার ফলরূপে অবগত হয়েছেন তখন উপেক্ষার প্রশ্নই ওঠেনা যে– তিনি যে শক্তিতে এবার তাঁর জীবনী-বাণীতে বলে গেলেন যে, 'আমি পূর্বজন্মে ব্রহ্মানন্দ গিরি ছিলাম' তা কখনও মিথ্যা নয়। পরা অপরা দুই শিক্ষা সম্পর্কীয় জ্ঞানই যখন একজন মানবের অন্তর্নিহিত প্রেরণা হয় তখনেই তার শিক্ষা বহুমুখী হয়।

স্বামী নিগমানন্দজীর জীবন যেদিন এই ধাঁচে গড়ে উঠল সেদিনেই তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করলেন শিক্ষার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য। শিক্ষাকে স্বামী নিগমানন্দজী এ লক্ষ্যেই একভাবে দেখেন নি তিনি শিক্ষাকে দেখেছিলেন বহুভাবে বহুমুখী রূপে। জগতে তিনি এই আন্দোলনকেই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপমা হিসেবে প্রচার করে গেছেন। কারণ বহুভাবে বহুমুখী শিক্ষার প্রসার না ঘটালে কিভাবে একজন শিক্ষার্থীর মনুষ্যত্ব জেগে উঠবে ? তাঁর প্রাণের ইচ্ছা আপামোর জনসাধারণের শিক্ষার প্রসার কিভাবে ঘটবে ? একজন শিক্ষার্থী কিভাবে স্ব-শিক্ষক হবে ?

নারীশিক্ষার প্রতি তাঁর আগ্রহ ও অনুরাগ ছিল প্রবল। বিদ্যোৎসাহী নিগমানন্দ শিক্ষক রূপে যেমন ছিলেন কঠোর তেমনি ছিলেন কমল। আশ্রমে অনাথা বিভাগে যে সকল মেয়েরা বাস করত তাদের মধ্যে যারা শিক্ষা বিরাগী তাদের মধ্যে যেমন বিমলা, সুরবালা অন্যতম। বালকদের মধ্যে কেনারাম, ঈশ্বর, ননী এবং ফণী এরা ছিল ফাঁকিবাজ। পড়া না করার অপরাধে এদেরকে অনেক মার খেতে হয়েছে। এর জন্য গোপনে ঘরে বসে

২৯। পূর্বোক্ত, স্বামী অখন্ডানন্দ সরস্বতী, **শ্রীনিগমানন্দের অমিও বাণী সম্ভার**, পৃ.,১৩

নিগমান্দকে বালিশ ভিজিয়ে কাঁদতেও দেখা গেছে। নিগমানন্দের মানস কন্যা লীলা নারায়ণী দেবীকে ঠাকুর মহারাজ চারবছর বয়স থেকেই পাঠদানে নিযুক্ত করেন। তাঁকে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ইতিহাসে অনার্স মাষ্টার্স পাশ করে সংস্কৃতে উচ্চ ডিগ্রী লাভ করান। এবং নিজের শিক্ষা শক্তিকে তার ভিতর শক্তি সঞ্চার করেন। তিনি জীবনে অনেক পুস্তক রচনা করেন এবং ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন।

অদ্যাবধি শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা সাপেক্ষে আমরা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার দুটি বিষয় সম্পর্কে দ্বিধাদ্বন্দ্বে উপস্থিত হয়েছি। প্রথমতঃ বর্তমানে প্রকৃত শিক্ষা না হচ্ছে প্রাচীন পদ্ধতির টোলে বা গুরুগৃহে, না হচ্ছে বর্তমানের সাহেবদের মনোনীত বিদ্যালয়ে। বিষয়টি ঠিক যেন এরূপ– যদি ঘরে ফিরারও পথ না থাকে আবার বাইরে পা বাড়াতেও ভয় হয়, তবে আমরা দাঁড়াই কোথায় ? আমাদের শিক্ষালয় হবে তবে কোথায় ? স্বামী নিগমানন্দজী একারণেই আপন অভিব্যক্তি প্রকাশ করে জানালেন, মূলতঃ আসল শিক্ষা টোলেতেও হয় না, বিদ্যালয়েও হয় না, আবার এ-দু'টিকে যে উপেক্ষা করব তাও ঠিক হবে না। মনে রাখতে হবে– শিক্ষার ক্ষেত্র এত সংকীর্ণ নয় যে, এর অন্য কোন উপায় নেই। যথার্থ শিক্ষার অর্থ হল আপন আত্মশক্তির উদ্বোধন। ঐশি শক্তির বিকাশ। মানুষ নিজেই নিজের শিক্ষক। প্রত্যেকের বিবেকই হল প্রতি মানুষের প্রকৃত শিক্ষক। স্বামী নিগমানন্দজী এরই নামকরণ করেছেন 'আত্মশক্তি'।

এই শক্তি কেবল বুদ্ধির সূক্ষ্মতা সম্পাদনেই ব্যয়িত হয় না– জীবনের সকল বিভাগে এর পরিচালনা করতে হয়। সুতরাং সব দিক দিয়ে যদি আমরা মানুষের মত মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারি তবেই বুঝব শিক্ষার ফল ফলেছে। মানব জীবনের মূল খুঁটি চারিটি যথা– ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। শিক্ষা হবে এই চতুর্মুখী। এই চতুর্মুখী শিক্ষা যখন চতুবর্গের সাধনাতে জীবন পূর্ণ হবে এবং যুগপৎ যে সামঞ্জস্য স্থাপন হবে– তাই হল স্বামী নিগমানন্দজীর শিক্ষা বিষয়ক মতাদর্শ। টোল বা কলেজে কতকগুলি পুস্তক মুখস্ত করে পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেলেই শিক্ষার আদর্শ পূর্ণ হলনা। অবশ্য তাতে যে কোন উপকার হয়না তা স্বামী নিগমানন্দ বলতে চাননি, তিনি বলতে চেয়েছেন শিক্ষায় যদি আত্মশক্তির উদ্বোধন জীবনে না ঘটে তবে শিক্ষা সম্পূর্ণ হলনা অপূর্ণই থেকে গেল। এছাড়াও প্রত্যেক মানুষের জীবনে কতকগুলি ব্যক্তিগত সমস্যার উদ্ভব হয়,

এবং ব্যক্তি হিসেবেই সেগুলির সমাধান প্রয়োজন পড়ে, কিন্তু আজকালকার গড়-কষা শিক্ষাতে এর যথার্থ সমাধান আজ পর্যন্ত কেউ সমাধান করতে পেরেছেন কি ? বরং একটির সমাধান টানলে আর একটি এসে উপস্থিত। অতৃপ্তি লাগাই থাকে। একটা তৃপ্তির আশায় এগিয়ে গেলে আরেকটি নতূন আকারে এসে উপস্থিত হয়।

অর্থাৎ আমাদের অপরাধটি হল, ব্যক্তির অধিকারটুকু যেমন করে বাঁচিয়ে রাখার দরকার আমরা সেইভাবে টিকিয়ে রাখতে পারি না। ব্যক্তি স্বাধীনতাকে আমরা স্বেচ্ছাচারী রূপে গড়ে তুলি বলেই স্বাধীনতার অর্থ বুঝি না। স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হল স্ব-স্বরূপে অধীন থাকা। স্বামী নিগমানন্দজী বলেছেন, 'কারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিও না।' সাথে এও বলেছেন তবে, 'স্বাধীনতা অর্থ অবশ্য স্বেচ্ছাচারিতা নয়'। মানুষকে অবশ্য তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দিতে হবে। তাকে কলমছাঁটা করে ফরমাসে সমস্ত গড়তে গেলে চলবে না। একটি নামকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কয়েকঘন্টার জন্য বুদ্ধির কসরত করলেই শিক্ষার চরম উন্নতি হল না। শিক্ষার্থীকে যতক্ষণ প্রাণের স্পর্শ প্রদান করা না হচ্ছে বা সজিব মানুষের সঙ্গ দিতে না পারছি, তার মনকে আনন্দে উদ্বেলিত করে আপন ইচ্ছায় এগিয়ে দিতে না পারছি, ততক্ষণ শিক্ষার স্বাদ থেকে সে বঞ্চিত থাকবে। কারণ তার অন্ত-রাত্মাকে যতক্ষণ না জাগ্রত করা যাচ্ছে ততক্ষণ সে নিজেকে অধীন, বুদ্ধিহীন, অক্ষম, সামর্থহীন ভাববে। বাস্তব জীবনের বারবার অপ্রত্যাশিত সংঘাতকে ঠেকিয়ে আনন্দপূর্ণ জীবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। নিগমানন্দ চেয়েছিলেন, আপন অন্তরাত্মার ঘুমন্ত শক্তিকে একজন জাগ্রত গুরুরূপী শিক্ষকের হাতের ছোঁয়ায় শিক্ষার্থীর হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে তুলতে। নিজ জীবনে তিনি যেভাবে জাগ্রত হয়েছিলেন এবং তাঁর আশ্রমের অনেক শিষ্যশিক্ষার্থীকে তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন, ঠিক সেইভাবে। শিক্ষা সম্পর্কে এই ছিল তাঁর মতবাদ।

এযুগে যদিও এটি অসম্ভব তবে যে একেবারে উপেক্ষিত তা নয়। ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে এই পদ্ধতির শিক্ষা আজও বর্তমান। হরিদ্বার, হৃষিকেষ, উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারতে এখনও গুরুগৃহে এই বেদান্ত শিক্ষা বা উপনিষদ্ বিদ্যা অনেক স্থানে প্রচলিত আছে। বাংলায় এই শিক্ষার কোন মূল্য না থাকলেও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এখনও প্রাচীন এই সংস্কৃত শাস্ত্র পড়ানোর জন্য কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে এবং এই প্রাচীন

শিক্ষা নিজের এবং অপরের কল্যাণে ভারতীয় দর্শনের এই ঘুমন্ত বিদ্যাকে নব প্রেরণায় আলোদানে আলোকিত করার প্রচেষ্টায় অব্যাহত আছে। স্বামী নিগমানন্দজী বর্তমান শিক্ষার পাশাপাশি এই প্রাচীন শিক্ষাকেও উপেক্ষা না করে বরং উৎসাহিত করে গেছেন বেশি। তাঁর শিক্ষা সম্পর্কীয় মতবাদের তাৎপর্য এখানেই সবিশেষ গুরুত্ব বহন করছে তুলনামূলক বেশি।

২.৬.৫: উপসংহার

আমরা জানি জাতীয় স্বার্থ বলতে একটি জিনিষ আছে। তাতে আত্মরক্ষার নাম করে মানুষ মানুষের বুকে ছুড়ি বসাতেও দ্বিধাবোধ করে না। জগতের সাথে কারবার করতে চাইলে অবশ্য আমাদের আত্মস্বার্থ-সংরক্ষণের দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। কিন্তু তাই বলে জাতীয় স্বার্থের জন্য আত্মরক্ষার ভাণ করে পরের টুকুও যে গ্রাস করতে হবে এমন শিক্ষা ভারতবাসী লাভ করেনি। বাঘিনী যেমন শিকার ধরবার জন্য তার সন্তানকে শিক্ষা দেয়, পাশ্চাত্য ব্যবসাদারী শিক্ষার মূলে তেমনি শিকার ধরবার সদ্ভাব আমরা শিক্ষা করি নি। আমরা শিক্ষা লাভ করেছি তোমার যা আছে তা নিঃশেষে বিলিয়ে দাও। তুমি যতই বিলাবে তোমার ততই মিলিবে। জগতের নিকট তোমার চাওয়া হোক মানুষ আর দেওয়া হোক নিঃস্বার্থ ভালবাসা। ভারতবাসী এই প্রাচীন শিক্ষানীতিকে আজও সম্মান করেন বলেই ভারত আজও শিক্ষার গুরু বলে অনেক জ্ঞানী গুণীজন আজও ভারতের জাতীয় শিক্ষা সভ্যতার ভূয়সী প্রসংশা ও মান্য করে থাকেন।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানানুশীলন। এই শিক্ষা এমন হবে যা রাষ্ট্রনীতি, বাণিজ্যনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি ইত্যাদি সকল নীতিকে পরিপূর্ণ করে। প্রাচীন অখন্ড ভারতের জাতীয় মূল শিক্ষানীতি হল পরমার্থ প্রতিষ্ঠা। পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমরা যদি আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতিকে অর্থলোলুপতার পথে প্রতিষ্ঠিত করি তবে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য যে অধ্যাত্ম শিক্ষা– যা জাতীয় শিক্ষার মেরুদন্ডরূপে প্রতিষ্ঠিত তা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। আমরা দিক্‌ভ্রষ্ট হয়ে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হব। অখন্ড ভারতে আজও অধ্যাত্মসাধনা বর্জিত শিক্ষা কখনও প্রকৃত শিক্ষার মূল বিষয়বস্তু বলে গণ্য হবে না। নিগমানন্দ চেয়েছেন শিক্ষার বিস্তার। এই শিক্ষার বিস্তার ভিন্ন ছোট বড়র মাঝে যে নিত্য অন্তর্নিহিত প্রতিহিংসা তা কোনদিন থামবে

না। শিক্ষার মাঝে যতদিন প্রাণের স্পর্শ প্রবেশ না করবে ততদিন শিক্ষার অর্থ যে মানুষের চিত্ত উদারীকরণ; তা কোনদিন সম্ভব হবে না।

বড় আর ছোটর প্রভেদ সেদিনেই মিটবে যেদিন শিক্ষা পাওয়ার জন্য ছোটরা বড়র শিক্ষা মন্দিরে উপস্থিত হবে। কিন্তু সে শিক্ষা নিতে ছোটরা কখনও বড়র নিকট উপস্থিত হবে না। কারণ তাদের সেখানে উপস্থিত হওয়ার যথেষ্ট সংকোচের কারণ আছে। কারণ ছোটরা সবসময় নিজেদের বড় ভাবে। যেহেতু আমরা আমাদের স্বভাবজাত নিয়মে অন্তর হতে কেউ কারও অধীন হয়ে চলতে পারি না বা কারও ছোট বা অধীন হয়ে থাকতেও বাধ্য হই না। এটি আমাদের স্বভাবের অনুকূল নয়। যেহেতু আমাদের অন্তরাত্মা স্বয়ং ভূমা। অতএব বড়কেই শিক্ষার স্বার্থে ছোটদের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে। তাদেরই ছোটদের সকল সুযোগ সুবিধা দান করতে হবে। কারণ প্রকৃত বড়রাই ছোট হতে পারে। তাতে তাঁরা লজ্জিত না হয়ে আনন্দিতই হন বেশি। ছোটরা আত্মহংকারী হয় বলেই নিজেকে মিথ্যা বড় ভাবে। কিন্তু তবুও তাদেরকে জাতীর স্বার্থে শিক্ষার আলো দান করতে হবে। মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে। সেবা নেওয়ার ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করে– সেবাদানের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার শিক্ষা নিতে হবে।

স্বামী নিগমানন্দজী এই শিক্ষায় সবাইকে শিক্ষিত করে তুলতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি 'নিজে আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়', এই নীতিতে অটল ছিলেন। তিনি শিক্ষার মর্যাদা এই ভাবেই জীবনভর দিয়ে গেছেন। তাঁর রচিত মহামূল্যবান 'ব্রহ্মচর্য-সাধন' পুস্তকখানি পাঠ করলেই বুঝতে পারবো তিনি শিক্ষা সম্পর্কে কি বুঝাতে চেয়েছেন। শিক্ষার জন্য তিনি প্রাচীন এবং বর্তমান উভয় শিক্ষাপথকেই সমর্থন করে গেছেন। তবে আত্মার স্বরূপজ্ঞান লাভকেই তিনি প্রতি শিক্ষার্থীর জীবন আদর্শ বলে চিহ্নিত করে গেছেন। এই শিক্ষাকেই মূল শিক্ষা বলে অভিহিত করেছেন। সদশিক্ষা বিস্তারকে মানুষের মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র উপায় বলে উল্লেখ করে গেছেন। সমাজের অবহেলিত লাঞ্ছিত নিপীড়িত অসহায় অনাথ দুস্থ অবাঞ্ছিত ঝড়ে পড়া সকল শিশুদের শিক্ষাদান করাই যে একমাত্র জাতীয় মুক্তি ও সংহতির অন্যতম একটি উপায় তিনি প্রাণভরে তা উপলব্ধি করেছিলেন। 'অনাথ নিকেতন' প্রতিষ্ঠা করে তা বুঝিয়ে গেছেন উক্ত অসহায় অনাথদের শিক্ষার জন্য

ঋষিবিদ্যালয় নামকরণে মঠে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তিতে বাংলাকে চারিভাগে ভাগ করে প্রত্যেক বিভাগে এই শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিলেন।

শিক্ষানুরাগী স্বামী নিগমানন্দজী জীবনভর যেমন আত্মোন্নতির জন্য নিজে চারজন গুরু বা শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে জীবনের সাধ্যসিদ্ধি লাভের জন্য এগিয়ে চলেছিলেন অনুরূপ অপরকেও তিনি শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃতি দ্বারা এর সত্য প্রকাশ করেছেন, যথা–

" মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।

জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোগুর্বন্তরং ব্রজেৎ।।"[৩০] –কামাখ্যাতন্ত্র, ৫/২৩ (নিরুত্তর তন্ত্র,১২/২৯)।

অর্থাৎ– 'মধুলোভে ভ্রমর যেমন এক ফুল হইতে অন্যান্য ফুলে গমন করে, তদ্রূপ জ্ঞানলুব্ধ শিষ্য নানা গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।' তোমাদের মূল লক্ষ্য হল শিক্ষালাভ। শিক্ষার জন্য তোমাদের যে গুরুর (শিক্ষকের) নিকট যে শিক্ষালাভ বা সাহায্যের প্রয়োজন তা অর্জন করা অপরাধ নয়, এটিই তাঁর বাক্যের মর্মার্থ। জ্ঞানারোহণ এমন একটি বিষয়– তা মুখস্থ করে লাভ করার বিষয় নয়, জ্ঞানলাভ হল উপলব্ধির বিষয়। দীর্ঘ সাধনার ফলে এই জ্ঞান আগে অন্তরের ভিতরে জ্যোতিরূপে জ্বলে ওঠে, ভিতরে আলোকিত করে গড়ে তুলে তবেই বাইর আলো রূপে তা প্রকাশ হয়ে ওঠে। হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যেমন একটি দিয়েশালাইয়ের কাটি-ই যথেষ্ট উদ্ভাসিত আলোর এক মুহূর্তের অপেক্ষার জন্য, তদ্রূপ অজ্ঞান অন্ধকার চিত্তে বিদ্যুৎ চমকের মত একটু জ্ঞানের জ্যোতি প্রকাশই– মনের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করাও অসম্ভব কিছু নয়। শুধু চাই সচ্চিদানন্দের এক পলকের কৃপা। এই বিদ্যা বা জ্ঞানই হল বিশ্বসৃষ্টির একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক ঈশ্বর দর্শন। ঈশ্বরকে দর্শন করাই হল মানব জীবনের বাকি যত সহায়ক শিক্ষা আছে তৎমধ্যে এই গুহ্যবিদ্যালাভ করাই হল সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যালাভ বা শিক্ষা। স্বামী নিগমানন্দজী এই বিদ্যাকে লাভ করার জন্যই সবাইকে আহ্বান রেখেছেন। ভারতীয় সনাতন ধর্মের এই শিক্ষা দান ও এই শিক্ষা ব্যবস্থাকেই জাতীয় শ্রেষ্ঠ শিক্ষা বলে অভিহিত করে গেছেন। এই বাংলা, ভারত যদি কোনদিন জাতীয় উন্নতি করতে চায় তবে ঋষি প্রণীত প্রাচীন এই অধ্যাত্ম জ্ঞান শিক্ষা ভিন্ন অন্য শিক্ষার তেমন গত্যন্তর নেই বলে স্বামী নিগমানন্দজী মনে করতেন।

৩০। স্বামী অখন্ডানন্দ সরস্বতী, **শ্রীশ্রী নিগমানন্দ গ্রন্তসম্ভার**, মেহেরপুরঃ গুরুধাম প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ১৪১৮, পৃ., ২২৫

তৃতীয় অধ্যায়

বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও নিগমানন্দের সমাজ সংস্কার বিষয়ক চিন্তা

বিবেকানন্দের সমাজ সংস্কার

৩.১ঃ ভূমিকা

আমাদের দেশ জাতি আজ এক ক্রান্তিলগ্নে উপস্থিত। আমরা প্রতি মুহূর্তে দেখছি এক পুরাতন সমাজ তার জীর্ণ প্রতিষ্ঠান সমূহ ও মূল্যবোধ নিয়ে ক্রমবলীয়ান। তার পরিবর্তে যে নতুন সমাজের রূপমন্ডল চলছে, তা সর্বাংশে সুষ্ঠু নয়। ইতিহাসের পটপরিবর্তনের এরূপ সন্ধিক্ষণে পরিস্থিতির অনিশ্চয়তার জন্য গণমানসে বিভ্রান্তি ও অস্থিরতা স্বাভাবিক। সেই জন্য এই আগ্নেয় লগ্নে চিন্তাশীল ব্যক্তি ও মানব কল্যাণ চিন্তায় যাঁরা নিযুক্ত তাঁদের দৃষ্টি খুঁজে ফিরছে সেই ক্রান্তদর্শী ঋষিকে, পুরাতন থেকে নতুনে উত্তরণ ঘটছে যার জীবনে, মননে ও চিন্তায়। অবশ্য বহু মনীষীর যৌথ মননের ফলশ্রুতিতে নতুন কালের রূপ মন্ডল ঘটে। তবুও যাঁর মধ্যে এই নতুন পূর্ণায়ত হয়ে ওঠে, তাকেই বিশেষ ভাবে সেই নতুন যুগের স্রষ্টা পুরুষ বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। যার মধ্যে এমনি করে একটি সম্পূর্ণ নতুন কাল রূপায়িত হয়ে ওঠে, তার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। সেটি হল এই যে, যে সকল মনীষীর মননের যৌথ প্রয়াস নতুন কালের রূপায়ন ঘটায় তার মধ্যে তাদের চিন্তা-রাশির সমন্বয় ঘটাতে হবে। অর্থাৎ তাকে একটি দূরূহ কাজ করতে হয়, তাকে ঐ সকল বিচিত্র চিন্তার মধ্যে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়। সেখানেই তার প্রতিভার পরিচয় মেলে। সেই সমন্বয় ও সামঞ্জস্য থেকেই পুরাতনের চৌহদ্দি থেকে চিন্তার মুক্তি ঘটে, এবং তারই ফলশ্রুতি নতুনের আবির্ভাব।

বর্তমান সময়ে আমরা নিঃসন্দেহে এ সকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী দেখি চিন্তানায়ক বিবেকানন্দজীকে। তাঁর চিন্তার গভীরে প্রবেশ করলে এ সত্য সহজেই প্রতিভাত হয়, যেমন হয়েছিল নিবেদিতার প্রজ্ঞাদৃষ্টির

সন্মুখে। নিবেদিতার সমীক্ষান্ত সিদ্ধান্ত আমাদের এই অভিহিত করে যে, “তাঁর মধ্যে অতীত ভারত ও পৃথিবীর অগণিত গুরু ও ঋষির অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা ও সিদ্ধির উত্তরাধিকারীকে আমি প্রত্যক্ষ করেছি একদিকে, অপরদিকে দেখছি তার মধ্যে ভাবী নতুন অভ্যুদয়ের এক প্রবর্তক ঋষিকে ।”[১] বিচার বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যায় যে, নিবেদিতার সিদ্ধান্ত নিছক গুরুভক্তি প্রসূত নয়। এ উক্তি একজন নিপূন সমাজ বিজ্ঞানীর বিজ্ঞান ও যুক্তি ভিত্তিক প্রজ্ঞাপ্রসূত। বিবেকানন্দের সমাজ দর্শন এই নতুন কালের সমাজ দর্শন। তার রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণা সহ অন্যান্য অনেক সামাজিক ধারণা বর্তমানের এই নতুন কালের। বস্তুতঃ বিবেকানন্দের লক্ষ্য ছিল এক আমূল রূপান্তর। আর এই রূপান্তরকে রূপ দিতেই তাঁর আবির্ভাব। বিবেকানন্দ তাঁর এই আমূল পরিবর্তনকে রূপ দিতে চেয়েছেন– সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে, আর সেখানেই তাঁর এই চিন্তা ধারার গুরুত্ব।

৩.২: সমাজ সংস্কার বলতে বিবেকানন্দ কী বোঝান?

সমাজ সংস্কার বলতে বিবেকানন্দ শুধু সমাজের দোষত্রুটি দেখেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি চেয়েছিলেন সমাজের একটি সামগ্রিক রূপের পরিবর্তন নিয়ে এসে সমাজে তা প্রতিষ্ঠা করতে। আমরা এই পরিবর্তনটিকে একটি রূপান্তরও বলতে পারি। স্বামীজি তাঁর এই ইচ্ছাটিকে যে দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে এর আমূল পরিবর্তন চেয়েছেন তাহল যথার্থ শিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞানার্জন। যা একমাত্র যথার্থ শিক্ষাই পারে একটি জাতির ভবিষ্যত নির্ধারণ করতে। উন্নতির চাবিকাঠি যেহেতু শিক্ষা; তখন কোন দেশ ও জাতির যাবতীয় সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য এই শিক্ষাই তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট।

ভারতের প্রথম সভ্যতার অভ্যুদয় হয় বৈদিক যুগে। সে যুগে নারী পুরুষের সমধিকার ছিল। কুসংস্কার ঢুকেছে বৈদিক পরবর্তী স্মৃতিযুগ, তন্ত্র যুগ, পুরাণযুগ ও মধ্যযুগে এসে। বিবেকানন্দের সমাজ সংস্কারে ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। অনেকের মতে বিবেকানন্দ ছিলেন, “হিন্দু রিভাইভ্যালিষ্ট”। সরকারী মার্কস্‌বাদীরা অর্থাৎ ভারতীয় কমনিষ্ঠ পার্টির তাত্ত্বিকেরা এই মতেরই সমর্থন

১। Sister Nivedita, **The Master as I Saw Him,** Calcutta: Udbadhan Office, 1st edition, 1977, P., 80

করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু তিনি শুধু ধর্মপ্রাণতা জাগার জন্যই যে তার সভা সমিতি ও ক্রিয়াকলাপ আমরা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যা প্রত্যক্ষ করে থাকি; শুধুই কিন্তু তা নয়।

তিনি এসছিলেন সমাজ সংস্কারের মূল ভিত্তির দৃষ্টান্ত দেখাতে। সেই ভিত্তির মূলেই যে আমরা প্রতি প্রত্যেকে, এবং সমাজের সংস্কার মূলে যে প্রকৃত অর্থে আমাদেরই অগ্রে সংস্কার প্রয়োজন– তিনি এসেছিলেন তাই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে। বাস্তবিক অর্থে তাঁকে শুধু ধর্মযাজক হিসেবে প্রতিপন্ন করলে ভুল হবে। ধর্মকে আশ্রয় করে যদিও বিবেকানন্দ নিজস্ব চিন্তাধারা প্রকাশ করেছেন, তবুও একথা অস্বীকার করা চলে না যে, তাঁর বক্তব্যের সার বস্তু কিন্তু প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদেরই অনুকূল। বেসরকারী মার্কস্‌বাদীরা বলেছেন যে, বিবেকানন্দ যে শুধু জাতীয়তার উদ্‌গাতা তাই নয়, ভারতের প্রথম সোস্যালিষ্টও বিবেকানন্দ। ডক্টর ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত ‘ডায়ালেকটিক্যাল বস্তুবাদী’। তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বিবেকানন্দের সমাজ বিষয়ক, ধর্ম বিষয়ক, সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক ও অন্যান্য মতামতের বিশ্লেষণ করেছেন। তার মতে বিবেকানন্দ patriot and prophet তদুপরি ভারতের প্রথম সোস্যালিষ্ট। ডক্টর দত্তের এই মতকে আমরা পুরোপুরি যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি। নিম্নে সমাজতন্ত্রের প্রবর্তক হিসেবে বিবেকানন্দের মতামত সমুহের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলেই বুঝতে পারব তাঁর এই মতামত সমূহ সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে কতটুক অবদান রেখেছে।

প্রথমতঃ বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন যে, ভারত বর্ষের পিছিয়ে পড়া সমাজ , অনুন্নত অর্থনীতি, জাতি সম্প্রদায়ের সংঘাত মুখর অসম সমাজ-জীবকে জীবত্বে , সসীমত্বে , আবদ্ধ রেখেছে। ধর্মের নামে আচার সর্বস্ব গোঁড়ামী, উচ্চ বর্ণের শোষণ, মূল্য বিভ্রাট, সব মিলিয়ে জীব যে ব্রহ্ম , এ সত্য স্ব-প্রকাশ হয়ে ওঠেনি। এই সত্য প্রকাশের জন্য, আত্মবিষ্কারের জন্য, সমাজের নব জন্মের প্রয়োজন। স্বামীজি সেই কাজটিই করেছিলেন। স্বামীজির কৃতিত্ব এখানেই যে, তিনি ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে বেদান্ত দর্শনের একটি মূল সূত্রকে নতুন অবস্থা ও নতুন চিন্তার সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। সেটি হল জনসাধারণই ইতিহাসের মহানায়ক।

দ্বিতীয়তঃ সমাজ সংস্কারে তাঁর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি হল– নারী মুক্তি ও নারী জাগরণ এবং জনসাধারণের উন্নতি সাধন ও মানব মুক্তির স্বপ্ন। মানবিকতাই ছিল স্বামী বিবেকানন্দ দর্শনের কেন্দ্রিয় ভাববস্তু। বেদান্ত দর্শনকেই স্বামীজি পাশ্চাত্যের মানবতাবাদীর দর্শন বলে অভিহিত করেছেন। বেদান্ত দর্শনের উদ্দেশ্যই হল উদারতা, মানবতা ও আত্মবিকাশ বা আমিত্বের প্রসার। স্বামীজি যা সূত্রাকারে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন, 'ব্যাপ্তিই মুক্তি, সংকীর্ণতায় মৃত্যু।'

তৃতীয়তঃ মানবের ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের শৃংখলকে তিনি ঘৃণা করতেন। এই শৃংখলের প্রশ্নে বলেছেন, সামাজিক ভাবে মানবতার অধিকার প্রতিষ্ঠা। দরিদ্র, অজ্ঞান, লোকাচার ও কুপমন্ডুকতার বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম। ভারতীয় মানবের তামসিক জীবনের মোহাবরণ উচ্ছেদ।

চতুর্থতঃ চেয়েছেন, সাংসারিক মায়া পাশে বন্ধন-যুক্ত মানুষ সবসময় বন্ধন-মুক্ত, কারণ আমিরূপ আত্মার বন্ধন নেই। আত্মা সর্বকালের ও সর্বক্ষণের জন্য মুক্ত তাঁর জ্ঞানে, কর্মে ও হৃদয়বৃত্তিতে। ভারতীয় সমাজে এই নববেদান্তটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই অভ্যূদয়েরই তিনি প্রত্যাশা করে গেছেন সারাজীবন ধরে। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, অজ্ঞান অশিক্ষার জন্যই মানব মিথ্যা সংকীর্ণ স্বার্থপূর্ণ কামনা বাসনায় লিপ্ত।

পঞ্চমতঃ উনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনা মুখে স্বামীজির 'পরিব্রাজক' ও 'বর্তমান ভারত' দুটি গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়। সেই গ্রন্থ দুটিতে তিনি ঐতিহাসিক প্রমাণ উপস্থাপিত করে দেখিয়েছেন যে, আগামী দিনে শূদ্র বা শ্রমিক শ্রেণীর (মার্কসীয় পরিভাষায় প্রলেতারিয়েত) অভ্যূত্থান ঘটবেই। কারণ একশ্রেণীর কিছু নামমাত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা বিভিন্ন যুগে জনগণের উপর শোষণ নির্যাতন করেই তারা নিজেদের সম্পদের পাহাড় জমিয়ে সমাজপতিরূপে সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করে আসছিলেন। তাদের আদেশই সমাজে ধর্ম নিয়ম বলে গ্রহণ করা হত। এই সমাজপতিরাই সকল সময় সমাজে কলংক ছড়িয়েছেন। স্বামীজির প্রতিবাদ ছিল এদের প্রতি। এরাই নিম্ন জাতিদের প্রাণান্ত পরিশ্রমে উৎপাদিত সম্পদ তাদের না দিয়ে বরং বঞ্চিত করে নিজেরা সম্পদশালী হয়ে গড়ে ওঠে সবসময় এদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে গেছেন। এদের নিগ্রহ করেছেন।

আলোচিত প্রসঙ্গে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, স্বামীজি একক ভাবে শুধু ধর্মগুরুই ছিলেন না, তিনি ছিলেন– একদিকে শিক্ষক, সমাজ সংস্কারক, সমাজের পতিত অসহায়দের বন্ধু, জাতি, ধর্ম, বর্ণ সংস্কারক, সমাজের ছ্যুঁৎমার্গীদের অভিশাপ, পৌরহিত্যদের মাথাব্যথা, খাদ্যাখাদ্যের বিভেদক ও খাদ্য-ছ্যুঁৎমার্গীতার সমালোচক। সবচেয়ে তার বড় অবদান হল ভারতে মানব সভ্যতার নবযুগের নববেদান্ত দান। ধর্মের দেশ ভারতবর্ষকে সাজিয়েছিলেন এক নতুন সমাজ ধর্মে। তাঁর স্বল্প জীবনে যে উন্নয়ন ভারতে তিনি দান করে গেছেন ভারত বর্ষে অতীতে ও বর্তমানে তেমন মানব আর কেউ আসেন নি। সাহিত্য শিল্প রাজনীতি দেশপ্রেম ধর্মজাগরণ ইত্যাদি কোনটিই কমতি ছিলনা তাঁর জীবনে। তাঁর বৈশিষ্ট্যই ছিল পুরাতনকে সংস্কার করে নতূনের জন্মদান। তাঁর ধ্যান ধারণা শিক্ষা চিন্তা চেতনা সব ছিল আধুনিক ভারতের জন্য এক নব দিগন্ত।

৩.৩: সমাজ সংস্কার সম্পর্কে বিবেকানন্দের মতের পর্যালোচনা

আলোচ্য বিষয়টি আলোচনার সুবিধার্থে নিম্নে সংখ্যানুক্রিমকভাবে স্বামীজির মতের সিদ্ধান্তগুলি তুলে ধরা হল–

প্রথমত: সমাজ সংস্কারে নারীজাগরণ চিন্তা: বর্তমান ভারতের ও ভবিষ্যৎ ভারতের রূপকল্পনায় স্বামীজি প্রথমেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন নারীজাতির প্রতি। ভারতের ধর্মগুরুগণ যখন সাধন পথের অন্তরায় জ্ঞানে চিরকাল নারীজাতিকে দূরে সরিয়ে রাখতেন, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ কিন্তু সচেতন ভাবে নারী জাতীর কথা চিন্তা করেছিলেন। ভারতকে জাগ্রত করতে হলে নারীশক্তিকে জাগরিত করে তুলতে হবে, এটি তিনিই একজন ধর্মগুরু হিসেবে প্রথম বুঝেছিলেন।

যে দেশে অর্ধেক নারীজাতিশক্তি বিদ্যমান সেখানে তাদের ফেলে রেখে জাতীয় উন্নতি কোনভাবেই সম্ভব নয়। ধর্মে-কর্মে-সমাজে-জাতিতে সর্বত্রই যখন নারীর প্রয়োজন তখন পুরুষের পাশাপাশি কেন তারা চলতে পারবে না। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে যখন এই চিন্তা কেউ করেনি তখন থেকেই তিনি এই চিন্তা করতেন।

বৈদিক যুগে ঋষিগণ নারীদের মর্যাদা যেমন দিয়ে এসেছেন, নারীরাও তাদের আত্মমর্যাদা আপন শক্তি দ্বারা অর্জন করে তখন পুরুষদের সমকক্ষ ছিলেন। নারীরা যে অসামান্য ত্যাগী ছিলেন তার প্রমাণ গার্গী, মৈত্রেয়ী, জাবালা, সীতা, সাবিত্রী, কুন্তি, তারা ও দয়মন্তি এঁরা কেউ পুরুষ ঋষিদের তুলনায় কম ছিলেন না। স্বামীজি চেয়েছিলেন নারী উন্নয়নে নারীদের মাতৃত্বের বিকাশ ও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠা। অন্তঃপুরে নারীর অবস্থান সমাজপতিদের বাধ্যতামূলক চিন্তা চেতনার প্রতি তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। প্রমাণ স্বামীজির লিখিত পত্রটি। যথা–

"শত শত যুগ ব্যাপি মানসিক নৈতিক ও দৈহিক অত্যাচারের কথা যাহাতে ভগবানের প্রতীমা স্বরূপ মানুষকে ভারবাহী গর্দভে এবং ভগবতীর প্রতীমা রূপা নারীকে সন্তান ধারণ করিবার দাসী স্বরূপা করিয়া ফেলিয়াছে এবং জীবন বিষময় করিয়া তুলিয়াছে।"[২] আরও লিখেছিলেন, "তোমরা যদি মেয়েদের উন্নতি করতে পার, তবে আশা আছে, নতুবা পশু জন্ম ঘুচিবে না।"[৩] আরও উল্লেখ করেছেন, " তোমাদের নারীগণকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও। তারপর তাহারাই বলিবে– কোন জাতির সংস্কার তাহাদের পক্ষে আবশ্যক।"[৪] আলোচিত উক্ত দুই একটি তথ্য থেকেই বুঝতে পারি স্বামীজি কত দূরদর্শী চিন্তা চেতনার অধিকারী ছিলেন।

দ্বিতীয়ত: তাঁর মতের পর্যালোচনায় তিনি আরেকটি বিষয়ে অনুধাবন করাতে চান, তাহল– এই মানুষের নিকট যে দেবত্ব শক্তি নিহিত আছে তাঁর বাণী প্রচার করতে হবে। সর্বকার্যে এই দেবত্ব শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। যেহেতু জগতের ধর্মগুলি এখন প্রাণহীন মিথ্যা অভিনয়ে পর্যবশিত তখন আমাদের একান্ত প্রয়োজন হল আপন আপন চরিত্র গঠন। জগৎ এখন আমাদের নিকট চায় একটি উজ্জ্বল প্রেমদীপ্ত জীবন এবং স্বার্থ শূন্যতা।

তৃতীয়ত: স্বামীজি বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষার যাদুকরী শক্তি আছে। এবং শিক্ষাই একমাত্র সকল সমস্যা সমাধানে সক্ষম হবে। কিন্তু সে শিক্ষা কেবল পাঠ্য পুস্তকের বা আক্ষরিক বিদ্যা নয়। যে শিক্ষা মনের শক্তি বাড়ায়, চরিত্র গঠন করায়, বুদ্ধির বিকাশ ঘটায়, নিজের পায়ে নিজেকে দাঁড় করাতে সক্ষম, আত্মজ্ঞানের

২। স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, **বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা,** কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ৭ম খন্ড, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৮৪, পৃ.,২৪৪
৩। ঐ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৮৩, সাল, পৃ.,৩৬৬
৪। ঐ, পৃ., ২০৫

অধিকারী করায়, স্বামীজি একেই প্রকৃত শিক্ষা বলে বুঝিয়েছেন। এই শিক্ষা নারী-পুরুষ উভয়ের প্রয়োজন। এই শিক্ষাই পারে সমাজকে জাগিয়ে তুলতে। জীবনের লক্ষ্য যে পরম সত্যলাভ তার বাস্তবতা দান করতে। সামান্য চাকুরী-বাকুরী, সমাজপতি, রাজনীতিবিদ্ ও ধনী হওয়া এবং আত্মসুখ-স্বার্থ লাভ করা, প্রকৃত শিক্ষা নয়। মানুষ হওয়ার চাবিকাঠিও নয়। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য স্বামীজির মতে সত্যলাভ । এবং আত্মোপলব্ধি সহায়ে অন্তর্নিহিত শক্তির নির্দেশ পালন।

চতুর্থতঃ সমাজ সংস্কার বৈশিষ্ট্যের মতামতের দৃষ্টিতে বর্ণ বিভাজন ও জাতিবর্ণ বিদ্বেষ; দেশ জাতির জন্য ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় অত্যন্ত একটি প্রভাবশালী দিক। উচ্চ বর্ণের সঙ্গে নিম্ন বর্ণের এবং নিম্ন বর্ণের সঙ্গে উচ্চ বর্ণের যে প্রাত্যহিক সংঘর্ষ তার নিরসন কল্পে স্বামীজির অবদান চিরস্মরণীয়। । তিনি জীবনভর উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে যে নিত্য হিংসা, বিবাদ, বিদ্রোহ ও বিদ্বেষ তা কি করে গণচেতনা ও গণজাগরণের মধ্য দিয়ে এগুলিকে দূর করা যায় এবং মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিয়ে মানুষরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায় এই মহতি চিন্তা তিনি কখনও ভুলে থাকেন নি। তিনি মানুষের কুসংস্কার কুঅভ্যাস এগুলিকে দূর করতে চেয়েছেন কিন্তু মানুষকে ঘৃণা করে নয়। যিশু যেমন বলেছিলেন, 'পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়'। কারণ প্রত্যেক জীবেই ঈশ্বর বিরাজ করছেন, তখন মানুষকে ছোট করার প্রবৃত্তি কেন ? বরং নিম্নবর্ণের উপর যে অন্যায় অত্যাচার তা তিনি সমাজের উচ্চ বর্ণ ও উচ্চবর্গের মানুষেরা যে যুগ যুগ ধরে তাদের উপর যে শাসন, শোষণ ও নির্যাতন করে এসেছেন তিনি তারই প্রতিকার কল্পে গণসচেতনতা ও গণজাগরণ সৃষ্টি করে গেছেন। এজন্য মানুষের অনেক পুরনো অন্যায় অনুপযোগী অভ্যাসকে দূর করতে অনেক সময় তীরষ্কার ও আগ্রাসী মনোভাবের বশবর্তী হতেও তিনি পিছ পা হতেন না। নতুন মতদানের বেলাতেও শতবাধা অতিক্রম করে এগিয়ে গেছেন, পশ্চাদপদ হননি কোনদিন কখনও। এমন কি সমাজের সবচেয়ে নিম্নবর্ণ হরিজন, ব্যাধ ও চন্ডালদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদেরকে সমাজে সুপতিষ্ঠিত করতে এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি। কারণ তিনি ধর্মের শেষ স্তর যে আত্মপোলব্ধি তা উপলব্ধি করেই তাঁর মতামত ও বিধান দান করেছিলেন। কখনও গায়ের জোরে নয়।

৩.৪: উপসংহার

আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে আমরা নিরুদ্বেগ চিত্তে এই বলতে চাই যে, সমাজ সংস্কারক স্বামী বিবেকানন্দজী ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন একমাত্র হিন্দু জাতি ও ধর্মের রক্ষক। ভূ-ভারতে আজ তাঁর আগমন না হলে এই জাতির অস্তিত্ব থাকতো কি না সন্দেহ।

ভারতধর্ম বলে– বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় থাকা ভাল কিন্তু জাতিভেদ নিয়ে বিদ্বেষ হিংসা ও সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতায় লিপ্ত থাকা ভারত ধর্ম কখনও উচিত মনে করে না। আপন আপন ভাবে সবাই ঠিক কেউ কারও থেকে ছোটও নয়, বড়ও নয়। আপন আপন জায়গায় সবাই সঠিক, সবাই শ্রেষ্ঠ। আমাদের শুধু একান্ত কর্তব্য হল সবাইকে উপযুক্ত সম্মান দান করা এবং আপন আপন কাজের জন্য অন্য আর সবাইকে গ্রহণ করা এবং উৎসাহ ও প্রেরণা দান করা। অধিকারভেদ রক্ষা করা। আর এটি না করে উপায়ও নেই। কারণ সব মানুষ জাতিতে এক হলেও সবার গুণ, ক্ষমতা ও যোগ্যতা এক নয়। আমাদের উচিত এজন্যই কারও উপর হিংসা না করে– সবার সাথে হাত মিলা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রকাশ করা। স্বামীজি এটাই মনে প্রাণে ভারতের কাছে চেয়েছিলেন। ভারতকে এভাবেই জাতীয়তার একাত্ম বন্ধনে আবদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। সবাইকে ভালবাসার দ্বারা আকৃষ্ট করে সমবেদনা ও একাত্মতা দ্বারা জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তার প্রমাণ আমরা তাঁর জীবন দর্শনেই পাই। স্বামীজি তাঁর সমাজ সংস্কার কার্যে প্রথম চেয়েছিলেন– সমাজের সকলকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। এরা যেন সংস্কৃত ভাষা জানতে ও শিখতে পারে। বেদ, উপনিষদ, গীতা ও ভাগবত পাঠ করে ধর্মের

সত্যটি জানতে ও বুঝতে পারে। কর্মের গুণ অনুপাতে তাদের মর্যাদা দিতে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করে জাগ্রত হতে পারে। ভারতবাসী যদি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে পরস্পরকে ভাই বলে গ্রহণ করতে না পারে তাহলে কোনদিন ভারত দাসত্বের শৃংখল মুক্ত হবে না।

স্বামীজির আত্মবিশ্বাস ছিল তাঁর কর্মযোজ্ঞে আত্মাহূতি দিলে ভারতবাসী একদিন উন্নত মস্তকে আপন গৌরবে ঘোষণা করবে ভারত সত্যিকারেই স্বাধীন হয়েছে। তাঁর গণচেতনার উদ্বোধনে শিক্ষা প্রসার কর্মের

ফলশ্রুতি একদিন প্রকাশ পাবেই। ভারতের সমাজতন্ত্রকে সাফল্যমন্ডিত করে তুলবেই। আমরা এই প্রত্যাশা রেখেই বিশ্বের সকল মানুষকে অবহিত করতে চাই– বিশ্বনন্দিত স্বামীজি মহারাজ বিশ্বধর্মসভায় উপস্থিত সকলের প্রতি ‘ My dear brother and sister ’ বলে যে আহ্বান রেখেছিলেন এবং যে কারণে ভূয়সী প্রশংসার অধিকারী হয়েছিলেন– তাঁর উদ্ভাবিত বেদান্তের আত্মার আত্মীয়তায়, পৃথিবী তা কোনদিন ভুলবে না। সনাতন ধর্মকে পৃথিবী শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে বিশ্বধর্মসভায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণকে কেউ অস্বীকার করতে পারেন নি– পারবেনও না।

পৃথিবীর বিশ্ববরেণ্য নেতৃবৃন্দ ও দেশনেতাগণ তাই তো আজ সমাজে, রাষ্ট্রে, পরিবারে সর্বত্র স্বামীজির আদর্শকে গ্রহণ ও বরণ করে দেশসেবায় নিয়োজিত হয়ে আছেন। স্বামীজির আদর্শানুসারী সেবা ধর্মকে সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ও কর্ম বলে গ্রহণ
করেছেন। বেদান্তরূপ মানব ধর্মকে পৃথিবীর সব দেশ গ্রহণ ও বরণ করে প্রজা শাসন করছেন। স্বামীজির এই আবিষ্কার পৃথিবী চিরদিন স্মরণ করবে।

৩.৫: শ্রী অরবিন্দের সমাজ সংস্কার ও একটি পর্যালোচনা

৩.৫.১: ভূমিকা

শ্রী অরবিন্দের সমস্ত জীবনটাই দেশ জাতি ও সমাজ সংস্কারে উৎসর্গীকৃত। তাঁর জন্মই হয়েছিল পরার্থে ও পরকল্যাণে। ভারতমাতাকে পরাধীনতার শৃংখল মুক্ত করাই ছিল তাঁর জীবন সাধনা ও অদম্য প্রেরণা। এই লক্ষ্যে উচ্চ শিক্ষা লাভার্থে বাল্যকালে বিলেত গমন, কাকতালীয়ভাবে বৃটিশদের জাতীয় কৃষ্টি, শিক্ষা, সভ্যতা, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, স্বভাব ও প্রকৃতি এবং তাদের জাতিসত্তার মন-মানসিকতার পরিচয় স্বাভাবিকভাবেই তাঁর জীবনে অনায়াসে করায়ত্ত হয়েছিল। অপ্রত্যাশিত এই সুযোগ থেকেই জন্মভূমিকে উদ্ধারের সূত্রপাত তাঁর মানসপটে উদিত হয়ে স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করে তুলেছিল। এটাই ছিল তাঁর নিয়তি।

শ্রী অরবিন্দ ছিলেন আগাগোড়াই প্রচার বিমুখ। আত্মপ্রচারের জন্য– কি সমাজ জীবনে, কি দেশপ্রেমে, কি রাজনীতিতে, কি যোগ-সাধনপথে, কি স্বদেশী আন্দোলনে, কি ভগবানের প্রতি আত্মনিবেদনে কোন ক্ষেত্রেই তার বাড়াবাড়ি ছিলনা। তিনি জীবনভর আত্মগোপন করে পথ চলার নীতিকেই পছন্দ করেছিলেন বেশি। নেপথ্যে থেকে তিনি দেশ জাতি ও সমাজের কল্যাণে আপন উৎসাহ, উদ্দীপনা, সাহস ও প্রতীভা যে কত ক্ষেত্রে ও কিভাবে প্রয়োগ করেছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি ছিলেন ভারতমাতার মুক্তির অগ্রদূত।

তাঁর তীক্ষ্ণ তীব্র প্রখর প্রতিভাই ছিল ভারত স্বাধীনতা কার্যে সমাজের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ ও কর্মপ্রেরণা। তিনি অসির পরিবর্তে মসিকেই বেশি পছন্দ ও গ্রহণ করেছিলেন; ভারতভূমিতে প্রাচীন আর্য কৃষ্টি সভ্যতার মত সুশৃংখল ও সুসংগঠিত একটি সমাজ উপহার দানে। তিনি পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করতে ব্যাপকভাবে রাজনীতিতে না নামলেও পিছন থেকে সর্বপ্রকার স্বদেশী আন্দোলনে যত কর্ম, যেমন– সভা, সমিতি, সিম্পোজিয়াম, পত্রপত্রিকায় গোপন সম্পাদক রূপে সম্পাদনা, অস্ত্রশিক্ষা, স্বদেশী আন্দোলনে অগ্নিময়ী ওজস্বিনী ভাষায় ক্ষুরধার সম্পন্ন লিখনী পত্র-পত্রিকা বিলিকরণ, গোপন মিটিং, কর্মী নির্ধারণ, কর্মীসংগঠন, কমিটি গঠন, কংগ্রেসে যোগদান ইত্যাদি সকল কার্যের, নেপথ্য ইন্ধনদাতা রূপে গোপনে ও নীরবে সবসময় সম্পৃক্ত ছিলেন। স্বাধীনতা সংগামীদের সাথে ছিল তাঁর গভীর অন্তর্যোগ। তাঁর উপদেশ ও নির্দেশিত পথে চলেই সংগ্রামীরা বেশি বিজয়ী এবং সুরক্ষিত থাকতো। তিনি কান্ডারীর মত সুযোগ্য হাল ধরেছিলেন বলেই– কর্মক্ষেত্রে দিক্‌বিদিক শূন্য হয়ে কাউকে পড়তে হয়নি। তাঁর এ সকল কৃতিত্বের গুণেই তিনি সবার মধ্যমনি হয়ে উঠেছিলেন।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা শ্রীঅরবিন্দকে মনে-প্রাণে ভয় করতো, তারা ভাল করেই জেনেছিলেন এই আন্দোলনের পিছনে কার হাত সম্প্রসারিত। কে অলক্ষ্যে ভারতকে সংঘবদ্ধ ও আন্দোলনমুখী হওয়ার ইন্ধন যোগাচ্ছে। কে জাতীয় প্রেরণা যোগাচ্ছে ? কার বুদ্ধির বলে তারা বারবার বিফল ও বিপর্দস্ত হচ্ছে ? কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া তাঁকে তারা কারারুদ্ধ করতে পারছিলনা। ভারতের স্বাধীনতা

আন্দোলনে দেশবাসীকে মুক্তির স্বাদ দানে কতিপয় বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া শ্রীঅরবিন্দকে সমগ্র ভারতবাসী– জাতীর পিতা মহাত্মা গান্ধিজীকে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে, মাষ্টারদা সূর্যসেনকে, স্বাধীনতা সংগ্রামী ক্ষুদিরাম বসুকে, বল্লভ ভাই পেটেল, সিষ্টার নিবেদিতা এদের মত তাঁকে কেউ তেমন গুরুত্ব সহকারে জানতো না। যতটুকু জানা দরকার ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন এদেশের স্বাধীনতার প্রধান ও প্রথম বার্তাবাহক স্বামী বিবেকানন্দজীকে শুধু গুণবান কিছু ব্যক্তিত্বগণ ছাড়া সাধারণের ভারতের স্বাধীনতার প্রতি তাঁর যে অদম্য উৎসাহ সে সম্পর্কে তেমন প্রকাশ ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ জীবনও ঠিক এর ব্যতিক্রম নয়। এর মূলেই হল কর্মের প্রকাশ্যতা থেকে হঠাৎ তাঁদের আত্মগোপন, জীবনের দিক্‌পরিবর্তন এবং পচ্ছাদ অনুসরণ এবং এসবের পিছনে যে ভগবৎ নির্দেশ ও বিশেষ কর্মপরিচিন্তন প্রত্যাদিষ্ট, সাধারণের নিকট তা থাকে অজ্ঞাত ও অপ্রকাশিত।

রাজনীতি যে প্রকৃত অর্থে ধর্মনীতি দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত; আজকের যুগে তা কেউ মানেনও না বুঝেনও না। একটি সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই যে রাজনীতি, মিথ্যা যে রাজনীতি বহির্ভূত; বর্তমান রাজনীতির কুটকৌশল তা আমল দেয় না। একারণেই বাসুদেবের নির্দেশে যে শ্রীঅরবিন্দকে রাজনীতি ছেড়ে ধর্মনীতির মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামী সাজতে হয়েছিল তা তাঁর অনুগতজনই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বুঝেছিলেন। ভারতবাসীর সর্বসাধারণের পক্ষে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। তাঁর বাণী তার প্রমাণ–

> ...এই আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, আর জাতীয়তা রাজনীতি নয়– পরন্তু একটা ধর্ম, একটা বিশ্বাস, একটা নিষ্ঠা। আজ আবার আমি সেই কথাই বলছি– কেবল অন্যভাবে। আর আমি বলি না যে, জাতিয়তা একটা বিশ্বাস, একটা ধর্ম, একটা নিষ্ঠা। আমাদের পক্ষে সনাতন ধর্মই হচ্ছে জাতীয়তা। এই হিন্দুজাতি জন্মেছিলেন সনাতন ধর্ম নিয়ে, এর সঙ্গেই সে চলে, এর সঙ্গেই সে বিকাশ লাভ করে। যখন সনাতন ধর্মের অবনতি হয় তখনই জাতির অবনতি হয়। আর যদি সনাতন ধর্মের ধ্বংস হওয়া সম্ভব হত – তা হলে সনাতন ধর্মের সঙ্গে এই জাতিটাও ধ্বংস হত। সনাতন ধর্মের, এইটিই হচ্ছে জাতীয়তা। আপনাদের নিকট এই আমার বাণী।[৫]

৫। সুশীল চন্দ্র বর্মন, **শ্রীঅরবিন্দ অনুধ্যান**, উঃ ২৪ পরগণা: শ্রী অরবিন্দ কর্মীসংঘ ট্রাষ্ট, শ্রীঅরবিন্দ সরণী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৭, পৃ., ১৮৩

শ্রীঅরবিন্দ এখানেই প্রমাণ করেছেন, ভারতের যত নীতি যেমন– সমাজ নীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি সকল নীতির মূলেই হল, ধর্মনীতি। এই ধর্মই পুণ্যভারতভূমির সমাজ সংস্কারনীতি। ধর্মভিত্তিক সমাজব্যবস্থাই হল ভারতের ঋষি প্রবর্তিত সমাজ ব্যবস্থা। চিরকাল ধরে যা আজও অব্যাহত।

৩.৫.২: সমাজ সংস্কার বলতে শ্রীঅরবিন্দ কী বুঝান?

এই পৃথিবীতে সমাজ সংস্কার বিষয়ক যত মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে তন্মোধ্যে শ্রীঅরন্দিই একমাত্র নতুন আঙ্গিকে একটি নতুন সমাজ ব্যবস্থা সর্বসাধারণে উপহার দিয়ে গেছেন। অরোভিল নগরী হল তার জীবন্ত উপহার। তাঁর মানসসৃষ্ট এই নগরী মাধম্যেই তিনি এই পৃথিবীকে তথা পৃথিবীর মানুষকে নতুন এক স্বর্গীয় দ্যুতি দান করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এই নগরী সমাজের যা চাহিদা সব মিটাবে, সব পুরণ করবে, একটি পূর্ণ সত্য ধর্মময় সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠাবে ও উঠবে।

যার কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। যেখানে না থাকবে খাওয়ার অভাব, পড়ার অভাব, না থাকবে বিবাদ, বিদ্বেষ। সমাজের সব মানুষ থাকবে সবসময় হাসিখুশি। জরা, ব্যাধি, মৃত্যু যে আঘাত মানুষ প্রতিনিয়ত ভোগ করে এবং মর্মাহত হয় পার্থিব দুঃখ কষ্টে, তা সবকিছু সবাই জ্ঞানের দ্বারা বুঝবে– এটি একটি শাশ্বত সত্য পূর্ণ সনাতন জীবনের সামান্য রূপান্তর মাত্র। আমাদের কারও মৃত্যু হয় না, আমরা সবাই এই মর্ত্যভূমিতে অমৃতের আস্বাদ লাভের জন্যই আবির্ভূত হয়েছি। এই মরজগতে আমরা যে ঋষিদের ভাষায় 'অমৃতস্যপুত্রাঃ', এই 'শৃন্বন্তু' বিশ্বে আমরা যে মৃত্যু নামক ভয়ে ভীত হই তা সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা। মৃত্যুকে আমরা চিনতে চেষ্টা করিনি বলেই এর ভয়ে ভীত হয়ে এতদিন দূরে দূরে ছিলাম। শ্রীঅরবিন্দ তাই কঠোর সাধনার দ্বারা বাসুদেবের সাথে সংযুক্ত হয়ে তাঁর ভালবাসায় তাঁকে রাজী করালেন, তুমি আর সূক্ষ্মভাবে নয়, স্থুল ও বাস্তব ভাবে– যেমন তুমি এক অদ্বিতীয় সত্য, তোমার সৃষ্ট এই বিশ্বপ্রকৃতির সকল জীব, জন্তু, মানুষ, প্রাণী এরাও সবই সত্য। সত্য হতে কখনও যেমন অসত্য সৃষ্ট হতে পারে না, তুমিও আমাদের এই মর জগতের ভিতর থেকে আমাদের অমৃতত্বকে বঞ্চিত করে রাখতে পার না। তাঁর বাণী তার প্রমাণ–

> আমার সাধনা সম্পর্কে আমার মূল বক্তব্যটা ছিল এই– আমার সাধনা আমার জন্যে নয়, তা হল পৃথিবী-চেতনার জন্যে, আলোর দিকে যাবার একটা দিক্‌নির্দেশ হিসেবে। পৃথিবী-চেতনার মধ্যে যা কিছু সম্ভব বলে আমি দেখিয়েছি– আভ্যন্তরীণ বৃদ্ধি, রূপান্তর, নতুন সব ক্ষমতার বিকাশ– এগুলি যে অন্যদের পক্ষে গুরুত্বহীন তা মোটেই নয়; এগুলি হল যা করণীয় তারি জন্য নানা পথ ও উপায় খুলে দেওয়া।[৬]

এই বাণী মাধ্যমেই তিনি প্রমাণ করেছেন, তাঁর জন্ম তাঁর নিজের জন্য হয়নি, তাঁর জন্ম হয়েছে এই দেশ জাতি ও সমাজের সকলের জন্য। সকলকে একটা সুষ্ঠু সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা দানের মাধ্যমে জীবনের গতি নির্ধারণের নিমিত্ত। আমরা এই কারণেই বলতে চাই যে,

হে জীবন পথের দিশারী ! তুমি তোমার সত্যপ্রতিষ্ঠিত স্থান থেকে আমাদেরকে সংকল্পবদ্ধ হয়ে ঋষিদের মত জানাও– 'অসতো মা সৎ গময়, তমসঃ মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যো র্মা অমৃতং গময়, আবিরাবির্ম এধি'। বল! কোন ভয় নেই, বেদবাণীর মায়াবৃত এই পৃথিবীর অসত্য থেকে তুমি আমাদের সত্যের পথ দেখাবে, মৃত্যু নামক 'তমোসঃ' বা অজ্ঞান অন্ধকার থেকে জ্যোতি বা জ্ঞানের অভী মন্ত্রে দীক্ষিত করবে, তুমি সর্বদা আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে উজ্জ্বল আলোর মত জ্বলে থেকে সারাক্ষণ তোমার আবিষ্কৃত রূপান্তরের পথ দেখাবে। আমরা যেন জানতে বুঝতে পারি– যা কিছু হচ্ছে বা ঘটছে অজ্ঞান অন্ধকাররূপ মায়া দ্বারা ঘটছে, এটি যে একটা অভিনয় বা 'খেলিছ এই বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আনমনে' কবির দার্শনিক দর্শনের দূরদৃষ্টির মত, আমরা তা যেন সর্বক্ষণ অনুভবে রাখতে পারি, কখনও যেন বিহ্বল হয়ে না পরি। তোমার দান– রূপান্তরের যে একটা নতুন সমাজ ব্যবস্থা যা তুমি পৃথিবীতে দান করতে এসেছিলে; পারি যেন তা শক্ত হাতে ধরে রাখতে।

৬। শ্রীঅরবিন্দ, **নিজের কথা,** পন্ডিচেরীঃ শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, প্রথম সংস্করণ, পুর্নমুদ্রণ, ১৯৮৩, ২০০৪, পৃ.,১৪৬

শ্রীঅরবিন্দ এই আধুনিক পৃথিবীতে আবির্ভুত হয়ে এবার প্রমাণ করে দেখিয়ে ও দেখায়ে গেলেন, সাধনায় সিদ্ধ হওয়া এক জিনিস আর বাস্তবে তার রূপদান সম্পূর্ণ আরেক জিনিস। রূপান্তরের সাধনা বৈদিক যুগ থেকেই প্রচলিত, অনেকেই তা সম্ভবও করেছেন কিন্তু বাসুদেবকে সক্রিয় ও সচল রূপে এবার তাঁরই ধরাধামকে দিব্যধামে রূপান্তরিত করার একক শক্তি ও সম্মতি তিনিই এযুগে এবার প্রথম তাঁর নিকট হতে সম্মতি আদায় করে সমাজের বুকে তা প্রতিষ্ঠা করে গেলেন।

সাবিত্রী যেমন করে সত্যবানের অকাল মৃত্যুকে ফিরিয়ে এনে নবজীবন দান করেছিলেন ঠিক তিনিও চেয়েছিলেন সেইভাবে এই পৃথিবীর রূপান্তর ঘটাতে। এরূপ একটি সমাজ ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল শ্রীঅরবিন্দের জীবন সাধনা। যা তিনি এই জীবনে অনেকটা এর অগ্রগতি দান করে গেছেন। বাকিটা বাসুদেব বলেছেন, 'অচিরেই তোমার এই স্বাদ পূর্ণ হবে। সময়ের জন্য অপেক্ষা কর, ধৈর্য ধর।'

আমাদের বিশ্বাস পৃথিবীতে যেদিন বর্তমান এই প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা রূপান্তরিত হয়ে অরবিন্দ প্রার্থীত স্বয়ং বাসুদেব প্রত্যাদিষ্ট প্রবর্তিত সমাজ ব্যবস্থা এই মর্ত্যে পূর্ণরূপে গড়ে উঠবে সেদিন এই পৃথিবী নতূন আলোয় ভরে উঠবে। দিব্যধামে রূপান্তরিত হবে। সবাই স্বর্গসুখ ভোগ করবে। অসত্য দূর হয়ে সৎ সত্য বিরাজ করবে। বর্তমান পৃথিবীর যে অমানবিক ও পাশবিক মৃত্যুরূপ হত্যাযজ্ঞ, মানুষকে মানুষ মনে না করে পশু নিধনের মত বর্বর নির্যাতন ও হত্যা করছে তা দূর হয়ে শ্রীঅরবিন্দের প্রত্যাশা পূরণ হবে আমরা অধীর আগ্রহে সে সম্পূর্ণ দিনটির জন্য অপেক্ষায় রইলাম। আর শ্রী অরবিন্দ যতটা বাস্তবায়িত করেছেন সেটি রক্ষায় সচেষ্ট রইলাম এবং যা পেয়েছি তা এগিয়ে নিয়ে চলার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলাম। আশা করি আমাদের এই সৎ সংকল্প অপূর্ণ থাকবে না। শুধু চাই– মনের রূপান্তর। মানবের মধ্যে মনুষ্যত্ব , দেবত্ব ও ঈশ্বরত্ব প্রকাশ।

৩.৫.৩: অরবিন্দের মতে সমাজ সংস্কারের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী?

ভবিষ্যত ভারতের প্রতিনিধি শ্রীঅরবিন্দ অনেক কথা মুখে না বললেও কার্যে প্রমাণ করে দেখিয়ে গেছেন, অন্ততঃ তাঁর আগমনে আমাদের এটুকু বোধ হয়েছে যে, ভারতের মানস সরোবরের প্রস্ফূটিত অরবিন্দ

আমাদের অরবিন্দ। তাঁর পাদস্পর্শে আজ সত্যযুগ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তাঁর স্পর্শে ধরণী আজ সুখমগ্না, তাঁর আবির্ভাবে বহুযুগ সঞ্চিত তমোভাব বিদূরিত হয়েছে, তিনি নিঃসন্দেহে যুগধর্ম প্রবর্তক। সত্যিকার রূপে তিনিই সমাজে একটি নতুন গতিধারা প্রবাহিত করার জন্য দুর্বার দুঃসাহসিক সাধনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন। কেউ মানুক আর নাই মানুক তিনি জেনেছিলেন, বাসুদেবের এটাই ইচ্ছা, তিনি তাঁকে দিয়ে চেতনার বিকাশের জন্য শুধু বিবর্তনেরই প্রতীক্ষা করেন নাই, বিবর্তনের পরবর্তী ধাপ যে হবে, চেতন সত্তার মধ্যে আত্মার ও অতিমানসের প্রাধান্য স্থাপন কেবল তখনেই হবে আমাদের সমাজের ভিতরকার ভগবত্তার পূর্ণ মুক্তি এবং জীবনের পূর্ণ প্রাপ্তি, এই প্রত্যাশা নিয়েই তাঁর আগমন।

নিম্নে অরবিন্দ ও তাঁর প্রাণপ্রিয় বন্ধু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, উভয় মিলে পলীসমাজ সংস্কার ও পল্লীউন্নয়ন সমিতি গঠনে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, নিম্নে তা তুলে ধরা হলঃ

> (১) গ্রামীন শিক্ষা ব্যবস্থা, (২)স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যবস্থা, (৩) সংস্কৃতির চর্চা, (৪) রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্করণ, (৫) পানীয়জল সংক্রান্ত ব্যবস্থা, (৫) কৃষি ও শিল্পের জন্য প্রশিক্ষণ, (৬) অসময়ের জন্য শষ্য সংরক্ষণ ও যথাযথ ব্যবহার, (৭) ক্ষুদ্র দেওয়ানী ও ফৌজদারী সমস্যার নিস্পত্তি ও প্রয়োজনে তা উর্ধ্বতন আদালতে প্রেরণ।' জেলার ক্ষেত্রে বলেন, (১) জেলার অধীন পল্লীসমাজগুলির কাজের তদন্ত করবেন (২) পল্লীসমাজগুলির শিক্ষার তদারক করবেন জেলার রাজধানীর শিক্ষার ভার নিবেন (৩) কৃষিকার্য ও কুটির শিল্পের যাতে উন্নতি ও প্রসার হয় তার উপায় উদ্ভাবন করবেন (৪) জেলার অধীন পল্লীসমাজগুলির স্বাস্থ্য ব্যবস্থার তদারক করবেন, পরামর্শ দেবেন ও জেলার রাজধানীর স্বাস্থ্য রক্ষার ভার নেবেন (৫) জেলার মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যবসা বানিজ্য চলতে পারে তা নির্ধারণ করে উপযুক্ত লোক দ্বারা ছোটখাট ব্যবসা চালাবেন। (৬) চাষীরা যাতে মহাজনদের দ্বারস্থ না হয়, শিল্প বাণিজ্যের জন্য অর্থের অসুবিধা না হয় তার জন্য একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করবেন (৭) জেলা ও পল্লীসমাজের কোন কার্যেই কোন সরকারী কর্মচারী না থাকেন তা দেখবেন (৯) পল্লীসমাজ ও জেলাসমাজের সমস্ত কার্য যথাযথ পরিচালনার জন্য আইন প্রণয়ন করবেন।[৭]

৭। মাধবী মিত্র, **শ্রী অরবিন্দ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন**, কলকাতাঃ শ্রী অরবিন্দ সমিতি, শ্রী অরবিন্দ ভবন, ৮, সেক্সপীয়ার সরণী, ৭১, ১ম সংস্করণ পৃ., ৬৭,৬৮

এই দুই দেশপ্রেমিক উভয়েই পল্লীসমাজ ও পল্লীসমিতির সংস্কার ও উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। উভয়ে প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর উন্নয়নকে সামগ্রীক উন্নয়ন ও স্বাধীনতা লাভের অপরিহার্য শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। উভয়েই নিম্নশ্রেণীর মানুষ ও তথাকথিত সধারণ মানুষের অবস্থার উন্নয়ন, তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ ছাড়া যে সমাজ সংস্কার আসবে না তা তাঁরা উভয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। আধুনিক অর্থে যে তাঁরা সমাজতন্ত্রবাদী এ কথা বলা উচিত হবে না। বরং তাঁদের বুদ্ধি প্রজ্ঞায় সেই সন্ধিক্ষণে তখন যে চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটেছিল এই ক্রমানুগগুলি তারই বহিপ্রকাশ মাত্র। শ্রী অরবিন্দ মনে করতেন, সমাজতন্ত্র কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং হওয়া চাই সামগ্রিকভাবে অর্থাৎ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে, তবেই আসতে পারে জাতীয় সমৃদ্ধি। নচেৎ সমাজের মুক্তি নেই।

শ্রীঅরবিন্দ, তাঁর 'কর্মযোগীন্' ও 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকাতে নিম্নলিখিত যে সকল কর্মসূচীগুলি তুলে ধরেছেন তাহল– দেশের সমাজ ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত ও সুদৃঢ় করতে চাইলে চাই – প্রথমতঃ আত্মনির্ভরশীল হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে অসহযোগের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে সক্রিয় করা। দ্বিতীয় হল– সরকারের নীতির প্রতি সংযতভাবে উদাসীন থাকা। তৃতীয় হল– মধ্যপন্থীদের সাথে সম্ভাব্য বোঝাপড়ার মাধ্যমে অখন্ড কংগ্রেসের পুনর্বিন্যাস করা। চতুর্থত– সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে বিদেশী পণ্যদ্রব্য বর্জনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বর্জন নীতিকে ফলপ্রসূ করা। পঞ্চম হল– জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাদেশিক সংগঠন, এমন কী সর্বভারতীয় সংগঠন গড়ে তোলা।

শ্রীঅরবিন্দের উপরোক্ত দূরদর্শিতা পর্যবেক্ষণ করলে এই প্রতীয়মান হয় যে, একজন যথার্থ মানুষ হতে চাইলে কত গুণের আধার রূপে আত্মগঠন করতে হয়। আর এমন মানুষের মাঝেই অতিমানুষের আবির্ভাব পরিলক্ষিত হওয়ার সুযোগ তাঁর কৃপাতে এমনিতেই হয়। আর তখনই নেমে আসে প্রকৃত অর্থে দেশ জাতি ও সমাজের উন্নয়ন। রূপান্তর বলতে শ্রী অরবিন্দ একেই প্রতিপন্ন করেছেন। হঠাৎ করে আমূল পরিবর্তন কখনও

রূপান্তর নয়, বরং চেতনার ধাপে ধাপে অগ্রগতির পরির্তনই হল প্রকৃত রূপান্তর। এই রূপান্তর তিনি যেমন চেয়েছিলেন আধ্যাত্মিকতায়, তেমনি সামাজিকতা ও রাজনীতিতেও।

৩.৫.৪: সমাজ সংস্কার সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের মতবাদের পর্যালোচনা

সমাজ সংস্কার ও উন্নয়ন সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের মতবাদ হল– তিনি সামাজিক কর্তব্যের প্রতি যতটা জোর না দিয়েছেন ততধিক জোর দিয়েছেন, আধ্যাত্মিকতার সাথে সামাজিক উন্নয়নের প্রতি। যেহেতু ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ, ধর্মই এখানকার জাতিসত্তা। আমরা যেহেতু আর্যজাতীর বংশধর, আমরা আর্য শিক্ষা নীতির অধিকারী। আর্য শিক্ষার মূল হল যখন জ্ঞান, ভক্তি, ও নিষ্কাম কর্ম এবং উদারতা, ত্যাগ, প্রেম, সাহস, শক্তি, বিনয় এবং মানবজাতিকে জ্ঞান বিতরণ করা, জগতে উদার নিষ্কলঙ্ক আদর্শ দান করা, তখন সমাজে প্রকৃত উন্নতি ও সংস্কার চাইতে গেলে প্রথমেই চাই ভারতের জাতীয় ধর্মভিত্তিক চিন্তা চেতনার উন্মেষ ঘটানো। তবেই ভারতবাসীর প্রকৃত সমাজ সংস্কার সম্ভব। তিনি ঠিক সেভাবেই এর বাস্তবায়ন দান করেছিলেন। আধুনিক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিত্ব পরায়ণ ব্যক্তি হয়েও কোন আধুনিকতার প্রতি অত্যাগ্রহ না দেখায়ে যেভাবে প্রাচীন ভারতীয় সমাজনীতির অনুরণন করে গেছেন তা বাস্তবতার অনেক উর্ধ্বে এক অসাধ্য সাধন। যা বর্তমান যুগে আজ পর্যন্ত কেউ এমন করে অগ্রসর হননি। এখানেই তাঁর বিশেষত্ব আমার মতে বিশেষভাবে প্রকাশলাভ ঘটেছে বলে আমি মনে করি।

সময়টা উনবিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশক ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসন একশো বছর পার হয়ে সম্ভবত দু'শো বছরের দিকে ধাবমান। ভারতের সামগ্রিক জাগরণের তখনও অনেক বিলম্ব। সমাজে তখনও কোথাও কোথাও জাত পাতের প্রতিহিংসা, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিদ্বেষ, ছুঁৎমার্গের সাম্প্রদায়িক প্রতিবন্ধকতা, শিক্ষার অভাব, সেবার নামে দারিদ্রতার মুখোমুখী পরিত্রাণপরায়ণ ব্যক্তিবর্গের সাহায্যের পরিবর্তে খ্রিষ্ট ধর্মে ধর্মান্তর, অফিসে আদালতে বাঙালী কর্মচারীদের উপর সন্দেহ প্রবণতা এবং শাসন কার্যে আইনের একপক্ষ অন্যায় অবিচার, ভারতবাসী যাতে সামাজিকভাবে সুশিক্ষায় সুনীতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে না পারে, সামাজিক উন্নয়নে

পরমুখাপেক্ষি হয়ে আজীবন বাস করে– ইত্যাদি নানা সমস্যায় জর্জরিত ভারতবাসী যখন মনে প্রাণে পরিত্রাণ চান তখনেই সেই নিষ্পেষণ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কিছু বুদ্ধিজীবি ব্যক্তিত্ববান ব্যক্তিদের স্বাধীনতার গোপন আন্দোলন ধীরে-ধীরে প্রসার লাভ করতে থাকে। সমাজে পরিবারে তখন সবার এক চিন্তা এক চেতনা, চাই– জাতীয় মুক্তি ও পূর্ণ স্বাধীনতা। শ্রী অরবিন্দ ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন।

১৮৯৩ সালে শ্রীঅরবিন্দ যখন ভারতভূমিতে পদার্পণ করলেন তাঁর অন্তর তখন থেকে দেশকে পরাধীনতার শৃংখল থেকে মুক্তি দিতে তিনি তাঁর যোগ্যতা দিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনে সোচ্চার হয়ে উঠার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করলেন। তিনি তখন বরোদায় চাকুরীরত। সময়ের ফাঁকে ভারতবর্ষের পারিবারিক, সামাজিক ও গ্রামীন জনজীবনের পারিপার্শ্বিক ও ব্যবহারিক জীবন ব্যবস্থা, ভারতবাসীকে অজ্ঞতায় ডুবে রাখা, স্বদেশ চেতনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা, সামাজিক উন্নতির উত্তরণকে প্রতিহত করা– বৃটিশদের ছিল তখন ভারতকে তাদের আপন কবলে কুক্ষিগত করে রাখার নানামুখী এরূপ জল্পনা।

এই সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় স্বরূপ তিনি সামাজিকভাবে নিম্নলিখিত উপায়গুলিকে চিহ্নিত করেন। যথা–

> (১)" জনসংখ্যা ও কাজের সুবিধার্থে কতকগুলি গ্রামকে নিয়ে একটি গ্রাম সমাজ প্রতিষ্ঠা, (২) ষোল বছরের যুবক থেকে বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকবেন এবং তারা পাঁচজন ব্যক্তিকে নির্বাচন করবেন, যাঁদের উপর গ্রামের সামগ্রিক কল্যাণের ভার ন্যস্ত থাকবে। (৩) আমাদের শিক্ষার অভিমান আপামর জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের একটা অনভিপ্রেত ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। শিক্ষা প্রণালীর পরিবর্তনই নব্য সংস্কৃতির জন্ম দিতে সক্ষম। (৪) তাঁর ধারণা ছিল দেশের সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ যদি স্বাধীনতা আন্দোলনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অগ্রসর না হয় তাহলে জাতীয় উন্নতি সফল হওয়া অসম্ভব।"[৮]

৮। ঐ, পৃ., ৬৭,৬৮

তিনি এরূপ নানা অভিমত প্রদান করে ভারতের জাতীয় মুক্তির আন্দোলনে সহায়ক হতে তৎপর ছিলেন। তাঁর আলোচিত মতবাদগুলিকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। নিম্ন সাধারণ শ্রেণীর মানুষের অবস্থার উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধি ছাড়া যে দেশের উন্নতি সম্ভব নয় তা তিনি মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন। শিক্ষায়-দীক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, নীতি-নির্ধারণে ও আধ্যাত্মিকতাতেই যে সমাজ সংস্কার ও এর প্রকৃত উন্নতি একমাত্র সম্ভব; তার প্রমাণ তিনি নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে ও দেখায়ে গেছেন। অহিংস সত্য বিপ্লবী আন্দোলন যে একটি অসাধারণ আন্দোলন এবং এর মাধ্যমেও যে দেশের স্বাধীনতা ও সমাজের উন্নতি সম্ভব এবিষয়ে তিনি এক নবদিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়ে নবপ্রেরণা জাতিকে দান করেছেন। এখানেই তাঁর মতবাদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার প্রতিও ছিল তাঁর এক নতুন মতাদর্শ। মহাত্মা গান্ধিজী যেমন বলেছিলেন, ‘হিন্দু মুসলিম মেরে দুনো আঁখি’। শ্রীঅরবিন্দের চিত্তেও ছিল সেই সম্প্রীতির আন্তরিক অভিব্যক্তি। শ্রীঅরবিন্দের অসামান্য চারিত্রিক শক্তি ছিল– তিনি যে কোন পরিস্থিতিতে স্থিতধী। মোটেই আবেগ তাড়িত ছিলেন না। যেকোন প্রসঙ্গেই তিনি সমস্যার একেবারে মূলটির সন্ধান করতেন। তাৎক্ষণিক প্রয়োজনেও কখনও অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত নিতে তাঁকে দেখা যায়নি। তিনি দেশ জাতি ও সমাজের উন্নয়নে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন শিক্ষার প্রতি। শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই তিনি তাঁর অভাবনীয় মতাদর্শ প্রকাশ করে গেছেন। স্বদেশি যুগেও ছাত্র, সমাজের সাধারণ মানুষ, সংগ্রামী ও বিপ্লবী সবাইকে একটি নিখুঁত আধার হিসেবে গড়ে তুলতে সর্বদা প্রয়াসী ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ যে মতাদর্শকে মূল্যদান করে গেছেন আমরা আজও তার ধারে কাছে অগ্রসর হতে পারিনি। তিনি সব কিছুর রূপান্তর দেখতে চেয়েছেন। ভারতের সমাজ ব্যবস্থাও তা থেকে ভিন্ন নয়। এই রূপান্তরটি হল– প্রাচীনকে উচ্ছেদ ও উপেক্ষা না করে ধাপে ধাপে তার ক্রমবর্ধমান উন্নতি । আজকের সংস্কৃতি, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি ও পারস্পারিক সম্পর্ক থেকে আমরা যেসব মূল্যবান বস্তুগুলি হারিয়ে ফেলেছি তাহল– শান্তি, আনন্দ, প্রেম, মানসিক ঐক্য ও আত্মিক অনুভূতি। আমার মতে বোধ করি– আমাদের একটু অবসর প্রয়োজন আজ সেদিকে ফিরে তাকাবার।

সমাজের প্রতি শ্রীঅরবিন্দের শেষ স্বপ্নটি ছিল– "বিবর্তনের পর্যায়ে আরও একধাপ এগিয়ে যাওয়া। এতে মানুষ এক উচ্চতর ও বৃহত্তর চেতনার স্তরে গিয়ে উঠবে। অতঃপর চিন্তাবৃত্তির উন্মেষের সময় থেকেই যে সব সমস্যা নিয়ে এতকাল সে বিমূঢ় ও বিপর্যস্ত হচ্ছিল তার একটা সমুচিত সমাধান করতে শুরু করবে, আর এবার সে ব্যক্তিগত পরমোৎকর্ষের ও সমাজগত সংহতির স্বপ্ন দেখবে।"[৯] শ্রী অরবিন্দের জাতীয় বিপ্লবটিই এক অর্থে সমাজ সংস্কার ও সমাজ উন্নয়ন। দেশ যদি পরাধীন থাকে সেখানে নিজেদের কোন অস্তিত্ব বা স্বাধীনতা থাকে না। নিজের মত করে নিজ দেশের জাতি সমাজ সত্তা কৃষ্টি সভ্যতা নীতি আদর্শ কোনকিছুই টিকে না। তাই তিনি দৃঢ়স্বরে ব্যক্ত করে জানালেন, " আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না। জ্ঞানের বল।"[১০]

আর্যশাস্ত্রে ব্রহ্মতেজ ও ক্ষাত্রতেজ বলতে দুটি কথা আছে। যথা ব্রহ্মশক্তি ও বাহুশক্তি। শত্রুকে জয় যেমন দুইভাবে করা যায় এক– বাহু বল, নয়– আধ্যাত্মিক বল। শ্রী অরবিন্দ এখানে অধ্যাত্ম বলকেই বেছে নিয়েছিলেন। তিনি যা কিছু করেছেন ভগবানের বলকে সম্বল করেই জাতির মুক্তি আন্দেলনে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। বাসুদেবের গীতায় অজুর্নের প্রতি আদেশের মত,' হে অর্জুন তুমি নিমিত্ত মাত্র, যা কিছু করার তা আমি পূর্বেই করেছি।' একথার প্রমাণ দেখিয়েছিলেন, তাঁর বিশ্বরূপ দর্শনের মাধ্যমে।

শ্রীঅরবিন্দের জীবন চেতনার প্রকাশ ছিল তিনটি সংস্কৃতি নিয়ে। প্রথমটি ছিল–এক সৃজনক্ষম আত্ম প্রকাশের এবং উদার সৌন্দর্যবোধের দিক; বুদ্ধি ও কল্পনার দিক, দ্বিতীয়টি ছিল– চিন্তার দিক, আদর্শের দিক, উর্ধ্বমুখী এষণা এবং অন্তরাত্মার অভীপ্সার দিক। তৃতীয়টি ছিল– বাস্তব করিৎকর্মের এবং স্থুলের দিক। এই তিনটি দিকের মধ্যে প্রথমটি হল ধর্ম ও দর্শন নিয়ে, শিল্প কাব্য সাহিত্য দ্বিতীয়টি নিয়ে। সমাজ ও রাজনীতি তৃতীয়টি নিয়ে। কিন্ত ভারতবাসীর জীবন, সংস্কৃতি ও সমাজিক আদর্শসমূহের মূলভাবটি ছিল তাঁর সত্তার অন্বেষণ। শ্রী অরবিন্দ সমাজ সংস্কার আর পাঁচ জনের মত ছিলনা। আমাদের যৌবনে, আমাদের জাগরণ-লগ্নে, আমাদের আশা-আকাঙ্খা ভয়-ভাবনায়, আমাদের উন্মীলিত চেতনায়, আমরা দেখেছি, মহাত্মা গান্ধি মহারাজকে, দেখেছি দেশবন্ধুকে, সুভাষচন্দ্র ও পন্ডিত নেহেরুকে, আমরা শুনেছি সত্যাগ্রহের বাণী, অহিংসার

৯। ঐ, পৃ.,৯৬
১০। ঐ, পৃ., ৫৮

বাণী, অসহযোগের নিরুপদ্রব সংহিতা, কংগ্রেসের বিজয় দুন্দুভি আমাদের যৌবন, কংগ্রেসের যৌবন। আমাদের বাস্তবতা কংগ্রেসের বাস্তবতা। একটা সম্পূর্ণ নতুন সংগ্রামের মধ্যে, নতুন চেতনার মধ্যে তাঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে ভারতবাসীর জন্য একটা নব চেতনা। সমাজ সংস্কারে তাঁর চিন্তা চেতনা ছিল– অতি দুর্জ্ঞেয়, তিনি সমাজ সংস্কার চেয়েছেন, এক অভিনব উপায়ে। ব্যক্তির একক শক্তি সহায়ে নয়, মহাসত্যের এক দিব্য প্রকাশ মাধ্যমে। যে মানুষ এসেছে ভগবানের দূত হয়ে, যে মানুষ এসেছে মৃত্যু ও বেদনার বন্ধন থেকে এই অধপতিত সমাজকে জাগিয়ে তুলতে তাঁরই শক্তি সহায়ে।

৩.৫.৫: উপসংহার

শ্রীঅরবিন্দের জীবন শুরু হয়েছিল, যেমন রোগ সারে শক্তির গুণে, ওষুধ তার যন্ত্র মাত্র। ঠিক তেমনিভাবে এক অতিমানস সত্তার অস্বাভাবিক আকস্মিক দিব্য শক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটে– তাঁর জীবনকে ঢেলে সাজিয়েছিল এক নব চেতনার দিব্য যন্ত্ররূপে। যন্ত্রীই যে যন্ত্রকে বাজায়, যন্ত্র যে নিজে বাজে না, প্রতিটি যোগ্যআধারে মহামানবের জীবন যে এর এক জীবন্ত প্রমাণ দাঁড় করায়; একটু গভীরে প্রবেশ করলেই বুঝতে পারি, যেমন– বিচার ও স্বজ্ঞা আলাদা মনে হলেও মূলতঃ এক সত্তারই বিকাশ, একই বৃন্তে যেমন দুটি ফুল ফুটা, হাতের এপিট ওপিট যেমন এক হাতেরই বহিঃপ্রকাশ, অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি এক আগুনেরই আত্মপ্রকাশ, এসব অস্বাভাবিক মনে হলেও উপেক্ষার উপায় নেই। কারণ সত্য স্বয়ং প্রকাশ। যেমন সূর্যকে প্রকাশের কোন মাধ্যম লাগে না, এটাই বাস্তব স্বাভাবিকতা। তদ্রূপ “একং বহুস্যাম” বেদবাণী তার উপলব্ধি ও বিচার এখানে পরস্পর বিরুদ্ধ মনে হলেও আলোচিত মহামনীষীগণ যেমন– রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শংকর, যীষু, মোহাম্মদ, গৌরাঙ্গ, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও শ্রীনিগমানন্দ সকলের জীবনে সাক্ষাত সত্য রূপলাভ ঘটিয়ে প্রমাণ দান করে সেই দিব্য সত্য আজও অক্ষয় অমর হয়ে আছেন। বিচারবাদীরা আজ পর্যন্ত কেউ এমন করে এর বিপক্ষে যেমন নতুন কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারেন নি, তবে মতবাদ প্রকাশ করেছেন প্রচুর; কিন্তু

তাঁদের উপলব্ধ সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ বলে প্রমাণিত করে আলাদা নতুন সত্যের নতুন কোন বাস্তব ও জীবন্ত দর্শন দান করতে কেউ আজ পর্যন্ত কোন সঠিক সন্ধান দিতে পেরেছেন বলে আমি জানি না।

শ্রীঅরবিন্দ জীবনের বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য হল, তাঁর মত আধুনিক যুগের অন্যতম শিক্ষিত যুক্তিবাদী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুক্তি বিশ্লেষক দার্শনিক এবং নবযুগের একজন শ্রেষ্ঠ পূরধা ও প্রতিভাবান হয়েও তিনি ভারতের ক্রান্তদর্শী ঋষিদের চূড়ান্ত অবদান আত্মার অনুভূতিকে অস্বীকার করতে পারেননি। বরং তিনি এর স্বপক্ষে অবদান রেখে জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন এই মর্মে যে, সেই দিব্যজ্ঞানকে নতুন যুগের উপযোগী পূর্বক আরও নতুন আধ্যাত্মিক সত্যে সমৃদ্ধ করে– কি করে আরও অতুলনীয় এক সাহিত্য সম্পদে পর্যাপ্তরূপে প্রস্ফূটিত ও দীপ্তিদায়ক করে তুলা যায়; এই ধরার ধরণীতে তারই এক নতুন দূরদৃষ্টির রূপান্তর দান করে গেলেন। নিম্নে দুইজন কৃর্তিমান গুণীমনীষীর দৃষ্টান্ত মাধ্যমেই বুঝতে পারবো তারা ভারতের অধ্যাত্ম সত্যকে কিরূপ মূল্যদান করেছেন, এবং শ্রী অরবিন্দ তাঁদের চেখে কি ছিলেন ?

> জার্মান পন্ডিত অটো উলফ ও চার্লস মূর বলেছেন, "কেবল ভারতবাসীই নয়, সকলেই দেখতে পেলে যে শ্রী অরবিন্দ মানবচিন্তার ক্ষেত্রে সেই প্রাচীন বেদের কাল থেকে এখনকার কালের মধ্যে যে অনুপম সেতু রচনা করেছেন তাতে মানব চেতনা তার সাধারণ সীমা অতিক্রম করেছে।" চার্লস্ মূর বলেছেন, " এই গ্রন্থে প্রাচ্যের অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে পাশ্চাত্যের অন্তর্দৃষ্টির চরমরূপেই সন্মেলন ঘটেছে, এবং প্রাচ্যের প্রজ্ঞা ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানের অপরিহার্য সংশ্লেষণের ফলে যে আদর্শবাদ ও আধ্যাত্মিকতা মিলিয়ে কী দাঁড়াবে তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।"[১১]

পরিশেষে আমি আমার অভিসন্দর্ভে যতটুকু শ্রীঅরবিন্দ কথা উপস্থাপন করেছি তা অতি সামান্য , নগন্য বললেও অত্যুক্তি হবে না। কারণ তিনি একজন অসম্ভব অসাধারণ মহাগুণী মহামানব। মানব জাতির ভবিষ্যত পরিবর্তন তাঁর অন্তর্নিহিত দূরদৃষ্টি ও বিবর্তন প্রক্রিয়া কোন উদ্দেশ্য অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে, এর ভবিষ্যত পরিণতি কি ও এই প্রক্রিয়ায় মানবের ভূমিকা কি হওয়া উচিত এই বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ মানবজাতির সম্মুখে তাঁর সুনির্দিষ্ট অভিমত রেখে গিয়েছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং আন্তর্জাতিক নামী দামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাঁর লব্ধপ্রতিষ্ঠ এই দর্শনকে গ্রহণ করে যে নব চিন্তা ও চেতনার

১১। পুর্বোক্ত, নারায়ণ প্রসাদ, **শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম জীবন কথা**, পৃ., ১৫৮

দিশারী হয়েছেন এবং জীবন ধন্য করেছেন; তা বলে কারও মত পথকে ছোট বা কারও প্রতি অসম্মান করতে চাই না। তাঁর 'দিব্যজীবন' রচনা জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম সম্পর্কে যে নতুন চেতনার একটি উন্নত ধারণা, তা এ যুগের মানবের জন্য একটি নতুন পথের নবযাত্রা ও দিশা বলে আমি মনে করি। সত্য সনাতন যে চির নবীন ও চিরনতুন তাঁর যে কখনও পুরানা হয়না বরং যত তাঁকে নিয়ে আলোচনা করা হয় ততই তাঁর গুণাবলী নব আকারে প্রস্ফূটিত ও বর্ধিত হয়। শ্রী অরবিন্দ জীবন, দর্শন, চিন্তা, চেতনা, আদর্শ ও অনুভূতি সম্পর্কে এই মর্মে বলা অসঙ্গত হবে না যে, এ সবই নবদিগন্তের এটি এক নব রূপায়ন যেন 'শেষ হয়েও হলনা শেষ', এই অভিব্যক্তি।

৩.৬: স্বামী নিগমানন্দের সমাজ সংস্কার ও একটি পর্যালোচনা

৩.৬.১: ভূমিকা

সমাজ সংস্কার বলতে আমরা সাধারণ অর্থে বুঝি– সমাজ শুদ্ধিকরণ বা সমাজ উন্নয়ন। অর্থাৎ সমাজের যত অপসংস্কার, কুসংস্কার ও ভ্রান্তসিদ্ধান্ত এবং দীর্ঘদিনের বিচারহীন আচার এবং উদ্দেশ্যহীন নিষ্ঠা ইত্যাদি সবছিকে দূরীকরণ পূর্বক সমাজে একটি সুস্থ্য, সুন্দর, স্থির ও স্থায়ী জীবন দান করাই হল প্রকৃত সমাজ সংস্কার। স্বামী নিগমানন্দজীর সমাজ সংস্কারের সারসংক্ষেপ আলোচিত দিক্‌নির্ণেয়ের আলোচনা এখানে যেমন এই লক্ষ্যে প্রাধান্যলাভ করেছে সাথে একটু ব্যতিক্রমধর্মী চিন্তার রূপরেখাও এই আলোচিত অধ্যায়ে অনুপ্রবেশ করেছে।

আজ হতে শতবর্ষ পূর্বে– যখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ডামাডোলে সমগ্র পূর্বভারত উত্তাল হয়ে উঠেছিল বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু, শহীদ প্রফুল্ল চন্দ্র চাকী প্রমুখ কিশোর যুবকগণের আত্মবিসর্জনে পরাধীন ভারতের তামসিকতার মোহনিন্দ্রা ভেঙ্গে গিয়েছে, যে সময় ইয়োরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রসদ সংগ্রহ হচ্ছে, সে সময় ত্রিপুরা রাজ্যের কুমিল্লা দুর্গাপুর আশ্রমে ধ্যানমগ্ন এক বীর সিদ্ধসাধক স্বামী নিগমানন্দজী ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক নবজাগরণের মাধ্যমে– দেশ, জাতি ও সমাজের অপসংস্কৃতিকে দূরীভূত করে– কিভাবে সমাজের প্রভূত কল্যাণ ও উন্নয়ন ঘটা যায়– স্বামী নিগমানন্দজী আর্যভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ভারতের সামাজিক

অপসংস্কৃতিগুলি আধ্যাত্মিকতার ত্যাগরূপ মহিমা শক্তি দ্বারা বিদূরিত করতে– তাঁর মানস পটে ভেসে উঠে এই ভারত ভূমিতে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ চিন্তা। "আর্যদর্পণ" নাম দিয়ে উক্ত পত্রিকা মাধ্যমে তিনি প্রচার করতে শুরু করেন যে, ভারতবাসী যদি সত্যিকার স্বাধীনতার মুক্তি চায়, সামাজিক অপসংস্কৃতি থেকে বেরুতে চায়, আনন্দের প্রবাহিকা সুবাতাস রূপে দেশ জাতির মাঝে বহাতে চায়, তবে ভারতের জাতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা যে অধ্যাত্মবাদ তার মাধ্যমেই জাতীর উন্নয়নে ব্রতী হতে হবে এবং সমাজের কুসংস্কার দূর করতে হবে। স্বামী নিগমানন্দের অভাবনীয় কীর্তি এই আর্যদর্পণ পত্রিকাটি তারই একটি সহায়ক উপাদান শক্তি হিসেবে সাহায্য করেছে বলে আমার বিশ্বাস। স্বামী নিগমানন্দজীর সমাজ সংস্কার বিষয়ক দূরদর্শিতার এটি একটি নব উদ্ভাবন দিক। মানুষকে অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে চাইলে শিক্ষার প্রসার লাভ অবশ্য আবশ্যক। স্বামী নিগমানন্দজী একারণেই সমাজের অপসংস্কৃতির সংস্কার নিমিত্ত ঘরে ঘরে একটি করে দর্পন পাঠাতে লাগলেন। ভারতের ঘুণে ধরা সমাজের ছবিটি যেন তারা ঘরে বসেই এই পত্রিকারূপ দর্পন মাধ্যমে দেখতে পান এবং প্রকৃত উন্নতির পথ খুঁজে পান।

ঠাকুর নিগমানন্দ বুঝেছিলেন, ত্যাগই হল একটি জাতীর সামাজিক উন্নতির এবং আধ্যাত্মিক সচেতনতা সৃষ্টির মূল চাবিকাঠি। যে জাতি যত ত্যাগী তার উন্নতি তত বেশি। ত্যাগ ও শিক্ষা ছাড়া সমাজের অবহেলিত নিরক্ষর এবং অন্ধ তামসিকতায় পরিপূর্ণ কোন জাতিকে উন্নতির পথ দেখনো সম্ভব নয়। ভারতের জাতীর পিতা মহাত্মা গান্ধীজী তার উপযুক্ত প্রমাণ। তাঁর কি পরিমাণ ত্যাগ সহিষ্ণুতা অসহযোগ আন্দোলন জন্য আত্মনির্ভরশীল রূপে জাতিকে আত্মগঠন করে তুলা– যার প্রাপ্তি ফল; ভারতের বৃটিশ বেনিয়াদের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়ে আসা– একটি অভাবনীয় অসাধ্য কাজ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারা যায় না।

অনুরূপ ফলের আশা ত্যাগ করে– কর্তব্য কর্মকে আদর্শ করে, এবং সেই কর্মকে জীবনের দায়িত্বরূপে বরণ পূর্বক কি পরিমাণ সমাজের কল্যাণ সাধন করা যায় স্বামী নিগমানন্দজীর মহামূল্যবান জীবনাদর্শ – তার জীবন্ত ও জ্বলন্ত প্রমাণ। তাঁর স্বরচিত মহামূল্যবান পাঁচখানি গ্রন্থ এবং প্রথম জীবনে আর্য-দর্পনের সম্পাদক থাকা কালীন সময়ে নানাবিষয়ে নানাবিধ স্ব-বীরোচিত জ্ঞানগর্ভ লিখনীগুলি তার উপযুক্ত প্রমাণ বহন করে–

তিনি সমাজের কল্যাণে কি পরিমাণ সহায়তা দান করেছিলেন । সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত কিভাবে শতাধিক বৎসর ধরে বিজ্ঞাপন বিহীন এই পত্রিকাটিকে মাধ্যম করে সমাজের কুসংস্কার দূরিকরণে সহায়তা দান করে আসছেন তা পাঠ করলেই আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারি । তিনি ধর্মের নামে ভন্ডামীগুলি কিভাবে তাঁর লিখনী মাধ্যমে দূর করে জাতীয় উন্নতির দিশা দান করে গেছেন তা সকলের প্রণিধানযোগ্য । একজন কপর্দকহীন সন্ন্যাসি একাকী কি সাহসের উপর ভর করে সমাজ সংস্কারের জন্য একটি আদর্শ জাতি গঠনে যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দান করেছেন এই দেশ জাতি চিরদিন তা স্মরণ রাখবে বলে আমি মনে করি ।

আমি একজন ক্ষুদ্র জ্ঞানহীন গবেষণাকারী তাঁর মত সমাজ সংস্কারের গভীরে না পৌঁছে আমি যতবার সাধারণের মত পান্ডিত্যবুদ্ধি দ্বারা তাঁর সমাজ সংস্কারের আদর্শগুলি খুঁজে দেখতে গেছি এবং সমাধান টানতে চেয়েছি– ততই পশ্চাদপদ হয়েছি । কারণ তাঁর সমাজ সংস্কারের অন্তর্নিহিত অর্থ গভীর মনোযোগ সহকারে যখন জানতে ও বুঝতে শিখলাম তখনেই দেখলাম– ব্যবহারিক সমাজ সংস্কার যেমন প্রয়োজন সাথে আধ্যাত্মিকতার চিন্তা চেতনাও সমাজে অগ্রধিকার । নিগমানন্দের 'মহাপুরুষ নাটক'-এ সমাজপতি শশধর পন্ডিত মহাশয়ের ব্যাঙ্গোক্তিতেই জানতে পারি– নিগমানন্দের (বাল্য নাম নলিনী কান্তের) সমাজ সংস্কারের ব্যাপকার্থ কি ।

"তোমাদের নলিনী তো মহাপুরুষ, সাধু ! নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মে চন্ডাল-বৃত্তি । আমরা যাকে একঘরে করি, তার বাড়ি গিয়ে পাত পাতে ! অস্পৃশ্যের সেবা, ইতর, ছোটলোকের মড়ায় কাঁধ দেওয়া– বাগদী, কৈবর্তর হাতে জল খাওয়া–এতে কি তোমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল হচ্ছে? "[১২]

প্রাথমিক ভাবে আমিও এ বিষয়গুলিকে বারবার সামাজিকভাবে সমাধানের অন্তর্ভুক্ত করে যত উপায়ে সিদ্ধান্ত প্রদানে অংশগ্রহণ করেছি এবং এর সমাধান টানতে চেষ্টা করেছি, দেখেছি– সেখান পর্যন্ত এগিয়ে আসতে না পেরে বরং পিছিয়ে পরেছি বেশি । কারণ ব্যবহারিক সমস্যা সমাধান কিছুক্ষণের জন্য আনন্দ দান করলেও সমাজের প্রভূত ও প্রকৃত কল্যাণ বয়ে আনে না । মানুষ যতদিন ভিতর থেকে শুদ্ধ না হচ্ছে ততদিন তার অভিমান, অহংকার এবং একগুয়েমী মানব জীবনে মানবের কল্যাণে মানবতার দ্বার উন্মোচন করতে সক্ষম

১২ । শ্রীতারক হালদার, সাহিত্যরত্ন , **মহাপুরুষ নাটক**, কলিকাতা: হালিশহর, আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৫, পৃ.,৭

হয় না। নলিনী কান্তকে তাঁর কাকা যুধিষ্ঠির, সমাজপতি শশধর পন্ডিতের কটুক্তিকে উপলক্ষ্য করে– এ-কারণেই বলেছিলেন, "একদিন নলিনী তোমাদের মরা, ঘুণ ধরা সমাজে আনবে প্রাণের বণ্যা। সেদিন শুধু আমাদের বংশ নয়, কুতুবপুরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।"[১৩] পরবর্তিতে আমরা ঠিক এটাই ঘটতে দেখেছি তাঁর জীবন-দর্শনে।

তাঁরই আদর্শাধিকারী উন্নতিকামী সামাজিক জীবন-যাপনকারী সমাজবদ্ধ অনেক মানব জীবন মাঝে। ভারতবাসীর সমাজ-দ্রষ্টা, বাংলার সাহিত্য সম্রাট, সমাজ এবং রাষ্ট্রের আদিগুরু তাঁরই জ্ঞাতি দাদু বঙ্কিম চন্দ্র চট্রপাধ্যায় নলিনী কান্তকে খুব ভালবাসতেন। প্রথম জীবনে ঠাকুর তাঁকে অনুসরণ করতেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর জীবনের গভীর অন্তর্যোগ ছিল। নলিনীকান্তও সাহিত্য সম্রাটকে সম্মান দান পূর্বক বলতেন , "আমি তাঁকে প্রত্যহ প্রণাম করি। তিনি আমাকে কত ভালবাসতেন। তাই আমিও তাঁকে খুব ভালবাসি। "[১৪]

আমরা এই সামান্য উদ্ধৃতি থেকে এটাই উপলব্ধি করতে পারি যে, স্বামী নিগমানন্দজী কত বড় ধরণের একজন সমাজ সংস্কারক কর্মী ছিলেন। সমাজ সচেতনশীল নলিনী কান্তের বুদ্ধির ফলে– তাঁর পিতা ভুবন মোহনকে একদা বাধ্য হয়ে বলতে হয়েছিল, "শুধু বাগদি পাড়া নয়, সমস্ত কুতুবপুর বেঁচে গেছে বৌমা। নলিনীর জন্যই কলেরা মহামারি হয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে নি।"[১৫] মেডিকেল শাস্ত্রে বার বার সতর্ক করা আছে, " Prevention is better than cure." রোগ আক্রমণের পূর্বে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা বেশি কার্যকর। স্বামী নিগমানন্দের মানসিক চিন্তা চেতনা এখানেই প্রমাণ করে – একটি সুন্দর সমাজ গঠনে; পরিবারে ,সমাজে, রাষ্ট্রে তখনই উন্নয়নের মুখ ও শান্তির পথ দেখায় যখন নাকি তা মানবহৃদয় থেকে একটি সঠিক মানবিক কল্যাণ চিন্তা জাগ্রত হয়। তখন সমাজের কোন বাধ্যবাধকতা মূলক বাধা বা চাপিয়ে দেওয়া অতীত কুসংস্কার সমাজকল্যাণকারী ব্যক্তির চিত্তকে দাবিয়ে রাখতে পারে না।

১৩। ঐ, পৃ., ৭
১৪ । ঐ, পৃ.,৪
১৫। ঐ, পৃ., ৫

নিম্ন জাতির একটি মেয়ে একদা ঘরে মরে পড়ে আছে, অথচ কেউ সৎকার করছে না, কারণ জাত যাবে বলে। একঘরে হয়ে থাকতে হবে বলে। কিন্তু নলিনী নিজ কাঁধে শবটিকে নিয়ে বন্ধুদের সাথে দাহ করে ফিরে এসে সমাজকে এটাই বুঝালেন, মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য কি ? মানুষের জন্য মানুষের কি করা উচিত। বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানই ধর্ম । দোষ ধরাই শুধু সমাজের কর্তব্য নয়। দোষ মুক্ত ও প্রতিকার করাও সমাজের অন্যতম কাজ। বিপদ থেকে উদ্ধার করাই সমাজের দায়িত্ব।

বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া কখনও সমাজের সামাজিকতা নয়। মানুষ তো মানুষেরই জন্য । মানুষকে ছুঁলে এবং মানুষের জন্য মানুষের খাদ্য খেলে কোন মানুষের কখনও জাত যায়না। ধর্ম ও জাত কাঁচ-এর মত এত ঠুন্‌কো নয় যে, পরে গেলে ভেঙে চুরে খান্‌-খান্‌ হয়ে যাবে। বরং যে এই কর্তব্য কর্ম থেকে দূরে সড়ে থাকে সে হল সমাজপাপী। সমাজ ও ধর্মের নামে সে একটি কলঙ্ক। স্বামী নিগমানন্দজী সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে বাস করে– সমাজের চাপের মুখে থেকেও কখনও অন্যায় অন্ধকারের পথ অনুসরণ করেন নি বরং সবাইকে মানবতার আদর্শে উজ্জীবিত করে তুলেছিলেন। তিনি প্রকৃত অর্থে যা চিরসত্য সমাজ সংস্কার বলতে বুঝায়– সেই ধর্মময় একটি সত্য সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা দান করতেই ভারত-ভূমিতে পদার্পণ করেছিলেন। আমি একারণেই স্বামী নিগমানন্দজীর জীবন ধর্ম ও দর্শন এবং শিক্ষাকে আপন আদর্শ বলে গ্রহণ করে আমার গবেষণা পর্বের গবেষণা কর্ম বলে গ্রহণ করেছি।

স্বামী নিগমানন্দজীর সমাজ সংস্কার বিষয়ক অনুক্রমণিকাটি তাঁর বাণী দ্বারাই শুরু করছি–হিন্দু ধর্মে একসময় ব্যক্তি, সমাজ ও ধর্ম সব বিষয়ের মধ্যে এমন এক সমুজ্জ্বল ভাব ও বিধি বর্তমান ছিল, যাতে প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে থেকেও তার দ্বারা মহান্‌ কর্তব্যের সন্ধান পেত। তখন অবস্থাভেদে ব্যবস্থা ছিল। এখন দেখি হিন্দুর সব যেতে বসেছে। সামঞ্জস্য নেই ছন্দ নেই, আছে কেবল উচ্ছৃংখল স্বেচ্ছাচার। হিন্দুর এখন বড় দুর্দিন এসেছে।.... সে সময় সমাজ ও দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির অনুকূল ভিন্ন প্রতিকূল ছিল না। বর্তমানে কালের পরিবর্তনে, শাশকের পর শাশকের পরিবর্তনে পারিপার্শ্বিক বহু বিপর্যয়ের মধ্যে এই সনাতন ধর্ম ও সমাজ এখনও

জীবিত আছে সত্য কিন্তু অস্থিচর্মসার। হিন্দুর আজ বড় দুর্দিন । সকলকে সংঘবদ্ধ হতে হবে।–নতুবা আর উপায় নাই।[১৬]

স্বামী নিগমানন্দজীর অন্তর্নির্হিত ইচ্ছা ছিল– ভারতের এই অধঃপতিত জাতিকে প্রাচীন ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের আদর্শে বর্তমান সমাজে পুনরুজ্জীবিত করে তুলা। কারণ সেকালের ঋষিযুগে সকলেই আনন্দে বসবাস করতেন। এর কারণটি ছিল– তৎকালীন ধর্মভিত্তিক আদর্শ সমাজ-জীবন-গঠন ব্যবস্থার প্রবর্তন।

মানব সমাজকে আজও যদি আমরা আনন্দে রাখতে চাই, একটি আদর্শ সমাজ-জীবন দান করতে চাই– তবে বর্তমান মানবসমাজকে স্বামী নিগমানন্দজী প্রতিষ্ঠিত সমাজের বুকে সমাজ গঠনমূলক তিনি যে সকল অবদান রেখে গেছেন, যেমন– প্রধানতঃ সাপ্তাহিক সারস্বত সংঘ প্রতিষ্ঠা, বাৎসরিক ভক্তসম্মিলনী প্রবর্তন, মাসিক আর্যদর্পন গ্রহণ মূলতঃ জনহিতকরমূলক এই কর্মগুলি দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সমাজে– পরস্পরের মধ্যে ধারাবাহিক এক নিগুঢ় আত্মিক বন্ধন, আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা গঠন, এবং এর বৃদ্ধিকরণ। আজকের যুগে আমাদের সমাজ সংগঠন ও সমাজ সংস্কারের জন্য সংঘবদ্ধ হওয়াই হল এর একমাত্র সঠিক উপায়। স্বামী নিগমানন্দদেবও এটাই চেয়েছেন। ব্যবহারিক জীবনের সাথে জ্ঞান বিজ্ঞান ও ধর্মের আলোচনা মাধ্যমে একটি সুন্দর ও সুষ্ঠু সমাজ গঠন ব্যবস্থা– স্বামী নিগমানন্দজী মুখে না বলে– ঘরে-ঘরে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে গেছেন।"জদদ্ধিতায় বহুজনহিতায় চ" যে মহান আশ্রমের ব্যবস্থা, তার জন্য সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসি হতে হবে না বরং সংসারে থেকেই স্বামী নিগমানন্দজীর আদর্শ পথে ত্যাগ প্রতিষ্ঠিত ভোগ পূর্ণ সামাজিক জীবন-গঠন মাধ্যমেই একটি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলা সম্ভব।

স্বামী নিগমানন্দজী প্রবর্তিত বিজ্ঞাপন বিহীন শতাধিক বৎসর অতিক্রান্ত সনাতন ধর্মের মুখপত্র নামে মাসিক আর্যদর্পন পত্রিকা যা আজও ঘরে-ঘরে সমাজ সংগঠন লক্ষ্যে পর্যালোচিত হয়ে আসছে। এছাড়াও তাঁর প্রবর্তিত প্রতিবৎসর বিভিন্ন স্থানে দেশ-বিদেশ ব্যাপি নির্দিষ্ট একটি সার্বভৌম ভক্ত সম্মিলনী মাধ্যমে মিলিত হয়ে পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময়, সম্মিলনীর উদ্দেশ্য– আদর্শ গার্হস্থ জীবন গঠন, সংঘশক্তি প্রতিষ্ঠা, ও জীব সেবা এই ধর্ম-সংঘরূপ কর্মগুলি থেকেই আমরা জীবনভর জানতে ও শিখতে পারছি কিরূপে একটি আদর্শ

১৬। পূর্বোক্ত, সত্য চৈতন্য ও শক্তি চৈতন্য, **শ্রীশ্রী নিগমানন্দ উপদেশামৃত**, পৃ., ১৮০

সমাজ সংগঠন করা সম্ভব। আমাদের নৈতিকতা, চরিত্র গঠন, ভক্তি, শ্রদ্ধার্জন, ধর্মজ্ঞান শিক্ষা, সমাজসেবা, সমাজশিক্ষা, নররূপে নারায়ণ সেবা বা শিব জ্ঞানে জীবসেবা, সকলের প্রতি প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা এই সম্মিলনী আমাদের উদ্দীপক শক্তি হিসেবে উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করে আসছে। পরকে আপন করার অভিজ্ঞতা, পরের উপকারের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার শিক্ষা আমরা এই সম্মিলনী থেকেই পেয়ে থাকি। আরও জানতে পারি– সকলেই যখন আমরা এক স্রষ্টার সৃষ্টি, তখন কেন থাকবে আমাদের মধ্যে ভেদ-বিভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ, কলহ-বিবাদ ও বৈষম্য। পরমেশ্বরই যখন পৃথিবীর সকল জীবের একমাত্র স্রষ্টা, আমাদের সকলের পরমপিতা, আর আমরা যখন সবাই তাঁরই সন্তান; পরস্পর ভাই-বোন। তখন আমাদের মাঝে ঐক্য ছাড়া অনৈক্য কিছুতেই স্থান লাভ করতে পারে না। অতএব সমাজের উন্নতি একমাত্র ভাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি। আমি মনে করি স্বামী নিগমানন্দজীই এর শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক।

আমাদের সকলের প্রতিজ্ঞা হতে হবে , আমি ধর্মের শরণাপন্ন হয়ে জীবন পরিচালন করব। পৃথিবীর একমাত্র উদার ও মহৎ শিক্ষাই হল ধর্মশিক্ষা। যা সকল জাতির ধর্মজ্ঞান তা প্রমাণ করে। এই লক্ষ্যে ধর্মই পারে একটি আদর্শ সমাজ দান করতে।

সমাজে আজ যে প্রকার উচ্ছৃংখলা ও অধঃপতন, মারামারি, খুনখারাবি তার মূলেই হল ধর্মহীন মানবেতর জীবন-যাপন। প্রচলিত পদ্ধতিগত শিক্ষালাভ অবশ্য মানব জীবন ধর্ম। তবে সেই শিক্ষায় থাকতে হবে অবশ্য নৈতিকতা, উদারতা, নিঃস্বার্থতা ও পরপোকারিতা। এই গুণগুলির সাথে যুক্ত থাকতে হবে ভালবাসারূপ সার্বজনীন ধর্মশিক্ষা। এর পর যে পরিবার সমাজ জাতি ও দেশ গঠন হবে তা হতে গড়ে উঠবে মহানুভবতা। এই মহানুভবতাই হল সমাজ সংস্কারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই মানুষের জীবন ধর্ম। সকলে সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে; সকলকে সকলে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে, স্ব-স্ব মত পথকে সবাই সবার সত্য বলে জেনে, সবার লক্ষ্যস্থান একখানে, এরূপভাবে পরস্পর মিলে মিশে জীবন-যাপন করাই হল সামাজিক রীতি বা মানব-জীবন সংবিধান।

স্বামী নিগমানন্দজী গভীর সাধনা করে যে অনুভূতি লাভ করেছিলেন, তাহল– "মদাত্মা সর্বভূতাত্মা" আমার আত্মাই সর্বজীবের আত্মা, এবং "সর্বভূতাত্মমদাত্মইব"– সর্বজীবের আত্মাই আমার আত্মা। এই অনুভবটি যখন তিনি অন্তরে এবং বাইরে এই চর্মচক্ষু দিয়েই দেখলেন ও উপলব্ধি করলেন সমাধির চরম স্তর নির্বিকল্প সমাধিতে, তখন তিনি আর হিংসা বিদ্বেষপূর্ণ সাধারণ মানব পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত থাকলেন না, তিনি হয়ে উঠলেন একজন দেবতুল্য অতিমানব। সমগ্র পৃথিবীর সকল জীবের প্রিয় পাত্র অতি প্রিয় আপনারজন। এই অনাগত অনবগত শক্তিকে পরিপূর্ণরূপে লাভ করেই তিনি বিশ্ববান্ধবরূপে বিশ্বভাতৃত্বের আহ্বান জানিয়ে গেছেন। তিনি এই লক্ষ্যেই একজন শ্রেষ্ঠ সমাজ সংগঠক এবং সমাজ সংস্কারক।

আমি আমার অভিসন্দর্ভে আমার জীবন-দেবতা স্বামী নিগমানন্দের এই সাধনলব্ধ অভিজ্ঞানটিকে আশ্রয় করেই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে বিশ্বভাতৃত্বের বন্ধনে পৃথিবীর সবাইকে এক পরমেশ্বরের এক চাঁদোয়ার ছায়াতলে আশ্রয় লাভে অনুপ্রয়াসী হয়ে একটি বিশ্বমানবতার একত্রিভূত বিশ্বসমাজ চেয়েছি। বিশ্ব শান্তি চাইলে এভিন্ন দ্বিতীয় আর কোন উন্নত পন্থা আছে বলে আমার জানা নেই। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সামাজিক সুখ ও শান্তি চাইলে নিগমানন্দের ভাষায়– 'সকলের সংঘবদ্ধ' হওয়া ছাড়া দ্বিতীয় উপায় নেই। আমি একজন ফিলোসফির ছাত্র হিসেবে পড়াশুনা করে যতটুকু উপলব্ধি করেছি তাতে এটুকুই আশ্বস্থ হয়েছি এবং জীবনক্ষেত্রে মরমে মরমে অনুভব করেছি যে, মানুষ যেদিন নিজেকে চিনে জানবে যে সে শুধুমাত্র নামরূপধারী একজন সাধরণ মানুষই নন। তাঁর হৃদয়-কন্দরে অস্তি সত্তা বা চেতনরূপী চৈতন্যশক্তিধারী যে অমর আত্মা বিদ্যমান তাঁকে জানাই হল প্রকৃত মানব জীবন। তাঁকে লাভ করাই হল মনুষ্যত্ব, প্রকৃত শিক্ষা, প্রকৃত সমাজব্যবস্থা। ভারত ধর্মে একমাত্র পৃথিবীশ্রেষ্ঠ শান্তির ধর্ম বেদান্ত ধর্ম এই শিক্ষাই জগৎবাসীকে দান করে গেছেন।

স্বামী নিগমানন্দ বলেছেন, " মুষ্টিমেয় নিবৃত্তিমার্গী সন্ন্যাসীর দ্বারা দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধিত হইবে না। সমাজকে জাগাইতে হইলে আদর্শগৃহীর প্রয়োজন।"[১৭] এই আদর্শ গৃহী কেমন হবে– নিগমানন্দ তাও ব্যক্ত করে গেছেন:

১৭। ঐ, পৃ., ২৭১

> গৃহস্বামীকে এরূপভাবে আত্ম গঠন করিতে হইবে যে, তাঁহার স্ত্রী মনে কররেন, এমন স্বামী কাহারও হয় না, পুত্র-কণ্যাগণ মনে করবেন, এমন পিতা কাহারও ভাগ্যে মিলেনা, বন্ধু মনে করবে- এমন সহৃদয় বন্ধু কাহারও হয় না, ভাই মনে করবে- এমন দাদা কারও থাকে না, পিতা-মাতা মনে করবে– এমন পুত্র কারও জন্মে না, বন্ধু মনে করবে– এমন বন্ধু কারও হয় না, জমিদার মনে করবে– এমন প্রজা আর নাই, প্রজা মনে করবে– এমন জমিদার আর নাই। সংসারের যার যেটুকু পাওনা, তাকে সেটুকু কড়ায়-গন্ডায় বুঝিয়ে দিবে, অথচ স্বীয় লক্ষ্যে অটুট থাকবে, এই হচ্ছে প্রকৃত একজন সামাজবদ্ধ আদর্শ গৃহস্থের লক্ষণ। আমি সমাজে এরূপ আদর্শ গৃহস্থ দেখতে চাই।[১৮]

আমি আমার গবেষণার অভিসন্দর্ভে এটাই প্রতিপাদন করতে চাই যে, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে আমরা যতই উন্নত সভ্য অর্থাৎ প্রাচীন বর্বর যুগের চেয়ে সর্বাধিক উৎকৃষ্ট বলে দাবি করি না কেন, স্বামী নিগমানন্দ যে আর্য সনাাতন যুগের সভ্য সামাজিক দূরদৃষ্টি তাঁর বাণী মাধ্যমে প্রদর্শন করে গেছেন, তাতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের বর্তমান সুসভ্য যুগের চেয়ে তাঁর প্রচারিত প্রাচীন আর্যঋষিদের যুগের বৈশিষ্ট্য অসভ্যতার পরিচয় প্রদান করছি তা নিত্যদিনের পত্র পত্রিকা, মিডিয়া, দেশের সব প্রচার মাধ্যম দৃঢ়স্বরে প্রতিনিয়ত ঘোষণা দিচ্ছে – সমাজের মেরুদন্ড যে, মহানুভবতা, উদারতা, নিঃস্বার্থতা ও পরপোকারিতা, তা না হয়ে সর্বত্র আজ দেখতে পাচ্ছি শুধু যে অনেকানেক গুরুত্বপূর্ণ এবং সত্যিকাররূপে যে– একটি দেখার মত, জানার মত, শিখার মত এবং বুঝার মত আদর্শ গার্হস্থ জীবন ব্যবস্থা প্রচলন ছিল, যা– উপেক্ষা করার কোন উপায় আজ আর কারও নেই। আমরা সভ্য সমাজে যে আজ কত বড় স্বার্থপরতার জঘণ্য লোলুপতা। স্বার্থের জন্য পিতা করছে পুত্রকে খুন, পুত্র করছে পিতাকে খুন, মা করছে সন্তানকে খুন, সন্তান করছে মাকে খুন।

মাতৃস্বরূপ নারীদের উপর অকথ্য অত্যাচার এবং পাশবিক নির্যাতন, কামকলুষিত জবরদস্তি, অন্যায়ভাবে সমাজে এতটাই বিস্তার লাভ করেছে যে, বা এতটাই বর্বর হয়ে উঠেছে যে, মা বোন, আত্মীয় সজন, পাড়া-পরিজন, শিশু-সন্তান বর্তমান সভ্য সমাজ –

১৮। পূর্বোক্ত, স্বামী অখন্ডানন্দ সরস্বতী, **শ্রীশ্রী নিগমানন্দের অমিয় বাণী সম্ভার**, পৃ., ৪৪

কাউকে যৌন হয়রানী ও নির্যাতনের হাত থেকে বাদ বা রেহাই দিচ্ছে না। সবার সাথে অমানবিক যৌনবৃত্তির আসঙ্গ লিপ্সায় অধীর উৎকণ্ঠিত হয়ে হায়নার মত ওঁতপেতে সুযোগের অপেক্ষায় অপেক্ষমান থাকে। এটাই কি বর্তমান সভ্য যুগের গর্বিত আদর্শ ? মনুষ্যত্বের পরিচয়ে যে একজন মানুষের প্রকৃত পরিচয়, আজ এ-সভ্য সমাজে তা দাবির অধিকার রাখে বলে আমরা মনে করি কি ?

অতএব সমাজ সংস্কার অর্থ সমাজে শিশু থেকেই নীতি আদর্শের সুশিক্ষা প্রবর্তনই হল প্রকৃত সমাজ ব্যবস্থা। শিক্ষার নামে সমাজে অসভ্যতা কখনও সামাজিক বিধান হতে পারে না। যে সমাজ আমাদের নীতি আদর্শ নৈতিকতা উদারতা ও মহানুভবতা শিক্ষা দান করে না বা আমরা সেই আদর্শবান হয়ে গড়ে উঠতে পারি না, সেই সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন আমাদের জীবনে কোনদিন উন্নতি বিধানে সহায়ক হতে পারবে না। বরং যেভাবে আমাদের দিন দিন ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তা হতে আমাদের রক্ষা জন্য সেই শিক্ষাই নিতে হবে – যে; প্রাচীন সু-সভ্যঋষিগণ যে সমাজ ব্যবস্থা গঠন করে গেছেন স্বামী নিগমানন্দজী এ-যুগে যা আমাদের নিকট প্রত্যাশা করেছেন। সেই ধর্মভিত্তিক সমাজশিক্ষা ছাড়া উত্তরণের কোন উপায় আছে বলে আমি মনে করি না।

আমার জীবনদেবতা স্বামী নিগমাননন্দজীর নিকট আমার প্রার্থনা– আমি যেন আমার শিক্ষকতা জীবনে আমার সকল ছাত্র-ছাত্রীরূপ সন্তানদেরকে তাঁর মহান আদর্শে আদর্শবান করে তাঁরই প্রার্থিত একটি নতুন সমাজব্যবস্থা দান করতে পারি– এই কামনাই রাখছি তাঁর সমীপে।

৩.৬.২: সমাজ সংস্কার বলতে নিগমানন্দ কী বুঝান?

সমাজ সংস্কার বলতে স্বামী শ্রীনিগমানন্দজী সাধারণতঃ যে অর্থে সমাজ সংস্কার বলতে বুঝায়– সোজাসুজি তিনি তা সমাজে চাপিয়ে না দিয়ে তিনি সমাজের গভীরতর সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, সমাজ ব্যবস্থাকে অবশ্য ধর্মভিত্তিক হতে হবে। ধর্মহীন সমাজ-সংস্কার কখনও কোনদিন সমাজে শান্তি দিতে পারে নি পারবেও না। ধর্ম অর্থই হল সত্য ও শান্তির প্রতীক। অতএব ধর্মকে বাদ দিয়ে কোন

মানব, তার অর্থ, আনন্দ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ, সমাজ, দেশ, জাতি, কাম, মুক্তি ও মোক্ষ কোনটাই পরিপূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম নন ।

"ধর্মেন হীনা পশুভিঃ সমানাঃ" শাস্ত্রে বলা আছে– ধর্মহীন মানব পশুর সমান । ধর্ম মানুষকে জ্ঞানী করে তুলে । জীবনের চলার পথের সঠিক রাস্তা দান করে । ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত জ্ঞান দান করে । কর্তব্য দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে । ধর্মকে যদি অস্বীকারও করি তবু ধর্মের যায় আসে না । কারণ যারা ধর্ম স্বীকার করেন না তারা অবশ্য নীতি স্বীকার করেন । সত্য ন্যায় নীতি মেনে চলেন । ধর্ম বলতে আমরা তাকেও বুঝিয়েছি । কারণ ধর্ম মানে শুধু ভগবান নামক একজনকে ভক্তি করা বুঝায় না । তাঁর অধীনতা স্বীকার করা বুঝায় না । ভগবান অর্থই হল– সর্বশক্তিমান ও সর্বনিয়ন্ত্রক । যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলময় এবং সবকিছুর রক্ষা বিধান করেন, বিশ্বের নীতি ধর্ম ও আদর্শকে রক্ষা করেন– তিনিই ধর্ম , তিনিই ভগবান বা সর্বশক্তিমান । অতএব সত্য সুন্দর শিবস্বরূপ ধর্ম বা ঈশ্বরই হলেন প্রকৃত সমাজ-সংস্কারক । যিনি এই উল্লিখিত ধর্ম বা নীতি ধর্মহীন, তিনি অজ্ঞান পশু সদৃশ । তার দ্বারা সমাজ কল্যাণ অসম্ভব ।

গীতায় এজন্যেই শ্রীভগবান স্বয়ং পৃথিবীবাসীর জন্য নিজের স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করেছেন, "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত । অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহম্ । "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্ ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।"[১৯] অর্থাৎ– 'যখন যখন ধর্মের পতন ও অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখন তখন আমি আবির্ভূত হই । সাধু বা ধর্মপ্রাণকে অর্থাৎ যিনি সত্যবাদী, ধার্মিক, নীতিপরায়ণকারী তাদেরকে রক্ষা করি এবং অধর্ম অন্যায়কে বিনাশ করে পুনঃ পৃথিবীতে নীতি-ধর্মসংস্থাপন করি ।'

স্রষ্টার সৃষ্টিই একটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি । নিয়মের বাইরে এক দন্ডও পৃথিবীর কোন কিছু চলে না । চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী , গ্রহ, তারা , নক্ষত্র , সাগর , পাহাড়-পর্বত সবাই নিয়মের অধীন । নিয়মের বাইরে চলার শক্তি ঈশ্বরের থাকলেও তিনি নিয়মকে উপেক্ষা করে চলেন না । নিয়মই ধর্ম । ধর্মই ঈশ্বর ।

---

১৯ । অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতা স্বামী অমৃতত্ত্বানন্দ, **শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা**, দিনাজপুরঃ রামকৃষ্ণ আশ্রম ও মিশন, প্রথম সংস্করণ, ১লা মার্চ, ২০০৬, পৃ., ৯০

এই সত্য ও নিয়মকে বস্তুবাদীগণ গায়ের জোরে না মানলেও তারাও যে বাধ্যগত একটি নির্ধারিত নিয়ম যথা– সবাই মৃত্যুর অধীন; তা অস্বীকার করা– তাদের পক্ষেও কোন উপায় নেই। সমাজ সংস্কার সম্পর্কে ধর্মতত্ত্ববিদ্‌গণ একারণেই ধর্মকে আশ্রয় করেই সমাজের সকল সমস্যার সমাধান এবং উপদেশ দিয়ে গেছেন।

ব্যবহারিক সমাজ সংস্কারের সাথে ধর্মীয় সংস্কারেরও যে সমাজে প্রয়োজন স্বামী নিগমানন্দজী তা নিজেই সংস্কারক সেজে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ বিধান দান করে গেছেন– সমাজের প্রতি ঘরে-ঘরে। "নিজে আচরি জীবেরে শিখায়" এই আদর্শকে অনুসরণ করে।

নিগমানন্দ চেয়েছেন, "আমি চাই ধর্মের মধ্য দিয়ে এই অধঃপতিত জাতিকে উঠিয়ে তুলতে। এদের মধ্যে সেই ঋষিযুগের আদর্শগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে, সে যুগের ঋষিদের মত মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ দান– আত্মার স্বরূপ জ্ঞান দান করতে।"[২০] স্বামী নিগমানন্দের এই সমাজ সংস্কার চিন্তা একটি অসাধারণ চিন্তা। ভারতীয় সংস্কৃতিতে এর চেয়ে সমাজ-সংস্কার বিষয়ক দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ আর কোন নতুন পন্থা নেই। এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। মানুষ যতদিন নিজেকে জানতে ও চিনতে না পারবে ততদিন সে কেমন করে বুঝবে– কেন আমাকে সমাজবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে ? কেন সমাজের প্রতি-প্রত্যেকের উপকারে আসতে হবে ? অর্থাৎ যেদিন আমার আত্মার স্বরূপ উন্মোচিত হবে সেদিন আমি নিশ্চিত করে জানব এবং অন্তরের অন্তঃস্থলে বুঝব আমিও যা, আর– সবাই তা। তাদের সাথে আমার পার্থক্য শুধু নাম ও রূপে এবং আচার ও ব্যবহারে, কিন্তু স্বরূপে আমরা সবাই এক আত্মা। এক চেতন ও চৈতন্য শক্তি। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় এই জ্ঞান লাভই হল সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজপ্রীতি এবং শাশ্বত সমাজ সংস্কারক নীতি।

আমার যেমন উচিত আর একজনের সহায়তা ও সহযোগিতা করা তারও উচিত আমাকে তাই করা। পিতা-মাতা যেমন অতি আপনার জনরূপে বা আমরা আপন জন মনে করে – আমাদের প্রতি তাঁদের ধরিয়ে দেওয়া ভুলগুলি আমরা নির্বিচারে সংশোধন করে নেই বা মেনে চলি, অনুরূপভাবে আমার আপন বা প্রতিবেশি ভাইয়ের আমার প্রতি ধরিয়ে দেওয়া ভুলগুলি এবং আমার – তার প্রতি ধরিয়ে দেওয়া ভুলগুলি উভয়ে সংশোধন করে যদি আমরা গলা জরাজড়ি করে পথ চলি সমাজে–

২০। পুর্বোক্ত, স্বামী অখন্ডানন্দ, **শ্রীশ্রী নিগমানন্দের অমিয় বাণী সম্ভার,** পৃ., ৩২

তবে সবচেয়ে বেশি উপকার হবে না কি ? সমাজ সংসংস্কারে জন্য কারও জবরদস্তির প্রয়োজন আছে কি ? কারও উপর আঘাত দিয়ে তাকে বাধ্য করার প্রয়োজন পড়ে কি? সমাজ হল শান্তির প্রতীক। প্রত্যেকের উন্নয়ন চিন্তাই হল সমাজ চিন্তা। অবহেলিত উপেক্ষিতদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা দান করাই হল সামাজিক বিধান। অন্যায় কুসংস্কারকে দূরীকরণ করাই হল সমাজ সংগঠন।

এ-যুগে অনেকেই দাম্ভিকতার সাথে বলে থাকেন, ধর্ম আমাদের সমাজে কি দিয়েছে ? তাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ রইল– তারা যেন একটিবার সমাজবিজ্ঞান পাঠ করেন। সমাজ ও জনজীবনে ধর্মের প্রভাব এবং অবদান কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ ও জনকল্যাণে ধর্ম মানুষকে উৎসাহ, শক্তি ও প্রেরণা কতটা দান করে, অবচেতন মনকে কতটা সচেতন করে তুলে, পরার্থে ধন, জন, শক্তি, সামর্থ ও শ্রমদানে কতখানি অনুপ্রাণিত করে ? ধর্ম যে সত্যিকার অর্থে বহু মঙ্গলজনক সামাজিক ক্রিয়া ও কর্মের উদ্দীপক তার প্রমাণ ধর্মের পরার্থপরতা। আর ব্যবহারিক সমাজ শিক্ষা আমাদের দান করে স্বার্থপরতা। পরনিন্দা, পরচর্চা, অহংকার, অভিমান এবং লোকমান্য প্রতিষ্ঠা ব্যবহারিক সমাজ ব্যবস্থা ও শিক্ষার প্রধান লক্ষণীয় দিক্। এই অপসংস্কৃতির নিকৃষ্ট অন্যায় গুণগুলি নিয়েই সমাজ আজ পর্যন্ত তার কর্তব্য মনে করে চলছে এবং নিজেই নিজের উন্নতিতে নিজেই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে সমাজকে দায়ি করছে। ধর্মসংযুক্ত সমাজ ব্যবস্থা ছাড়া যে, কোন মানুষ সহনশীলতা, নৈতিকতা, উৎসাহী, সামর্থবান এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রেম-প্রীতি-মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারে না, তার প্রমাণ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা ও সমাজ-সংস্কার কার্যকলাপ এর উপযুক্ত সাক্ষি।

রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি যে নীতির কথাই বলি না কেন, ধর্মনীতিই হল সমস্ত নীতির পরিপূরক। আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, ধর্মই প্রকৃতভাবে প্রাণীগণকে সৎ পথে ধারণ করে। অতএব যার দ্বারা প্রাণীগণের হিত হয়, রক্ষা হয়, সর্বভূতে প্রীতি, সর্বভূতে দয়া ও সেবা এবং সর্বভূতের তুষ্টি হয় এবং যে নীতি মানব সমাজে নিষ্কাম নিস্বার্থভাবে প্রাণীগণকে দান ও উজ্জীবিত করে , তাই হল যথার্থ একটি সমাজনীতি। যা আজ পর্যন্ত ধর্মনীতি মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়ে আসছে– সমাজে যদি পরিপূর্ণতা দান করতে কেউ ইচ্ছুক হন তবে আপনাকে একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে হবে।

বিংশ শতাব্দীর শেষে বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার ও অগ্রগতির যুগে আর একটি আশ্চর্য ঘটনা এই যে, পৃথিবীর সেরা পন্ডিত, বৈজ্ঞানিক গবেষক এবং মনীষীগণ আজও ছুটে আসছেন ভারতের মাটিতে আর লুটিয়ে পড়ছেন ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক গুরুর পদতলে, ভিক্ষা চাইছেন জীবনের পরম সুখ শান্তি। এর হেতু কি হতে পারে ? এর কারণ ভারতের বুকে বিরাজ করছে সনাতন ধর্ম। যে ধর্ম কাউকে দূর করে দেয় না,নিরাশ করে না, হতাশ করে না, এই ধর্ম সকলকে নিকট করে , আপন করে, সবাইকে শান্তির সুশীতল ছায়াদানে এগিয়ে আসে। কিন্তু এই মহান ধর্মের অধঃপতন অবলোকন করে বর্তমান হিন্দু সমাজের দুর্দশা দেখে; দুঃখ করে– স্বামী নিগমানন্দজী বলতে বাধ্য হয়েছিলেনঃ

> সমগ্র হিন্দু সমাজ উচ্ছৃংখল হয়ে গেছে। নানা সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে হিন্দুধর্ম তার নিজের বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে। সারা দেশ দূরে থাক, একই পরিবারভূক্ত হয়েও সমগ্র পরিবারের প্রত্যেকে যে এক মতে চলে তা নয়। মা যদি হিন্দু ঋষিদের প্রদর্শিত পথে চলেছেন, বাবা ইংরাজিতে অনূদিত হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করে ব্রাহ্ম, ছেলে ইংরাজী দর্শনশাস্ত্র পড়ে নাস্তিক। বর্তমানে প্রকৃত হিন্দু সমাজ বলে কিছু নেই। সমাজের অর্থ কিছু লোক –একটি নিয়ম মেনে চলবে।[২১]

স্বামী নিগমানন্দজী এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, পরিবার না জাগলে সমাজ জাগবে না, সমাজ না জাগলে দেশ ও জাতির কল্যাণ বয়ে আনবে না। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা তাই আজ পশ্চাৎ নীতি অনুসরণ করেছে। সমাজের প্রাচীন উদার নীতি থেকে মানুষকে দূর করিয়ে দিয়েছে। অথচ আমরা অবগত আছি– সমাজ মানুষকে বাদ দিয়ে নয়, মানুষকে নিয়েই সমাজ। অতএব মানুষকে ভালবাসার শিক্ষা ও জ্ঞানদান সমাজে একান্ত কর্তব্য। তিনি এই লক্ষ্যেই পুনঃ একটি আদর্শ সমাজ গড়ে তুলার জন্য আহ্বান রাখলেন আপন তৈরিকৃত শিষ্যভক্তদের মাঝে–

"আমি চাই বিবাহ করিয়া তুমি যদি একজন আদর্শ গৃহস্থ হইতে পার, তবে সমাজের ও জগতের বহু উপকার হইবে। বক্তৃতা অপেক্ষা কাজে দেখাইতে পারিলে জগতের স্থায়ী উপকার হয়।

২১। আর্যদর্পণ, **শতবর্ষ স্মরণিকা**, সংকলক আর্যদর্পন শতাব্দী জয়ন্তী উদ্‌যাপন কমিটি, পক্ষে মহন্ত স্বামী জ্ঞানানন্দ সরস্বতী, কলিকাতাঃ হালিসহর, আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৫, পৃ., ৫৪৩

সে আদর্শ অন্ততঃ দশজনের ভিতর প্রবেশ না করিয়া পারে না। আর এক্ষণে সমাজে আদর্শ গৃহস্থেরই বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।"[২২] স্বামী নিগমানন্দজী এইভাবেই জগতময় অতীত চেতনার সাথে বর্তমান নব সমাজ চেতনার অন্তর্দৃষ্টিতে তাঁর দূরদুর্শিতা নিজের মাঝে দেখতে পেয়ে– তাঁর মানুষ গড়ার পরিকল্পনা ও সমাজের আদর্শ; জগৎময় ছড়িয়ে দিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। অতীত বৈদিক যুগের ত্রিকালজ্ঞ চিন্তাবিদ্ ঋষিদের সমন্বয়ে গঠিত জগতে এই মহতি শিক্ষা দ্বারা পুনঃ একটি সুষ্ঠু সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে এ যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বাস্তবিক অর্থে এটিই হল একটি পূর্ণ সমাজ সংস্কারের মূল আদর্শ। স্বামী নিগমানন্দজী আমাদের নিকট ঠিক এমনই একটি সমাজ ব্যবস্থা কামনা করেছেন। তিনি জানতেন, বাল্যে চরিত্র গঠন বা ব্রহ্মচর্য শিক্ষাদান মাধ্যমে জীবনকে একটি শক্ত ভিত্তিতে তৈরি করে আদর্শ গার্হস্থ্ জীবন গঠন করাই হল প্রকৃত সমাজ শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থা।

১২৮৬-৮৭ সালের কথা বলছি, উনিশ শতকের শেষপাদে বাংলায় সমাজের অবস্থাটা কেমন দাঁড়িয়েছিল শিবনাথ শাস্ত্রীর ' রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ '-এ আমরা যে প্রামাণিক চিত্র পাই – ১৮৩৩-এ রামমোহন মারা গেছেন,তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থার অবসান ঘটে– নব যুগের সূচনা দেখা দিয়েছিল বাংলায় এ-কথা সবাই বলবেন। আধুনিক শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, প্রচলিত হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারকে অস্বীকার করে বুদ্ধির আলোয় ধর্মাধর্ম বিচারের প্রয়াস, স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন, বিদেশী শাসকের অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ– নবযুগের এই প্রতিটি বৈশিষ্ট্য যেন নিজের জীবন দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর। এঁরা রাজপুরুষদের সহায়তায় ও নিজ চরিত্র গৌরবে দৃঢ়বলে অর্গল মোচন করেছিলেন মধ্যযুগের। তাঁদেরই বদৌলতে মুক্তসাগরপারের খোলা হাওয়া এসে লাগল সমাজের গায়ে।

আমরা জানি যে কোন জিনিষেরই ভাল-মন্দ দুটি দিক আছে। এঁদের মন্দ দিকটা ছিল– ডিরোজিও, মাইকেল মধুসুদন দত্ত তথাকথিত ইঙ্গবঙ্গ সমাজের স্রোতধারায় স্বজাতি স্বধর্ম একুল ওকুল দুই নষ্ট করে হারিয়ে ফেলা।

২২। পুর্বোক্ত, স্বামী অখন্ডানন্দ, **শ্রীশ্রী নিগমানন্দের অমিয় বাণী সম্ভার**, পৃ., ৪১

মধুসুদন অনেক পরে বুঝতে পেরে তাই আক্ষেপ করে বলেছিলেন,

‘পরধনলোভে যত করিনু ভ্রমণ

পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি ’

কাটাইনু বহুদিন সুখ পরি হরি

অনিদ্রায় অনাহারে সঁপি কায়-মনঃ

মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি ।’

আর ভাল দিকটি ছিল– মাইকেল পরধর্মাবলম্বী হয়েও পরবর্তিতে নিজের ভুল বুঝতে পেরে দেশের হিত চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন । রামমোহনও নিজেই নিজের অতৃপ্ততার কথা লিখে দেশবাসীকে জানিয়েছেন, আমার সমস্ত তর্কবিতর্কে আমি কখনও হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করি নাই । উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম এক্ষণে প্রচলিত তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল । অনেকেই রামমোহনকে ভুল বুঝেছিলেন এবং কি হিন্দুধর্মের বিরোধী বলতেও অপেক্ষা করেন নি । তারা জানতেন না যে, রামমোহন হিন্দুধর্মের বিরোধী ছিলেন না । তিনি ছিলেন, হিন্দু সমাজ বিরোধী । ডিরোজীও এবং তাঁর শিষ্যরা ছিল প্রকৃত হিন্দুধর্ম বিরোধী । এরাই হিন্দুধর্ম ও সমাজ দুটোকেই গুঁড়িয়ে দিতে প্রয়াসী ছিলেন । আর ব্রাহ্ম সমাজ হিন্দুধর্মকে স্বীকার করেও হিন্দু সমাজের সঙ্গে অন্ত র্দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল । দ্বৈত ও অদ্বৈত হিন্দু ধর্মের মূল আদর্শ । ব্রাহ্মরা অদ্বৈতকে গ্রহণ করেছিলেন কিন্ত হিন্দু ধর্মের বেদ অনুশাসিত অদ্বৈতকে স্বীকার করলেও দ্বৈতকে তাঁদের গোষ্ঠিরা অনেকেই খাটো করে দেখেছেন । হিন্দুদের সাথে ব্রাহ্ম সমাজের মূলতঃ দ্বন্দ্ব ছিল সমাজ সংস্কারের । সাধারণরা ধর্ম ও সমাজকে এক করে গুলিয়ে ফেলেছিল বলেই ধর্মের সাথে সমাজের গোল বেঁধেছিল । ধর্মের জন্যই সমাজ, সমাজের জন্য ধর্ম নয় । সমাজকে সুন্দর সুষ্ঠু রাখতে চাইলে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা চিরকাল প্রয়োজন ।

স্বামী নিগমানন্দজী একারণেই চেয়েছিলেন, ধর্মের মধ্য দিয়ে এই অধঃপতিত জাতিকে উঠিয়ে তুলতে । এমন এদের মধ্যে সেই প্রাচীন ঋষিযুগের ধর্মভিত্তিক আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে । সমাজ ও ধর্মের দ্বন্দ্ব আজকের নয় বহু কালের । সমাজ ধর্মকে বারবার কলুষিত করেছে, কিন্তু ধর্ম সমাজকে বার বার রক্ষা করে

আসছে। ধর্ম ও সমাজ যদিও পরস্পর বিরুদ্ধ নয়, কিন্তু আমরা আপন স্বার্থের জন্য ধর্মকে সমাজের কাছে হেয় করে তুলি এবং সমাজ ও ধর্ম নিয়ে গোল পাকাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে স্বামী নিগমানন্দের জন্ম। যদিও আধুনিক যুগের পূরোধা তাঁর দাদু সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের ছায়া তাঁর উপর অনেকটাই প্রভাবিত হয়ে উঠেছিল তবুও তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা ততোটা সংস্কার মুক্ত ছিলনা। তৎকালীন সমাজ সংস্কারকগণ জাতীয় সমাজ সংস্কারের চেয়ে সমাজে মানবতার ধর্মকেই বেশি গুরুত্ব দান করে গেছেন। কিন্তু এই মানবতা ধর্মের মূল উৎস যে সনাতন হিন্দু ধর্মের 'বেদান্ত,' তা তাঁরা তত গভীরে প্রবেশ না করে সমাজিকতার ব্যবহারিক দিক থেকেই ধর্মকে বিচার করে গেছেন। স্বামী নিগমানন্দজীও প্রথম জীবনে এর কবল থেকে মুক্ত ছিলেন না। কারণ নিগমানন্দ– দাদু বঙ্কিমচন্দ্রকে যথেষ্ট সম্মান ও মান্য করতেন। প্রথম জীবনের আধুনিক নাস্তিকতার ছাপই তাঁর জীবনে এনে দিয়েছিল আস্তিকতার অস্তিত্ব।

স্ত্রীর মৃত্যুর অস্বাভাবিক ঘটনাগুলি বারবার আঘাত দিয়ে তাঁকে এই বুঝিয়েছিল যে, ধর্ম সত্য, ঈশ্বর সত্য। সনাতন ধর্মের জন্মান্তরবাদ আরও সত্য। বস্তুবাদী নিগমানন্দ প্রথম জীবনে যদিও এই যুক্তি স্বীকার করতে পরাঙ্মুখ ছিলেন কিন্তু বাস্তবতার কঠিন সাক্ষি ও প্রমাণে পরবর্তী জীবনে এই চরম সত্যকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। গুরুবাদ, অবতারবাদ, শাস্ত্রবাদ বা ঈশ্বরবাদ,এবং জন্মান্তরবাদ বেদান্তের চারিটি ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই যে তাঁর জন্ম তার প্রমাণ তিনি এই জীবনেই সাক্ষাৎ লাভ করে এবং ঈশ্বরের আদেশে নির্দেশিত হয়ে ধর্ম ও সমাজের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে সমাজ সংস্কার করে গেছেন। স্বামী নিগমানন্দ কঠোর সাধনা দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করার পর দাদু সাহিত্য সম্রাটের আত্মাকে জগতে আকর্ষণ করে নিয়ে এসে তাঁর চিন্তা চেতনার অন্ধ বিশ্বাসকে দূর করে– তাঁকে বাধ্য হয়ে তাঁর মুখ থেকে স্বীকার করিয়েছিলেন যে:

জানিলাম জীবের বিদ্যাবুদ্ধি প্রতিভার অহংকার বৃথা, কারণ তিনি যাহার দ্বারা যে কাজ করাইবেন, তাহাকে সেই শক্তি দান করতঃ এইরূপে তোমার-আমার দ্বারা জগতে কার্য করাইতেছেন। আমি প্রথম তোমার হৃদয়ে ধর্মবীজ রোপন করি। সেই বীজ প্রকান্ড কান্ডবিশিষ্ট বৃক্ষোৎপত্তি দেখিয়া ও তাহার সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে যথাস্থানে গমন করিলাম।[২৩]

এখানেই প্রমাণ হয়, ধর্ম ও ঈশ্বর নিত্য বর্তমান । সমাজ ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত। ধর্ম রক্ষার্থেই সমাজ সংস্কার যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। ভগবান তাঁর প্রয়োজনেই এইভাবে যুগে যুগে বিভিন্ন মহাত্মাদের আত্মাকে আশ্রয় করে অবতীর্ণ হয়ে প্রমাণ দিয়ে আসছেন ধর্মের সংস্কার নয়, সমাজেরই সংস্কার। ধর্ম কখনও নষ্ট হয়নি হবে না। ধর্ম নিত্য শাশ্বত সনাতন অক্ষয় অব্যয় কিন্তু সমাজ অনিত্য নশ্বর ও পরিবর্তনশীল। তাই সমাজেরই সংস্কারের জন্য রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ শংকর যীষু মোহাম্মদ্ ও গৌরাঙ্গদেব এবং এযুগে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ নিগমানন্দ অরবিন্দ এঁরা সবাই সমাজ সংস্কার করে ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্যই জগতে আবির্ভূত হয়েছেন।

৩.৬.৩: নিগমানন্দের মতে সমাজ সংস্কারের প্রধান বৈশিষ্ট্য

প্রাচীন ভারতে গুরুগৃহই ছিল জাতির সূতিকাগার। বৈদিক সমাজে শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্ম ঋষি-গুরুর আশ্রমে। ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি-গুরুকুল ছিল ভারতীয় আদর্শ, শিক্ষা, সাধনা ও সংস্কৃতির ঘনীভূত মূর্তি। গুরুর প্রদর্শিত ও অনুষ্ঠিত পথই– অভ্রান্ত সত্যপথ। তাঁর আচরণই সদাচার। তাঁর অনুশাসনই– শাস্ত্র। তাঁর বাক্যই বেদবাক্য। তাঁর জীবন ও লীলাই – শাস্ত্রের প্রমাণ ও ভিত্তি।

ব্রহ্মজ্ঞ গুরু ভারতীয় জাতির ব্যক্তিজীবন, পরিবার ও সমাজজীবন, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতি, ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের যাবতীয় শক্তি ও প্রেরণার মূল উৎস। এদিক থেকে বলা যায় বৈদিক আদর্শের ভিত্তি গুরুকরণ, গুরুপূজা ও গুরু শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে জীবন গঠন, জীবন-যাপন, জাতি ও দেশ গঠন। প্রাচীন ভারতবর্ষে এই গুরুশক্তির মাধ্যমে দেশ ও জাতি সুনিয়ন্ত্রিত ও সুগঠিতরূপে বিরাজ করতো। এই দিক থেকে স্বামী নিগমানন্দজী নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

২৩। স্বামী নিগমানন্দ, জ্ঞানীগুরু, মেহেরপুরঃ গুরুধাম প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ,১৯৬০, পৃ., ৩০৮

"তোমরা আমাকে সদ্‌গুরু বলে জেন।" এই সদ্‌গুরু নাম ধারণ করার কে যোগ্যতা রাখেন তারও প্রমাণও নিজের মুখেই ব্যক্ত করে গেছেন। "কত ব্যাস বশিষ্ঠ পরাশর এই দেহে লীন হয়ে আছে ,তাদের জীর্ণ করে ফেলেছি, অর্থাৎ তাঁদের সমস্ত জ্ঞানরাশি তো আয়ত্ত করেছিই, তাছাড়াও আরও কিছু জানি।"[২৪] "আমি একসঙ্গে ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেছি, আমি যুগপৎ তিনটাতেই প্রতিষ্ঠিত আছি। আমাকে ধরলে তোমাদের ভিতর ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবানের জ্ঞান আপনা-আপনি ফুটে উঠবে।"[২৫] এখানেই প্রমাণ হয়, সদ্‌গুরু কি বস্তু। সদ্‌গুরু স্বামী নিগমানন্দজী কিরূপ যোগ্যতা ও ক্ষমতার আধিকারী ছিলেন ? সমাজ গঠনে তাঁর ভূমিকা কতদূর অগ্রগামী এবং বিস্তৃত, তাঁর সামান্য পরিচয়েই আশা করি যতটুকু উপলদ্ধি করতে পেরেছি তা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একজন সাধারণ সমাজকর্মীর চেয়ে তিনি কি প্রকার জ্ঞানী শক্তিধর সমাজকর্মী ছিলেন ? আলোচ্যাংশে আমি তাঁর সমাজ সংস্কারের বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমবিন্যাস আকারে সজ্জিত করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি– যাতে স্বল্প কথায় সহজ ভাবে বুঝতে এবং পড়তে আগ্রহ জন্মায়।

প্রথমত: জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম সেবাধর্ম। 'সেবা-সহায়ে চিত্তশুদ্ধি' হল সেবকের প্রধান সেবাকর্ম। সমাজের উন্নতি– এরূপ একজন প্রকৃত সেবক দ্বারাতেই সম্ভব। স্বামী নিগমানন্দ এমন কর্মযোগীকেই সমাজকর্মী বলেছেন। যে নিজের জন্য নয়, পরের জন্য জীবন দানে প্রস্তুত।

দ্বিতীয়ত: প্রাচীন ঋষি প্রবর্তিত চতুরাশ্রম প্রথা মাধ্যমেই তিনি চেয়েছেন সমাজের উন্নতি। বাল্যে ব্রহ্মচর্য বা শিশুমঙ্গল আদর্শকে সুদৃঢ় করে গড়ে তুলে যৌবনে আদর্শ গার্হস্থ্ জীবনে প্রবেশ করাকেই তিনি বলেছেন প্রকৃত সমাজ সংস্কার।

তৃতীয়ত: 'নরই সাক্ষাত নারায়ণ, নরের সেবা ব্যতীত নারায়ণের কৃপা হয় না।" এই বাণী মাধ্যমেই স্বামী নিগমানন্দজী তাঁর আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠা করে – আদর্শ গার্হস্থ্ জীবন গঠন মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা দান করতে মনে-প্রণে আশা প্রকাশ করেছিলেন।

২৪। লীলা নারায়ণী দেবী, **নীলাচলে ঠাকুর নিগমানন্দ,** কলকাতাঃ আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, দ্বিতীয় সংস্করণ,১৩৯৭, পৃ.,১৫
২৫। ঐ, পৃ., ১৬

চতুর্থতঃ জীবনের শত ব্যাঘাত দুঃখ, কষ্ট ও আঘাতে মুহ্যমান হলে চলবে না, জীবনটা করতে হবে আনন্দময়। নিজের আনন্দ স্বরূপত্ব বজায় রাখাই হল সমাজ জীবনে একজন সমাজ কর্মীর প্রধান উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য।

পঞ্চমতঃ সমাজে আর্ত-ক্লিষ্ট-রুগ্ন-অনাথ-দরিদ্র এবং অসহায় যারা তাদের জন্য সামাজিক দায়িত্ব জ্ঞানে বা মানবিক কারণে অনেকেই সমাজের কাজে এগিয়ে আসেন, সহায্য করেন কিন্তু স্বামী নিগমানন্দজী একে একেবারে উপেক্ষা না করে বরং চেয়েছেন– 'এ কাজটিও মন্দ নয়, কারণ এতে মানবের হৃদয়ে দয়াগুণ সঞ্চার হয়।

এই দয়াই একদিন সেবা জ্ঞানের চেতনায় মানব মনের উন্মেষ ঘটায়। পরবর্তিতে এই সেবাগুণই তখন আমাদের হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে আত্মবিকাশ লাভ করায়। সামাজিকতা বলতে যা বুঝায় তখনেই তা প্রকৃত প্রতিষ্ঠা পায়। মূলতঃ সমাজকর্মীরা সাধারণ অর্থে সমাজকর্ম বলতে যা বুঝাতে চান তা আপেক্ষিক।

ষষ্ঠতঃ অখন্ড ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। এই জাতির উত্থান ও সমাজ উন্নয়ন করতে চাইলে ক্রান্তদর্শী স্বামী নিগমানন্দজী প্রবর্তিত পঞ্চ নিয়ম ও সপ্ত বিধানযুক্ত ধর্মনিয়মগুলি এ-যুগে পালন অবশ্য কর্তব্য। প্রতি গৃহস্থ প্রতিদিনের জীবন-যাপনে পাঁচটি ঋণে আবদ্ধ হন। প্রথম– দেবঋণ, দ্বিতীয়– ঋষিঋণ তৃতীয়– পিতৃঋণ, চতুর্থ– নৃঋণ, পঞ্চম– ভূতঋণ। এই ঋণগুলি হল ঋষি যুগীয় আদর্শের দিক্ নির্দেশনা। এযুগের ঋষি নিগমানন্দ সেই ঋণগুলি নিজ কাঁধে গ্রহণ করে আরও সহজ করে – আমাদের মুক্তির জন্য উপায় দিলেন, ঋষি ঋণ মুক্তি অর্থে তোমরা প্রত্যেকে ঘরে ঘরে আর্যদর্পণ পাঠ করবে। দেবঋণ মুক্তি অর্থে আমাকে অতিমানব রূপে উপাসনা করবে। গুরু মাতা, গুরু পিতা জ্ঞানে পিতৃঋণ থেকে আমার নিকট তাদের মুক্তি প্রার্থনা করবে। সমাজের আর্ত-ক্লিষ্ট-রুগ্ন-দরিদ্রের সেবা– নৃঋণ জ্ঞানে মুষ্টিভিক্ষা সংরক্ষণ দ্বারা তাদের প্রতিপালন করবে। মঠ, আশ্রম ও গুরুধামে সাহায্য দ্বারা ভূতঋণ রূপে– পৃথিবীর সবার কল্যাণ কামনা করবে। সামাজিক নিত্য নৈমিত্তিক এই বৈশিষ্ট্যগুলি পালন মাধ্যমেই সমাজের প্রকৃত উন্নতি হবে। এইভাবে

পৃথিবীর প্রতি তোমা কর্তৃক যেমন প্রতি প্রত্যেকের চাওয়া পাওয়ার চাহিদা মিটবে তেমনি পৃথিবীরও তোমার প্রতি সমাজের সকল অর্পিত দায়িত্ব কর্তব্য যুগপৎ পূরণ হবে।

সপ্তমত: তিনি দেহে নেই। দেহান্তরিত হয়েছেন। তাই বলে তাঁর মৃত্যু হয়নি; তিনি বরং বাণীমূর্তিরূপে প্রতি মুহূর্ত বর্তমান। আমরা যতদিন বাঁচবো ততদিন তাঁর বাণীই আমাদের প্রতি তাঁর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং চলার পথে এক অনুপম দিক্‌নির্দেশনা। সমাজে এগুলি যথাযথ পালন করাই হল আমাদের সামাজিক দায় এবং মুক্তি মোক্ষের একমাত্র উপায়।

অষ্টমত: নিগমানন্দের সমাজ ব্যবস্থা হল ধর্মভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা। ঐহিক সুখের জন্য আমরা নিজের ধর্মকে বাধ্যতামূলকভাবে অন্যদের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নিজেদের সমাজ ব্যবস্থাকে দুর্বল করে তুলেছি। হিন্দুসমাজ আজ তাই উচ্ছৃংখল অধঃপতিত। বিজাতীয়গণ এই সুযোগে সনাতন ধর্মকে ধর্মান্তরিত করার সুযোগ লাভ করেছে। স্বামী নিগমানন্দজী একারণেই অবগত করালেন, মানব সমাজকে যতদিন ধর্মপথে পরিচালিত করতে না পারছি ততদিন সমাজের মঙ্গল অনিশ্চিত।

নবমত: ক্ষয়িষ্ণু এই হিন্দুসমাজকে রক্ষা নিমিত্ত স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসজী সর্বসাধারণের জন্য সারস্বত সংঘ প্রতিষ্ঠা,আপামর সর্বসাধারণের জন্য ভক্তসম্মিলনীতে যোগদান ও ভাববিনিময় মাধ্যমে সমাজে পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃত হাওয়াথেকে হিন্দুর মুক্তি দান নিমিত্ত– খাওয়া-পরা, চাল-চলন, গমন-ফিরন, সবকিছু যেন বিবেক বর্জিত কর্ম না হয় তিনি

সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। তিনি যে গোঁড়া ছিলেন তাও নয়, ‘বিচার হীন আচার আর উদ্দেশ্যহীন নিষ্ঠা’ তিনি পছন্দ করতেন না। এই ভাবাবেগই যে হিন্দু সমাজের ধ্বংসের মূল কারণ তিনি এজন্য পাঁচখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন।

তাঁর প্রতেকটি গ্রন্থ কুসংস্কার থেকে মুক্তিদান লক্ষ্যেই সঠিক দিক্‌নিদের্শনা স্বরূপ– ‘নিজে আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়’, এই নীতির পৃষ্ঠপোষকরূপে সনাতন আর্যঋষি প্রদর্শিত পথই যে উৎকৃষ্টতম পথ তা তিনি আপন গ্রন্থে

বিচার বিশ্লেষণ মাধ্যমে নিজে সাধনা দ্বারা এবং তা আপন জীবনে প্রতিফলিতরূপে রূপলাভ করেই সমাজের প্রতি সঠিক সিদ্ধান্ত দান করে গেছেন। প্রমাণ করে গেছেন, শাস্ত্রবাক্য যে কখনও মিথ্যা নয় বরং নব্য পন্ডিতদের শাস্ত্রের অপব্যাখ্যাই যে, ভারত ধর্মে বিশৃংখলার অন্যতম কারণ তাঁর লিখিত গ্রন্থ তার উপযুক্ত প্রমাণ। তিনি ছিলেন শাস্ত্রমূর্তি ত্রিকালজ্ঞ জ্ঞানী। ভুল আমাদের মত সাধারণদের হতে পারে কিন্তু তাঁর পক্ষে তা কার্যকর সম্ভব নয়।

দশমত: হিন্দু ধর্মাবলম্বী অথচ সমাজ শাসনে বদ্ধপরিকর নবযুগের এই পুরোধাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন স্মরণীয়। একজন লেখক বলেছিলেন, ‘এ-যুগের মনু বিদ্যাসাগর’। ১৮৫৫ থেকে ১৮৭৩ এই আঠার বৎসর ধরে নবযুগে বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক নির্ণয় করে গেছেন ঈশ্বর চন্দ্র। ধর্মে তিনি ছিলেন অজ্ঞেয়বাদী। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে পরোক্ষে নাস্তিক বলে গাল দিয়েছিলেন। অথচ হৃদয়ের ঔদার্যে মানবধর্মকে ঈশ্বর চন্দ্র যে মর্যাদা দিয়েছিলেন, এ দেশে আজও তা গল্প কথা হয়ে আছে। ‘বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে ’ ছড়া বেঁধে বাংলার সমাজে এই ঠাট্টা অনেকেই করে থাকলেও তিনাকে দয়ার সাগর না বলে কেউ পার পাননি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ, বিজয় কুমার গোস্বামী তাঁকে প্রকৃত অর্থে চিনেছিলেন বলেই তাঁর প্রভূত সম্মান দান করে গেছেন। যদিও তিনি ডিরোজীও শিষ্যদের সগোত্র ছিলেন, কিন্তু জাতীয় কৃষ্টি সভ্যতা রক্ষার্থে ছিলেন বদ্ধপরিকর। সংস্কৃত শাস্ত্রের সাথে ইংরেজি দর্শন শাস্ত্র পাঠ ছাত্রদের অবশ্য বাধ্যতামূলক, এই বিষয়ে তিনি কারও সাথে আপোষ করেন নি। তিনি যে জাতীয় সংস্কৃতির বিরোধী ছিলেন তাও নয়, বরং ধুতি চাদর তাল তলার চটি পরিধান ছিল তাঁর সারা জীবনের আদর্শ। প্রতিদিন নিয়মিত ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী পাঠ, ইংরেজি শিক্ষার পক্ষপাতি হয়েও চিঠিপত্র লিখার সময় চিঠির শিরোনামে ‘শ্রীদুর্গা শরণম্’ বা ‘শ্রী হরিঃ শরণম্’ লিখে জাতীয় ঐতিহ্যকে জীবনভর রক্ষা করে গেছেন। তাঁর মত পরপোকারীর সংখ্যা সমাজে দুর্লভ।

তাঁদেরই উত্তরসুরী হিসাবে শ্রীনিগমানন্দজী সেই সকল আদর্শের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখেও হিন্দু সমাজের প্রকৃত ভিত্তি যে ‘বেদ’ তা নিজ জীবনে নিজ নাম নিগম+আনন্দ =নিগমানন্দ নাম ধারণ করে বেদের

গুঢ় রহস্য উন্মোচন পূর্বক– 'নিগমানন্দ' নামের আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও সার্থকতা দানপূর্বক প্রাচীন আর্যঋষিদের সমাজ ব্যবস্থাই যে প্রকৃত এবং সঠিক সমাজ সংস্কারের কল্যাণমূলক প্রগতি তা তাঁরই অনুগত ভক্ত-শিষ্যদের মাঝে আদর্শ গার্হস্থ জীবন গঠন মাধ্যমে বাংলার বুকে প্রতিষ্ঠা দান করে গেছেন। তিনি যে প্রভূত সমাজ সংস্কার করেছেন তার তুলনা হয় না। পাশ্চাত্যের সাথে প্রতীচ্যের মিলন রক্ষা করেও প্রাচীন আর্যনীতির যে শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থা আমরা নিগমানন্দের জীবনাদর্শেই বরং বেশি করে দেখতে পাই। তাঁর সমাজ সংস্কারের বৈশিষ্ট্যগুলি এখানেই তাৎপর্যপূর্ণ।

৩.৬.৪: সমাজ সংস্কার সম্পর্কে স্বামী নিগমানন্দের মতের পর্যালোচনা

বাংলার ইতিহাসে স্বামী নিগমানন্দজী একটি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রচার প্রসার তেমন নাই বটে কিন্তু তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় "ভরা কলসি", স্বামী ভাস্করানন্দজীর ভাষায়– 'সন্ন্যাসি সমাজের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসি'। তিনি বলে গেছেন, জীবনটা প্রচারের নয়, প্রসারের। আত্মাভিমানকে তিনি সুরাপান এবং আত্মপ্রতিষ্ঠাকে তিনি বিষ্ঠাজ্ঞান করতেন বলেই তিনি সব সময় প্রচার বিমুখ ছিলেন। তাঁর সারাজীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও আদর্শ ছিল স্রষ্টা ও সৃষ্টির জ্ঞানলাভ এবং আত্মার স্বরূপ জ্ঞান দান। সর্বশেষ অবদান– প্রেম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিখিল বিশ্বকে আপন বুকে ধারণ।

বাংলার বুকে শ্রীরামকৃষ্ণের পরেই একমাত্র তিনিই বেদান্তের সর্বশেষ স্তর নির্বিকল্পভূমি ব্যুত্থিত পুরুষ। তাঁকে জানতে ও বুঝতে গেলে সাধনার চরম রাজ্যে গমন ছাড়া গত্যন্তর নেই। বাংলার তিনিই একমাত্র নির্গুণব্রহ্মের নির্দেশিত সদ্‌গুরু পদবাচ্য মহাপুরুষ। প্রকৃত অর্থে তিনিই একমাত্র দেশ জাতি ও সমাজের সংস্কারক, প্রতিকারক ব্রহ্মবিদ্ গুরু। তিনি যখন নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মে, অর্থাৎ– বরফ যেমন সাগরের জলে একবার মিশে গেলে তার স্বরূপ ফিরে পায় না বা নিজেকে আলাদাভাবে ব্যক্ত করতে বা বোধ করতে পারেনা, তিনিও তদ্রূপ নির্গুণ ব্রহ্মে মিশে যাওয়ার পর তাঁর কোন আলাদা বোধ বা অস্তিত্ব ছিলনা। হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন, "আমি গুরু" তখনেই তিনি বুঝতে পারলেন, সেই নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মই তাঁর শরীরকে অবলম্বন বা আশ্রয় করে তাঁর দেহে স্বয়ং ফিরে এসে স্বয়ং তিনিই ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর গুরুসত্তার স্বরূপ। কিন্তু কেন ?

কারণ খুঁজতে গিয়ে বুঝতে পারলেন, এখন থেকে তিনি আর তিনি নন। যা কিছু করবেন, বলবেন, এখন নির্গুণ ব্রহ্মই তাঁর দেহকে অবলম্বন করে করবেন এবং বলবেন। যন্ত্র ও যন্ত্রীর মত। অতএব যিনি এমন গুরুপদবাচ্য তত্ত্ববিদ্ হন, অর্থাৎ শাস্ত্র নির্দেশ আছে– 'সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরই একমাত্র গুরু', তিনি হন জগতের স্বয়ং সত্য সুন্দর ও মঙ্গলময় নির্দেশ কর্তা, উপদেশ দাতা, ভাল-মন্দ সবকিছুর অধিকর্তা। তাঁর দয়ায় যারা আশ্রিত হন তারা হন ভাগ্যবান ও তাঁরই আদর্শিত পথ প্রদর্শক বা অনুবর্তক। স্বামী নিগমানন্দজীর বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য এখানেই অন্তর্নিহিত। তিনি 'আমি গুরু' বোধ লাভ করে হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ কর্তা এবং সমাজের প্রকৃত হোতা। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যখন সবকিছুর নিয়ন্তা তখন তিনি কি জানেন না কি করলে সমাজের উপকার হবে ? স্বামী নিগমানন্দজী এই অর্থে একজন অতুলনীয় সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক এবং সমাজের যথার্থ অনুবর্তক ও প্রবর্তক।

প্রথমত: বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার সাথে স্বামী নিগমানন্দজীর সমাজ ব্যবস্থার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কারণ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা বা সমাজ সংস্কার হল স্বার্থবুদ্ধিগত সংস্কার আর নিগমানন্দজীর সমাজ সংস্কার হল– সত্য শাশ্বত বোধিগত সংস্কার।

দ্বিতীয়ত: নিগমানন্দজী অন্তর্দৃষ্টিতে দেখেছেন, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে। বর্তমানে সমাজ আর সমাজ নেই, এখন সমাজ গেছে অতল গহবরের অতল তলে।

তৃতীয়ত: স্বামী নিগমানন্দজী সমাজকে লক্ষ্য করে তার প্রাণ প্রিয় শিষ্যদের বলেছেন,

> তোমরা বাংলার নানা স্থান হতে বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন সমাজ থেকে এসেছ। এখানে জাতি হিসাবে বা সমাজ হিসাবে কোন উচ্চ নীচ ভেদ নাই। তবে গুণের আদর আছে। তোমরা সবসময় পরস্পরের গুরুভাই। তোমরা প্রতি প্রত্যেকে এক অপরের প্রতি ভালবাসা দেখাবা, একজনের অসুখ হলে আর একজন তার সেবা করবা। যদি তোমাদের কয়জনের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রেম-প্রীতি না থাকে, তবে তোমরা জগতের প্রতি প্রেম দেখাবে কিরূপে ? জগতের সম্মুখে তোমরা দাঁড়াবে কিরূপে ?[২৬]

২৬। পূর্বোক্ত, স্বামী অখন্ডানন্দ সরস্বতী, **শ্রীশ্রী নিগমানন্দের বাণী সম্ভার**, পৃ.,৯৮-৯৯

স্বামী নিগমানন্দজীর সমাজের প্রতি বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য এখানেই তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজ যদি এক অপরকে ভালবাসতে না শিখায়, প্রতি প্রত্যেকের উপকারে না আসে, আপন করে কাছে টানতে না শিখায়– তবে সেটা কি সমাজ হল ?

চতুর্থত: দেশ জাতি ও সমাজ সম্পর্কে স্বামী নিগমানন্দজী আরও ব্যক্ত করেছেন:

> এখন গৃহস্থদের পক্ষে কঠিন যুগ পড়েছে, এটা বিরোধের যুগ। রাষ্ট্রে , সমাজে, পরিবারে, ধর্মে, সাহিত্যে– সব দিকেই বিরোধ। স্ত্রী স্বামীর মতে চলছে না, পুত্র পিতার কথা শুনছে না, সব দিক দিয়ে শুধু বিরোধ আর অসামঞ্জস্য । এদিকে আবার সমাজ সংস্কার করার জন্য দেশের নেতারা খুব চেষ্টা করছে; সমাজই যে এখন নাই, তার আবার সংস্কার করবে কি ? মাথা নেই তার আবার মাথাব্যথা। বরং দেশের মধ্যে যেটুকু বর্ণবিভাগ বা শৃংখলা ছিল তা ওরাই শেষ করে গন্ডগোল পাকিয়েছে। যে যেদিকে সুবিধা পাচ্ছে সে সেদিকেই ধেয়ে চলছে। জাতীয় উন্নতির পথ এখনও ঠিক হয় নাই, কেবল গোলে হরিবোল দিয়ে গড্ডালিকা প্রবাহের মত নিত্য নতুন মতবাদের পিছনে আমাদের দেশের লোক ঘুরে মরছে। শান্তি নাই, আনন্দ নাই, তবুও ছুটছে সব হুজুগে, আর খুব হয়রাণও হচ্ছে। আমার উপদেশ হচ্ছে– তোমরা সকল রকম বিরোধ থেকে নিজেদের নিরপেক্ষ রাখবে। তোমরা কারও কথার প্রতিবাদ কর না, আর কারও সঙ্গে বিরোধ কর না। যে কোন বিরোধ বিসম্বাদে তোমরা প্রাচীন পন্থী হয়ে চলবে। সপক্ষেও নয় বিপক্ষেও নয়– যেন নিরপেক্ষ ভাব। নিরপেক্ষের নির্যাতন বেশি নয়, আর বিরোধেরও প্রয়োজন নাই, নিজ নিজ সমাজ ও ধর্মের ভিত্তি ঠিক রেখে অধিকাংশের পথে চলবা।[২৭]

স্বামী নিগমানন্দের সমাজ সংস্কার বিষয়ক যে সঠিক সিদ্ধান্ত; আজ তা সমাজ– উপেক্ষা করলেও কোন যায় আসে না। কারণ সত্যের ক্ষয়ও নেই, পরাজয়ও নেই। সত্যের অক্ষয় জয় একদিন হবেই । শৃংখলার মাঝে – মাঝে-মাঝে বিশৃংখলা প্রবেশ করাই প্রকৃতির ধর্ম, এই বিশৃংখলাই হল বর্তমান আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা। নিগমানন্দজী এজন্যই সতর্ক করে দিলেন:

২৭। ঐ, পৃ., ৮৮

> সমাজে এক-আধটু নির্যাতন যদি সহ্য করতে হয়, তাও ভাল। আর তা করতেও হবে। কারণ আমরা যে ভাবটা প্রতিষ্ঠা করবো বলে ইচ্ছা করছি, সমাজ তার বিরোধী। আদর্শ গার্হস্থ্ জীবন প্রতিষ্ঠা মাধম্যেই আমি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই।[২৮]

হয়তো সেটা একেবারে পরিপূর্ণ হবে না। তাই বলে এটি ঠিক নয় যে, সত্য উপেক্ষা করে এর প্রচেষ্টা করা বৃথা। সত্যের সংগ্রাম চলে আসছে, চলছে ভবিষ্যতেও চলবে। সাময়িক উত্থান ও পতন প্রকৃতির ধর্ম। "চরৈ বেতি" উপনিষদ্ বাণী একারণেই আমাদের সচেতন করে জানিয়ে দিচ্ছে– কখনও পিছনে ফিরে তাকাবেনা। সামনে এগিয়ে চল। এগিয়ে চলাই জীবন, পিছিয়ে পড়াই মরণ।

নিগমানন্দজীর এই প্রাচীন মতবাদ বর্তমান সমাজে অচল বলে কারও মতে প্রতীয়মান হলেও একটি কথা অস্বীকার করা উচিত হবেনা যে, ভিত্তি মজবুত না করে কখনও কিন্তু ইমারত গড়া বিচক্ষণতার পরিচয় নয়। তা যে কোন মুহূর্তে ধ্বসে পড়তে পারে। বনিয়াদ যদি একজন আদর্শ গৃহস্থের শক্ত মজবুত না হয়, তার আপন সন্তান যদি তার পিতামাতার আদর্শ অনুবর্তি না হয়, এবং অনুকরণপ্রিয় সন্তান যদি সেই গুণগুলি শিখতে ব্যর্থ হয়, পিতা ও মাতা এবং গুরুজনদেরকে যদি সম্মান করতে না শিখে, সুশিক্ষা যদি গ্রহণ করার সুযোগ না পায়, মনীষী বার্ণাডশোর ভাষায় যদি – ' One mother guided one hundred teachers.' এই সত্যটি প্রতিষ্ঠা না পায়, মায়ের মাতৃত্বের আদর্শরূপ গুণটি মিথ্যা পরিণত হয়, তাহলে একজন মা যে একশতটি শিক্ষকের সমান, এর বাস্তবতা কথায় দাঁড়ায়, বিষয়টি ভাববার বিষয়। অতএব পুরাতনকে রক্ষা করেই যে নতুন এবং নতুনকে বরণ করেই যে পুরাতনের অগ্রযাত্রা এবং উভয়ে মিলেমিশেই যে জীবনের পথ চলা, এইভাবে পুরাতনের শুভ চিন্তা ও আদর্শ গুণগুলি এবং নতুনের শুভ চিন্তা ও চেতনার গুণগুলি নিয়ে– বাড়তি বারাবারিগুলিকে প্রত্যাখান ও জঞ্জালমুক্ত করে; সামনে এগিয়ে চলাই কি উচিত নয়? স্বামী নিগমানন্দজী তাঁর সমাজ সংস্কারে এটাই প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী ছিলেন।

২৮। ঐ, পৃ., ৮৯

পঞ্চমতঃ সমাজের উন্নতি বলতে শুধু অর্থনীতির উন্নতি নয়, আদর্শের উন্নতি চাই। অর্থ, ভোগবিলাস, ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ একবিংশ শতাব্দীর উন্নতির ঘোষণা হলেও ন্যায় নীতি ও আদর্শের ঘোষণা চিরকাল বর্তমান। একে পিছিয়ে টেনে আনলেও একদিন ক্রমবির্তনের ধারায় তা এগিয়ে আসবেই। স্বামী নিগমানন্দজী তাই পুরাতনের আদর্শকে বাস্তব জীবনে কাজে লাগিয়ে সমাজের উন্নতি প্রত্যাশা করেছেন। ঋষি নিগমানন্দ তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে তাই দেখে জগতবাসীকে তাঁর অনুভূতি প্রকাশ দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, নিজে সচেতন হয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করাই হল তাঁর মতে সমাজ সচেতনতা।

৩.৬.৫: উপসংহার

সমাজ সংস্কার বিষয়ে প্রাচীন হিন্দু সমাজ মূলতঃ চতুর্বর্ণে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) বিভক্ত হলেও পরবর্তিকালে পরস্পরের সাঙ্কর্যবশত ও অন্য নানা কারণে এই বর্ণ বিভাগ তার মৌলিক রূপ ও চরিত্র অনেকটা হারিয়ে ফেলে। ফলে বহু সঙ্কর বর্ণের উদ্ভব হয়। বর্তমানে হিন্দু সমাজে বিশেষত বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুসমাজে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের উপস্থিতি বলা যায় একেবারে নগণ্য। এই দুই বর্ণ দেখা যায় বৃহৎ শূদ্র বর্ণে প্রায় মিলে মিশে একীভূত হয়ে গেছে এবং সম্পূর্ণত না হলেও অংশত একারণেই শূদ্রবর্ণের মধ্যেও বহু উপবর্ণের সৃষ্টি হয়েছে এবং সৎশূদ্র অসৎশূদ্র প্রভৃতি উচ্চ নিম্ন জাতিভেদ সৃষ্টি হয়েছে।

জাতিভেদের মূল সূত্র প্রাচীন যুগে যে জন্মসূত্রে হয়নি এবং পরবর্তিতে মানুষের বৃত্তি স্বভাব ও কর্মের অধিকারভেদ থেকেই যে এর উদ্ভব হয়েছে। এর প্রমাণ পাই 'ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণ প্রসঙ্গ' নামক গ্রন্থে। মহাপন্ডিত ম্যাক্সমূলার সাহেব দৃঢ়মত ব্যক্ত করে বলেন, "মনুস্মৃতিতে এবং বর্তমান যুগে যে জাতি বর্ণ প্রথা প্রচলিত তা বৈদিক সমাজে কখনও প্রচলিত ছিলনা। প্রাচীনকালে সবাই এক বর্ণ ছিল। পরে গুণ কর্মানুসারে বর্ণ বিভাগ হয়েছে।"[২৯]

২৯। উদ্বৃত, কানাইলাল রায়, **ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণপ্রসঙ্গ**, ঢাকাঃ বাংলা বাজার, আনন্দ পাবলিসার্স, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ এপ্রিল, পৃ., ২৮

আমি উপসংহারে বর্তমান সামাজিক এই চিত্রটি উপস্থাপন করলাম এই কারণে যে, জাতি সমাজ বর্ণ ও গোত্র এগুলি সমাজের প্রয়োজনে আমাদের নিকট সামাজিক বিধান মনে হলেও প্রাচীন ঋষি আদর্শিত সমাজ ব্যবস্থার সাথে এর একটু পার্থক্য আছে। কারণ প্রচীনকালে সবাই এক বর্ণ ছিল। গীতা একারণেই পরবর্তিতে জাতি ও বর্ণকে গুণ ও কর্মের সাথে সংযুক্ত করে বিভক্ত করেছেন। মূলতঃ এই অর্থেই সমাজে বর্ণবিভাগ। কাউকে ছোট বড় করা অর্থে বর্ণ বা জাতিভেদ প্রথা বেদ উপনিষদে কোথাও উল্লেখ নেই। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গূণ কর্ম ও জ্ঞানের এবং তার অন্তরস্থ জাগ্রত সত্তার বিশেষ বিকাশ ও উন্মেষের কারণেই সমাজে পর্যায়ক্রমে অধিকারভেদে কেউ বড়, কেউ ছোট বোধ মনে হলেও ভারত ধর্মের মূলমর্ম – "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং" হৃদদেশে অর্জুন তিষ্ঠতি, এক ঈশ্বরই সকলজীবে একরূপে বিদ্যমান। ব্যবহারিকভাবে আমরা আমাদেরকে আলাদা মনে করলেও অন্তরে আমরা পরস্পর এক। পৃথিবীর সকল জীবের ভিতর এক চৈতন্যসত্তার শক্তিতেই আমরা পরস্পর আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু এটা কখনই ঠিক নয় যে, কাউকে বাধ্য করে বা সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে ছোট-বড় জাতে পরিণত করা হয়েছে। জাতি গঠন হয়েছে গুণ ও কর্মানুপাতে।

পরমহংস নিগমানন্দের জীবনে জাতিগঠনোপযোগী বস্তুতন্ত্র উপাদান বহুল পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। তিনি আপন জীবনে নানাপ্রকারের মত ও পথের সুষ্ঠু সমাহার করলেও প্রত্যেক পন্থাকেই যথাযোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখিয়ে গেছেন। ভারতের ঋষি প্রবর্তিত সনাতন ধর্মের প্রচার করা ছাড়া তিনি নতুন কোন সম্প্রদায় বা অভিনব মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন নাই। এখানেই তাঁর জীবন সাধনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এই বিষয়ে পরমহংস নিগমানন্দদেব সকলকে জ্ঞাত করালেন,

> যদি জাতীয় উন্নতির জন্য আন্তরিক ইচ্ছা থাকে তবে রাজনৈতিক ব্যাপারে ও সভা-সমিতিতে বিশেষ মনোযোগ না দিয়া আমাদের প্রধান কর্তব্য হইবে নিজ নিজ ছেলেদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধন করিতে সর্বান্তঃকরণে চেষ্টা করা।... "লোক ছাত্র জীবনে ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বন করিয়া গার্হস্থ্যাবলম্বী হইলে তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণ নিশ্চই হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ, সৎসাহসী, দীর্ঘজীবী ও ধার্মিক হইবে। তাহা হইলে সমাজিক উন্নতি, জাতীয় উন্নতি, ধর্মনীতির উন্নতি সকল উন্নতিই আপনা আপনি হইবে। সোনার ভারত আবার সোনার হইবে।"[৩০]

৩০। স্বামী জ্ঞানানন্দ সরস্বতী, **শতবর্ষ আর্য-দর্পণ স্মরণিকা**, কলিকাতাঃ হালিসহর, আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, প্রথম প্রকাশ ১৪১৫, জানুয়ারি, ২০০৮, পৃ., ২০৬, ২০৭

আমাদের স্মরণে রাখতে হবে, সমাজ একটি নিয়মতান্তিক পদ্ধতি। নিয়ম নীতি মেনে চলা সবার জন্য ভাল এবং উপকার। ঋষি শেতকেতু একারণেই বৈদিক যুগে সমাজনীতি প্রবর্তন করেন। এই নীতিকে অনুসরণ করেই হিন্দুধর্মের সমাজে দশবিধ সংস্কার নামে একটি বিধান শাস্ত্র নির্দেশ রূপে তৎকালীন সময় থেকে সুন্দর সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। এই সংস্কারগুলি ছিল সম্পূর্ণ জ্ঞানভিত্তিক ও মানবকল্যাণমূলক। বড় কেন ছোট হবে এবং ছোট কি করলে বড় হবে, এই ব্যবহারিক ধারণাগুলি দূর করে ঋষিগণ শাস্ত্রে উল্লেখ করে গেছেন, কেউ বড় কেউ ছোট এই অর্থে বর্ণ বিভাগ হয়নি। মানুষ মাত্র সবাই সমান। সবার ভিতর এক আত্মাই বিরাজিত। আমারা অন্তরে কেউ আলাদা নই, বাইরে নাম, রূপে, ব্যবহারে, কর্মে ,আচরণে ও স্বভাবে এবং রুচি প্রকৃতি ও প্রণালীভেদে পরস্পর নিজেরাই নিজে ভাগ করে আলাদা হয়ে উঠেছি।

পৃথিবীতে নানা বর্ণে নানা জাতি ও গোত্রে পরিণত হয়ে বিদ্বেষ বৈষম্য সৃষ্টি করে নিজেকে এবং দেশ জাতি ও সমাজকে কলুষিত করে তুলেছি। যুদ্ধবিগ্রহ খুণ জখম নির্যাতন জুলুম হিংসা অহংকার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ও সৃষ্টি করে সমাজ সংস্কারক সেজেছি। সমাজ সংস্কার যে এভাবে কখনও স্বাভাবিক হবে না তার প্রমাণ আধুনিক সমাজ সংস্কারের প্রতি আধুনিক সমাজবিদ্ পন্ডিতদের সমাজ সংগঠন মূলক নির্দেশনা, যা আজও আলোর মুখ দেখতে পায়নি।

অতএব আমাদের উচিত হবে– আমরা সবাই এক স্রষ্টার সৃষ্টি, সবাই আমরা এক স্রষ্টাকে স্বীকার করি এবং মানি, আমরা পরস্পর ভাই, একে অপরের উপর নির্ভরশীল, আমরা সবাই সুখ আনন্দ ও ভালবাসাকে প্রাণে আঁকড়িয়ে ধরে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করি, ভালবাসাই আমাদের একমাত্র জীবন পাথেও। ভালবাসার জন্যই আমরা পৃথিবীতে জন্মেছি। এই ভালবাসাই পারে জাতি-ধর্ম-বর্ণ বিদ্বেষের হাত থেকে রক্ষা করতে, সমাজে শান্তি দান করতে। পৃথিবীর মানুষকে এক ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতে। স্বামী নিগমানন্দজী এই ভাবটি প্রতিষ্ঠা করার জন্যই এবার এই জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, “আমি চাই তোমরা প্রতি প্রত্যেকে প্রাণভরে ভালবাস। এই ভালবাসাই তোমাদের সকল অভাব পূরণ করবে।”

চতুর্থ অধ্যায়

বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও নিগমানন্দের ধর্ম বিষয়ক চিন্তাঃ

৪.১ঃ বিবেকানন্দের ধর্ম-চিন্তা

৪.১.১ঃ ভূমিকা

ধর্ম শব্দটি এক কথায় বললে ঈশ্বর-উপাসনা-পদ্ধতি অথবা আচার নিয়ম নিষ্ঠা প্রতিপালন ও পরকাল বুঝি। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ধর্ম শব্দটিকে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। শাস্ত্র বলেছেন, 'ধ্রীয়তে ইত্যাহু ধর্ম স এব পরম প্রভু।' বিশ্বের যা কিছু ধারণ করে আছেন এমন এক শক্তি, তিনিই ধর্ম। তবে বিবেকানন্দ ধর্ম শব্দটিকে দুটি অর্থে ব্যবহার করেছেন। ধর্মের এই দুটি রূপই আমাদের আলোচ্য, এবং বিশেষভাবে আলোচ্য এই কারণে যে, যে– অর্থে ধার্মিক হওয়া বলতে তিনি ঈশ্বকে প্রত্যক্ষ করা বা তাঁর জ্ঞানলাভ করাকে বুঝিয়েছেন, এ অর্থে ধর্ম ও মোক্ষ সমার্থক।

আজকাল আমরা ধর্ম শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করি তা উভয়ার্থক। কোন বাঞ্ছিত ফল– ইহলোক ও পরলোক কোন বাঞ্ছিত বস্তু লাভ বা অভ্যুদয়ের জন্য অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকেও ধর্ম বলি। আবার ইহ -পরলোকাতীত ভগবান লাভের জন্য অনুষ্ঠিত প্রচেষ্টাকেও ধর্ম বলি। চরম সত্যের বাচক হিসেবে ঈশ্বর শব্দটি স্বামীজির প্রিয় ছিল। ঈশ্বরের সগুণ ও নির্গুণ প্রকাশ উভয় অর্থেই তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। অতএব ঈশ্বরই ধর্ম, ধর্মই ঈশ্বর। স্বামীজি অন্যত্র আবার বলেছেন, 'মানব হৃদয়ের ঐশী শক্তি বিকাশই ধর্ম।' এই ঐশী শক্তিই আত্ম শক্তি। যা প্রতি হৃদয়ে বিবেক রূপে এক অনাবিল শান্তির আশ্রয় হিসেবে অবস্থান করছেন। যেখান থেকে মানুষ পায় অজানার সন্ধান, অফুরন্ত সুখের ইসারা, সত্য কি, তা বেছে নেওয়ার অত্যাশ্চর্য শক্তি।

৪.১.২ঃ ধর্ম বলতে বিবেকানন্দ কী বোঝান?

স্বামীজি পরিষ্কার করে ধর্ম বলতে বুঝিয়েছেন, মানব জীবনের চরম লক্ষ্য মোক্ষলাভ বা পূর্ণজ্ঞানলাভ অথবা ঈশ্বরলাভ। মীমাংসকদের অর্থে ব্যবহৃত এই ধর্ম আবার– চতুর্বর্গের ধর্ম বা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক

অভ্যুদয়। যা অধিকাংশ অধিকারীর পক্ষেই একান্ত প্রয়োজন বলে তারা এটি মানেন ও স্বীকার করেন। ধর্ম ক্রিয়ামূলক বলেই প্রয়োজন কারণ তা তামসিকতা বা জড়ত্বকে কাটিয়ে দিতে পারে। আর এই কার্যের সঙ্গে ভগবৎ চিন্তা বা আত্মচিন্তাকে যে কোনভাবে জড়িয়ে রাখলে তার ফল রাজসিকতাকে দমিয়ে ক্রমে সাত্ত্বিকভাবের উদয় ঘটিয়ে মানুষকে মোক্ষলাভের যথার্থ অধিকারী করে তোলে, স্বামীজির ধর্মমতের বিশেষত্বের মধ্যে এটিও একটি। আমরা অবগত আছি, কর্ম করতে গেলেই কিছু না কিছু পাপ আসবেই। এলোই বা- তবুও উপসের চেয়ে আধপেটা খাওয়া কি ভাল নয় ? কিছু না করে জড় হয়ে থাকার চেয়ে ভাল-মন্দ মিশ্রিত কর্ম করা কি ভাল নয় ? প্রাথমিক অবস্থায় কিছু না করাকে সাত্ত্বিক ভাব বলে অনুকরণ করতে গিয়ে মানুষ মহা তামসিকতায় ডুবে যায়। কিন্তু দুই রকম কর্মের কিছু না করার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। সত্ত্ব প্রাধান্য অবস্থায় মানুষ ধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হয়, রজঃ প্রাধান্যে ভাল-মন্দ ক্রিয়া করে। তমঃ প্রাধান্যে আবার নিষ্ক্রিয় ও জড় হয়, এ পর্যায়ে স্বামীজির একটি উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য:

> প্রাণহীন জড় প্রায় শক্তির অভাবে ক্রিয়াহীন মহা তামসিক অবস্থা থেকে সুখ-দুঃখের পার ক্রিয়াহীন শান্তরূপ সত্ত্ব অবস্থায় যা ঈশ্বর লাভ করার জন্য অবশ্য প্রয়োজন, যেতে হলে আমাদের রাজসিকতার ভিতর দিয়েই যেতে হবে, কর্ম সহায়ে তামসিকতাকে কাটিয়ে ঈশ্বর চিন্তা সহায়ে রাজসিকতার দোষ কাটিয়ে যেতে হবে। আর এ জন্যই 'ধর্মের' চেয়ে মোক্ষটা অবশ্য অনেক বড়। কিন্তু আগে ধর্মটি করা চাই।[১]

কর্মের মাধ্যমে মোক্ষলাভের যথার্থ অধিকারী হওয়ার জন্য কেবল কর্ম নয়, সেই সঙ্গে যে কোনভাবে ভগবৎ চিন্তাকে জড়িয়ে রাখার কথা বলে গেছেন স্বামীজি।

> ভগবানের পূজা জ্ঞানে কাজ কর, অহংটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাজ কর, ভক্তি বা জ্ঞান অবলম্বনে কাজ কর। এই কর্ম যেমন পূজা-হোমাদি কর্ম, তেমনি পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কর্তব্য কর্মও। নবযুগে স্বামীজির বিশেষ বাণী ঃ যে কোন কর্মক্ষেত্রে মানুষকে ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা কর। আগামী পঞ্চাশ বছরে আমাদের গরীয়সী ভারত মাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন।[২]

১। স্বামী বিবেকানন্দ, **স্বামীজির বাণী ও রচনা**, কলিকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়– ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৮৩, পৃ., ১৫৩
২। ঐ, পৃ., ১৯৮

স্বামীজির এই উক্তিগুলি কেবল লোক কল্যাণ সাধন নয়– ঈশ্বরের পূজা জ্ঞানে মানুষের সেবা– যা একদিকে ব্যষ্টিকে ঈশ্বর লাভের পথে এগিয়ে দেবে– অপরদিকে সর্ববিধ অকল্যাণের মূল কর্মীর ব্যক্তিগত স্বার্থকে ক্ষীণ ও পরিশেষে বিনষ্ট করে– পারিবারিক, সামাজিক, দেশগত, ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আধুনিক সর্ববিধ সমস্যার সমাধানও এনে দেবে। তাই স্বামীজির এই ঈশ্বরের পূজা জ্ঞানে কর্মকে নবযুগের মহামন্ত্রও বলা যায়। এ মন্ত্রে নিজের জন্য চাওয়ার কিছু নেই, আছে কর্তব্যের আহ্বান– অপরকে কিছু দেবার প্রেরণা যা ভারতের সনাতন সমাজ ব্যবস্থা ধারার একান্ত অনুসারী।

স্বামীজি বলেছেন, "ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে এক অনন্ত সত্তা রয়েছে। এই ক্ষুদ্র পিন্ড যাকে আমরা জগৎ বলি, এবং এর অতীত অনন্ত সত্তা, এই দুটি বিষয়ই ধর্মের অন্তর্গত যে ধর্ম এই উভয়ের মধ্যে একটিকে নিয়ে ব্যাপৃত তা অবশ্যই অসামঞ্জস্য। ধর্মকে এই উভয় দিক দিয়েই আলোচনা করতে হবে।"[৩] বিবেকানন্দ মনে করতেন, যথার্থ ধর্মে, সার্বজনীন ধর্মে, এ দুটোই থাকা চাই। কারণ সাধারণ মানুষকে স্থূল অবলম্বন করেই, সূক্ষ্মকে ধারণ করতেই হয়, তাছাড়া উপায় নাই। ভগিনী নিবেদিতার ভাষায় এই আদর্শ জাগতিক ও আধ্যাত্মিক ভেদের সীমা রেখাটি মুছে দিয়েছে। আমাদের শিখিয়েছে গৃহস্থালী, অফিস, বিদ্যায়তন, ক্ষেত-খামার, কল-কারখানা সবকিছুতে মন্দিরের সাধুর আশ্রমের পরিবেশ নিয়ে আসতে। এ আদর্শ যাকে মোক্ষ ও ধর্মের সমন্বয় বা মোক্ষাভিলাষী যেই ধর্মই বলিনা কেন এটি মানব প্রগতির একমাত্র পথও।

স্বামীজির ধর্ম বিষয়ক এই সামগ্রিক চিন্তাধারাকে বর্তমান যুগের জগতের জন্য তাঁর ধর্ম বিষয়ক আলোচিত ব্যাখ্যাগুলি অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ ও গুরুত্ববহ। তিনি ধর্ম বলতে শুধু মাটির প্রতীমারূপী ঈশ্বরকে এবং মন্দিরে বসে ভক্তিভাবে পূজার্চনাকেই ধর্মের মূল্যদান করেন নি, তিনি যে ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁর পূর্বে অতীতে 'কর্মকেই ধর্ম জ্ঞান' করার কথা আর কেউ এমন করে সরাসরি বলেননি। পরপোকারও যে ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ এবং পরের হিতের জন্য জীবন উৎসর্গ করলেই যে ঈশ্বর বা ধর্ম লাভ হয় বা 'জীব রূপে শিব সেবা' হয়, অতীতে এমন করে আর কেউ বুঝিয়েও বলেন নি।

৩। ঐ, পৃ., ৩২৬

সামান্য আলোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, স্বামীজির ধর্ম আর অন্যান্য ধর্মপ্রবক্তাদের ধর্মে পার্থক্য এটাই যে, মনের কোনে, বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ের গুহায় ধর্ম সীমাবদ্ধ নয়। ধর্ম এই পরিদৃশ্যমান জীব জগতের মানবের মাঝে। মানুষ সেবাই হল প্রকৃত ধর্ম।

স্বামীজির ধর্ম বিষয়ক এই সামগ্রীক চিন্তাধারাকে বর্তমান যুগের জগতের জন্য তাঁর ধর্ম বিষয়ক আলোচিত ব্যাখ্যাগুলি অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ ও গুরুত্ববহ। তিনি ধর্ম বলতে শুধু মাটির প্রতীমারূপী ঈশ্বরকে এবং মন্দিরে বসে ভক্তিভাবে পূজার্চনাকেই ধর্মের মূল্যদান করেন নি, তিনি যে ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁর পূর্বে অতীতে 'কর্মকেই ধর্ম জ্ঞান' করার কথা আর কেউ এমন করে সরাসরি বলেননি।

পরপোকারও যে ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ এবং পরের হিতের জন্য জীবন উৎসর্গ করলেই যে ঈশ্বর বা ধর্ম লাভ হয় অতীতে এমন করে আর কেউ বুঝিয়েও বলেন নি। সামান্য আলোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, স্বামীজির ধর্ম আর অন্যান্য ধর্মপ্রবক্তাদের ধর্মে পার্থক্য এটাই যে, মনের কোনে, বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ের গুহায় ধর্ম সীমাবদ্ধ নয়। ধর্ম এই পরিদৃশ্যমান জীব জগতের মানবের মাঝে। মানুষ সেবাই হল প্রকৃত ধর্ম।

৪.১.৩: বিবেকানন্দের মতে ধর্মের বৈশিষ্ট্যসমূহ

বিবেকানন্দজী মতে ধর্মের বৈশিষ্ট্য সমূহ আলোচনার প্রাক্কালে ধর্মের ভিত্তিকে স্বামীজি মহারাজ যে বাণী দ্বারা এর মূল্যদান করেছেন তা আলোচনা করলেই বুঝতে সক্ষম হব যে, স্বামীজির ধর্মবিষয়ক চিন্তা ধারার বৈশিষ্ট্য গুলি কি ?

> স্বামীজি বলেন: আত্মা (ঈশ্বর) মাত্রই অব্যক্ত ব্রহ্ম, বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করে আত্মার এই ব্রহ্মভাব – ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান ইহাদের মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায়ের দ্বারা নিজের ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও, এটিই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ মতবাদ, অনুষ্ঠান পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির, বা অন্য বাহ্য ক্রিয়াকলাপ এর গৌণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাত্র।[৪]

৪। বিবেকানন্দ, **বাণী ও রচনা**, কলিকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭০, পৃ.,২০৪

আত্মা ও ব্রহ্ম ঃ- আত্মা বলতে এখানে খুব সহজ ভাষায় আমাদের মধ্যে যে চেতন সত্তা, যে চিন্তা করে, যে বিচার করে, সুখ-দুঃখাদি অনুভব করে, দেহাদিকে 'আমি' 'আমার' মনে করে তাকেই বুঝায় এর অন্য নাম জীবাত্মা। একটি স্থূলদেহ ত্যাগের পর এই আত্মা বা জীবাত্মাই দেহান্তর গ্রহণ করে। ব্রহ্ম বলতে বোঝায় জগৎ ও জীবনের যা মূল সত্য তাই। সেই সত্য থেকেই জীব জগত সৃষ্টি হয়েছে, তাকে অবলম্বন করেই সব আছে। আবার বিনাশের পর তাতেই সবকিছু লীন হয়ে যায়। এই ব্রহ্ম বা মূল সত্য জীবাত্মারও আত্মা। এরই চৈতন্যের সংস্পর্শে এসে মন বুদ্ধিকে চেতন বলে মনে হয়। এই ব্রহ্মাই, শুদ্ধ চেতনাই এবং মনবুদ্ধাদি বিমুক্ত চেতনাই– বিশ্বে একমাত্র চেতন সত্তা। স্বামীজির ধর্মমতের প্রধান বৈশিষ্ট্য এটি।

আমার আপনার ভিতর, পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গের ভিতর দেবতার ভিতর এমন কি অবতার ঈশ্বরাদি পুরুষের ভিতরও এই এক অদ্বিতীয় চেতনাই প্রকাশ। বিভিন্নতা যা প্রকাশ পায়– তা মন-বুদ্ধাদি প্রকাশের মাধ্যমের বিভিন্নতার জন্যই। এই ব্রহ্ম বা চরম সত্যকেই বিভিন্ন ধর্মমত ও সম্প্রদায় সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ঈশ্বর, কালী-শিব, নারায়ণ, আল্লা ,গড প্রভৃতি নামে আখ্যাত করেছেন। এই ব্রহ্ম এক আনন্দময় চেতন অবিনাশী সত্তা– সচ্চিদানন্দ এই ব্রহ্মই আমাদের স্বরূপ– দেহ,মন, বুদ্ধি প্রভৃতি আমার স্বরূপ নয়, আমরা ভুল করে অজ্ঞান বা মায়ার জন্য বা ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিজেদের দেহ-মনাদি যুক্ত বলে ভাবি। এই ব্রহ্ম শুধু আমাদেরই দেওয়া নাম, কিন্তু তিনি বিশ্বের সব কিছুরই স্বরূপ মূল সত্তা। এই ব্রহ্মই জীব জগৎ রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। তিনি সৃষ্ট হয়েছেন, সৃষ্টি করেন নি। এটাই সনাতন ধর্মের বেদভিত্তিক সৃষ্টির আদি মর্মার্থ। যা অন্য ধর্মে এমন করে স্পষ্ট করা হয়নি।

বিবেকানন্দ এই সত্যটিকে অতি সংক্ষেপে সূত্রাকারে বলেছেন, ভগবান লাভের দুটি প্রধান পথ– 'জ্ঞান ও ভক্তি।' এই দৃষ্টিকোণ থেকে আবার বলেছেন, "হয় বলো সবই আমি, না হয় বলো সবই তুমি।"[৫]

৫। ঐ, পৃ., ৫১

বিবেকানন্দ মনে করতেন, সত্তা বা বস্তু সম্বন্ধে বিশ্বে দুই বলতে কিছু নেই। সবকিছু 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' । তিনি এক, তাঁর দ্বিতীয় বলতে কিছু নেই । যা কিছু বৈচিত্র্য প্রতিভাত হয় তা ভ্রমবশতঃ । সূত্রাকারে বলেছেন, এই যে বৃক্ষটি এর ভেতর সত্তা হচ্ছেন– ব্রহ্ম, আর বৃক্ষত্বটা মায়া । মায়া বলতে স্বামীজির মতে যা ঘটছে তারই বিবৃতি মাত্র । সত্যকে অন্যরূপে দেখার বিবৃতি মাত্র । সত্যকে অন্যরূপে দেখার উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, একটি শলাকাকে যদি খুব জোরে ঘুরানো যায় তবে তা আলোকের বৃত্তাকার রূপে দেখায় । আসলে কি সেটি বৃত্ত ? এই অসত্যকে সত্য রূপে দেখানোই হল মায়ার খেলা । যেমন 'রজ্জুতে সর্পভ্রম', 'মরিচিকাকে বারি' রূপ দেখানো, ঠিক তদ্রূপ । অনুরূপ এক অদ্বিতীয় চেতন আনন্দময় সত্তা, ব্রহ্ম ছাড়া বিশ্বে দ্বিতীয় কোন সত্তা নেই । তাঁকেই বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নরূপে দেখি আমরা । এই প্রসঙ্গে স্বামীজি বলেছেন:

> যখন বর্হিরিন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দেখি, তাঁকে স্থুল জগৎ রূপে দেখা যায়, যখন সোজাসুজি মন, বুদ্ধি মাধ্যমে দেখি তখন সূক্ষ্মজগৎ রূপে দেখা যায় । সূক্ষ্ম দেহীর দেবতাদির বা ঈশ্বরীয় রূপের দর্শন হয়, তাকেই যখন আবার মন-বুদ্ধির পারে গিয়ে দেখি, অদ্বিতীয় নির্গুণ, নিরাকার, আনন্দময় অবিনাশী চেতন সত্তারূপে নিজেরই স্বরূপ রূপে প্রত্যক্ষ করি ।[৬]

প্রেক্ষিতে স্বামীজির ধর্মমতের বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা নিম্নরূপভাবে আলোচনা করতে পারি , যেমন–

প্রথমতঃ আলোচ্য বৈশিষ্ট্যটি হল, ঈশ্বর যদিও 'অবাঙ্মানসগোচরম্' অর্থাৎ বাক্য মনের অতীত । তবুও যুক্তি সহায়ে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে বলেন নি– এ অনুমান বা তাঁর যুক্তির সিদ্ধান্ত মাত্র । বেদ, উপনিষদ এবং গীতা শাস্ত্রে বলা আছে এ এ সত্য সম্বন্ধে যুক্তি বিরোধীও কিছু নেই । সে জন্য নিজ প্রত্যক্ষ অনুভূতির ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত মনও নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে শুনেছেন বলেও নয়, বরং বলেছেন, নিজে প্রত্যক্ষ করে । যুক্তি যতদূরে যেতে পারে তার ভিতর যুক্তির পথেই এ বিষয়ে আধুনিক মন-বুদ্ধি সংশয়গুলির নিরসন করেছেন । এই বিষয়ে স্বামীজি বলেন:

---

৬ । ঐ, পৃ., ৫১

এই বিশ্বজুড়ে একটি স্থূল অভিব্যক্তি রয়েছে। আর তার পিছনে রয়েছে একটি সূক্ষ্ম স্পন্দন যাকে ঈশ্বর ইচ্ছা বলা যায়। জগতরূপে তাঁর প্রকাশের মূল কারণ তিনি। তবে আপেক্ষিক ক্ষেত্রে তাঁর সূক্ষ্মতর প্রকাশই স্থূলতর প্রকাশের কারণ অর্থাৎ সূক্ষ্মেই স্থূলরূপ পরিগ্রহ করে। সৃষ্টি বা বিনাশ বলে কিছু নেই, সবই রূপান্তর মাত্র। পূর্ব পরবর্তি ধাপগুলো ছেড়ে দিয়ে বলা যায় চৈতন্যই মনরূপে এবং মনই জগৎ রূপে প্রকাশিত।[৭]

দ্বিতীয়তঃ আলোচ্য বৈশিষ্ট্যটি হল, জগতের আর পাঁচটা জিনিস যেমন দেখি, ঈশ্বরকে সেভাবে দেখতে পাওয়া যায় না। কাজে ঈশ্বর নেই এই আধুনিক যুক্তির উত্তরে স্বামীজি বলেছেন, দেখার যোগ্যতা অর্জন করে নিজে যাচাই করে দেখ, পরে সে সব বিষয়ে মতামত দেবার অধিকার আসবে। যুক্তির দিক থেকে বলেছেন, কোন বিশেষ পরিবেশে প্রকৃতিতে একবার যে ঘটনা ঘটে সর্বকালেই ঠিক সেই পরিবেশে সেই ঘটনাই ঘটবে। তা যদি না ঘটে তা সত্যই নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা থেকেও দেখাতে পারি এ তারই ইঙ্গিত। যারা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছি বলে ঘোষণা করেছেন তারা যেভাবে চলে মনকে শুদ্ধ একাগ্র করেই তা করেছেন, যে কেউ ঠিক যদি সেভাবে চলে এবং মনকে সেরকম করতে পারে তবে সে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করবেই। নিজে দেখার আগে যত মন্তব্যই করি না কেন এবং যতবড় মনীষীই হই না কেন, তা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক।

স্বামীজি বলতেন, বিজ্ঞানের আবিস্কৃত স্থূল জগতের সত্যগুলির মধ্যে পরমাণু প্রভৃতি অনেক কিছুই সাধারণ প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, তাই বলে সেগুলির অস্তিত্ব কি অস্বীকৃত ?

অতএব যতক্ষণ না আমরা মন বুদ্ধির পারে যাচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত মন-বুদ্ধির ধারণা শক্তির গন্ডির ভিতরকার কিছু অবলম্বন করেই আমাদের মনকে সম্পূর্ণ একাগ্র করতে হবে। মন-বুদ্ধির পারে গেলে তখন ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি হবে। সাধারণ মানুষের অবলম্বনের জন্য সেই সত্যের এক স্থূল রূপ চাই। মূল সত্য এক হলেও তাঁর স্থূল রূপ অসংখ্য হতে পারে। যেমন– বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু এক হলেও কেন্দ্রবিন্দুর সন্নিহিত নিকটতম ক্ষেত্রে বৃত্ত টানলেও তার ভিতর অসংখ্য বিন্দু অবস্থান করতে পারে।

৭। ঐ, পৃ., ৪৪২

স্থূল বলতে সেই সত্যকে সাকার সগুণ আমাদের মত একজন মানুষ বা মানুষের মতই গুণ বিশিষ্ট ভাব বোঝায়। অর্থাৎ সংক্ষেপে বললে এই দাঁড়ায় যে, যা কিছু চিন্তা করা সম্ভব, বাক্য প্রকাশ করা সম্ভব তার কোনটিই চরম সত্য বা ঈশ্বরের স্বরূপ নয়, সে সবই তাঁর স্থূল রূপ।

স্বামীজি বলেছেন, এই সব স্থূল রূপের যে কোন একটি অবলম্বনে মন একাগ্র করে মন বুদ্ধির পারে যেতে পারলে সেখানে সকলেই মন বুদ্ধির সীমার ভিতর থাকাকালীন ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা যার যাই হোক না কেন একই সত্যকে প্রত্যক্ষ করে,

"সকল ধর্মের জ্ঞানাতীত বা তুরীয় অবস্থা এক। দেহ জ্ঞান অতিক্রম করলে হিন্দু, খ্রিষ্টান , মুসলমান, বৌদ্ধ এমন কি যারা কোন প্রকার ধর্মমত স্বীকার করে না, সকলেই ঠিক একই প্রকার অনুভূতি হয়ে থাকে। যে কথা শ্রীরামকৃষ্ণ সংক্ষেপে বলেছেন, সেখানে সব শিয়ালের– এক –রা ।"[৮]

৪.১.৪: ধর্মসম্পর্কে বিবেকানন্দের মতের পর্যালোচনা

ধর্ম সম্পর্কে স্বামীজির মতের পর্যালোচনাগুলি আমি নিম্নে সংখ্যানুক্রমিক আলোচনা মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

প্রথমত: ধর্ম বলতে আমরা যা জানি ও বুঝি আসলে তা কিন্তু ঠিক নয়, মূলতঃ প্রত্যক্ষই হল ধর্ম, উপলব্ধিই হল ধর্ম, আত্মার সাথে পরমাত্মার সম্বন্ধই হল ধর্ম, আত্মারাম হওয়াই হল ধর্ম। আমরা যখন নিজের স্বার্থ দেখি, সুখ-দুঃখ অনুভব করি, তখন আমরা ক্ষুদ্র জীবদেহে আবদ্ধ মায়াধীন একটি জীবাত্মা মাত্র। যখন এর উর্ধ্বে উঠি, আত্মরাম হয়ে যাই, 'আমি কে'? আমার স্বরূপ জানতে পারি তখন নিজের কোন চাওয়া-পাওয়া থাকে কি ? তখন আমি বিশ্ব-আমি হয়ে যাই। একবার সাধনা সহায়ে আমিত্বের প্রসার ঘটাতে পারলেই এ অবস্থাটি আনয়ন সম্ভব। স্বামীজি বারবার বহুভাবে ব্যক্ত করেছেন, নিশ্চিত জান, প্রত্যক্ষই ধর্ম, শাস্ত্রাদি পাঠ ধর্ম নয়, ধর্মের অঙ্গ মাত্র। বুদ্ধি, মতবাদ, সম্প্রদায়, সাম্প্রদায়িকতা, জপ, ধ্যান, মন্দির, মসর্জিদ, গীর্জা

৮। ঐ, পৃ., ২৪৫

যাওয়া ধর্ম নয়। এমন কি শাস্ত্র পাঠ, তপস্যা, মনোসংযম, নিষ্কাম কর্ম ইত্যাদি কোনটিই যথার্থ ধর্ম নয়, এসব ধর্ম লাভের বা সত্যদ্রষ্টা বর্ণিত চরম ও পরম সত্যকে প্রত্যক্ষ করার উপায় মাত্র। স্বামীজি তাই জানালেন, যতক্ষণ না কারও সত্য উপলব্ধি হচ্ছে, সত্য প্রত্যক্ষ হচ্ছে, ততক্ষণ তাকে ধার্মিক বলা যায় না, বলা যায়– সে ধার্মিক হবার চেষ্টা করছে মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ ধর্ম নিয়ে আমরা যারা বিবাদ ও বিরোধ করি, নিজের ধর্মকে বড় অপর ধর্মকে ছোট অথবা ধর্মের কোনটিকে বড়, কোনটিকে ছোট করি, আচার অনুষ্ঠান, নিয়ম পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দ্বারা কোনটিকে উন্নত কোনটিকে খাটো করি, নিজের ধর্মে অন্যকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করি, এ সবই আমাদের ধর্মান্ধতা ও ধর্মোন্মত্ততার প্রভাব মাত্র।

এইভাবে ধর্মে যত সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি হয়েছে এবং দিন-দিন শত-শত মানুষকে ধর্মের জন্য প্রাণ দিতে হয়েছে ও হচ্ছে, পৃথিবীকে হিংসায় পরিপূর্ণ করে নর শোনিতে সিক্ত করছে, ধর্ম রূপ সত্য সনাতন কি এর পরেও হাসিমুখে আমাদের স্নেহচুম্বন দান করছেন ? নাম, রূপ, রুচি, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও প্রণালী ভেদে বিভিন্ন মতামত থাকবেই। এটাই সৃষ্টির নিয়ম। কিন্তু স্রষ্টার কোন বৈশাদৃশ্য নেই। তিনি সবার সমান । তিনি সবার সকলের। এই উপলব্ধি করাই হল প্রকৃত জ্ঞান। এই জ্ঞান লাভই হল ধর্ম লাভ।

তৃতীয়তঃ স্বামীজির শ্রীমুখের বাণী দ্বারাই এখানে তাঁর মতের পর্যালোচনা তুলে ধরে– আলোচ্য বিষয়টি সংক্ষেপ করছিঃ

> যতদিন না ধর্ম অনুভূত হচ্ছে, ধর্মের কথা বলা বৃথা। তীর্থে বা মন্দিরে গেলে, তিলক ধারণ করলে অথবা বস্ত্র বিশেষ পরলে ধর্ম হয় না। যতদিন পর্যন্ত না তোমার হৃদয় খুলছে, যতদিন পর্যন্ত না ভগবানকে উপলব্ধি করছ, ততদিন সব বৃথা। হৃদয় যদি রাঙ্গিয়া যায় তবে আর বাইরের রঙের – আবশ্যক নাই।[৯]

৯। পূর্বোক্ত, বিবেকানন্দ, **বাণী ও রচনা**, পৃ., ২০৭

চতুর্থতঃ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করার সহজ উপায়টি হল, আমাদের মধ্যে অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় নামে যে দুটি বিষয় জীবন-যাপন ক্ষেত্রে সর্বক্ষণ আমাদিগকে সকলক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করছে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে, সেখান থেকে আমাকে বেছে নিতে হবে নিরপেক্ষ সত্যবস্তুটি। এজন্য আমাদের ডুব দিতে হবে অন্ত রীন্দ্রিয়ের অন্তঃস্থলে। সত্য বস্তুটি যা, তা লুকিয়ে আছে এখানে। স্বামীজিও সে কথাটি প্রতিপন্ন করে গেছেন, যথাঃ

> ইন্দিয়ের –এমন কি মনেরও সমূদয় সুখ অনিত্য, কিন্তু আমাদের ভিতরেই সেই নিরপেক্ষ সুখ রয়েছে, যে সুখ কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না। সুখের জন্য বাইরের বস্তুর উপর নির্ভর না করে যত ভিতরের উপর নির্ভর করব – যতই আমরা অন্তঃসুখ, অন্তরা 'রাম' হব, ততই আমরা আধ্যাত্মিক হব।[১০]

শরণাগতি ও নির্ভরশীলতাই হল ঈশ্বর প্রাপ্তির সহজ উপলব্ধি। এই নির্ভরতা বুদ্ধি যুক্তি দিয়ে আসেনা বা আনা যায় না, যুক্তি তর্কে ঈশ্বরের সিদ্ধান্ত হয় না। যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে অন্তরস্থ ব্রহ্মভাবের উদয় হয় না। ঈশ্বর লাভের সর্তই হল, 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।' বিশ্বাস,ভক্তি ও নির্ভরতাই হল ঈশ্বর লাভের সহজ গতি। এই উপায়টি গুটি কয়েক ব্যক্তির জন্য নয়, সর্বসাধারণের জন্য। এই পথটি হল কলি অপহত দুর্বল জীবের জন্য একমাত্র সার্বজনীন পথ, কলির প্রেম-ভক্তির শেষ অবতার মহাপ্রভুর পথ –'ভক্তি পথ'। এছাড়াও আছে– যোগপথ, জ্ঞানপথ ও কর্মপথ। এগুলির জন্য চাই– দৃঢ় মনোবল, ব্রহ্মচর্য, যুক্তি বিশ্লেষণের কঠিন কঠিন নিয়মাবলী ও ধারণা শক্তিসম্পন্ন উপযুক্ত আধার পুরুষ। ত্যাগ বৈরাগ্য ছাড়া এপথে আসা কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়।

১০। ঐ, পৃ., ২০৭

৪.১.৫: উপসংহার

ধর্ম প্রসঙ্গে আলোচনার উপসংহারে যে বিষয়টি প্রতিপন্ন করতে চাই তা সনাতন ধর্মের প্রায় মনীষীদেরই এক অভিমত। ধর্মলাভের সার্বভৌম পথ চারিটি। যথা– যোগ, জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি। আর এগুলির জন্য যা প্রয়োজন তাহল– দৃঢ় মনোবল, ব্রহ্মচর্য, যুক্তি বিশ্লেষণের কঠিন কঠিন নিয়মাবলী ও ধারণাশক্তি সম্পন্ন উপযুক্ত আধার পুরুষ। ঈশ্বর যেহেতু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, অতীন্দ্রিয় এক নিত্য শাশ্বত সত্য পদার্থ, আমাদের মন বুদ্ধি সন্ধানী আলোর মত– যার বুদ্ধি যত প্রখর, যত মার্জিত, পথকে সে তত ভালভাবে তত বেশি দূর পর্যন্ত দেখতে পারে। কিন্তু পথ চলা নির্ভর করে মনের উপর । মনের যা ভাল লাগে বুদ্ধি তাকে অকল্যাণর এমন কি সর্বলোকের কল্যাণকর পথ বললেও মন বুদ্ধি সেই কথা অগ্রাহ্য করে– আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে সেই পথে টেনে নিয়ে যায়। কাজেই মনকে ঈশ্বরাভিমুখী , তার ভোগলালসাজনিত বহির্মুখিতা থেকে তাকে টেনে এনে বাহ্য ও অন্তর প্রকৃতিকে বশীভূত করে তাকে অন্তর্মুখী করাই ঈশ্বর লাভের পথ।

ত্যাগই হল ঈশ্বর লাভ, আর ভোগই হল সর্বনাশ। ত্যাগ বৈরাগ্য ছাড়া ঈশ্বর উপলব্ধির দ্বিতীয় কোন উপায় বা পথ নেই। ত্যাগ বৈরাগ্য সব মতপথেই চাই। একাগ্রতাই হল ঈশ্বর লাভের একমাত্র লক্ষ্য। এই একাগ্রতার ফলেই আসে মনে প্রবল ইচ্ছাশক্তি, এই ইচ্ছাশক্তির ফলেই লাভ হয় – আনুগত্য শক্তি। এই আনুগত্যই জন্মায় ভগবানে ভক্তি ও তাঁকে ভালবাসার শক্তি। তখনেই লব্ধ হয় 'যমে বৈষে বৃণুতে তেন লভ্য'। তাঁর ইচ্ছায় তাঁকে দেখা দানের দয়া ও করুণা।

ব্রহ্মচর্য হল এই একাগ্রতা শক্তির মূল উৎস। বীর্যধারণই হল ব্রহ্মচর্য। বিবাহিত অবিবাহিত যেই হই না কেন, সবার জন্য চাই ব্রহ্মচর্যরূপ সংযম শক্তি। এটিই ধর্মলাভের মূল ভিত্তি। স্বামীজিও সে কথা বলেছেন, " ব্রহ্মচর্যের ফলে মস্তিষ্কে বিশেষ শক্তি জন্মায়, যা ছাড়া ধর্মের সর্বোচ্চ তত্ত্বগুলো ধারণা করা যায় না। ব্রহ্মচর্যের অভাবে আধ্যাত্মিকভাব, চরিত্র বল ও মানসিক তেজ সব চলে যায়।"[১১]

১১। পূর্বোক্ত, ৯ম খন্ড, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৮৪, পৃ., ২১০

এতৎব্যতিরেকে স্বামীজি মহারাজ আরও মনে করতেন, প্রত্যেক ধর্মেই তিনটি ভাগ রয়েছে– (১) দার্শনিক (২) পৌরাণিক (৩) আনুষ্ঠানিক। প্রতি ধর্মের এই দার্শনিক অর্থটিই হল সার। এখানে যেমন আমরা মনে রাখি, দর্শন বলতে স্বামীজি এখানে– কেবল বুদ্ধি যুক্তি সহায়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার কথা বলছেন না। বলছেন, সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ করার পর সে বিষয়ে বুদ্ধি যুক্তি যতটা ধরতে পারে ততটা পর্যন্ত তাদের অবলম্বন দেয়ার কথা। যতটা সম্ভব যুক্তি ও বুদ্ধিগ্রাহ্য করার কথা। তিনি আরও বলতেন, সব ধর্মই এরূপ প্রত্যক্ষ দ্রষ্টার অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই সব ধর্মের দর্শনভাগও এই সব সত্যদ্রষ্টাগণের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করেই রচিত। পৌরাণিক অংশ তার বিবৃতি মাত্র– গল্পের মধ্যে সাধারণকে উচ্চ তত্ত্বগুলি বোঝাবার চেষ্টা। আর অনুষ্ঠানিক ভাগটি হল– ধর্মের স্থূলস্বরূপ, প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক অংশেরই ব্যবহারিক রূপ। স্বামীজির মতে এই ব্যবহারিক স্থূলরূপের প্রয়োজনীয়তা পৃথিবীর সব ধর্মেই আছে। মানুষ যতদিন ধর্মের অন্তর্নিহিত রূপটি অনুধাবন করতে না পারছেন ততদিন আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের অবশ্য প্রয়োজন আছে।

প্রাথমিক দৃষ্টিতে মন্দির, মসজিদ, গীর্জা ও শাস্ত্রানুষ্ঠান এগুলি যদিও শিশুশিক্ষা মাত্র কিন্তু এগুলির জ্ঞান না থালেও আবার সেই অরূপ, অসীম, নির্গুণ সত্তার ধারণা করা সাধারণের পক্ষে কোনভাবেই বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। অতএব স্থান কাল পাত্রভেদে কোনটিই উপেক্ষার বস্তু নয়। আর একটি বিষয় স্বামীজি প্রায়ই দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন,

> "ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে এক অনন্ত সত্তা রয়েছে , যাকে বিশ্বজগৎ বলি এবং এরও অতীত হল অনন্ত সত্তা, এই দুটি বিষয়ই ধর্মের অন্তর্গত। যে ধর্ম এই উভয়ের মধ্যে কেবল একটিকে নিয়েই ব্যাপৃত তা অবশ্যই অসম্পূর্ণ। ধর্মকে এই উভয় বিষয় নিয়েই আলোচনা করতে হবে।"[১২]

আলোচনার উপসংহারে বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তা বিষয়ে আর একটি আলোচনা না করলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থাকে। পরমহংসদেব এবার পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে যে বিষয়টি পৃথিবীর আপামোর সর্বসাধারণের জন্য ধর্ম সম্পর্কে বুঝাতে যে "শিবজ্ঞানে জীব সেবা"-র কথা তুলে ধরেছিলেন তা স্বামীজি মহারাজ আর একটু অতিক্রম করে নব বেদান্তের দৃষ্টিতে "জীব রূপে শিব সেবা"-র মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করে বিশ্ববাসীকে স্তম্ভীত করে যা

১২। বিবেকানন্দ, **বাণী ও রচনা**, কলিকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়, ৪র্থ খন্ড, ৫ম সংস্করণ, ১৯৭০, পৃ., ১৬৭

বুঝালেন তা কখনও ভুলার বিষয় নয়। পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম নেই যে ধর্ম সেবা সুযোগ নিতে পছন্দ করে না। পরের উপকার, পরের সেবা করতে যে আনন্দ প্রাণে হয় আর অন্য কোনভাবে তা হয় না। এই সেবাকেই স্বামীজি মহারাজ পৃথিবীর প্রতি লোকের মুখে ছন্দের তালে তালে তুলে ধরেন, "জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" যা আজ সমগ্র বিশ্বধর্মমত এটিকে স্বীকৃতি দান করেছেন।

ভালবাসতে হবে আগে মানুষকে। কারণ মানুষই আমার অতি আপন ও নিকটতম। তারপর সমাজ, রাষ্ট্র, দেশ, জাতি ও বিশ্বকে। কারণটি হল আমিত্বের প্রসার। আমি শুধু আমার জন্য নই। আমি সবার জন্য। 'প্রত্যেকে আমরা পরের তরে '। এই পৃথিবীতে আমি শুধু আমার জন্য আসি নাই। এসেছি সবাইকে আপন করে বুকে জড়িয়ে ধরেতে। আমার জীবনকে সবার জীবনে বিলিয়ে দিতে, সবার উপকারে লাগতে, আমার প্রেম ভালবাসা ও সেবায় সবাইকে আনন্দ দিতে।

এই জীবপ্রেমই একদিন 'শিবজ্ঞানে জীব সেবা'-র মর্মার্থ মানব জীবনে ফুটে উঠবে। পরমহংসদেবের আদর্শ সহজে পূরণ হবে। ঈশ্বর আমাদের ব্যবহারিক নয়নের অগোচর, এজন্য আমরা প্রাথমিকস্তরে নরের মাঝে নারায়ণকে দেখতে চাই। স্বামীজি এজন্যেই প্রথমে জীব সেবার মাহাত্ম্য তুলে ধরেছেন। আগে জীবকে ভালবাসতে শিখ অতঃপর এমনিতেই ঈশ্বর সেবার অধিকার লাভ করবে। নিজেকে আগে চিনতে না পারলে অন্যকে যেমন চেনা যায় না। তদ্রূপ ঈশ্বরকে জনার আগে ঈশ্বর সৃষ্ট জীব জগতকে ভালবাসতে হবে। এই জীবপ্রেমই ঈশ্বরকে নিজের মাঝে চিনিয়ে দিবে। কারণ শিব অন্য কোনখানে নেই। আমি বা আমার মাঝে অবস্থিত চেতন রূপ আত্মাই শিব। এজন্য স্বামীজি জীব রূপে শিব সেবা করতে বলেছেন। জীবকে শিব জ্ঞানে ভালবাসতে বলেছেন। তাঁর প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়েছিল বলেই তিনি সর্বসারণকে সৎ, চিৎ ও আনন্দরূপ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরকে সবার সামনে তুলে ধরার এই মহতি ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তার বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব এখানেই।

ধর্মের নামে যে খাদ্যাখাদ্য বিচার, ও ছুঁৎমার্গের মানসিকতা, পৌরোহিত্য তন্ত্রের সংস্কার, সামাজিক অবক্ষয়, ধর্মান্ধতা ইত্যাদি যে সব অন্তরায় তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছিল; তা তিনি কঠোর হস্তে দমন

করেছিলেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন এই বাহ্য কুসংস্কারগুলি যতদিন ধর্ম থেকে চিরবিদায় না নিবে ততদিন জাতীয় মুক্তি সম্ভব নয়।

দেশ জাতিকে নবজীবন দানের জন্যই তিনি বনের বেদান্তকে ঘরে টেনে এনে জীবনমুখী করে তুলেছিলেন। পৃথিবী শ্রেষ্ঠ এই বেদান্ত দর্শন ক্রান্তদর্শী ঋষি অনুমোদিত। আজ পর্যন্ত এই দর্শনকে কোন ধর্ম অতিক্রম করতে পারেন নি। এই বেদান্ত যতদিন এই সনাতন ধর্মে থাকবে ততদিন এর পতন সম্ভব নয়। বিশ্ববাসী আজ যে মানব ধর্মের কথা বলে এই বেদান্তই সেই ধর্ম। বেদান্তরেরই অপর নাম মানব ধর্ম। স্বামীজি বিশ্বধর্মসভায়– যা বিশ্ববাসীকে বুঝিয়েছিলেন।

৪.২: শ্রী অরবিন্দের ধর্মচিন্তা ও একটি পর্যালোচনা

৪.২.১: ভূমিকা

ভারতবর্ষের মাটির মানুষের একটা স্বাভাবিক গরিমাবোধ আছে যে, আমাদের সভ্যতা সর্বপ্রাচীন ও তার মূল বিবৃত বেদে এবং আমাদের সংস্কৃতির উৎস আর্য বা ঋষিসম্ভূত জ্ঞান। কিন্তু সে বেদই বা কী, সে ঋষিই বা কেমন, তার কোন সুস্পষ্ট ধারণা আজ আর আমাদের নেই। পাশ্চাত্য ভারততত্ত্ববিদ পন্ডিতদের কল্যাণে তার কিছু অস্পষ্ট প্রতিভাস আমাদের মধ্যে জেগেছে, কিন্তু তা'র সাক্ষাত নিজস্ব পরিচয় লাভে আমরা বঞ্চিত হয়েই ছিলাম এতদিন। একটি আলো হঠাৎ জ্বলে উঠেছিল এই বাংলার মাটির দেউলে তা'র অনির্বাণ শিখায় চিনিয়ে দিতে– কী সুমহান সম্পদে আমাদের উত্তরাধিকার, কী আমাদের অনন্ত বিকাশের সম্ভাবনায় বৈপুল্য, কী আমাদের লক্ষ্য, কিসে আমাদের যথার্থ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি, কোথায় আমাদের যথার্থ মহিমময় স্থিতি।

মাটির যে আধারটি ভেঙে গিয়েছে, কিন্তু সে প্রদীপের স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে আছে তার আনন্দোজ্জ্বল নানা লেখায় অসংখ্য অতলান্ত গভীর রচনায়, বিভিন্ন মমতাস্নিগ্ধ পত্রে, লোকোত্তর ভাবনাবিভোর কবিতার ছত্রে। 'শ্রীঅরবিন্দ প্রকাশনী' সেই সোনার আলো সকলের অন্তরে সঞ্চারিত করে দেবার পরিকল্পনা করেছেন বিশেষ

করে তাঁর লেখা অসাধারণ গ্রন্থ 'দিব্যজীবন' এবং তাঁর দিব্য জীবন-যজ্ঞের অভাবনীয় কীর্তি 'সাবিত্রী' নামক মহাকাব্য গ্রন্থ মাধ্যমে।

এই লক্ষ্যে শ্রীঅরবিন্দ নিজের সম্বন্ধে নিজেই বলেছিলেন, "আমার জীবনের কথা ঠিক ভাবে কেবল আমিই বলতে পারি; তোমরা কেউই তা জানতে পার না, কারণ তা বাইরের থেকে দেখা যায়নি।"[১৩] অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি নিজেও তাঁর জীবনের ইতিহাস বিশদভাবে কোথাও লেখেননি। যতটুকু জানা গেছে তাঁর ভক্তশিষ্য ও জিজ্ঞাসুদের চিঠিপত্রে এবং নানা মনীষীর নানা অভিজ্ঞানে ও অভিব্যক্তিতে।

এই মহামানবের জন্ম হয়, কলিকাতা ১৫ই আগষ্ট, ১৮৭২ খিষ্টাব্দে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্ম লগ্নের সাথে যার অভাবনীয় মিল। ১৮৭৯ থেকে ১৮৯৩ সময়কাল ছিল তাঁর ইংলন্ডে বাল্য শিক্ষাজীবন কাল। ভারতবর্ষে তাঁর মত সৃজনশীল শিক্ষিত জ্ঞানী গুণী, স্বাধীনতাসংগ্রমী, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ্, কুটনীতিবিদ্, বিদ্রোহী নেতা, জাতি সংগঠক, কবি, দার্শনিক মানবপ্রেমিক, প্রাচীন ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের সত্যসন্ধানী, গভীর তত্ত্বানুসারী এবং সর্ববিদ্যাবিশারদ, বহুভাষাবিদ্, ভারতবর্ষের জীবনপ্রাণ, বেদরহস্য উদ্ভাবনকারী, অভাবনীয় ব্যক্তিত্বভাবাপন্ন, অহিংস সুমহান স্বদেশী আন্দোলনকারী, স্বরাজ-প্রতিষ্ঠাকারী , ভগবৎভক্ত, সত্যলাভকারী, প্রভু ও গুরু যুগপৎ এমন এক মহাযোগী পুরুষ প্রাচ্য পাশ্চাত্য শিক্ষায় সর্বোচ্চ মহীয়ান রূপে আবির্ভাব; দ্বিতীয়টি আর কেউ এই ভারত ভূমির মর্যাদা এমন করে দান করতে সক্ষম হয়েছিলেন কি না– আমার তা জানা নেই। এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষকে আর একজন অপ্রকাশিত অলক্ষ্য-প্রস্ফূটিত মহামানব পরা-অপরা বিদ্যায় সর্বোচ্চ পারদর্শী সত্যলাভকারী এই বাংলার প্রথম ও প্রধান শ্রেষ্ঠ বেদমীমাংসক, পরবর্তিতে যাঁকে শ্রী অরবিন্দ স্বয়ং "কলির বেদব্যাস" বলে আখ্যায়িত করেছিলেন, তিনি আর অন্য কেউ নন–

তিনি হলেন, বেদান্তের নির্বিকল্প বুত্থিত পুরুষ– পরমহংস, পরিব্রাজকাচার্য, সদ্গুরু, সিদ্ধসাধক– তন্ত্র, যোগ, জ্ঞান ও প্রেমসিদ্ধ মহামানব স্বামী নিগমানন্দজীর মানসপুত্র মহাজ্ঞানী মহাযোগী সত্যলাভকারী

১৩। শ্রীঅরবিন্দ, **নিজের কথা পুস্তক,** পন্ডিচেরী; শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, ১ম খন্ড, ১ম সংস্করণ, ১৯৭২, পুর্ণমুদ্রন, ২০০৪, পৃ.,২

বেদমীমাংসক এবং অরবিন্দ শিষ্য-ভক্ত সহায়ক বন্ধু ও বড়ভাই শ্রীমৎ অনির্বাণ। যিনি তাঁর গুরুদেবের অন্ত নির্হিত দর্শনের সূত্রটি শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবন দর্শনে দেখে আপ্লুত হয়েই এর বিকাশ মানসে তাঁর গুরুদেবের কৃপায় শ্রীঅরবিন্দ দর্শনের অন্তর গভীরে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনিই অরবিন্দকে সর্বসাধারণের মধ্যে তার দূর্ভেদ্য প্রাচীরের তত্ত্বকে অর্গল মুক্ত করে সাধারণের মধ্যে তুলে ধরেছিলেন একজন সাধু হয়ে অন্য আর একজন সাধুর কাজের অসামান্যতাকে সমাদৃত করার নিমিত্তে।

শ্রীঅরবিন্দের মহান কীর্তি Life Divine এর Perfect বাংলা বঙ্গানুবাদ তিনি নিজ গরজে, নিজ দায়িত্বে, নিজ উপলব্ধিতে, বিবেকের আপন তাড়নায়, শিলং পাহাড়ে সাধনাকালীন সময়ে আপন মনে এই দূরহ কার্যটি সমাপ্ত করেন। হাতে কোন সহায়ককারী ডিক্‌শনারী বা সহযোগী অন্য কোন পুস্তকও ছিলনা যে সাহায্য নিতে পারবেন। পরে মিলিয়ে দেখেছিলেন আশ্চর্যভাবে সব ঠিকঠাক হয়ে আছে। কাকতালিয়ভাবে কোন এক সময় এই অনুবাদটি শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিগোচর হয়। শ্রীঅরবিন্দ বিচলিত হয়ে– প্রিয় পাত্রটিকে একটিবার দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। প্রাণের আনন্দে তিনি নেচে বলে উঠেন, “Realy! It is a living translation.” অথচ তিনি কোনদিন তাঁর নামও শুনেন নি, তাঁর সাথে দেখাও করেন নি, কোন পরিচয় বা সম্পর্কও স্থাপন করেন নি। অনির্বাণজীও এর কোন প্রয়োজন বোধ করেন নি, কোনদিন কখনও। অথচ উভয়ের অন্ত-রের অন্তঃস্থলে ছিল ‘একং সত্যে-’র কি এক অনুপম অনাকাঙ্খিত যোগ। এই হল সত্যসুন্দরের অন্তনির্হিত দিব্যজ্যোতির অনাহত এক অন্তরস্থ প্রেরণা। একজন সাধুর প্রতি অন্য এক সাধুর কর্তব্য। যা নিয়তির নীতি নিয়মেই নির্বাচিত ও নির্ণায়িত হয়।

শ্রীঅরবিন্দের জীবনবেদ, দর্শন ও সাধনাকে বাংলার সনামধন্য কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সুপুত্র ডঃ দীলিপ কুমার রায় মহাশয় যে দৃষ্টিতে শ্রীঅরবিন্দকে দেখেছিলেন সেই কারণেই তাঁর গুরুদেব (শ্রীঅরবিন্দ) তাঁর প্রতি অধিক ভালবাসার হাত প্রসার করেছিলেন। এই লক্ষ্যেই তিনি অরবিন্দের প্রাণাধিক স্নেহ ভালবাসার পাত্র রূপে বাংলায় প্রথম সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার স্থাপন করেছিলেন। এই দীলিপ কুমারই শ্রীমৎ অনির্বাণজীকে তাঁর গুরুদেবের জীবন দর্শনে একমাত্র যথার্থ সহায়ক মানব রূপে জেনে– তাঁর একান্ত স্নেহ প্রীতি ও ভালবাসার

ভক্ত হয়ে উঠেন। তাঁর স্নেহ বদান্যতাতেই কলিকাতার 'শ্রীঅরবিন্দ পাঠ মন্দিরে' নিয়মিত বেদ ও বেদান্ত বিষয়ক পাঠদান অনেক শিক্ষার্থী মধ্যে অন্যতম বিদুষী মনীষী গৌতম ধর্মপাল, অধ্যাপিকা গৌরী ধর্মপাল, অধ্যক্ষ ডঃ গোবিন্দ গোপাল মুখপাধ্যায় ইত্যাদি আরও অনেক জ্ঞানী গুণীজন তাঁর ছাত্র হয়ে ওঠেন। এবং শ্রীঅরবিন্দ দেবের দর্শনের মর্ম উপলব্ধি করেন। কিন্তু অনির্বাণজী কোনদিন গুরু সাজেননি। এখানে এই প্রসঙ্গটি উপস্থাপন না করলে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের প্রকৃত যথার্থতা প্রকাশ পেত না, বরং অকৃতজ্ঞতার পরিচয় চিরকাল বহন করত।

'দিব্যজীবন' উপায়নের প্রাক্ কথনে অনিবার্ণজী ঋক্ সংহিতার সুরে তাঁর সুর মিলায়ে তাঁর মহিমা এইভাবে প্রকাশ করেছিলেন যে, শ্রীঅরবিন্দদেব যে উদ্দেশ্যে এই মাটির পৃথিবীতে দ্যুলোকের আলোককে নামিয়ে আনতে আবির্ভূত হয়েছিলেন– আপন মহিমা বলে– এবার সবাইকে আলোকিত করে তুলতে, আর শুনাতে এসেছিলেন বেদের ভাষায়– 'তিনি যেমন ওখানে, তেমনি এখানেও'। যা কি না ঋক্ সংহিতাতেও এর উপাদান সংহৃত আছে। যথা– "বি সুপর্ণো অন্তরিক্ষাণ্যখ্যদ ... রশ্মিরস্যা ততান।" –ঋক সংহিতা ১।৩৫।৩ অনির্বাণজী যার সহজ বঙানুবাদ করে যার কাব্যরূপ দিয়েছেন–

কিরণ-কমল– দলে-দলে তার
    কত যে জগত উঠিছে ফুটি,
কাঁপিছে গভীরে প্রাণের নিঝর–
    নিতেছে হেলায় বাঁধন টুটি।
এখনি ছিল যে উজলি গগন,
    মিলালো কোথায় জানে কি কেউ–
কোন্ সে নবীন দ্যুলোকের 'পরে
    ছড়াল তাহার আলোর ঢেউ ![১৪]– অনির্বাণ।

১৪। ঋষি অনির্বাণ, **দিব্যজীবন**, পন্ডিচেরী; শ্রীঅরবিন্দ ট্রাষ্ট এবং আশ্রম, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃ., ৮

অন্ধকারই আলোকের পরিমাপক। জগৎটা যা হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং ভবিষ্যতে যা হবে, এই দৃশ্যমান জগৎটা ঠিক তার বিপরীত। আর পরে তা হবে বলেই আজকের জগৎটা ভবিষ্যতে যা হবে সেই রূপটি না নিয়ে তার উল্টোটাই নিয়েছে। পরস্পর বিপরীত স্থিতি এক সাথেই চলছে। যেমন খাদের গভীরতা দিয়েই খাড়াইয়ের উচ্চতার পরিমাপ হয়, তেমনি পতনের মধ্যেই মানুষের উত্থান ক্ষমতার পরিচয় নির্ণীত হয়। কিন্তু মানুষকে সেই উচ্চতায় উঠতেই হবে।

বাধা বিপত্তির সৃষ্টি; মানুষের শুধু শক্তি পরীক্ষার জন্যই নয়, বরং তোমার শক্তিকে পরিচালন করতে, শক্তির বিকাশ করতে, সুশৃংখল করে তুলতেও এই বাধাবিপত্তির প্রয়োজন। এজন্যেই সে সব অতিক্রম করে তুমি তোমার মহত্বের পূর্ণতা লাভ করবে। শ্রীঅরবিন্দ এই অর্থেই বলেছেন, ‘Even this body shall remember God.’ অর্থাৎ এই দেহও ভগবানকে স্মরণ করবে। কিছু পরেই তিনি আবার বলেছেন, ‘This earthly life shall become the life Divine.’অর্থাৎ এই দেহ যদি ভগবানের স্মরণে নিত্য উজ্জীবিত হয়, সঞ্জীবিত হয়, অমৃত বর্ণ হয়, তাহলে এখানকার এই যে মর্ত্যজীবন তাও দিব্যজীবনে রূপান্তরিত হবে। শ্রী অরবিন্দের দর্শন ও সাধনা সূত্রাকারে এই দু’টি কথার উপরেই বিধৃত হয়েছে। এই বাণীই সমস্ত মানব জাতীর জীবনের পাথেয়, চলার পথের দিশারী।

‘দিব্যজীবন’ ও ‘সাবিত্রী’ এদু’টি তাঁর বুদ্ধির দীপ্তি নয়, সাধনায় উপলব্ধির অসাধ্য সৃষ্টি। আর ‘বেদরহস্য’ ছিল তাঁর জীবন পাথেয়, বেদ রহস্য সাধনার উক্ত দু’টি জীবন বেদই ছিল তাঁর যোগজীবনের একমাত্র সাধনা। সাবিত্রী ছিল তাঁর আত্মজীবনী। এই পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করেই তিনি এক অপরূপ মহাকাব্যের রূপ মানব জাতিকে উপহার স্বরূপ দান করেছিলেন। রূপকের দৃষ্টান্তের ভিতর যে গভীর অধ্যাত্ম চেতনা ইন্দ্রিয়ের অধিপতি মন নামক যে অশ্ব এবং অশ্ব নামধারী সাবিত্রীর যিনি পিতা– তিনি হলেন, অশ্বপতি। এই অশ্ব নামবাহিত পিতার অসাধ্য অশ্বরূপ মনকে জয় কারই ছিল সাবিত্রীর জীবন সাধনা। বিবাহের এক বৎসর মধ্যে স্বামী সত্যবানের মৃত্যু, এই এক বৎসর আয়ুকালই হল– মনকে স্ব-স্বরূপে আয়ত্তে আনার– সাবিত্রীর এক কঠোর সাধনা এবং অদম্য প্রেরণা। এই কঠোর সাধনার অমৃত ফল হল মৃত্যুজয়।

অর্থাৎ মৃত্যুরূপ অন্ধকার থেকে সাবিত্রী রূপ সৌরশক্তি বা আলো; যা জীবকে প্রতিনিয়ত প্রচোদিত করে তুলছে সর্বক্ষণ, মনের রূপান্তর দ্বারা অর্থাৎ সেই 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' তমসা বা অন্ধকার থেকে জ্যোতির পথে মনের উত্তরণ ঘটিয়ে– আমরা সেই 'অসতো মা সৎগময়' সেই একং সত্যরূপ 'সত্যবান' রূপে আত্মস্বরূপ রূপ সৎ-কে লাভ করে মানব জীবনকে গড়ে তুলতে পারাই ছিল শ্রীঅরবিন্দের যোগজীবন ।

এই জাগ্রত ভূমিতেও আমরা অশ্বপতির এই ইসারা গ্রহণ করতে পারি । আমি না হয় মুক্ত হলাম, শাশ্বত ভূমিতে ডুবে গেলাম, কিন্তু যে মাটির পৃথিবীকে আমি পিছনে ফেলে এসেছি– সে তো অবিদ্যার আঁধারে ডুবেই রইল, মৃত্যুই হল তার চরম নিয়তি । এই অবিদ্যার মায়াপাশ থেকে কি মুক্তির কোন উপায় নেই ? সাবিত্রীর 'জননী'- রূপে জগৎজননী জানালেন, তুমি যা চাইছ তা তুমি পাবে, এমন একজন এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হবে যে এই নিয়তির বন্ধন ছিন্ন করে মাটির বুকেই ফুটিয়ে তুলবে অমরত্বের মহিমা । এই 'মা বা জননীরূপ'-ই হল আলোর দেবী জীবনের নিয়তি চিৎশক্তি সাবিত্রী । যিনি কঠোর তপস্যা দ্বারা অদম্য ইচ্ছাশক্তির বলে মৃত সত্যবানকে (অন্ধকারে আবৃত সৎ-কে) স্বশরীরেই যমের কৃপায় জীবন দান করতে সমর্থ হয়েছিলেন । শ্রীঅরবিন্দের চিন্তা চেতনা ও জগতে এবার তাঁর আলোকিত উক্ত শক্তিতে আবির্ভূত হওয়ার কারণ রূপে আমরা মহাভারতের এই কাব্যরূপ কাহিনীর দর্শন থেকেই সেই অভিজ্ঞান লাভ করতে পারি ।

তাঁর জীবনের গতিপথ এখানেই শেষ হয়ে যায়নি– তিনি যুগপৎ আরও দেশপ্রেমের কবি, জাতীয়তার নবী এবং মানব প্রেমিক রূপেও জগৎবিখ্যাত ছিলেন । এই গুণ তিনটি ছিল তাঁর জীবন প্রতীক । আরও একটি বিশেষণ আমরা এখানে সংযুক্ত করতে পারি, তাহলেই আলোচিত বক্তব্যটি আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে আমি মনে করি । তিনি আমাদের দিকে তাঁর বিদ্যুন্ময় ইঙ্গিত তুলে অঙ্গুলী নির্দেশ করে জানিয়েছিলেন, ঐ চেয়ে দেখ ! নীল সিন্ধুর ওপারে দিক্‌চক্রবালের জ্যোতিস্তরলিত রহস্যের পানে কি অপরূপ এক স্নিগ্ধ আলোক জ্যোতি তোমাকে আহ্বান জানাচ্ছে । বলছে তুমি অমর । কে বলছে তুমি মৃত্যুর অধীন । তুমি আত্মা এক অদ্বিতীয় অবিনশ্বর । তুমি এই মরজগতে অমরত্ব লাভ করতে এসেছ, মৃত্যুর অধীন তুমি নও, মৃত্যু তোমার অধীন । শ্রী অরবিন্দ একেই অভিব্যক্ত করেছেন, দিব্যজীবন । অন্তরাল থেকে এটি তাঁর মধ্যে

সর্বদাই জাগ্রত ছিল। এটিই তাঁর জীবনের কর্মধারাকে দিয়েছে– তাদের যা কিছু অর্থ ও মাহাত্ম্য যা কিছু পরিপূর্ণ সার্থকতা। তাঁর কাজ ছিল মানুষের বিবর্তন, অর্থাৎ ক্রমোন্নতির ধারায় – তাঁর জীবন পরিবর্তন সাধনা।

তিনি এই সম্পর্কে বলেন, "পরিবার, দেশ ও মানবজাতি, এই তিন ক্রম হল একাকীত্ব থেকে একতাবদ্ধ সমগ্রবদ্ধের দিকে বিষ্ণুর ত্রিপদক্ষেপ। প্রথমটি সিদ্ধ হয়েছে, দ্বিতীয়টি পূর্ণ সাফল্যের জন্য এখনও প্রয়াস করে চলেছি আমরা, তৃতীয়টি লাভের জন্য আকূল আকাঙ্খা আমাদের এবং তার সফলতার গোড়াপত্তনও শুরু হয়ে গিয়েছে।"[১৫] আমার এই অভিসন্দর্ভে শ্রীঅরবিন্দ দেবের জীবনবেদকে ফুটিয়ে ওঠা এবং ভূমিকা লিখে অবতারণা করা– তাঁকে ছোট করারই সামিল বলে আমি মনে করি। আমি একজন সামান্য পুঁথিগত বিদ্যার অধিকারী হয়ে তাঁর মত একজন অতিমানবের জীবনবেদ এবং দর্শন বর্ণনা পঙ্গুর গিরি লংঘন ছাড়া আমার অন্য কিছু আর মনে আসে না। জানি না আমার এই অভিসন্দর্ভ কারও হৃদয় স্পর্শ করবে কি না কিন্তু কোনভাবে যদি কারও হৃদয়ে এতটুকু ছোঁয়া লাগে তবে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করব। আমার গবেষণা পর্বের এই ডিগ্রীলাভ সার্থক হবে বলে মনে করব।

১৫। ব্রজগোপাল দাশ, **অমর জ্যোতি,** ঢাকা; ফরাশগঞ্জ রোড, সৎ সাহিত্য প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৫, পৃ., ১৮

৪.২.২: ধর্ম বলতে শ্রী অরবিন্দ কী বোঝান?

শ্রীঅরবিন্দের ধর্ম বলতে এক কথায় প্রাচীন মুনি ঋষিদের দেওয়া শিক্ষাকেই তিনি অন্তর দিয়ে গ্রহণ ও বিশ্বাস করেছিলেন। এবং সেই মতেই পরিচালিত হয়েছিলেন। বেদান্তকেই তিনি ভারতীয় ধর্ম-সাধনার শ্রেষ্ঠ পথ বলে উল্লেখ করে গেছেন। ধর্ম বলতে তিনি মানব জীবনের উদ্দেশ্য যে দীব্য-জীবন লাভ, সেটিকেই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন।

মনুষ্যজীবনে যতদিন না দিব্যজীবনের রূপান্তর ঘটছে ততোদিন মানুষ অন্ধকারের আস্তাকুঁড়েই বাস করবে। শ্রী অরবিন্দ একারণেই উচ্চারণ করেছেন, " life divine জিনিষটা দর্শনতত্ত্ব নয়, সত্য ঘটনা। যা উপলব্ধি করেছি ও দেখেছি তাই ওতে আছে।"[১৬] এই সাধনা ও সিদ্ধিলাভ করাই ছিল শ্রীঅরবিন্দের ধর্মচারণ। ধর্ম বলতে অরবিন্দদেব এই জ্ঞান লাভ করাকেই বুঝিয়েছেন। তবে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন বা ধর্মশিক্ষা যে অন্ধবিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল অথবা নির্বিচার বা Dogmatic , শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু তেমন শিক্ষা নিয়ে ধর্মবিদ্ ছিলেন না। কারণ তিনি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সকল দর্শনে ব্যুৎপত্তি লাভ করে এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য আর সকল দর্শনের উপর ভূয়সী প্রশংসা ও দক্ষতা অর্জন করেই তবে ভারতীয় দর্শনকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। যদিও অনেক দার্শনিকই ভারতীয় দর্শনকে Dogma বা নীতিহীন অন্ধবিশ্বাসের ধর্ম বলে আখ্যায়িত করে গেছেন কিন্তু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা বুঝতে পরি– ভারতীয় দর্শন কিন্তু আস্তিক ও নাস্তিক যুগপৎ বিভাজিত। অতএব নির্বিচারে বা অন্ধবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে এই ধর্মকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে বলে এখানে কোন যুক্তিই খাটে না। কোন প্রশ্নেরই অবকাশ ওঠেনা। অন্ধবিশ্বাস ও বিচারহীনতা দ্বারা এর প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকলে একবাক্যেই এই ধর্মদর্শনের আস্তিক ও নাস্তিক এই দুই আদর্শ; এই ধর্মে প্রতিষ্ঠা পেত না। বরং প্রচুর আলোচনা ও সমালোচনা এবং বিচার পর্যবেক্ষণ মাধ্যমেই যে এর প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটেছে এই ধর্মে –আস্তিক নাস্তিক এই দুই বিপরীত দর্শন সমন্বয়ে গঠিত প্রমা ও পর্যলোচনাকেই এর উপযুক্ত প্রমাণের ভিত্তি বলে আমি মনে করি।

১৬। ঐ, পৃ., ৩০

এতৎব্যতীত ভারতীয় দর্শন নিজেই স্বীকার করেছেন, "যুক্তিহীন বিচারেন ধর্মহানিঃ প্রজায়তে"। অর্থাৎ ধর্মকে কখনও বিনা যুক্তিতে বা বিচার বিশ্লেষণ না করে ধর্ম বলে গ্রহণ করবে না, এতে ধর্মহানিই হবে। বেদবিহিত সনাতন ধর্ম যে নির্বিচারে যুক্তি সঙ্গত প্রমাণসিদ্ধ এবং বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ এতে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। আমরা আরও জানি– যে ধর্ম ক্রান্তদর্শী ঋষি মুনি দ্বারা হাজার হাজার বৎসর ধরে আজও সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুসংগঠিত; তার সম্পর্কে আলাদা আর কোন প্রমানের প্রয়োজন পড়ে কি ? বরং এটি যে নির্বিচারে বিচার সিদ্ধ এবং এটাই যে এর উপযুক্ত সাক্ষ্য– এর জন্য আলাদা আর কোন প্রমাণের প্রয়োজন রাখে না। দার্শনিক প্রবর ঋষি অরবিন্দ যে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মকে গ্রহণ করে কোন ভুল করেন নাই তাঁর জীবন ধর্ম কর্ম ও সাধনা এবং সিদ্ধলাভ তার জীবন্ত প্রমাণ। আলোচনা থেকে এই প্রমাণ হয় যে, প্রাচীন মুনিঋষি প্রবর্তিত ধর্মই অরবিন্দের ধর্ম।

ধর্ম বলতে শ্রী অরবিন্দ এই মতাদর্শকেই বুঝিয়েছেন। শ্রী অরবিন্দ এই মতবাদকেই জগতবাসীর নিকট তুলে ধরেছেন আরও একটু উন্নত ধারণার জন্মদান করে। এবং এরই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন ভারতবাসীদের পুনরুত্থানের জন্য।

বস্তুজগত যেমন প্রমাণ ছাড়া কোন বিষয়কে নির্বিচারে গ্রহণ করেন না, ধর্মজগতে অনুরূপ যোগ সাধনাও এই দেহ-মন ও প্রাণ দ্বারা প্রমাণ ছাড়া ধর্মের অস্বাভাবিক অলৌকিকত্বকে মেনে নেয় না। ধর্মলাভে অন্য আর যতপ্রকার সাধন পদ্ধতি আছে, সেগুলি মধ্যে কোনটি বিচার, মনন ও নিদিধ্যাসন সাপেক্ষ, কোনটি ভাবনার দ্বারা ভাবিত, কোনটি বিশ্বাস, ভক্তি নির্ভরতা, কোনটি আরোপ-সাধনার আরোপিত পথে সম্পৃক্ত। কিন্তু আলোচিত এই মত পথগুলি অধিকাংশই আপাত অজ্ঞান মনের অন্ধবিশ্বাসের বা আবেগের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু যোগপথের সব ক্রিয়াগুলিই এই দেহ মন ও প্রাণের জীবন্ত বাস্তব উপলব্ধি নিয়েই তিলে তিলে গড়ে ওঠে এবং একটু একটু করে উপলব্ধি করিয়ে সামনের লক্ষ্যপথের দিকে অগ্রসর করায়। রাজযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ, ষটচক্র ভেদ, প্রাণায়াম ইত্যাদি সব যোগপথগুলি এই দেহে, এই মনে সরাসরি প্রসার লাভ

করে উপলব্ধি করেই সাধনার লক্ষ্য পথে ক্রমান্বয়ে অগ্রগতি ও উপলব্ধ হয়। শ্রীঅরবিন্দদেবের স্ব-মুখে এই উপলব্ধির কথা শ্রবণ করলেই বিষয়টি স্বচ্ছ হবে বলে মনে করি। শ্রীঅরবিন্দদেব বলেন:

> আমি এই উপলব্ধিকে গভীর ও আধ্যাত্মিকভাবে নিরেট বলছি এই অর্থে যে তা তখন প্রকৃত বাস্তব, সক্রিয়, চেতনার কাছে স্থূল দৃশ্য বস্তুও যেমন সম্পূর্ণ সত্য বস্তু তেমনি সম্পূর্ণ সত্য। ব্যক্তি ভগবান বা নৈব্যক্তিক ব্রহ্ম বা আত্মার তেমন স্পষ্ট উপলব্ধি সাধারণত সাধনার প্রথম অবস্থাতে বা বহু বছর পর্যন্ত আসে না, খুব কম লোকের বেলাতেই আসে। আমার এসেছিল লন্ডনে প্রথম একটা পূর্বানুভূতির পনরো বছর পরে, আর রীতিমত যোগ সাধনা শুরু করার পঞ্চম বৎসরে। একে আমি খুবই ত্বরিত ব্যাপার বলে মনে করি, প্রায় মেল ট্রেনের গতিতে আসা; যদিও এর চেয়েও তাড়াতাড়ি অনেকের ঘটেছে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি হবার দাবি করা অভিজ্ঞ যোগী বা সাধকের কাছে অস্বাভাবিক অধৈর্য বলে গণ্য হবে। প্রায় সকলেই বলবে ধীরে ধীরে প্রথম কয়েক বছরে কিছু কিছু বিকাশ হতে থাকাই সবচেয়ে ভাল, কেবল প্রকৃত প্রস্তুত হয়ে ওঠে ভগবানের দিকে একাগ্র হয়ে গেলে তখনেই আসবে পাকা সুস্পষ্ট উপলব্ধি।[১৭]

যোগপথ যে ঈশ্বর লাভের একটি Practical পদ্ধতি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তার্কিক যুক্তিবাদী যারা ধর্মকে বিশ্বাস করেন না তাদেরই জন্য প্রমাণিত এই যোগপথ। কিছুদিন মনযোগ সহকারে আসন, মুদ্রা, ধ্যান ও প্রাণায়াম ইত্যাদি যোগশ্রেষ্ঠ সদ্‌গুরুদেবের উপদেশ মত কার্য করলেই মূলাধার চক্রে কুলকুন্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হওয়ার যে সকল পূর্বাভাষ তা মাত্র তিন মাসেই জীবন্ত উপলব্ধি করা যায়। যোগীশ্রেষ্ঠ সদ্‌গুরু স্বামী নিগমানন্দদেবের রচিত ‘যোগীগুরু’ গ্রন্থখানি পাঠ করলেই বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ মিলবে, আমি এবিষয়ে নিশ্চিত। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ধর্মমতকে এই লক্ষ্যেই প্রাচীন ভারতীয় ধর্মপথের ঋষি প্রদর্শিত যোগ পথকেই তাঁর সাধন জীবনে গুরুত্ব দিয়েছিলেন সর্বাপেক্ষা বেশি। যোগী অরবিন্দজীর আলিপুর জেলে অনন্ত জ্যোতির্ময় বাসুদেব মূর্তি দর্শন তারই উল্লিখিত প্রমাণ বহন করে।

১৭। শ্রী অরবিন্দ, **নিজের কথা পুস্তক**, পন্ডিচেরী: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭২, পৃ., ৭৩-৭৪

যার ফল স্বরূপ তাঁর বারবার অবধারিত মৃত্যুর কারাগার অর্গল মুক্ত করে তাঁকে অন্ধকার থেকে মুক্ত আলোর জ্যোতি পথে নিয়ে আসে। যোগসিদ্ধ অরবিন্দ পরবর্তিতে সিদ্ধিলাভ করার পর এই আলো আঁধার সম্পর্কে একটি গভীর জ্ঞান গর্ভ বাণী দান করেন,

"Into blind darkness they enter who follow after the ignorance, they as if into a greater darkness who devote themselves to knowledge alone."[১৮]

ঈশোপনিষদে এর উপযুক্ত প্রমাণ মিলে– 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যাম উপাসতে ।
ততো ভূয় ইব তে তমো যে উ বিদ্যায়াংরতাঃ' ।। ঈশ–৯

অরবিন্দের এই দিব্য ইসারা যখন তাঁর কোন শিষ্যবর্গ কেউ উপলব্ধি করতে পারছিলেন না "প্রবচন" পুস্তকের তৃতীয় খন্ডে তার অনেক আগে বেদমীমাংসক শ্রীমৎ অনির্বাণ সাদা সাপটা ভাষায় লিখলেন, "অবিদ্যা যে একটি অন্ধ তমঃ, তা বুঝতেই পারি, তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই বিদ্যার সাধনা, আলোর সাধনা। বেদে উপমা দেওয়া হয়েছে, দিন আর রাতের। রাত অবিদ্যা, দিন বিদ্যা। আমার মধ্যে থেকে রাতের আঁধার কেটে যাক, দিনের আলো ফুটুক, এ সবাই চায়। এমন কি এ-ও চায় যে, একবার আলো ফুটলে আর যেন অন্ধকার তাকে গ্রাস না করে।"[১৯]

শ্রীঅরবিন্দের প্রাণাধিক অন্তরঙ্গ শিষ্য দিলীপ কুমার, যিনি শ্রীমৎ অনির্বাণের একান্ত অনুরাগী। একদা হঠাৎ তাঁর হাতে আসা উক্ত 'প্রবচন' পুস্তকটি তিনি পাঠ করে যখন জানতে পারলেন এবং উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর গুরুদেবের জেলের অন্ধকার প্রকৃত অন্ধকার ছিলনা, এ ছিল এক উন্নত আলোর দিশা। এ যেন অনির্বাণের প্রতি একদা তাঁর গুরুদেব কৃপাবর্ষিত উপদেশের মত ঋষি অরবিন্দেরও এক জ্বলন্ত নিদর্শন। কারণ সাধনার শেষ স্তর নির্বিকল্পভূমিতে পদার্পণ না করা পর্যন্ত কোন সিদ্ধসাধকের এই উপলব্ধি কারও মধ্যে আসে না। এখানে পরমহংস স্বামী নিগমানন্দজীর উপদেশটি তুলে ধরলেই আশা করি আলোচিত বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে আমি আশা করি, যথা–

১৮। ডঃ দীলিপ কুমার রায়, **স্মৃতিচারণে মহাযোগী অনির্বাণ**, কলিকাতা: হৈমবতী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৬ বঙাব্দ, পৃ.,২৫
১৯। ঐ, পৃ., ২৫

"এই যে কালো আকাশ দেখতে পাচ্ছ, এও যেমন সত্য, তেমনি এই আকাশই আবার আলোর আকাশ। দিন রাতের পর্যায়ে নয়, একই সঙ্গে। সেখানে দিনরাত নাই, ব্রহ্ম যুগপৎ আলো আর কালো; এইটি যেদিন বুঝবে সেইদিন তোমার সম্যক্ জ্ঞান হবে।"[২০] এই সম্যক্ উপলব্ধিই শ্রীঅরবিন্দদেবের জীবনে বাসুদেবের কৃপায় প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল বলেই ধর্মের এই যোগপথে প্রাক্টিকেল উপলব্ধিটি লাভ করেছিলেন। আর ঠিক এই মহাশক্তির আকর্ষণের জোরের কারণেই বৃটিশদের জেল জুলুম তাঁকে একবিন্দু বিচলিত করতে পারেনি। তাদের শত পরিকল্পিত বুদ্ধিও তাঁর উপর খাঁটিয়ে তাঁকে ফঁসিকাষ্ঠে ঝুলাতে পারেননি। কোনভাবেই তাঁকে তারা আর জেলে আটকে রাখতে পারেন নি। কারণ যোগপথ তাঁকে আত্মস্বরূপ দান করেছিলেন বলেই তিনি মৃত্যুহীন অমর হয়ে উঠেছিলেন। জাগতিক শত বন্ধন ছিন্ন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বাসুদেবের অপার শক্তি তাঁকে ঘিরে রেখেছিল। অতএব 'মাভৈঃ', তাঁর কোন ভয় ছিলনা, তিনি ভয়কে জয় করে অভী হয়ে উঠেছিলেন। এজন্য তিনি জোর গলায় বলতে সক্ষম হয়েছিলেন ভারত স্বাধীন হবেই। কোন শক্তি নেই তাকে পরাভূত করে। 'বাসুদেব যখন আমাকে বলেছেন, ভারত স্বাধীন হবেই তখন হবেই'।

অদ্যাবধি আলোচনা প্রসঙ্গে মহাযোগী অরবিন্দ সম্পর্কে এবং তাঁর ধর্মমত প্রসঙ্গে যথাযথভাবে বলতে গেলে আমাদের এই ধারণা জন্মায় যে, জড়ের মাঝে যদি ভগবানের চেতনা না যুক্ত থাকত, প্রাণের জন্ম ঘটতে পারত না, তেমনি প্রাণের মধ্যে যদি ভাগবত চেতনার আরও বেশি বিকাশ না থাকত, মন-ও জন্ম নিত না। আর সেই মন ক্রমে ক্রমে বিকশিত হতে হতে পূর্ণতম চেতনায় – অতিমানস-এর স্তরে উঠে Supermental Consciousness-এ বা Supertruth Consciousness, Supra-rational Conscious stage-এ Super-most energy- র সঙ্গে মিলতেও পারত না। শ্রীঅরবিন্দ ধর্মমত এই লক্ষ্যেই একমাত্র যোগপথ মাধ্যমে অতি অল্প সময়ে অতি সহজে সর্বোচ্চশক্তি বিশিষ্ট অতিমানসের যোগ সংস্থাপন সম্পন্ন করেই তিনি দ্রুত এই পরাধীন ভারতকে বহুদূরে অন্তরালে বসে থেকেও আধ্যাত্মিকতার শক্তি দিয়ে স্বাধীন করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর ধর্মমতের গুরুত্ব এখানেই বিশেষভাবে আমাদের সবাইকে কমবেশি আকর্ষিত করে।

২০। নন্দদুলাল চক্রবর্তী, **শ্রীমৎ অনির্বাণজীর গুরুভক্তি**, দিনাজপুরঃ শ্রীনিগমানন্দ সারস্বত সেবাশ্রম, প্রথম সংস্করণ, ২০০২ পৃ., ৮৮

৪.২.৩: ধর্ম সম্পর্কে শ্রী অরবিন্দের ব্যাখ্যা অথবা তাঁর মতের প্রধান বৈশিষ্ট্য

শ্রী অরবিন্দের মতে ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ নিম্নরূপ:

শ্রীঅরবিন্দের মতে ভারতবর্ষ একটি সামান্য ভূ-খন্ড মাত্র নয়, বরং ভারতবর্ষ হল ভারত শক্তি। এক মহান আধ্যাত্মিক ভাবের প্রেরণা– ভারতমাতা রূপে এক জীবন্ত তপঃশক্তি, দিব্যশক্তি ও দেবমূর্তি। এই শক্তির প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধাই হল ভারতবর্ষের অস্তিত্বের মূল। কারণ এই শক্তির মূলেই ভারতবর্ষ অমর জাতিদের মধ্যে অন্যতম।

কলিকাতায় এসেই শ্রীঅরবিন্দ দেখলেন ও ভাবলেন, তাঁর ধর্ম ও কর্মকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করলেই সম্ভবত তাঁর আরাধ্য সাধনা পূর্ণাঙ্গ হয়; যথা– (১) বিপ্লবের সংগঠন। (২) জাতীয় সংগঠন বা কংগ্রেসের মাধ্যমে গণজাগরণ। (৩) সংবাদ পত্র প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচার, (৪) জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন এবং শেষোক্তটি হল– (৫) যোগ ও সাধনা। এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্যসমূহকে তিনি তাঁর কর্মযজ্ঞে প্রধানরূপে স্থান দান করতে পারলেই ভারতের স্বাধীনতা ও তাঁর স্ব-স্বরূপের সাধনায় উত্তীর্ণ হতে তাঁর পক্ষে কোন বাধা থাকবে না। এই কল্যাণ কর্মচিন্তাতেই বাসুদেবের কৃপা তাঁর উপর বর্ষিত হয়েছিল। নিম্নে ধর্মের জন্য তাঁর কর্মচিন্তার বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরা হল–

প্রথমত: তিনি শুধু ধর্মের জন্য আসেন নি বরং ধর্মই তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাঁর জীবনকে বেছে নিয়েছিল। ভারত যাতে সত্যিকার পরাধীনতার শৃংখল মুক্ত হয়ে স্বাধীন হতে পারে। এই ধর্মপথে আসার পিছনে যাঁর অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত ছিল তিনি এক উর্ধ্বলোকের পুরুষ। তাঁরই সুপরিচিত কণ্ঠস্বরের প্রত্যাদেশ লাভ করে শুরু হয়েছিল তাঁর ধর্মময় এক কর্মযোগজীবন। প্রত্যাদেশটি ছিল এরূপ–" I suddenly received a command from above, in a voice welknown to me, in three words ; go to chandannagore."[২১] সেখানে পৌঁছা মাত্র দ্বিতীয় আদেশ অন্তর্বাণীরূপে প্রাপ্ত হন, "পন্ডিচেরি চলে যাও"। (it was by an adesh............command from above)."[২২] তাঁর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল–

২১। পূর্বোক্ত, ব্রজগোপাল দাশ, **অমর জ্যোতি**, পৃ., ৩০
২২। শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার, **ঋষি অরবিন্দের যোগ- জীবন ও সাধনা**, কলিকাতা: শ্রী অরবিন্দ সোসাইটি, পঞ্চম পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২৪ নভেম্বর, ২০০০, পৃ., ১৮

এতে কি ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই ? উত্তরে তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেছিলেন, ভুল হওয়া বা সে কণ্ঠকে অমান্য করা অসম্ভব।

দ্বিতীয়ত: যাঁর জীবন শুরু হয়েছিল স্বদেশ প্রেম নিয়ে। ভারতের স্বাধীকার আন্দোলন আদায়, রাজনীতির গভীর ছত্রছায়ায় স্বদেশের জন্য জীবন দান। মুহূর্তে বদলে গেল এক Supermantal আদেশ লাভ করে। যার অর্থ ছিল আগে নিজেকে পরাধীনতার শৃংখল হতে মুক্ত কর। অর্থাৎ আত্মস্বরূপ লাভে উদ্বুদ্ধ হও। অতঃপর নিজে মুক্ত স্বাধীন হয়ে স্বাধীনতা প্রদানে অগ্রসর হও। এই ছিল তাঁর প্রতি বাসুদেবের আজ্ঞা।

তৃতীয়ত: তাঁর জীবন ও ধর্ম কর্ম সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, "যে কর্মের প্রবর্তনা আমি করেছিলাম, নিয়তি নির্দিষ্টভাবেই, তা অন্যের দ্বারা আমার পূর্বদৃষ্ট পথেই অগ্রসর হবে এবং আমার ব্যক্তিগত ভূমিকা বা উপলব্ধি ব্যতিরেকেই এই আন্দোলন অন্তে বিজয়ী হবে। আমার এই স্বেচ্ছাপসরণের পিছনে কোন নিরাশা বা অজ্ঞানতার ভাব ছিল না।"[২৩]

চতুর্থত: ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী তাঁর বরোদা রাজ্যে কাজে যোগদান। এখানেই তাঁর অধ্যাপনা কার্যের সাথে সাথে শুরু হয় ধর্মময় এক অনুপম কর্মযোগজীবন। এখানেই তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় ভিত্তির মূলে যে ধর্ম, আর সেই ধর্মপোদেশ যে বেদ, বেদান্ত, গীতা প্রস্থানত্রয় শাস্ত্র হিসেবে সনাতন ধর্মের মূল শাস্ত্র তা অধিগত করেন। শিখেন সংস্কৃত ভাষা, ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, প্রসিদ্ধ ভাষ্য ও টিকাকার সায়ন শংকরাচার্য ইত্যাদি আচার্যদের দিক্‌নির্দেশনা। এই দিক্ নির্দেশনাই ছিল তাঁর ধর্মজীবনের বৈশিষ্ট্য।

পঞ্চমতঃ বরোদায় একদা ঘোড়াগাড়ীতে উঠে কার্যান্তরে গমন জনিত কারণে তাঁর জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনা থেকে– তিনি যখন মৃত্যুর হাত থেকে জীবন ফিরে পাওয়ার জন্য ছট্‌পট্ করছিলেন হঠাৎ তাঁর মনে জাগ্রত হয়, আমাকে বাঁচতে হবেই। যেই মনে হওয়া অমনি এক জ্যোতির্ময় পুরুষ বেরিয়ে এলেন তাঁর ভিতর থেকে। মনে হয়েছিল তাঁর, নিশ্চয়ই ইনি আমার সর্বনিয়ন্তা পরমপুরুষ। এই পুরুষই অভাবনীয় রূপে তাঁকে সেই দুর্ঘটনা থেকে মুক্ত করলেন, জীবন ফিরে পেলেন অক্ষত শরীরে। ধর্মের বীজ তাঁর জীবনে তিনি নিজে বপন করেন নাই বরং তিনি পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট ছিলেন ধর্মের এক উপযুক্ত আধার রূপে।

২৩। ঐ, পৃ., ২৫

এই অন্তরাত্মার কৃপাই ছিল তাঁর ধর্মজীবন লাভের এক গভীর অন্তর্যোগ যা শুরু হয়েছিল পাঁচ বছর বয়স থেকেই ।

ষষ্ঠত: ভগবান মানুষকে কখন কিভাবে তাঁর দিকে নিয়ে আসবেন তা তিনিই একমাত্র জানেন । কাউকে বিপদ দিয়ে– বিপদভঞ্জনরূপে, কাউকে দুঃখ দুর্দশা প্রদান করে–ত্রাণকর্তারূপে, কাউকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে–জীবনদাতা হিসেবে, এমনি আরও কত কি ভাবে রক্ষা ও নতুন আলোর পথ সৃষ্টি করে দেখান তা তিনিই একমাত্র জানেন । শ্রীঅরবিন্দের ধর্মলাভ শুরু হয়েছিল এরকমই একটি ঘটনা থেকে । তিনি বলেন:

> তাঁর উপর আমার জ্বলন্ত বিশ্বাস ছিল– তা বলতে পারি না । বরং আমার মধ্যে বেশি বিদ্যমান ছিল অবিশ্বাসী, সংশয়বাদী নাস্তিক, ভগবান আদৌ আছেন কি না সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলাম না । তথাপি কি করে যে আমাকে বেদের সত্যের দিকে, গীতার সত্যের দিকে, হিন্দুধর্মের সত্যের দিকে আকর্ষণ করত । আমি অনুভব করতাম, যে এই যোগের মধ্যে, বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত এই ধর্মের মধ্যে মহাশক্তশালীনি সত্য নিশ্চয় আছে । তাই আমি যখন যোগের দিকে ফিরলাম, সংকল্প করলাম যে, যোগসাধন করব । দেখব আমার ধারণা সত্য কিনা, তখন আমি এই ভাব নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলাম, ভগবানকে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম– যদি তুমি থাক, তুমি আমার মনের কথা জান । তুমি জান আমি মুক্তি চাই না, অপরে যা চায় এমন কোন জিনিষই আমি চাই না । আমি শুধু চাই এই জাতিটাকে তোলবার শক্তি । আমি শুধু চাই এই যে ভারতের লোকসকলকে আমি ভালবাসি, যেন এদের জন্য জীবন ধারণ করতে পারি, কাজ করতে পারি, যেন এদের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পারি ।[২৪]

সপ্তমত: আমরা জানি এই বিশ্ব প্রাকৃতিক নিয়মে চলে । এবং এই বিশ্বজগতের বিবর্তন ঘটছে ক্রমবিকাশের দিকে । মানুষের জীবনেও এই ক্রমবিবর্তন চলছে তার মানস চেতনায় । যেখানে সত্য, জ্ঞান, প্রেম, ন্যায়-ধর্ম, সুষমা ও দিব্য চেতনার আলো প্রস্ফুটিত হচ্ছে পূর্ণবিকাশের নব পরিণতির দিকে যা আগে ছিল তার কাছে আধো আলো আধো ছায়ায় আচ্ছন্ন । আজ তার মনে এই ধারণা সুস্পষ্ট যে মানুষের বর্তমানরূপ তার চুড়ান্ত পরিণতি নয় । মানুষের মানস চেতনার বিকাশ তখনই পূর্ণ হবে যখন এই পৃথ্বী জড়-চেতনার মধ্যে ঘটবে অতি

২৪ । ঐ, পৃ., ১৮

মানস চেতনার অবতরণ। তখনেই মানুষ বুঝতে পারবে এই দুঃখ-দুর্দশা, জন্ম-মৃত্যু জরা ব্যাধিতে পরিক্লিষ্ট এই পৃথিবী রূপান্তরিত হবে স্বর্গরাজ্যে। নরাসুরের দ্বন্দ্ব সেদিনেই হবে অবসান। এ স্বপ্ন বা কল্পনা বিলাস নয়, এই সত্যদর্শন শ্রী অরবিন্দের জীবন-দর্শনে জীবন্ত ও বাস্তবরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমান বিজ্ঞান যুগে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানী শ্রীঅরবিন্দের এটি হল এ-যুগের বিজ্ঞানীদের প্রতি তাঁর একটি বিস্ময়কর চ্যালেঞ্জ।

অদ্যাবধি মোটামুটি এই পর্যন্ত আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের ধর্মজীবনের মূল পর্ব আমরা অবগত হয়েছি। পৃথিবীর চেতনার রূপান্তরের যোগ সাধানাই ছিল তাঁর জীবন সংগ্রাম ও অসাধ্য সাধন। দিবা-রাত্র সমানভাবে তাঁর ধ্যান তপস্যা অবিরাম গতিতে চলছিল। এটি শুরু হয়েছিল, ১৯২৭ হতে ১৯৩৮ দীর্ঘ বার বৎসর। পরের একটি ঘটনায় সামান্য পরিবর্তিত হয়ে আবার শুরু হয় সেই যোগ সাধনা– ১৯৩৮ থেকে ১৯৫০ তাঁর মহাপ্রয়াণ কাল পর্যন্ত। আরও ১২ বৎসর, সর্বমোট ২৪ বৎসর। নিঃসন্দেহে একটি জীবনের জন্য এটি কম সাধনা নয়। শুধুমাত্র এই মাটির পৃথিবীতে সেই অনন্ত জ্যোর্তিময় পুরুষকে নামিয়ে এনে গঠন করতে চেয়েছিলেন পরম শ্রেষ্ঠ এক পৃথিবী। দীর্ঘ ২৪ বৎসর ধরে এমন সাধনা অতীতে আর কেউ এমন করে– করে; এবং বাস্তবায়ন দান করে গেছেন বলে আমার জানা নেই। এই প্রসঙ্গে তিনি চেয়েছিলেন,

“অতীতে মানুষ যাহা করিয়াছে, চিরকাল তারই পুনরাবৃত্তি করিয়া চলা আমাদের কাজ নয়। আমাদের কাজ হল অভিনব সিদ্ধি।”[২৫] তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেন, “পৃথিবীর অগ্রগতি চাও, পুরাতন সব ধারণাকে বিদায় দাও। তাহলে সমস্ত চিন্তা আঘাত পেয়ে নতুন করে জেগে উঠবে”[২৬]।

৪.২.৪: অরবিন্দের ধর্ম সম্পর্কিয় মতের পর্যালোচনা

শ্রী অরবিন্দের জীবন ধর্ম ও কর্মালেখ্য এমনই এক সুন্দর ও স্বর্গীয় সুষমামন্ডিত ভাব উন্মেষক বিষয়বস্তু যা অনুধাবনে মুমুক্ষ পাঠককে অজান্তে তাঁর চেতনার পার্থিব স্তর হতে বহু উর্ধ্বে এমন এক চেতনার স্তরে উন্নীত করে সেই দিব্য চেতনা বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর সকল মানব জাতির নিঃসন্দেহে একটি নব প্রেরণা।

শ্রী অরবিন্দ একজন সত্যদ্রষ্টা ঋষি। ‘দিব্য-জীবন, (Life Divine) ‘যোগ-সমন্বয়’ (Synthesis of Yoga) (The Secret of the Veda) বেদরহস্য ও ‘সাবিত্রী’ (Sabitri) এই চারটি মহাকাব্যই

২৫। পূর্বোক্ত, ব্রজগোপাল দাশ, **অমর জ্যোতি**, পৃ.,২২
২৬। ঐ, পৃ.,৩০।

তাঁর সমস্ত জীবনের কঠোর সাধনার কর্মফল এবং জীবন দর্শন। এই চারটি মহাকাব্য মাধ্যমেই তাঁর দর্শনের এক নতুন রূপ মানব জীবন দর্শনে অভিনব রূপায়নে পর্যবসিত হয়ে নব আলোকে এক নতুন প্রেরণার উৎস রূপে আমাদের মাঝে ধরা দিয়েছে। উক্ত মহাকাব্যগুলি মাধ্যমে তাঁকে পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত হতে না পারলেও তাঁর চরণতলে স্থান পাওয়া যাবে এটুকু বিশ্বাস রাখতে পারি। তিনি তাঁর মতের আলোকে যে প্রত্যাশা আমাদের জন্য রেখেছেন, তা জীবনের দিব্য পরিণতি ও পূর্ণতা, কেবল মুক্তিই নয়।

পৃথিবীর মানুষ আজ মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছে– বিজ্ঞান তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে নি। এদিকে সন্ন্যাস জীবন-যাপনে ব্যক্তিগত মুক্তি এলেও তা সমগ্র মানব গোষ্ঠিকে উন্নীত করতে সক্ষম হন নি। এই দুই পথে পার্থিব চেতনার কোন রূপান্তর এখনও কেউ আমাদের পরিপূর্ণ রূপে দিতে পারেন নি। শ্রীঅরবিন্দ এই দুই বিরোধী মতের সমন্বয় করলেন এইভাবে যে, এই মাটির পৃথিবীকেই দিব্যজীবনের পরিপূর্ণতা দান করতে হবে। এর রূপান্তর আনতে হবে। ক্রমবিবর্তন ধারায় পৃথিবীর পরিবর্তন যেমন নিয়ত বর্তমান, ঠিক এই ক্রমকে লক্ষ্য করেই স্বর্গ আর– আমাদের স্বর্গলোক কল্পনার বিষয়বস্তু হয়ে থাকবে না। তাঁকে নামিয়ে আনতে হবে এই ধরার ধরণীতে দিব্যজীবন রূপে। এটি যে অসম্ভব নয় শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নিজ জীবনে সাধনার মাধ্যমে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে– কিছু হলেও যথাসাধ্য বাস্তবায়ন দান করে গেছেন। ঋষি অরবিন্দের ধর্মমতের বিশেষত্ব এবং বৈশিষ্ট্য এখানেই তাৎপর্যপূর্ণ। যা আজ পর্যন্ত কোন সাধক এই অসাধ্য সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেন নি।

এই বাস্তবায়নতার পরিপূর্ণ রূপ তিনি এইভাবে দান করেছেন যে, পৌরাণিক কাহিনী সাবিত্রী মহাকাব্যকে আপন জীবনের যোগসমন্বয়ের এক জীবন্ত-সাধনা রূপে গ্রহণ ও বরণ দ্বারা।

যেমন করে মহাভারতের সেই রূপকটি– সবিতা বা আলো রূপে যা সাবিত্রী নাম ধারণ করে তার আলোর পরশ দ্বারা জীবন দিয়ে তার সমস্তকিছুকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে বাঁচিয়ে রেখেছেন এই ভূলোককে, সত্যরূপ মৃতস্বামী সত্যবানকেও ঠিক অনুরূপভাবে পুনর্জীবন দান করা বা অমরত্ব দান করা যে কোনরূপ অসম্ভব নয়, সাবিত্রী মহাকাব্যটিকে সাধন মাধ্যম করে তিনি তা ফুটিয়ে তুলে জীবন্ত প্রমাণ দান করে গেছেন।

ঋষি অরবিন্দের এই সুবিশাল সাধনার লক্ষ্যরূপে 'যোগসমন্বয়' সাধন গ্রন্থটি হল এর ধারাবাহিক একটি জীবন্ত রূপ।

পন্ডিচেরীর অরবিন্দ আশ্রম আজ ভূয়সী প্রশংসার দাবিদার রূপে বিশ্বনন্দিত হয়ে উঠেছে। সেখানে গড়ে উঠেছে ভূলোকের রূপ পরিবর্তন করে দ্যুলোকের এক নব জাগরণ। গড়ে উঠেছে – বিশাল কর্ম যজ্ঞশালা। পৃথিবীর শিশু, কিশোর, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ– স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই নিরন্তর জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি সমন্বয়ে পূর্ণযোগের পথে আত্মবিকাশের সাধনায় নিমগ্ন। তিনি যে এই বিষয়ে সবাইকে উদ্ধার করতে সক্ষম তাঁর আশ্বাস বাণীই আমাদের জন্য বিশেষভাবে সহায়ক। তাঁর অমর জ্যোতি প্রকাশ ও অমরত্বদান; তাঁর সাধনার যে এক দৃঢ় প্রত্যয় বাণী– শ্রবণেই তা অবগত হতে পারি–

> আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার আছে। ক্ষাত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে, ব্রহ্মতেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এইভাব নতুন নহে, আজকালকার নহে, এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম। এইভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। চোদ্দ বৎসর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার বছর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল।[২৭]

'বাসুদেব সর্বমিতি', সর্বভূতে বাসুদেব বর্তমান। বাসুদেব নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তিনি যখন জানলেন এবং তাঁকে অন্তসত্তায় উপলব্ধি করলেন, কারাগার যখন আর তাঁর নিকট কারাগার না থেকে করানন্দনে রূপান্তরিত হয়েছিল তখন বাসুদেব তাঁকে যে নির্দেশ দানে বাধিত করেছিলেন তা অরবিন্দ ধর্মমতের এক অনবদ্য অবদান। মানুষের সসীম ইচ্ছা শক্তির চেয়েও যে অসীম পরমসত্তার ইচ্ছা অনিবার্য, আর শ্রীঅরবিন্দদেব সেই শক্তির কৃপাতেই যে, এই পৃথিবীতে দিব্য জীবনের রূপান্তর ও ভারতভূমিকে স্বাধীন করতে উৎসাহী হয়েছিলেন তা অন্য কেউ জানুক আর নাই জানুক তিনি মরমে মরমে উপলব্ধি করেছিলেন অন্যের থেকে অধিক। তিনি কিভাবে বাসুদেবের কৃপা লাভ করে জীবনের গতি পাল্টিয়েছিলেন তাঁর বাণী থেকেই তা জানতে পারি। হিংসা করে, রক্ত ক্ষয় করে যে– পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ হয় না, স্বাধীনতা যে পরম

২৭। **শ্রী মা, শ্রী অরবিন্দ ও তাঁর বাণী**, কলিকাতাঃ অরবিন্দ পাঠ মন্দির, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭১, পৃ.,৫-৬

সত্তার মহতি ইচ্ছাতেই একমাত্র সম্ভব হয়, শ্রীঅরবিন্দ তা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর জীবন ধর্ম ও কর্মের বিশেষত্ব এখানেই তাঁর কথায়:

> মনে রেখ ! কালো মেঘ বা জড় ঝাপটা, বিপদ বা কষ্টভোগ বা বিঘ্নবিপত্তি যাই কেন আসুক, অসম্ভব বলে যা কিছুই মনে হোক না কেন; বস্তুত অসম্ভব কিছুই নয়, অসাধ্য কিছুই নয়। আমিই নারায়ণ, আমিই বাসুদেব, আমি রয়েছি এই জাতির উত্থানের মধ্যে, আর আমার যা ইচ্ছা তাই হবে, অন্য কারো ইচ্ছাতে কিছু হবে না। আমি যা এখানে আনতে চাই । কোন শক্তি তা এখানে ঠেকাতে পারবে না।[২৮]

শ্রী অরবিন্দ এখানেই তার ধর্মজীবনে সবচেয়ে বেশি মহিমান্বিত ও শ্রদ্ধেয় এবং সম্মানিত। তাঁর সাধনায় ভগবান এত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর ইচ্ছাকে তাঁর ইচ্ছামত লালন করেছিলেন। একারণেই তিনি এই মাটির পৃথিবীতেও দিব্যজীবনের জ্যোতি ফুটাতে তাঁর ইচ্ছার সাথে নিজ ইচ্ছা সমভাগী সহমর্মী করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ ভারতধর্ম সাধনার মধ্যে যোগসাধনাকেই অন্যতম সাধনা বলে গ্রহণ করেন। প্রথমে গঙ্গামঠের স্বামী ব্রহ্মানন্দের এক শিষ্যের নিকট হতে যোগের সাধারণ নিয়ম ও পদ্ধতি জেনে নেন। পরে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নেন প্রখ্যাত যোগী বিষ্ণুভাস্কর লেলের নিকট। প্রথমে তিনি প্রাণায়াম অভ্যাস করেন। সেই সময় সকলের ধারণা ছিল প্রাণায়াম ব্যতীত যোগ হয় না। তাই তিনি প্রাণায়াম অভ্যাস করতে থাকেন। কোন কোনদিন ৬ ঘন্টারও বেশি সময় প্রাণায়াম করতেন। এইভাবে চলে তিন চার বৎসর। প্রাণায়াম করতে গিয়ে তিনি যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন তাহল, এরকম:

২৮। ঐ, পৃ., ২৫-২৬

আমার নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি প্রাণায়ামে মাথা প্রকাশময় হয়– অর্থাৎ ভিতরটা আলোকিত হয়ে ওঠে। বরোদায় আমি সকালে তিন ঘন্টা এবং বিকালে দুই ঘন্টা অভ্যাস করতাম। এতে মন সজীব হয়ে কাজ করত। আমি পদ্য লিখতাম, দিনে আট দশ লাইনের বেশি আগে লিখতে পারতাম না কিন্তু প্রাণায়াম করার পর থেকে আধঘন্টায় দু'শো লাইন লিখতে পারি। পূর্বে আমার স্মৃতি শক্তি প্রখর ছিলনা, পরে যখন অনুপ্রেরণা এল, তখন লাইনগুলি পরের পর তাদের স্থান অনুযায়ী ঠিক মনে রাখতে পারতাম ও পরে সুবিধামত তা লিখে রাখতাম। এই বর্ধিত মানসিক শক্তিতে আমি মাথার ভিতরে একটা সক্রিয় তেজময়তা অনুভব করতাম। এই প্রণায়াম করার ফলেই আমি সক্রিয় শক্তিতে ভরপুর হই। কবিত্ব শক্তি বাড়ে এবং জ্যোতির্ময় মূর্তি প্রভৃতি অনৈসর্গিক দৃশ্যসকল দেখতে আরম্ভ করি এবং আশ্চর্যের বিষয়, ঐ সকল বেশির ভাগ খোলা চোখেই দেখি। এই প্রাণায়ামের গুণেই আমার স্বাস্থ্য ভাল হয় এবং আমাকে একটা জ্যোতি ঘিরে ধরে থাকে।[২৯]

এখানেই প্রমাণ হয়, ভারতীয় সাধনা ও ধর্মলাভ এবং সাধনায় ঈশ্বর লাভ; বাতুলতা বা ব্যর্থতা নয়। বরং প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও গ্রহণযোগ্য। পাশ্চাত্য শিক্ষায় ও পাশ্চাত্য দর্শনে অসাধারণ জ্ঞানী বিচক্ষণ একজন ব্যক্তিত্ব হিসেবে শ্রী অরবিন্দ ভারতধর্মকে যে স্তরে ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে প্রমানিত হয় তিনি ভারতের বিশিষ্ট ধর্মবিদ্ এবং জাগ্রত চেতনার অধিকারী সাক্ষাত একজন অধ্যাত্মবিজ্ঞানী।

এখানেই তাঁর ধর্মমতের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। শিক্ষিত সমাজে তা আজ এই প্রমাণ করে যে, ধর্ম সম্পর্কে তাঁর চিন্তা চেতনা অসার নয়। বরং তিনি আধুনিক যুগের একজন ধর্মের সাথে দেশ স্বাধীনতার অপূর্ব যোগসমন্বয় আমরা পরিপূর্ণ রূপে সক্রিয়ভাবে ঋষি অরবিন্দ জীবন-দর্শনেই দেখতে পাই। তিনি চেয়েছিলেন একান্তভাবে পরাধীনতার শৃংখল হতে ভারতের মুক্তি। ভারত মাতার যে অনন্ত শক্তি তারই বিকাশ। একটি স্বাধীন সম্পূর্ণ ভারত। তাঁর ধর্মজীবনের মূল মন্ত্রই ছিল– স্বরাজই (স্বাধীনতা) জীবন, স্বরাজই অমৃত, স্বরাজই মুক্তি। মানুষ স্বাধীন হয়েই জন্মায় এবং যদি সে সেই স্বাধীনতা কোন কারণে হারায় তাহলে তাকে পুনরায় তা অধিকার করতে হয়। এই স্বাধীনতা অর্থ ঋষি অরবিন্দদেব আপন সত্তার অধিকারকেই বুঝাতে চেয়েছেন। দেশের এই স্বাধীনতা অর্জনই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান সংকল্প।

২৯। পূর্বোক্ত, শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার, **ঋষি অরবিন্দের যোগ-জীবন ও সাধনা**, পৃ.,২৭।

কিন্তু এই স্বাধীন অর্থটি সম্বন্ধে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, স্ব-স্ব স্বাধীন সত্তারূপ আত্মার স্বরূপজ্ঞান লাভ। এটাই ভারত-দর্শনের 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' ।...বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বা তি মৃত্যু মেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ।"– উপনিষদ্ । আমরা অমৃতের পুত্র, এই মর জগতে আমরা এসেছি শুধুই অমৃত লাভ করতে। মৃত্যু বলে যে কোন জিনিষ নেই, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ তা স্বচোক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁদের বাণীই তার প্রমাণ। মৃত্যু একটা রূপান্তর মাত্র ছাড়া অন্য কিছুই নয়। অজ্ঞানতাই হল মৃত্যু, জ্ঞানই হল মুক্তি। এই মুক্তিকে তিনি জীবনের জন্য একটা রূপান্তর রূপে গ্রহণ করে সেই অমৃতময় পুরুষকে এই মাটির পৃথিবীতে নেমে আসার আহ্বান জীবনভর জানিয়ে গেছেন। তাঁর বাণী মাধ্যমেই জানতে পারব তিনি কি চেয়েছিলেন ?

> কোন ধূসর অতীতে প্রবুদ্ধ মনের প্রথম কিরণ সম্পাতেই –মানুষের মাঝে জেগেছে এক লোকত্তর এষণা– দিব্যস্বরূপের এক অস্ফূট আভাস তার মাঝে এনেছে পূর্ণতার প্রেতি। তাকে ছুটিয়েছে নিখাদ সত্যের অনির্বাণ আনন্দ দীপ্তির সন্ধানে, অমৃতের নিগুঢ় চেতনায়। আকূল করেছে তার অন্তর। যুগ যুগান্তরের ধারা বেয়ে চলেছে তাঁর অবিশ্রাম এষণা; তার আদি নাই, বুঝিবার অন্তও নাই; সংশয়ের নাস্তিকতার দীর্ঘতম অমানিশার পরেও জীবনের প্রাচীমূলে বারবার দেখা দিয়েছে তার অরুণ লেখা– মানবের প্রাচীন ইতিহাস তার সাক্ষি। আর আজ বহিঃপ্রকৃতির ঐশ্বর্যের বিপুল দানে যখন ভরে উঠেছে মানুষের অঞ্জলি, তখনও তার প্রাণের গহনে কোথায় বেজেছে এক অতৃপ্ত হাহাকার... আলো চাই, স্বাতন্ত্র চাই, চাই অমৃতের অধিকার, চাই দিব্য জীবনের ভাস্বর মহিমা ... ।[৩০]

শ্রী অরবিন্দের মতের পর্যলোচনা এখানেই বিশেষভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে এই লক্ষ্যে যে, তিনি যেমন চেয়েছেন অমৃত লাভ তেমনি চেয়েছেন, সেই অতিমানসের অবতরণ। ঋষি অরবিন্দ যে তাঁর দিব্য-জীবনের স্রষ্টা তা কিন্তু নন। তিনিও হলেন বেদের ঋষিদের মত দিব্যজীবনের দ্রষ্টা। তাঁর এই বেদ তাঁরই জীবনবেদ। একটি নতুন পরাজ্ঞান। যা কিনা মানুষ সহস্র সহস্র বছর ধরে তা লালন করবে– বেদেরই মত। এটিই তাঁর ধর্মমতের একটি বিশেষ আলোচ্য বিষয়।

৩০। ঐ, পৃ., ৯৩

৪.২.৫: উপসংহার

বিবর্তনের অগ্রদূত মহাযোগেশ্বর শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে বহু দেশে বিদেশে তাঁর বহুল প্রচার ও প্রকাশ লাভ যতটা ঘটেছে তাঁর জন্মভূমি বঙ্গে ততটা প্রচার ও প্রকাশ লাভ ঘটেনি। বিশ্বের অধিকাংশ দেশের মাধ্যম ভাষা– ইংরাজী। তাঁর জীবন ও দর্শন সম্পর্কীয় অনুধ্যান বাল্যকাল থেকেই ইউরোপের শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর পিতা স্বয়ং সেটাই চেয়েছিলেন এবং সেই ব্যবস্থাই করে গিয়েছিলেন। এই কারণটিই ছিল তাঁর প্রতি বঙ্গবিমুখতার মূল কারণ।

শ্রীঅরবিন্দকে ভারতবর্ষে যেভাবে চেনার প্রয়োজন ছিল ঠিক সেভাবে অনেকেই চিনেননি। প্রথমত তিনি ছিলেন প্রচার বিমুখ। কি রাজনীতি জীবনে, কি যোগ জীবনে, কোথাও তাঁর প্রচার ছিলনা। তিনি নেপথ্য জীবনযাপনকেই পছন্দ করতেন বেশি। তিনি যে রাজনীতি করেছেন তা দেশমাতার মুক্তির জন্য, দেশবাশীর জাগরণের জন্য, যে যোগসাধনাকে জীবনে বেশি প্রাধান্য দান করেছেন তা সমগ্র বিশ্বের মানব কল্যাণের জন্য। তিনি নিজের মুক্তির জন্য যোগসাধনা করেন নি, যোগসাধনা করেছেন, মানব জাতির মুক্তির জন্য। তাঁর এই নতুন পদ্ধতির যোগসাধনাটি ছিল– অতিমানস চেতনাকে এই পৃথিবীতে নামিয়ে এনে সমগ্র বিশ্ব তথা মানব জাতির রূপান্তরই ছিল তাঁর অদম্য স্পৃহা ও তপস্যা। তিনি সমগ্র মানব জাতির উন্নয়নকেই জীবনে বেশি প্রধান্য দিয়েছিলেন ।

ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধিজী ভারতবর্ষে যে তুলনায় প্রচারিত হয়েছেন অরবিন্দ সেই তুলনায় প্রকাশিত হন নি। অথচ বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে নিজেই বলেছেন, "অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার"। এদিকে স্বাধীনতাযোদ্ধার প্রতিকৃতিতে যিনি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি রূপে সুপরিচিত, শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু তাঁর বহুপূর্ব থেকেই ভারতের স্বাধীনতার দাবি করে চরমপন্থীরূপে সর্বভারতীয় নেতার আসন পেয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এখানে এটিই যে, শুধু অরবিন্দ একা নন এমন অনেক যোগীশ্রেষ্ঠ সাধক ও দেশপ্রেমিক যেমন স্বামী নিগমানন্দ, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, স্বামী সুমেরুদাসজী, লেলে প্রভৃতি আরও বহু নামী দামী

ভারতভূমির সর্বশ্রেষ্ঠ অনবদ্য বৈদিক যোগীশ্রেষ্ঠ বিশ্বকল্যাণকারী ঋষি মুনিবৃন্দ তাঁরা কেউ ভুলেও বহু অমুল্য গ্রন্থ রচনা করেও নিজের নাম প্রকাশ করেননি। কারও কারও জীবনে এক আধটু অজান্তে প্রকাশ হয়ে পড়লেও জাতীয়ভাবে তার মূল্যায়ন দান করা হয়নি। ভারতধর্মের এটাই স্বাভাবিক রীতি। আর গুণীর গুণ সহজে প্রকাশ না করাও একপ্রকার মানব স্বভাব ও প্রকৃতি। কারণ দুর্লভ মানব জন্মের পর মানুষরূপে আমরা পরিচিত হলেও আমরা অধিকাংশ্ পরশ্রীকাতর। কিন্তু ভারতবর্ষের একটি মহান আদর্শ সর্বজন সুবিদিত যে, প্রকৃত ত্যাগী ও গুণীজন কেউ আত্মপ্রকাশ হতে চাননি। কারণ তাঁরা প্রতিষ্ঠাকে বিষ্ঠা জ্ঞান করতেন, এবং অভিমানকে সুরা পান বলে জানতেন, এটাই ভারতীয় জাতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্যের পূর্ণাহুতি। যা ঋষি অরবিন্দদেবের বেলাতেও এটিই ঘটেছে।

পাশ্চাত্য বিদুষী মমতাময়ী মহিষী শ্রীমা-ই ত্যাগী গুণী শ্রীঅরবিন্দকে প্রকৃত জেনেছিলেন। শ্রীমা-ই অরবিন্দকে সবার সামনে তুলে না আনলে আমরা জানতেও পারতাম না তিনি কি ছিলেন, কেন তিনি ভারতে আবির্ভূত হয়েছিলেন ? শ্রীমার একটি বাণী তুলে ধরে বিষয়টি স্বচ্ছ করার চেষ্টা করছি। মা বলতেন,

> হে আমাদের ভগবানের জড় আবরণ, তোমাকে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। তুমি যে আমাদের জন্য এত করেছ – এতখানি কাজ করেছ, যুদ্ধ করেছ, কষ্ট করেছ, আশা করেছ, সহ্য করেছ, তুমি যে সবকিছু সংকল্প করেছ, চেষ্টা করেছ, তৈরী করেছ, সংসিদ্ধ করেছ আমাদের জন্যে; তোমার সম্মুখে প্রণত আমরা, আর এই প্রার্থনা তোমার কাছে, আমরা যেন কখনও ভুলে না যাই, এক মুহূর্তের জন্যও, তোমার কাছে সবকিছুর জন্যে কত আমরা ঋণী ।[৩১]

৩১। সুশীল চন্দ্র বর্মন রায়, **শ্রীঅরবিন্দ অনুধ্যান**, পশ্চিম বঙ্গ, উঃ ২৪ পরগণা: শ্রীঅরবিন্দ কর্মীসংঘ ট্রাষ্ট, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৭, পৃ., ৪৮

শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবনের স্বপ্ন ছিল অরভিল- উষাগ্রাম নামের এমন একটি স্বপ্নের শহর প্রতিষ্ঠা । যেখানে থাকবে না কোন হিংসা- বিদ্বেষ,উচু-নীচুর ভেদাভেদ,থাকবেনা জাতিত্বের প্রশ্ন,স্বার্থের কুটিল হানাহানি। অরভিলের নাগরিকরা বাস করবেন একটি সুন্দর পরিবারের মত। মানুষের ভালবাসাই হবে তাদের ধর্ম। জাতীয়তাবাদ,রাজনীতি কিংবা মতবাদের পার্থক্য নয়-সবার অন্তরে শান্তির স্বর্গীয় আলো স্পর্শ করবে। সমস্ত জাগতিক কাজ সেরেও যে মহালোকের সন্ধান পাওয়া যায় সেই শিক্ষাই দেবে অরভিল। এই ছিল ঋষি অরবিন্দের সারা জীবনের চিন্তা ও চেতনা।

উপসংহারে আমার অভিসন্দর্ভে আমি শ্রীঅরবিন্দকে, তাঁর দর্শনকে, জীবনকে, কর্মকে এবং ভারতবর্ষের তিনি যে একজন অসামান্য সনামধন্য প্রাজ্ঞ প্রতিভা-সম্পন্ন আদর্শ সেই সম্পর্কে অনেক বিদ্বানের মধ্যে সামান্য নগণ্য একজন গবেষণাকারী হয়ে – যে কঠিন কর্মে আত্মনিয়োগ করেছি তা পঙ্গুর গিরি লংঘনসম ছাড়া অন্য কিছু প্রকাশ করে না। ধনীর একজন আদুরে দুলাল হয়ে– কুসুমাস্তীর্ণ সুখ ঐশ্বর্যের পরিমন্ডলে মানুষ হয়ে, দুঃখ দরিদ্রতার জীবন সংগাম থেকে মুক্ত হয়েও, রাজার ছেলে বুদ্ধের মত জীবন লাভ করেও, মানব কল্যাণে যে দুঃখ দরিদ্রতাকে সম্বল করে, কারাবাসে থেকে, কঠোর ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্যে জীবনকে উৎসর্গ করে, কুটিরবাসী ঋষিদের মত সারাটি জীবন পরের কল্যাণে যে জন্য আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, তা অসাধারণ একটি কৃতিত্ব বললে তাঁকে ছোট করা হবে। তিনি আত্মসুখের কথা চিন্তা করলে তদান্তীনকালে ভারতের প্রধান মন্ত্রীত্ব লাভ করার উপযুক্ত প্রার্থী হিসেবে অগ্রগণ্য ছিলেন বলে আমি মনে করি। কিন্তু বাসুদেব কৃষ্ণের আদেশে তিনি ভারত কল্যাণকারী হিসেবে চিরকাল চিরপরিচিত হয়ে বিশ্বে এক মহান আদর্শ শিক্ষক হয়ে থাকবেন বলেই বরোদার অধ্যাপনা জীবন, পন্ডিচেরীর ভগবৎ ধ্যাননিমগ্ন জীবনাদর্শকে বরণ করে নিয়েছিলন। তবুও তৎকালীন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ আই, সি, এস পাশ সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হয়েও সর্বেচ্চ শিক্ষা লাভ করেও আত্মসুখ ও আত্বস্বার্থের জন্য এক বিন্দু প্রত্যাশা ও কল্পনা মনে স্থান দেননি। তিনি জানতেন, তাঁর জীবন তাঁর ইচ্ছার মূর্তবিগ্রহ নয়। তিনি আগাগোড়া পরিচালিত ছিলেন বিশ্বেশ্বরের বিশ্ব ইচ্ছায়।

আমি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকতা জীবনে যে কারণে তাঁর জীবনাদর্শ দেখে মুগ্ধ হয়েছি এবং গবেষণা কর্মে আত্মনিয়োগ করেছি তার মূল উক্তিটি হল– জীবন যদি গঠন করতেই হয়, এই সংসারে যদি বাস করতেই হয়, দেশ জাতিকে যদি ভালবাসতেই হয়, মানব জীবনকে যদি ধন্য করতেই হয় তবে নির্দ্বিধায় শ্রীঅরবিন্দ দর্শনকে জীবনের একমাত্র পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করা উচিত বলে আমি মনে করি। তাঁর মত একজন উচ্চ শিক্ষার্থী, নির্লোভী, বহুভাষাবিদ্, ত্যাগী, জ্ঞানী, বিচক্ষণ, প্রাজ্ঞ, স্বদেশহিতৈষী, উদার , মহৎ ও অধ্যাত্ম জ্ঞানী মানুষ রূপে আত্মগঠন করে দেশ জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করাই একমাত্র প্রকৃত মানব জীবনগঠন ও মানব জীবন-যাপন ।

৪.৩ঃ স্বামী নিগমানন্দের ধর্ম চিন্তা ও একটি পর্যালোচনা

৪.৩.১ঃ ভূমিকা

স্বামী নিগমানন্দদেবের ধর্মচিন্তার সার সংক্ষেপ বলতে আমার জীবনভর গভীর স্বাধ্যায় এবং পর্যালোচনায় যে বিষয়টি আমার সম্মুখে বা আমার মানসপটে উদিত হয়েছে বা গ্রহণযোগ্য বলে আমি মনে করেছি তা অতি সামান্য। আমি বহু জ্ঞানী, গুণী, পন্ডিত মনীষীদের রচিত নিগমচিন্তাগুলি অনুধাবন করেছি তা আমার সাধ্য-সাধনার সাথে সামান্যরূপ সম্পৃক্ত মনে হলেও মনে হয়েছে; আমি সাধ্যাতীত একটি অসামান্য গবেষণার বিষয়বস্তুকে আমার গবেষণা পর্বের বিষয় বলে গ্রহণ করেছি। একজন সত্যলাভকারী মহামানবের আমরা বাইরটা যতদূর জানি সেই তুলনায় ভিতরে প্রবেশ করে যে অমৃত আহরণ ক্ষমতা; তা যে কত বড় দুঃসাধ্য কাজ– "মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম ।"[৩২]

৩২। পূর্বোক্ত, স্বামী অমৃতত্বানন্দ, **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা**, পৃ.,৬৭

গীতার বাণী মাধ্যমেই এর প্রমাণ মিলে– এ কাজ নিঃসন্দেহে পঙ্গুর গিরি লংঘন এবং মূক-কে বাচাল করার মত এক অসাধ্য সাধন কাজ এবং তাঁর কৃপা ভিন্ন যে অন্য কিছু ভাবা অসম্ভব , তার প্রমাণ যতটুকু আমি আমার গবেষণায় ফুটে তুলতে সক্ষম হয়েছি তা প্রতি পদক্ষেপে উপলব্ধি করেছি। আমার মত অতি নগণ্য সাধারণের এই গবেষণা "উলু বনে মুক্তা ছড়ান" ছাড়া আমার মনে আর অন্য কিছু আসে নি।

স্বামী নিগমানন্দের ধর্মচিন্তা পর্বে যে বিষয়টি আমি উপলব্ধি করেছি– তাহল ; তাঁর নামের সাথে তাঁর ধর্মচিন্তার এক গভীর অপূর্ব সমন্বয় সূত্র আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। আমরা জানি– নিগম অর্থ বেদ। বেদ অর্থ জ্ঞান। এই জ্ঞান লাভই হল মানবের মানবত্ব ও মনুষ্যত্ব এবং এর পরিস্ফুটনে যে আনন্দলাভ তাই হল– নিগমানন্দ। অর্থাৎ নিগমের আনন্দ লাভ বা সুবিশাল জ্ঞানলাভ। যখন পৃথিবীর বহু দেশেই সভ্যতার অরুণোদয় হয়নি বেদরূপ এই বিশ্বকোষ, কর্মকান্ড ও জ্ঞানকান্ড তার বহুপূর্ব থেকেই আলোর পথ দেখিয়ে আসছিল। অতএব সনাতন হিন্দু ধর্মের মূল গ্রন্থ যেহেতু বেদ অপৌরুষেয় তখন বেদরূপ জ্ঞান-প্রেম লাভ যে সবার জন্য উপভোগ্য এবং সাধ্য সেই অমৃতত্ত্ব লাভই হল, নিগম ধর্মচিন্তা।

এই নিগম বা বেদচিন্তার কীর্তন শুধু ভারতবর্ষের মনীষীগণই করেন নি বরং পৃথিবী বিখ্যাত মনীষী জার্মান দার্শনিক সোপনহোর বলেছেন, "সারা পৃথিবীতে বেদ বেদান্তের ন্যায় এত উন্নত এবং মঙ্গলদায়ী পাঠ কিছু নাই। জীবিতাবস্থায় আমি ইহা হইতে সান্তনা পাইয়াছি, মৃত্যুকালে পাইব প্রশান্তি।"[৩৩]

বিশ্ববিখ্যাত পন্ডিত ও দার্শনিক ম্যাক্সমূলারও বলেছেন, " পৃথিবীতে যত দার্শনিক মতবাদ আছে, তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মহীয়ান এবং যত ধর্ম মত আছে তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা শান্তিদায়ক হইতেছে এই বেদ বা বেদান্ত।"[৩৪] এই বেদ ও বেদান্তেরই অন্তর্ভুক্ত সনাতন ধর্মের যে মূল বিষয়গুলো স্বামী নিগমানন্দের সমাধির মানসপটে ভেসে উঠে ছিল। তা হল:

৩৩। ডঃ দূর্গাদাস বসু, **হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব,** ঢাকা-১১০০: হিমু প্রকাশন-৩৬ বাংলাবাজার, , ১ম সংস্করণ, প্রকাশকাল-আগষ্ট-২০১৪,পৃ., ২৩

৩৪। ঐ, পৃ.,২৩

ক. 'সনাতন ধর্মের প্রচার,' খ.'সৎ শিক্ষা বিস্তার', গ. জীব-সেবা রূপ– 'আর্ত-ক্লিষ্ট-রুগ্ন-অনাথ-দরিদ্র-নর-নারায়ণ সেবা', ঘ. 'ধর্মের মধ্য দিয়ে এই অধঃপতিত জাতিকে উঠিয়ে তুলা', ঙ. 'এদের মাঝে ঋষিযুগের মহান আদর্শগুলি ফুটিয়ে তুলা', চ. 'আত্মার স্বরূপজ্ঞান দান করা,' ছ.'সেবা ও ভক্তিপথে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ,' জ. 'সর্বধর্মসমন্বয় অসাম্প্রদায়িকভাবে ধর্মের বিস্তার', ঝ. 'আদর্শ গার্হস্থ্যজীবন গঠন, ঞ. সংঘশক্তি প্রতিষ্ঠা, ট. ভাববিনিময়'। সমাজ সংস্কার এবং আপামোর সর্বসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য সত্য লাভকারী স্বামী নিগমানন্দজীর যে ব্যাকূলতা ও বাস্তবতা এর সবকিছু মিলে তাঁর উপরোক্ত নির্দেশিত কোটেশানযুক্ত বাণীর অংশগুলি ছিল তাঁর ধর্মচিন্তার মোটামুটি মূল পর্যালোচনার বিষয়।

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য সদ্‌গুরু স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেবের ধর্ম চিন্তা গবেষণাপত্রটি আমার জীবন সাধ্য সাধনার অন্ত-র্ভূক্ত এক অভিনব অনবদ্য অধ্যায়।বর্তমান যুগের সম্প্রদায়-প্রবর্তক মহাপুরুষদের মধ্যে এ দেশে শ্রীনিগমানন্দই সর্ব প্রথম তাঁর দর্শনকে একটি সুশৃংখল এবং বিধিবদ্ধ রূপ দিয়ে আমাদের কাছ থেকে হৃদয়োচ্ছ্বাসের চাইতে বুদ্ধির উদ্দীপনাই দাবি করেছেন বেশি– এটি তাঁর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। আলোচিত গবেষণাপত্রের ধর্মচিন্তার মূল প্রবন্ধকে পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে– ভূমিকা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে– ধর্ম বলতে নিগমানন্দ কি বোঝান, তৃতীয় অধ্যায়ে- ধর্ম সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা অথবা তাঁর মতে ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য, ক্রমানুগ। চতুর্থ অধ্যায়ে– তাঁর মতের পর্যালোচনা ক্রমানুগতভাবে সজ্জিত করে উল্লেখ করা। পঞ্চম অধ্যায়ে উপসংহার। সর্বশেষে একটি গ্রন্থপঞ্জি দ্বারা তাঁর সুবিশাল তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ ধর্মচিন্তা সাধ্যমত পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেছি।

তাঁর জীবন যুগপৎ চারিটি সাধনার পরম্পরা। তন্ত্রপথে তাঁর রূপের সাধনা, জ্ঞান পথে ব্রহ্ম সাধনা, যোগ পথে পরমাত্মার সাধনা এবং প্রেম পথে ভগবানের সাধনা। পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বললে বিষয়টি এই দাঁড়ায়– নাম ও রূপ প্রত্যেক ব্যক্তি-জীবনের একটি প্রথম প্রধান লক্ষণীয় দিক। তন্ত্র পথে– প্রথম তিনি তাই সাধনা দ্বারা লাভ করলেন এই নিখিল বিশ্বের বিশ্বমূর্তি জগৎজননীকে তাঁরই মনোময়ী মূর্তি– জায়া সুধাংশু বালার নাম ও রূপের সাধন পথে। সন্ন্যাস গ্রহণের পর জ্ঞান সাধনার পথে– আপোষহীন যুক্তি, বিচার ও

বিশ্লেষণের নিকট ঈশ্বরের সেই নাম ও রূপ কোন ভাবেই টিকতে পারলনা। বিচার পৌঁছাল তাঁর রূপ ছেড়ে– অরূপের পথে। 'বোধে-বোধ' অর্থাৎ যোগপথের– প্রাক্টিকেল অর্থে বেদান্তের ভাষায় আত্মার সাথে পরমাত্মার যোগ, (আমি কে, আর তিনি কে ?) বেদান্তের যোগ পথে যাকে উল্লেখ করা হয়েছে স্বরূপের সাধনা নামে। যাঁকে আমার আপন করে পেতে চাই– তাঁকে চাই আমার অন্তঃস্থলে; অন্তরে ও বাইরে এক করে পেতে ও দেখতে। ('তদন্তরস্য সর্বস্য তদু)। (উপনিষদ) এখানেই সাধনা শেষ নয়। সাধনার শেষ হল অপরূপে। অর্থাৎ তিনি আর আমি ভালবাসায় এক হয়ে যাই। আমি যেমন তাঁকে ছাড়া ভাবতে পারি না তিনিও আমাকে ছাড়া একা সুখ পান না। "একাকী নৈব রেমে"।

বেদান্তের এই চারিটি সাধনা আপাত বিভিন্ন মনে হলেও অধ্যাত্ম পথিক অখন্ড বিজ্ঞানী তত্ত্ববিদ্গণ একবাক্যেই বলবেন, নিঃসন্দেহে এটি এক অদ্বয়তত্ত্বেরই বৈচিত্রিক সাধনার অন্যতম প্রাপ্তি। যা আমরা তাঁর জীবন দর্শনে ধর্মচিন্তার মূল সূত্রে যুগপৎ লক্ষ্য করেছি। স্ত্রীর মৃত্যুই ছিল তাঁর জীবন উপলব্ধির জিজ্ঞাস্য বিষয়। তাঁর প্রিয় প্রেমময়ী মনোমোহিনী অপরূপাই তাঁকে হাত ধরে– তন্ত্র পথে করিয়েছেন রূপের সাধনা, জ্ঞানে নেমে এসে তা হয়েছে অরূপের সাধনা, যোগে তাই প্রকাশ লাভ করেছে স্বরূপের প্রতিষ্ঠা, প্রেমে এসে তা তাঁর জীবনে ধরা দিয়েছে অপরূপের এক অনুপম মহিমা।

স্বাভাবিক ভাবে একজন বাস্তববাদী মানুষও তার জীবনে ঠিক এই পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তিনিও ঠিক এই ভাবে পরিপূর্ণরূপে কোনকিছুকে দেখতে ও পেতে চাবেন। শ্রীনিগমানন্দের ধর্মচিন্তার মূল বৈশিষ্ট্য এখানেই নিহিত এবং অন্য মহাপুরুষদের চেয়ে তাঁর ধর্মচিন্তা এখানেই সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি অপৌরুষেয় পুরুষাকার সম্পন্ন বীর সিদ্ধ-সাধক মহা বিজ্ঞানভৈরব মহাকৌল সিদ্ধসাধক মহাপুরুষ ছিলেন বলেই তাঁর ধর্মচিন্তার সাথে অন্য কাউকে তাঁর মত করে কোনরূপ সাদৃশ্য খুঁজে পাই না। শান্ত, দাস্য সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচ ভাবেই ভারতধর্মে সর্বত্র ঈশ্বর লাভ সাধনার প্রাপ্তির উপায় বলা আছে এবং কম বেশি মহাপুরুষগণ সবাই উল্লিখিত ভাবেই সাধনা করে গেছেন। কিন্তু বিশ্বেশ্বরীকে জায়ারূপে লাভ উপনিষদ যুগে মহর্ষি শুধু বশিষ্টদেব এবং ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ছাড়া আজ পর্যন্ত আর কেউ এই সাধনায় সিদ্ধ ছিলেন না, বাংলার একমাত্র সিদ্ধসাধক

স্বামী নিগমানন্দদেব হলেন এর অন্যতম এক ব্যতিক্রম। এই লক্ষ্যেই তাঁর জীবন ও ধর্মচিন্তার বৈশিষ্ট্য এখানে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

বর্তমান পন্ডিত দার্শনিকগণ মন্তব্য করতে পারেন এর আবার নতুনত্ব কি ? এ-সাধনাও তো পূর্বে কারও না কারও দ্বারায় আবিস্কৃত হয়েছে। এর নতুনত্ব এখানে এটাই যে, আপন জীবনে বাস্তবায়ন দান। এই বাস্ত বায়নই হল এর নতুনত্ব। কারণ এটি পুরাতন হলেও নতুন একারণে যে, যেমন কোন একটি বই পড়ে মুখস্থ করে– আমরা সেই বিষয়টিকে সহজে অনুকরণ করতে পারি, এই কাজটি কিন্ত এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ এটি পড়ে মুখ্স্ত করে অনুকরণ করা যায় না, একে উপলব্ধি করে হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। আবার সাথে চাই প্রভুর একান্ত অনুকম্পা এবং আশীর্বাদ। (যমে বৈষে বৃণুতে তেন লভ্যঃ- উপঃ) একারণেই এটি সব সময় নতুন। এর পুরাতন হয়না, উপলব্ধি করতে যিনি সক্ষম হন, একমাত্র তিনিই এর নিহিত তত্ত্ব নতুন করে– আরও কিছু নতুনত্ব খুঁজে পান। কারণ যাঁকে খুঁজছি তিনি সর্বক্ষণ নতুন। তাঁর দয়ায় যে তাঁকে পায় সে সেটি ছাড়াও আরও নতুন কিছু অযাচিত ভাবেই পায়। নতুনত্বের বৈশিষ্ট্য এখানে এটাই।

আমি আমার অভিসন্দর্ভে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে নিয়েই আমার অবিচলিত প্রত্যয় দ্বারা এই মহামানবকে আমার জীবনের ধ্রুবতারা রূপে পেতে চেয়েছি। তিনিই আমার জীবন দেবতা। তাঁর এপারের কর্মের জন্যই আমি এই গবেষণার মাধ্যমে নিজেকে উৎসর্গ করেছি। তাঁর অনুপম অনিন্দ্য আদর্শ জীবনকে দেশ জাতির কল্যাণে শান্তির অমিয় ধারা রূপে বহাতে চেয়েছি। এই ঘূনে ধরা বাঙালী জাতির জন্য সত্যিকার তিনি একজন আদর্শ গার্হস্থ্য ধর্মের আদর্শ পথিকৃত। তিনি সত্যিকার একজন আদর্শ গার্হস্থ জীবন গঠন কর্তা। ভালবাসার মূর্ত প্রতীক। তাঁর সহকর্মিনী, জীবন-সাথী তাঁর স্ত্রী শুধু তাঁর জীবনে তাঁর নিকট ভোগ্য সামগ্রী ছিলেন না– ছিলেন, শুদ্ধ-পবিত্র-প্রেম-পাত্রী। সাধারণ পুরুষের মত সামান্য এক স্ত্রীর ভালবাসার জোর তাঁকে এই পথে টেনে তুলে আনে নি, এনেছিলেন এক মহামানবীয় স্বর্গীয় প্রেমে। এ প্রেম সাধারণ প্রেম ছিল না, এটি ছিল দিব্য স্বর্গীয় পূত পবিত্র নিষ্কাম অনাবিল এক বিশুদ্ধ প্রেম। ত্যাগ ও ভোগ উভয় পথেই ছিল তাঁর উচ্চ দৃষ্টি। সমাজ রক্ষার্থে তিনি সংঘ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। দেশ জাতি রক্ষার্থে ভক্তসম্মিলনী প্রতিষ্ঠা

করেছেন। প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য ব্রহ্মচর্য সাধন পুস্তক রচনা করে– মনুষ্যত্বের পথ উন্মুক্ত করেছেন। আপন সাধ্যানুসারে ঈশ্বরকে লাভ করার জন্য হাতে-কলমে পাওয়ার উপায় রূপে মূল্যবান পাঁচখানি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। গ্রন্থে স্বয়ং উল্লেখ করেছেন, " মৎপ্রণীত পুস্তক কয়খানি পৃথিবীর সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ের ধর্মসম্বন্ধীয় সকল অভাব পূর্ণ করিবে।"[৩৫]

তিনি বলেছেন, 'আনন্দের জন্য সৃষ্টি, আনন্দ ব্যাহত হইলে সেই সৃষ্টির কোন স্বার্থকতা নাই।' তিনি কারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় কখনও হস্তক্ষেপ করেন নি। অথচ তিনি এমন শক্তিধর মহাপুরুষ ছিলেন বিভিন্ন মত পথের সাধককে এক জায়গায় সম্মিলিত করতে যা অন্যান্যের পক্ষে অসম্ভব তা ছিল তাঁর পক্ষে অনায়াস। তিনি জীবনভর আনন্দ রক্ষা করে গেছেন। জানিয়ে গেছেন– আনন্দ থাকলে প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ হলে শক্তির জাগরণ এবং আদর্শের প্রতিষ্ঠা হবেই হবে। তিনি বলতেন, 'পুরুষ একমাত্র তিনি, আর আমরা সকলেই আনন্দ লীলায় তাঁহারই প্রকৃতি বা শক্তি।' আমি যতদিন না আমার স্বরূপ উপলব্ধি করছি– ততদিন আমি পুরুষ হয়েও 'প্রকৃতি'। যেদিন আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করব সেদিন আমি 'পুরুষ'। এটিই ছিল তাঁর ধর্মচিন্তার একটি ব্যতিক্রমী আদর্শগত দিক। তাঁর সাধনার মূল বিষয়বস্তুটি ছিল– জীবকে অবশ্য শিব হতে হবে। সন্ন্যাস সাধনার বেদের প্রধান মহাবাক্য; মূল বীজমন্ত্র– "অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমি ব্রহ্ম), একারণেই গুরু আজ্ঞা বলে গ্রহণ করেছিলেন। সাধনায় শিবত্ব লাভ করার কারণে বিশ্বপ্রকৃতি তাঁর অধীনতা স্বীকার করেছিলেন। এই অধীনস্ততা বিষয়ে আভিধানিক শব্দার্থের অর্থক্রম গণ্য হবে না, অর্থটি দাঁড়াবে–পুরুষ রূপে তিনি তাঁরই আত্মশক্তি– হ্লাদিনী শক্তির নানা কৌশলগত খেলার ভালবাসায় আত্মমগ্ন থাকবেন এবং বিশ্বপ্রকৃতি জগদ্-জননী সর্বক্ষণ তাঁকে আনন্দ দান করবেন। প্রকৃতিরূপে বিশ্বব্রহ্মান্ড পরিচালনার দায়িত্ব নিবেন আর পুরুষ রূপে তিনি দ্রষ্টা স্বাক্ষিরূপে দেখে যাবেন। এই অভিনব ভালবাসার আদর্শটিকে পৃথিবীর মাটিতে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর ধর্মচিন্তার সারতত্ত্ব। সৃষ্টি যে আনন্দের জন্য এবং আমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপত্ব লাভই যে আমার জন্মের কারণ তা উপলব্ধি করাই হল নিগমানন্দ ধর্ম চিন্তার মূল উদ্দেশ্য।

৩৫। পূর্বোক্ত, শ্রী নারায়নী দেবী, **বাংলার সাধনা ও শ্রী শ্রী নিগমানন্দ**, পৃ., ১৫

পরিশেষে- কবি গুরুর আহ্বান এই আনন্দকে সবার সাথে যুক্ত করে সবার প্রাণে প্রাণ মিলিয়ে বলতে চাই–

'যুক্ত করহে সবার সঙ্গে

মুক্ত করহে বন্ধো

সঞ্চার কর

সকল কর্মে শান্ত তোমার ছন্দ ।'

হে প্রাণ প্রিয়! স্বামী নিগমানন্দ; আমার পরমপূজ্যপাদ গুরু মহারাজ, এই দুরূহ কাজে আমাকে সামর্থ দিন, আমাকে শক্তি সাহস দান করুন, আমাকে সমগ্রের সাথে যুক্ত করুন, প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত করুন, নিষ্কাম নিঃস্বার্থভাবে কর্মে সঞ্চার করুন– আমি যেন ছন্দপতন না ঘটিয়ে শান্ত হয়ে পঙ্গুর গিরি লংঘন করতে সমর্থ হই । আমার ক্ষুদ্র আমিত্বকে বিশ্বআমিত্বে বিলিয়ে দিতে সক্ষম হই । আমার ক্ষুদ্র ভালবাসা যেন নিখিল বিশ্ব প্রেমে রূপ নেয় । আমার আত্মা যেন সর্বভূতের আত্মা হয় । সর্বভূতের আত্মা যেন আমার আত্মা হয় ।

৪.৩.২: ধর্ম বলতে নিগমানন্দ কী বোঝান ?

ধর্মের মূল তত্ত্ব হল ধারণ করা । পাপ কি, পূণ্য কি, জ্ঞান কি, অজ্ঞান কি ? সুন্দর কি, কুৎসিৎ কি, ভাল কি, মন্দ কি? সব কিছু মিলে যা কিছু ধারণ করে তাই ধর্ম । "ধ্রীয়তে ধর্ম ইত্যাহুঃ স এব পরমঃ প্রভু ।" এই জীব ও জগত যাতে নিহিত তাই ধর্ম । অথবা এই লোকসকল যাকে ধারণ করে আছে তাই ধর্ম । এই পৃথিবীর অনু পরমাণূর যা কিছুর সম্ভাবনা আছে সে সব কিছুই এই ধর্ম দ্বারা ধৃত, রক্ষিত ও পরিচালিত । ধর্মই এই জগতযন্ত্রে একমাত্র যন্ত্রী । ধর্মই সুখের স্বরূপ । এই ধর্মের জন্যই জাগতিক সকল পদার্থের আকূল আকাঙ্খায় ছুটাছুটি । এই ধর্ম সম্পর্কে স্বামী নিগমানন্দ আরও সহজ করে বাণী দান করে বুঝিয়েছেন:

> তোমরা আপন ভুলিয়া প্রেম-ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ কর, গুরুর উপদেশ মত চরিত্র গঠন কর, সংযত হও, পৃথিবীর নর-নারীকে ভাই-ভগ্নি জ্ঞানে জড়াইয়া ধর, রোগীর শুশ্রূষা কর, শোকগ্রস্তকে সান্তনা প্রদান কর, দুঃখীর অশ্রু মুছাইয়া দাও, তাপিতকে বুকে কর,

পাপীকে ঘৃণা না করিয়া তোমাদের প্রেমজলে তাদের পাপ ময়লা ধুইয়া দাও। স্বার্থপর শয়তানকে হৃদয় হইতে তাড়াইয়া প্রেমময় ভগবানকে আসন দাও– ইহাই ধর্ম।[৩৬]

পৃথিবীর প্রতিটি পদার্থের এক একটি নিজস্ব ধর্ম আছে। মানুষেরও ধর্ম আছে। তবে অন্য জীব জন্তু কীট-পতঙ্গ এদের ধর্ম থাকলেও মানুষের মত এদের ধর্মজ্ঞান বা ধর্ম বিবেক নেই। 'জ্ঞানেন হীনা পশুভি সমানাঃ'। জ্ঞানহীন মানব পশুর সমান। আহার, নিন্দ্রা, ভয় ও মৈথুন এই চারিটি জীবের জৈবিক ধর্ম। এগুলি মানুষেরও আছে পশুদেরও আছে। পার্থক্য হল শুধু মানুষ এই চারিটি স্বভাবকে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারে কিন্তু পশুকুল তা পারে না। কারণ তারা প্রবৃত্তির দ্বারায় পরিচালিত ও পরিপালিত। মানবে ও পশুতে ধর্ম বিষয়ে এখানেই পার্থক্য। মানুষকে এজন্য পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীব বলে আখ্যান করা হয়েছে। মানুষের জ্ঞান, বিবেক ও মনুষ্যত্ব আছে কিন্তু পশুদের তা নেই।

মানুষের আত্মশক্তি বলে সে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। আত্মশক্তি বলে আর সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। মানুষ ইচ্ছা করলে সহজেই ধর্মসাধনায় সাফল্য লাভ করতে পারে। অন্যান্য জীবরা যে ধর্ম করে না তা নয়, তারাও প্রকৃতির ধর্ম দ্বারা চালিত। পার্থক্য শুধু মানুষ প্রকৃতিকে জয় করার জন্য বারবার চেষ্টা করে এবং তার সম্পদ জোর করে আদায়ও করে থাকে। কিন্তু জীবজন্তু ও পশুসকল প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না, অক্ষমতাটুকু এখানেই। এর অন্তর্নিহিত কারণ একটিই, তাহল মানুষ বিবেক জ্ঞান সম্পন্ন, বল, বুদ্ধি, চিন্তাশক্তির অধিকারী। মানুষ যতটা স্বাধীন তার উপর আর কেউ ততটা স্বাধীন নয়।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী হার্বাট স্পেন্সার ঠিক একারণেই বলেছিলেন, "ক্রমবিবর্তনবাদে একবিন্দু বালুকণা মহামহীধরে পরিণত হয়, বা মানুষ হইয়া জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া থাকে।"[৩৭] প্রকৃতির নিয়মে পরিধি যেমন কেন্দ্রকে লক্ষ্য করে চলে অথবা কেন্দ্র হল পরিধির মূল। জগতের এই নিয়ম শুধু একমাত্র মানুষই সবটা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলেও অনেকটা আয়ত্তাধীন রাখতে সক্ষম। বাকি আর যে টুকু আছে তাও আয়ত্তে আনতে বদ্ধপরিকর। প্রকৃতিবাদীগণ যাকে ক্রমবিবর্তন বলছেন, ধর্মবিজ্ঞানীগণ তাকে জন্মান্তরীয় উন্নতি বলছেন।

৩৬। পূর্বোক্ত, স্বামী অখন্ডানন্দ সরস্বতী, **শ্রী নিগমানন্দের অমিয় বাণী সম্ভার,** পৃ.,২৭
৩৭। স্বামী নিগমানন্দ, **জ্ঞানীগুরু,** আসাম: আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, ৪র্থ সংস্করন, ১৯৭০, পৃ., ৬৭

কারণ সনাতন হিন্দু ধর্মে বেদ জানিয়েছে, "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। জীব-জগতকে যে অজ্ঞাত এক অপরিণাম সত্তা ও শক্তি যা চেতন বা চৈতন্য নামে অভিহিত তিনি "একোহং বহুস্যাম" [বেদ]। তিনি এক হয়েও বহু হয়েছেন। তিনি হলেন সকল জীবের অনন্তশক্তি; আবরিতরূপে এক আত্মা। আর যিনি মুক্ত মহান অপরিণামী অদ্বয় অব্যয় অক্ষয় চির শাশ্বত সনাতন তিনি হলেন সকল জীবের এক এবং একক পরমাত্মা। তিনি অসংখ্য বন্ধন মাঝে থেকেও বন্ধিত হন না। তিনি স্রষ্টা হয়েও আমরা যেভাবে স্রষ্টা অর্থে সৃষ্টি করা বুঝি তিনি সেইভাবে সৃষ্টি করেন না, তিনি সৃষ্টির মাঝে ঢুকে স্বয়ং সৃষ্ট হন। নইলে সৃষ্ট পদার্থগুলি চৈতন্যতা পাবে কি করে ? বেদ একারণেই বলেছেন, "অহং বহূস্যাম প্রজায়তে।"

'একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি।" [ঋক্‌বেদ] । 'আমি এক বহুরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়েছি'। তিনি যেন ঠিক এরূপ, "সমস্ত বিভিন্নতাই মূলতঃ এক অভিন্ন সত্তার আপাত ভিন্ন প্রকাশ।'

একারণেই বিশেষ করে জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ 'আমি' শব্দ দ্বারা নিজেকে অনেক বড় শক্তিশালী অথবা স্রষ্টার মত বলে নিজেকে প্রতিপন্ন করতে দ্বিধা করেন না। আপন অন্তরে সর্বশক্তিমান বলে নিজেকে উপলব্ধি করেন। সর্বশক্তিমানও মানুষকে বুঝান, তুমি আগে তোমার স্বরূপকে উন্মোচন কর, তখন বুঝবে– আমার সাথে তোমার কি সম্পর্ক ? মানুষ চেষ্টা করলে বা গভীরভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করলে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হওয়ার ক্ষমতা রাখেন। নিগমানন্দের ধর্মচিন্তা আমাদের এই শিক্ষাই দান করেছেন। তিনি নিজেই নিজের প্রকৃতস্বরূপ লাভ করে নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে এর সত্যতা প্রমাণ করে গেছেন–

> আমি যুগপৎ ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবানে প্রতিষ্ঠিত আছি, আমাকে ধরলে তোমাদের সব হবে। আমি এই জন্মে ভগবানকে জেনেছি, সত্যলাভ করেছি, ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। আমার ব্যক্তিত্ব ধ্বংস হওয়ায় আমার ভিতর দিয়ে জগদগুরুর ইচ্ছাই লীলায়িত হয়ে উঠেছে।.....আমি সাধনা দ্বারা নিজে মুক্ত হয়েছি– তোমাদেরও মুক্তির পথ দেখিয়ে দেব এই আমার কাজ। আমার উপর যারা নির্ভর করেছে, তাদের আমি হাতধরে মুক্তিধামে নিয়ে যাব।[৩৮]

৩৮। স্বামী অখন্ডানন্দ সরস্বতী, **আমি কি চাই,** কুতুবপুর মেহেরপুরঃ শ্রী শ্রী গুরুধাম, ৫ম সংস্করন, ১৯৮০,প.,৪১

..."আমার নিকট অর্থাৎ এই মানুষ গুরুর নিকট প্রার্থনা করলে ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ সবকে পাওয়া যায়। এই মানুষগুরুর সব দেবার ক্ষমতা আছে। শুধু গুরু জীবন্মুক্ত, ব্রহ্মজ্ঞানী, আত্মদর্শী এই বিশ্বাসটুকু থাকলেই হল।"[৩৯]

এই পৃথিবীতে কোন জীবই চায়না সে অন্য জনের চেয়ে খাট বা ছোট হয়ে বাঁচুক। বড় হয়ে বাঁচতে সবাই চায় কেউ কারও অধীন হয়ে থাকতে চান না। প্রয়োজনে বাধ্য হলেও অন্তরে কেউ কারও থেকে নিজেকে ছোট মনে করেন না। কারণ জীবই যে শিব। ধর্ম কেউ মানুক আর নাই মানুক ধর্ম কিন্তু তাঁর আপন গতিতে ও শক্তিতে সবাইকে ধারণ করে আছেন। এবং তার আপন শক্তিবলে তাকে গড়ে তুলছেন। তাকে দূরে সরিয়ে দিলেও আপনার আপন প্রয়োজনেই সে আত্মসম্ভূত হয়ে থাকে। আমরা বিজ্ঞজনমাত্রই সবাই জানি, এমন একটা সময় প্রতিটি জীবনে অযাচিতভাবে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আপনি একদিন আসবে, আমি না চাইতেও আমার সুখ শান্তি আপনিতেই আমার জীবনে বয়ে আসবে। কিন্তু আমরা হাতগুটিয়ে ততদিনের জন্য কেন অপেক্ষায় থাকতে চাইনা বা পারি না– প্রশ্ন আমাদের এখানেই। কারণ আমরা কেউ প্রকৃতির দাস হয়ে থাকতে চাই না। কারণ আমি 'পুরুষ'। স্বামী নিগমানন্দ ধর্ম বলতে এখানে এই বুঝাতে চেয়েছেন যে, "আত্মার স্বরূপ জ্ঞান লাভ"-ই হল ধর্মের যথার্থ স্বরূপ। অতএব তুমি আত্মস্বরূপ লাভ কর।

মানুষ যেদিন নিজেকে জানতে ও বুঝতে শিখবে যে সে সাধারণ স্তরের কিছু নয়। তাঁর ভিতর আছে অনন্ত শক্তি ও সিংহবিক্রম। তাঁর আত্মা বা অস্তি বা চেতন চৈতন্যরূপ সত্য সনাতন শক্তি কোন কিছু থেকে নিকৃষ্ট বা দুর্বল নয়। সে স্বমহিমায় মহীয়ান।

অতএব ধর্মজ্ঞান লাভ করাই মানবের প্রধান কর্তব্য। মানুষ কত শত জন্ম ধরে ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ হচ্ছে, তার নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু এই দুঃখ জ্বালা অতিক্রম করার শক্তি তার আপন অধিকারে আছে। সে ইচ্ছা করলে এই জীবনেই উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছতে পারে। ভগবান মানুষকে দয়া করে এই প্রাণের বল মানুষকে দান করেছেন। তাঁর সাধের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব করেছেন। এই শক্তি অন্য আর কিছু নয়, তাহল– ধর্মজ্ঞান। অতএব মানুষ মাত্রই ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত থেকে পশুত্ব বর্জন ও মনুষ্যত্ব অর্জন করা আমাদের জন্য

৩৯। ঐ,পৃ., ৪১

প্রত্যেকের জীবন-ধর্ম। এই পশুত্ব বর্জনের শক্তি শ্রীভগবান আমাদের দান করে জীব জগতে পাঠিয়েছেন, পশুত্ব একবার পরিহার করতে পারলেই মনুষ্যত্ব জাগ্রত হবে, এরপর দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব ও ব্রহ্মত্ব লাভ করে মানব তার আত্মস্বরূপে ভগবৎস্বরূপ ফিরে পাবে। শ্রীনিগমানন্দের ধর্ম ও ধর্মচিন্তা বলতে এই সম্পর্কে তিনি এই শিক্ষাই দান করতে ধরাধামে এসেছিলেন। ধর্ম সম্বন্ধে স্বামী নিগমানন্দ আরও বলেন:

> ভগবান এক, মানবাত্মাও এক, সুতরাং ধর্মও এক ভিন্ন কখনও দুই রকম হইতে পারে না। মহদাদি অনু পর্যন্ত যাহার দ্বারায় ক্রমবিবর্তন-ধারায় উন্নতির চরম সীমায় চালিত, তাহার নাম ধর্ম। সুতরাং যাবতীয় মানবই এক ধর্মের অধীন। তবে সমস্ত জগৎ জুড়িয়া সাম্প্রদায়িকতার এ বিদ্বেষ কোলাহল উত্থিত হয় কেন ? এর উত্তরে শ্রীনিগমানন্দ বলেন– "সকল দেশের, সকল মানবের, সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম এক, কিন্তু সাধন পথ বিভিন্ন। জীবমাত্রেরই শরীর পোষণার্থ ক্ষিত্যাদি পাঞ্চভৌতিক পদার্থের প্রয়োজন। সকলেই ঐ সকল পদার্থ শরীর রক্ষার্থ নিত্য গ্রহণ করিতেছে।[৪০]

অতএব আমরা ধর্মরূপ এক ঈশ্বরকে ধারণ করেই চলছি। তখন ধর্মান্তরের জন্য কেন জেদাজেদি ? কেন দল ভারী করার প্রবণতা ?

কেন ধর্মবিদ্বেষের জন্য ধর্ম নামে মারামারি, খুনা-খুনি ? ধর্মের উদ্দেশ্য যদি ঈশ্বরলাভ হয়, তবে ধর্মান্তর কেন ? আপন আপন মত পথ ধরে– পথ চলাই কি সবার জন্য এক শান্তির উপায় নয় ? স্বামী নিগমানন্দ ধর্ম বলতে এই মতাদর্শে সবাইকে ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গলা জড়াজড়ি করে ধর্মরূপ শান্তির সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দান করে পৃথিবীর সবাইকে আপন পথে অগ্রসর হতে বলেছেন। কারও উপর জোর জুলুম করার অধিকার দান করে নি।

৪০। পূর্বোক্ত, স্বামী নিগমানন্দ, **জ্ঞানীগুরু**, পৃ., ২৩৮

৪.৩.৩: ধর্ম সম্পর্কে শ্রী নিগমান্দের ব্যাখ্যা অথবা তাঁর মতে ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য

শ্রী নিগমানন্দের মতে ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ

স্বামী নিগমান্দের ভাষায়:

> পৃথিবীর একচ্ছত্রাধিপতি সম্রাট হইতে কুটিরবাসী ভিখারী পর্যন্ত, সকলেই আশা-অকাঙ্খার তীব্র দংশনে নিয়ত অস্থির। ধন-জন বল, রূপ-ঐশ্বর্য বল, খ্যাতি-প্রতিপত্তি বল, কিছুতেই মানুষ তৃপ্ত হইতে পারে না। আকাঙ্খা রাক্ষসীর হস্ত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। চন্দ্রিকাশালিনী বসন্ত যামিনীর মধ্যভাগে যুথিকা শয্যায় শয়ন করিয়াও দিল্লীর প্রবল প্রতাপ সম্রাট্গণ সুখী হইতে পারেন নাই। সংসারে কাহারও আশা পুরে না– সাধ মিটে না। কেহ এক বিষয়ে সুখী হইলেও অন্যান্য পাঁচ বিষয়ে নিরন্তর মনঃকষ্টে কাল যাপন করিতেছে। অতএব ধর্মলাভ ছাড়া মানবের সুখ-শান্তিতে বাঁচিবার দ্বিতীয় কোন উন্নত পন্থা নাই।”[৪১]

এই লক্ষ্যেই স্বামী নিগমানন্দজী ধর্মের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। এবং ধর্মব্যাখ্যার উপর জোর দিয়েছেন অধিক।

“সুখং বাঞ্ছন্তি সর্বে হি তচ্চ ধর্মসমুদ্ভবম্ ॥

তস্মাদ্ধর্ম সদা কার্যঃ সর্ববর্ণে, প্রযত্নতঃ।

- দক্ষ সংহিতা /৩/২৩।

প্রথমত: সুখের জন্য এ-জগতে সকলেই কাঙ্গাল। কিন্তু আমরা জানি না সুখ কোথা থেকে উদ্ভূত হয়। ধর্মই যে সুখের একমাত্র আশ্রয় আর ধর্ম হতেই যে প্রকৃত সুখ উদ্ভূত আমরা তা না বুঝে সুখের জন্য প্রকৃতির নশ্বর বস্তুর প্রতি সাময়িক আকৃষ্ট হই। সংসারে সর্বসুখে সুখী হলেও সে সুখ চিরস্থায়ী নয় তা আমরা আমলে নেই না। জীবনের শেষ লগ্নে অনুভব করি, এতদিন আমি যাকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিলাম আজ তা আমার কোন কাজে লাগছে না। কারণ আমার জরা ব্যাধিগ্রস্ত দেহ এবং নিয়তির প্রতিনিয়ত দুঃখ কষ্ট জ্বালা-যন্ত্রনা ও মৃত্যু দন্ডবিধান আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে, এই সংসারে তুমি যা কিছুকে আপন ভেবেছিলে তারা সময়ে আসে সময় হলেই চলে যায়। অতএব এই নশ্বর পৃথিবীর কোন বস্তু আপন ও চিরস্থায়ী নয়। সত্যরূপ ধর্মই একমাত্র

৪১। পূর্বোক্ত, স্বামী নিগমানন্দ, **জ্ঞানীগুরু**, পৃ., ২৩৭

আপন ও চিরস্থায়ী। পরলোক বলতে যেহেতু একটি বস্তু আছে তখন ইহকালই শেষ নয়, পরকালের চিন্তাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে। প্রকৃতি আমাদেরকে তার অমোঘ বিধানে বাধ্য করিয়ে নিবে। তার হাত থেকে কারও নিস্তার নেই।

দ্বিতীয়তঃ আত্মা সুখ-দুঃখ চান না। প্রতি মানবের আত্মা চান তার আত্মোন্নতি। যাতে আত্মপ্রসাদ লাভ হয় কামনা-বাসনার খাদ দূরিভূত হয় তা পালন করাই হল স্বামী নিগমানন্দের ধর্ম ব্যাখ্যা। স্বামী নিগমানন্দ চেয়েছেন আত্মার স্বরূপ জ্ঞান লাভ।

আমি কে, এই বস্তুটি আমরা যতদিন না জানতে ও বুঝতে পারছি– ততদিন ধর্মসাধন পথের– কর্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি যে কোন পথের সাধনই হোক আপন স্বরূপ রূপ আত্মাকে উপলব্ধি করাই হল তাঁর ধর্মমতের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর এই আত্মোন্নতির মূল কারণ হল ধর্ম। ধর্ম মানুষকে একটি নিয়মতান্ত্রিক জীবনের শিক্ষা দান করে। জীবনে চলার পথের অন্যায় অসৎ কাজগুলি থেকে বিরত রাখে। মানব জীবনে ভোগের চেয়ে ত্যাগই যে বেশি সুখকর ও শান্তিপ্রদায়ক, তার প্রমাণ দান করায়– লোভ-লালসারূপ বহ্নির কবল থেকে মুক্তি লাভ পূর্বক লোভহীন ত্যাগ জীবন গ্রহণ করে। স্বামী নিগমানন্দ এ লক্ষ্যেই চেয়েছেন, আমিত্বের প্রসার দ্বারা তোমরা নিখিল বিশ্বকে আপন প্রিয় আত্মা বলে ভাব দেখবে; তুমি যেমন সবার তেমনি তারা সবাই তোমার। এই নিষ্কাম ভালবাসা লাভই হল প্রকৃত ধর্ম লাভ। শাস্ত্রও বলেছেন, "আত্মমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"। তোমার মুক্তি জগতের মুক্তি, জগতের মুক্তি তোমার মুক্তি। স্বামী নিগমানন্দের এটিই প্রধান ধর্ম বৈশিষ্ট্য। এই সম্পর্কে তিনি তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন, "মনে রেখ ! ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। তোমরা ধর্মে উন্নত হও, জগতে তোমরা গুরুর স্থান অধিকার কর। পাশ্চাত্য জগৎ ঐহিক উন্নতি করছে তোমরা তাদের সাথে নিজ নিজ সম্পদ আদান-প্রদান কর।"[৪২] ভারতের জাতীয় সম্পদ তাহলে ধর্ম। অন্যেরা আমাদের নিকট ধর্ম নিবে আমরা তাদের নিকট প্রযুক্তি নিব। এই দুই মিলে আমরা আরও শক্তিশালী হব। 'ধর্ম হি মূলম্' ধর্মযুক্ত কর্মই হল প্রকৃত উন্নতি। ধর্ম ছাড়া কোন উন্নতি যে মানব জীবনে পরিপূর্ণ সম্ভব নয়, স্বামী নিগমানন্দ তাঁর ধর্মের বৈশিষ্ট্য বলতে এরই প্রধান্য দান করে গেছেন ।

৪২। পূর্বোক্ত, স্বামী সত্যানন্দ, **আমি কি চাই**, পৃ., ৩০

তৃতীয়ত: ধর্ম এমনই একটি শাশ্বত সত্য ও শান্তির বস্তু এ শুধু ধর্মের বা ভগবান লাভের কথাই বলে না। দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সমাজনীতির মূলেও চাই ধর্ম। ধর্মহীন রাজনীতি অর্থনীতি ও সমাজনীতি কোনটিই টিকে না। ধর্ম মানুষের চরিত্রকে সংশোধন করে। কু-পথ থেকে সু-পথে ফিরিয়ে আনে। ন্যায় ও সত্যের প্রতি দৃঢ়তা আনয়ন করে। হিংসা ঘৃণা সাম্প্রদায়িকতা দূরিভূত করে। ধর্ম– অন্য সকল ধর্মকে সত্য ও সম্মান দান করে। সকল ধর্মকে এক ঈশ্বরের কথা বলে। সৃষ্টিকর্তা 'এক,' এ-ছাড়া কোন ধর্ম– স্রষ্টা বহু, এ-কথা বলেন না। ধর্মনিরপেক্ষতা আমরা এই অর্থে বুঝেই সাম্প্রদায়িকতার হিংসা দ্বেষ থেকে শান্তিতে থাকতে পারি। একমাত্র ধর্মই একারণে আমাদের শান্তিপূর্ণ জীবন দান করে থাকে। স্বামী নিগমানন্দ প্রথম জীবনে নাস্তিক ও বস্তুবাদী ছিলেন। কিন্তু ধর্ম ও ভগবান যে সত্য এবং এই জগত-জীব যে তাঁর নিয়ন্ত্রণেই নিয়ন্ত্রিত; যখন তিনি জীবন চক্রে সেই পরিস্থিতির স্বীকার হলেন, প্রাণ দিয়ে জানলেন ও বুঝলেন, তখন ভগবানের দয়াতেই তিনি সত্য কি বস্তু তা বুঝেছিলেন। "ধর্ম হি মূলম্" ধর্মই যে মানব জীবনের মূল বিষয়, এই বিষয়টি তিনি তাঁর নিজ উপলব্ধ জীবন থেকে প্রমাণ লাভ করেই ব্যাখ্যা দান করে বুঝিয়েছিলেন যে, ধর্মহীন জীবন পশুর সমান।

ধর্মজ্ঞান না থাকলে একজন মানুষের ভিতর যে বিষয়টি সকল মানুষ প্রার্থনা করে– তার মনুষ্যত্ব ও উদারতা এই মহামূল্যবান বুস্তুটি খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষের প্রতি মানুষের যে ভালবাসা থাকা দরকার যার সাহায্যে একটি সুন্দর পরিবার, সমাজ, দেশ, জাতি তথা বিশ্বময় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায় ধর্ম না থাকলে জগতের সকল মানুষ তা থেকে বঞ্চিত হয়। স্বামী নিগমানন্দের উদার ধর্ম মতের চিন্তা চেতনা ও ব্যাখ্যার মূল বৈশিষ্ঠ্যগুলি থেকেই খুঁজে পাই– তাঁর ধর্মের প্রতি কি প্রকার আন্তরিকতা ও মনোবল ছিল ?

চতুর্থত: ধর্ম সবচেয়ে যে বিষয়টি মানুষকে শ্রেষ্ঠ উপহার-বস্তু রূপে দিতে সক্ষম; তাহল– ভালবাসা। কারণ যে জগতকে ভালবসিতে পারে না, সে ভগবানের ভালবাসা আশাও করিতে পারে না। ভারতের জাতীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টি হল ধর্ম। এই ধর্মই পারে সবাইকে ধারণ করে আপনার আপন প্রিয় করে নিতে। একমাত্র এই আত্মধর্মই পারে এই অধঃপতিত জাতিকে উঠিয়ে তুলতে। এর একমাত্র উপায় হল ঋষিগণ তাঁদের যে হাজার

বৎসরের সাধনকৃত তথ্য ও তত্ত্বগুলি আবিষ্কার করেছেন সেগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা মাধ্যমে। হাজার হাজার বছর আগে তাঁদের যুগের প্রতিষ্ঠিত যে সর্বশ্রেষ্ঠ এক মহান বস্তু যা পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কোন জাতি এর ধারে কাছে যেতে পারেন নি সেই আত্মা নামক একটি অমূল্য বস্তু আবিষ্কার দ্বারা পৃথিবীতে আজও তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে আছেন। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীগণ যা সবাই স্বীকার করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দজী তাঁর জ্বলন্ত ও জীবন্ত প্রমাণ। চিকাগো বিশ্ব ধর্মসভায় তিনি ঋষিদের আবিস্কৃত এই আত্মার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বিশ্ব ধর্মসভা তা মেনে নিয়ে সাধুবাদ ব্যক্ত করেছেন। স্বামী নিগমানন্দজীর ধর্মসাধনার ব্যাখ্যা ও বৈশিষ্ট্য এখানেই লক্ষ্যণীয়।

৪.৩.৪: শ্রী নিগমানন্দের মতের পর্যালোচনা

তাঁর মতের পর্যালোচনা প্রসঙ্গে আমি ক্রমানুগতিকভাবে তাঁর মতগুলির ক্রমবিন্যাস যে ভাবে উপস্থাপন করেছি– আমার মনে হয় তাতেই তাঁর মতের যাবতীয় পর্যালোচনার আদর্শ উদ্দেশ্য এবং ইচ্ছা সব কিছুই ব্যক্ত হয়ে উঠবে। আলাদা করে উল্লিখিত মতগুলির বিশেষভাবে পর্যালোচনার কোন প্রয়োজন পরবে বলে আমি মনে করি না। কারণ আলোচিত বিন্যাসগুলি নিজেই নিজের পর্যালোচনার সার সংক্ষেপ। অর্থাৎ স্বামী নিগমাননন্দের আলোচিত মত পথগুলি অতি সহজ সরল ও সাবলীল। ধর্মজ্ঞানী মাত্রেই আলোচনার নির্দেশিকা থেকেই বুঝতে পারবেন তিনি কি মত ব্যক্ত করতে চেয়েছেন এবং তাঁর আলোচিত ও পর্যালোচিত মতগুলির উদ্দেশ্য কি ?

তন্ত্র, জ্ঞান, যোগ এবং প্রেম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে স্বামী নিগমানন্দ ধর্মের সকল শাখায় অর্জন করেন সম্পূর্ণতা। যে স্বর্গের অমৃতে তিনি হৃদয় পাত্র পূর্ণ করেছেন কানায় কানায়, এখন সেই সুধা বহু পিপাসিত প্রাণে তৃষ্ণা নিবারণই তাঁর ধর্মমত দান। তাঁর ধর্মমতগুলি হল:

(১) "সনাতন ধর্ম প্রচার ও সৎ শিক্ষা বিস্তার।"[৪৩]

(২) "সর্বধর্মসমন্বয় অসাম্প্রদায়িক ভাবে ধর্ম বিস্তার।"[৪৪]

(৩) আর্ত-ক্লিষ্ট-অনাথ-রুগ্ন-দরিদ্র-নারায়ণের সেবা। সেবা দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ।

(৪) "নররূপে-নারায়ণের সেবা।"[৪৫]

(৫) গৃহী-সন্ন্যাসীর মহামিলনে মঠাশ্রম পরিচালন।

(৬) "আর্যঋষিদের ভাবধারাকে পুনঃ অবতারিত করণ।"[৪৬]

(৭) "আদর্শ গার্হস্থ জীবন গঠন।"[৪৭]

(৮) ভক্তিগঙ্গার সাথে ভাবগঙ্গার মহামিলন জন্য তাঁর রচিত ভক্ত-সম্মিলনী উদ্‌যাপন।

(৯) সাপ্তাহিক সংঘ মাধ্যমে সহজ উপায়ে ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ এবং একলক্ষ্যে সববেত শক্তির উদ্বোধন ও পারস্পারিক ভাববিনিময়। 'সংঘ শক্তি কলৌযুগে'–এই ভাব সংরক্ষণ।

(১০) দেশে সনাতন ধর্মপ্রচার, সৎশিক্ষা বিস্তার, সর্বধর্ম সমন্বয়, অসাম্প্রদায়িক ভাবে ধর্মবিস্তার ও জীবসেবা নিমিত্ত আত্মগঠনের জন্য তাঁর অসাধারণ অমূল্য কীর্তি– ব্রহ্মচর্যসাধন, যোগীগুরু, জ্ঞানীগুরু, তান্ত্রিক গুরু ও প্রেমিকগুরু পৃথিবী বিখ্যাত এই পাঁচখানি গ্রন্থ রচনা।

(১১) মানুষের মাঝে ঐহিক ও পারলৌকিক জ্ঞানের প্রকাশ জন্য আর্য ঋষিদের স্মরণে-আর্যদর্পন নামে তাঁর মাসিক পত্রিকা প্রকাশ।

(১২) গুরু-করণ মনুষ্য জাতির পরিত্রাণ। এই লক্ষ্যে তাঁর অসাম্প্রদায়িক নাম রূপে বিশেষ উপহার, 'জয়গুরু' মহানামের সম্ভাষণ ও প্রচার।

(১৩) নামরূপহীন বিমূর্ত গুরু ব্রহ্মের আসন মঠাশ্রমে প্রতিষ্ঠায়; সকল ধর্মের সাথে অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অর্জন ও ভাব বিনিময়ের পরিপূর্ণ সুযোগ দান।

৪৩। স্বামী অখন্ডানন্দ, **অমৃত সুধা**, কুতুবপুর, মেহেরপুরঃ শ্রীশ্রী গুরু ধাম, ১ম সংস্করণ, ১৪১০, পৃ., ৩
৪৪। ঐ, পৃ., ৩
৪৫। ঐ, পৃ., ৩
৪৬। ঐ, পৃ., ৪-৫
৪৭। ঐ পৃ.,২২

(১৪) বেদান্ত ধর্মমত প্রচারই তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ।

(১৫) এক আত্মবোধেই সকল ধর্ম, মত পথের সাথে মহামিলন ও ভালবাসার সূত্র স্থাপন । 'মদাত্মাসর্বভূতাত্মা' 'সর্বাত্মভূতমদ্‌আত্মৈব', এই মহামিলন মন্ত্র তাঁরই রচনা । (আমার আত্মাই সর্বভূতের আত্মা, সর্বভূতের আত্মাই আমার আত্মা । আমরা পরস্পর ব্যবহারিকভাবে আলাদা মনে হলেও আমাদের সকলের আত্মা এক ।)

(১৬) তাঁর ধর্মমতের মূলমন্ত্র– 'ভালবাসাই ভগবান্‌, ভালবাসার সাধনাই ভগবানের সাধনা' ।

(১৭) তিনি যুগপৎ ঋষিপন্থা ও মুনিপন্থা দুই গ্রহণ করেছেন । আত্মযাযী ও পরার্থযাযী উভয়ের সংঘবদ্ধ মিলনে দেশ, জাতি, সমাজ ও পরিবারের কল্যাণ সাধনই তাঁর ধর্মমত । 'আত্মমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' । অর্থাৎ– এই পন্থায় নিজেরও মুক্তি জগতেরও হিত । তিনি যুগপৎ চেয়েছেন ।

(১৮) শ্রীনিগমানন্দের ব্রহ্মত্বলাভের মহামন্ত্র ছিল, 'অহং-ব্রহ্মাস্মি' বেদান্তের শ্রেষ্ঠ মহাবাক্য । এর সারাংশ- আত্মসমর্পণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা । আত্মপ্রতিষ্ঠার অপর নাম আত্মবিলোপ (অহংবিসর্জন) । আত্মসমর্পণ ও আত্মবিলোপ মাধ্যমই হল, বিরাটকে পাওয়ার উপায় । যেমন বেদের প্রতি মন্ত্রের প্রথমে 'ওঁ ' শেষে 'স্বাহা' । 'স্বাহা' হল আত্মসমর্পণ 'ওঁ ' হল, আত্মপ্রতিষ্ঠা ।

(১৯) তিনি পুরুষদের মুক্তি মোক্ষের জন্য যেমন মঠাশ্রম, সংঘ, সম্মিলনী স্থাপন করেছেন অনুরূপ নারীদের মুক্তি মোক্ষের জন্য পুরুষদের পাশাপাশি সর্বত্র সহযোগীরূপে বিচরণ ব্যবস্থা করেছেন । নীলাচল মহিলা সারস্বত সংঘ প্রতিষ্ঠা দ্বারা মহিলাদের জন্যও ত্যাগপথের সৌভাগ্য সূচনা করেছেন ।

(২০) তিনি এক এবং বহুর সমন্বয়কারী ছিলেন । তিনি এক-কে গ্রহণ করে বহু-কে উপেক্ষা করতেন না আবার বহু-কে গ্রহণ করে এক কে ত্যাগ করার উপদেশও দিতেন না । তিনি চাইতেন, 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'– এক বিরামহীন ওঁঙ্কার ধ্বনীর মহামিলন, সবার জন্য সম্প্রসারিত হোক ।

৪.৩.৫: উপসংহার

স্বামী নিগমানন্দের ধর্ম চিন্তা ও একটি পর্যালোচনা পর্বের উপসংহারে একটি কথা নিঃসন্দেহে সত্য বলে প্রমাণিত হয় যে, স্বামী নিগমানন্দ ছিলেন একজন সত্য লাভকারী সিদ্ধ সাধক । তিনি নিজেই বলেছেন ,'' আমি ব্রহ্ম আত্মা ভগবানে প্রতিষ্ঠিত আছি , আমাকে ধরলে তোমাদের সব হবে ।'' তাঁর ধর্মচিন্তার জন্য এই শাশ্বত বাণীটিই সকল মতবাদী সম্প্রদায়ী আস্তিক নাস্তিক সবার জন্য একটি সুসংবাদ । ঈশ্বর লাভের সকল মত পথ তিনি সবার জন্য উদার ও মুক্ত ভাবে উল্লেখ করে গেছেন ।

রামকৃষ্ণ,বিবেকানন্দ,নিগমানন্দ ও অরবিন্দ এঁরা চার জনই অদ্বৈত বেদান্ত মতকে আশ্রয় করে সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেছেন। শ্রীনিগমানন্দ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের সমন্বয়ী দৃষ্টিকে আরও স্ফুটতর করেছিলেন । শ্রীনিগমানন্দ যা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেননি বা গুছিয়ে বলেননি তার অনেকখানি আমরা অরবিন্দ দর্শনে পাই । ঋষি অরবিন্দ বাঙ্গালীর মনীষা অনাগত বিধাতা হয়ে ভাবী কালের যবনিকা উন্মোচন করে এক দিব্য জীবনকে লোকগোচর করে গেছেন । বাঙ্গালী হিসেবে আমরা এ বিষয়ে উদ্বীপ্ত না হয়ে পারি না ।

জীব ব্রহ্ম ও জগৎ তিনটি নিয়েই দর্শনের কারবার। এই তিনের তত্ত্ব পারস্পারিক সম্বন্ধ নির্ণয়ই দার্শনিকের কাজ। ভারতবর্ষে প্রাচীন দার্শনিকদের চিন্তা চেতনা শুধু তত্ত্ব নির্ণয়ই ক্ষান্ত ছিল না। তাঁরা সেই তত্ত্বকে জীবনে সত্য করতেও ব্রতী ছিলেন । শ্রীনিগমানন্দ ধর্ম চিন্তা এই লক্ষ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। দর্শনের প্রয়োগ শুধু নিজের জীবনের জন্য নয় , দেশ ও দশের, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যও এবং এর উদ্গাতা যেমন ছিলেন বিবেকানন্দ, তেমনি এর গভীরে প্রয়োগ কর্তা ছিলেন স্বামী নিগমানন্দ । পশু হতে একলাফে যেমন কেউ ব্রহ্ম হতে পারেন না। এর জন্য চাই প্রথমে পশুত্ব ত্যাগ , তারপর মনুষ্যত্ব , দেবত্ব পরিশেষে ব্রহ্মত্ব । এই হল মানব জীবনের লক্ষ্য। স্বামী নিগমানন্দ ছিলেন এর জীবন্ত আদর্শ। তিনি সারাজীবন মানব জীবনের গোড়ায় জল ঢেলে গেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন- '' শিশু মঙ্গল '' বা ব্রহ্মচর্য লাভই হলো জীবনের ভিত। স্বামী বিবেকানন্দজী চেয়েছিলেন , যুবকের শক্তি যা কিনা ধর্মে , জীবনে , রাষ্ট্রে ও সমাজে

সুদূর এক আলোর পথের দিশা যোগাতে পারে। ধর্মচিন্তা বিভিন্ন হলেও সকলের লক্ষ্য ‘ ঈশ্বর লাভ ’ এক বাক্যে স্বীকৃত হয়েছিল।

অতএব ভারতোদ্ভূত যে কোন ধর্ম ও তার দর্শনকে জানতে হলে প্রথমে সনাতন ধর্মের সারতত্ত্ব যে ‘ঈশ্বর লাভ’ বা ‘আত্মার স্বরুপ জ্ঞান লাভ’ তা জানার জন্য জীবনভর সচেষ্ট থাকতে হবে। এই একটি মাত্র উপায়েই আমাদের জাতীয় একতা ও সংহতির প্রকৃষ্ট উপায় পরিলক্ষিত হবে। যে সকল রাজনৈতিক নেতা ‘ধর্ম’-কে একতার পরিপন্থী ও সাম্প্রদায়িকতার উৎস বলে মনে করেন তাঁরাও ধর্মের এই মূল সারতত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম ও আবিষ্কার করতে পারলে ধর্মকে জাতীয় একতার সহায়ক রুপে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন বলে আমি মনে করি।

পঞ্চম অধ্যায়

বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও নিগমানন্দের শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ও ধর্ম মতের তুলনামূলক আলোচনা

৫.১: বিবেকানন্দের শিক্ষা

মানব জীবনের অর্জিত প্রথম বস্তুটির নামই হল শিক্ষা। জীবনের শুরু– 'কথা বলা' থেকে আরম্ভ করে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত যে সময়কালটি তার সবটি মিলেই মানব জীবনের রেখে যাওয়া ও নিয়ে যাওয়ার মধ্যে আহৃত যত সম্পদ তার নাম শিক্ষা। এই পৃথিবীতে আমরা যা কিছু দেখছি, করছি, বলছি, খাচ্ছি ও পড়ছি ইত্যাদি সবকিছুই অগ্রে শিখে শিখাই, করে করাই, বলে বলাই এবং পড়ে পড়াই। আর এর মূলে হল প্রকৃতি। প্রকৃতি আমাদের সবার প্রথম শিক্ষক। স্বামী বিবেকানন্দজী, নিগমানন্দজী ও অরবিন্দজী এঁদের জীবন চিত্রটিও কিন্তু এর ব্যতিক্রম নয়। ব্যতিক্রম বলতে তাঁদের জীবন শিক্ষা ও আমাদের জীবন শিক্ষার মধ্যে স্বাভাবিকের চেয়ে যা একটু আলাদা বা অন্যরকম বলে অনুক্ষণ মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে, আলোচ্য বিষয়টি আমাদের সেখানেই। আমরাও মানুষ, তাঁরাও মানুষ। ব্যতিক্রম আমাদের সাথে তাঁদের হল– শিক্ষা নিয়ে। আমাদের শিক্ষার সাথে তাঁদের শিক্ষার পার্থক্য হল– শুধু ব্যবহারিক অথবা শুধু আধ্যাত্মিক এই দুটির মত পার্থক্য নিয়ে নয়, বরং যুগপৎ সমন্বয় নিয়ে।

আমাদের এখন আলোচ্য বিষয় হল– এই ত্রয়ীর শিক্ষা বিষয়ক তুলনামূলক আলোচনা। আমি এখানে তুলনামূলক আলোচনা পর্বটি অধ্যায়ভিত্তিক পর পর প্রতি প্রত্যেকের আলোচনার মূল মর্মার্থটি সংক্ষেপে তুলে ধরে শেষে তুলনামূলক আলোচনা করেছি। সরাসরি করার সাহস পাইনি। এর কারণটি পরবর্তীতে প্রসঙ্গক্রমে তুলে ধরা হয়েছে। স্বামীজি তার শিক্ষা সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন সেখানে তিনি প্রকৃতি, মানুষ ও ব্রহ্ম এই তিনটি বিষয়ের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আরও দৃষ্টি নিক্ষেপ

করেছেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয়ের উপর। শিক্ষার উপর বহু বিষয়ে বহু আলোচনা করেছেন, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাষণ দ্বারা, দেখিয়েছেন এক শতাব্দী পর কি হবে তার দূরদর্শিতা।

তিনি শিক্ষা বলতে সকল প্রকার জ্ঞান আহরণকে বুঝিয়েছেন। শিক্ষার মধ্যে থাকবে ধর্ম, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিদ্যা, কালোত্তীর্ণ প্রাচীন সাহিত্য শিক্ষা। থাকবে- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাজনিত ইত্যাদি নানা বিদ্যা। নানা বিষয়ক জ্ঞানলাভমূলক শিক্ষা। নন্দনতত্ত্ব, কলাবিদ্যা, গীতবাদ্যবিদ্যা, কান্তিবিদ্যা, চারুকলা, শরীর চর্চা ও খেলাধুলা প্রভৃতি মিলে অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমাজের উন্নয়নে যা যা প্রয়োজন সবকিছুকে তিনি শিক্ষার অঙ্গ বলে ভাবতেন ও বুঝতেন। তাঁর বাণী এখানে প্রণিধানযোগ্য হবে বলে উদ্ধৃতিটি তুলে ধরলাম। যথা-

"তোমরা প্রকৃতি থেকে শিক্ষা লাভ কর (Let nature be their teacher)। প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ফলে এই পরিদৃশ্যমান জগতের পশ্চাতে চিরন্তন সত্তার সাথে সাক্ষাৎকার সম্ভব হয় এবং এই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা।"[১]

তাঁর বাণী থেকে আমরা প্রমাণ পেলাম- প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি তাঁর চিন্তা-চেতনা ও সম্পৃক্ততা ছিল কত গভীর। ধর্মের সাথে শিক্ষার ক্ষেত্রে- "চিরন্তন সত্তার সাথে সাক্ষাৎকার" এই বাক্যটি আরও প্রমাণ করে তিনি ছিলেন কত বড় আধ্যাত্মিক। তাঁর বিদ্যমান চিন্তা-চেতনা ছিল আরও কত সূদুরপ্রসারী।

এছাড়াও পুরুষ শিক্ষা ও স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মতদান ছিল গভীর চেতনাদীপ্ত ও যুক্তি বিশ্লেষণপূর্ণ। নারী শিক্ষাকে তিনি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কারণ পাশ্চাত্য দার্শনিক জর্জ বার্নার্ডশোর One mother guided one hundred teachers, এই উক্তিটি তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন। মা'ই হলেন একজন শিশুর প্রকৃত শিক্ষক। এজন্য নারী শিক্ষাকে তিনি দেশ, সমাজ, জাতি ও ধর্ম সব জ্ঞানের অধিকারী করে পুরুষের পাশাপাশি নারী মুক্তির চিন্তাকেও প্রাধান্য দান করেছিলেন। প্রায় দেড় শতাব্দী পূর্বে

১। K. C. Lahiri, **The Complete Works of Swami Vivakananda**, Calcutta: Udbadhon Karjyalya, Vol-5, P., 369

পাশ্চাত্যের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য এবং তাদের জারিজুরি বুঝার জন্য এবং নিজেদের সাথে তাদের সম্পদ আদান-প্রদানের জন্য ইংরেজি শিক্ষার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ভারতবাসীকে বহু ভাষায় শিক্ষিত হতে হবে; নইলে জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয় এটিও তিনি এক শতাব্দী পূর্বে অনুধাবন করেছিলেন।

ভারতের জাতীয় সম্পদ হল ধর্ম। এই ধর্মকে তিনি গুরুত্বের সাথে দেখতেন এবং পর্যালোচনা করতেন। ধর্ম ভিত্তিক শিক্ষা ছাড়া যে নৈতিক উন্নতি অসম্ভব তা তিনি জীবনে প্রথম পর্বেই বুঝেছিলেন। এই জন্য তিনি চতুরাশ্রমের প্রথম পর্ব ব্রহ্মচর্যজীবন-যাপনকে বরণ ও গ্রহন করে- বীর্য ধারণই যে ব্রহ্মচর্যে মূল এবং ব্রহ্মচর্যই যে শিক্ষার অবকাঠামো তা তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। সন্ন্যাসজীবন ধারণ তাঁর জীবনে সেটাই প্রমাণ করে। ভারতের বেদ বেদান্ত যে শিক্ষা দান করে- 'ভোগে সুখ নাই ত্যাগে সুখ'। তিনি মর্মে মর্মে এটি উপলব্ধি করেই তাঁর কঠোর ব্রহ্মচর্য্য জীবন দ্বারা জগতকে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন যে, শুধু ব্রহ্মচর্য্য ও ত্যাগ শিক্ষার ফলেই তিনি কিভাবে বিশ্ব বরেণ্য ও বিশ্ব বিজিতারূপে পরিচিত হয়েছিলেন।

ভারতের যুবক বন্ধু বা ভাইদের শিক্ষা বিষয়ক মর্ম বাণী উচ্চারণ করে তিনি বুঝিয়েছিলেন যে, ‘‘বিদ্যার উন্মেষে ইতর সাধারণকে জীবন সংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্র, বল, পরার্থ তৎপরতা, সিংহ সাহসিকতা এনে দেয় না, সেটি আবার শিক্ষা? ’’[২] এই বাণী মাধ্যমে স্বামীজি চেয়েছিলেন ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে চূড়ান্ত সমন্বয়। কিন্তু তিনি যে দৃষ্টিতে এটিকে অপরিহার্য বলে মনে করেছিলেন, বাস্তবে সেটি না হয়ে কালক্রমে যে ব্যক্তি প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হবে, আপামর জনসাধারণ অবহেলিত হবে অল্পদিনে তা ভবিষ্যৎ বুঝতে পেরেই তিনি আম জনতার শিক্ষাকেই অগ্রাধিকার দিয়ে গেছেন। অর্থাৎ বর্তমান সমাজের জন্য এক্ষুনি জনশিক্ষাই যে একমাত্র উপাদেয় এই প্রেক্ষিতে বাণীও দান করে বুঝিয়ে গেছেন, যথা:

> যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যা বুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্বনাশ হইয়াছে, তার মূল কারণ একটি- রাজ শাসন ও দম্ভ বলে দেশের সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ করা। যদি আমাদিগকে পুনরায় উঠিতে হয়, তা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগনের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া উঠিতে হইবে।[৩]

২। পূর্বোক্ত, রঙ্গনাথানন্দ, **স্বামীজির বাণী ও রচনা**, পৃ., ১০৭

৩। Bipin Pal, The Complete Works of Swami Vivakananda, Calcutta: Udbadhon Karjyalya, 5th edition-1961, Vol. 4, P., 182

স্বামীজি মহারাজের শিক্ষা বিষয়ক চিন্তাগুলি আধ্যাত্মিকতার চেয়ে সামাজিকতার উপরেই বেশি ক্রিয়াশীল বলে আমি মনেকরি। ধর্মের দ্বারা দুই একজন ব্যক্তি কশ্চিৎ উপকৃত হতে পারেন বা আত্মগঠন করা তার পক্ষে সম্ভব কিন্তু সর্বসাধারণের পক্ষে এটি একটি অসম্ভব কল্পনা ছাড়া অন্য কিছু মনে আসে না। ধর্মের কঠোর নিয়ম পালন করে যে ব্যক্তি শিক্ষিত হয় তা অবশ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু সর্বসাধারণের স্থান এখানে কোথায়? যারা দুবেলা দু'মুঠো খেতে পায় না, জীবন রক্ষার্থে অর্থ সংগ্রহে ব্যস্ত, তারা কি করে ধর্ম সুখ লাভ করার জন্য ক্ষুধার জ্বালায় ব্রত উপবাস করে পুড়ে মরবে। আত্মবলি কিভাবে দিবে ভগবৎ চরণে? সে বিশ্বাস ভক্তি ও সাহস তাদের কোথায়? ধর্ম মানা আর ধর্ম পালন করা এ দ'টি কখনো এক নয়।

এরা সাধারণ দুর্বল বলহীন এদের পক্ষে আত্মার উপলব্ধি কখনো সম্ভবপর নয়। আমার মনে হয়- বুভুক্ষ জনগণকে ধর্ম জ্ঞান শিক্ষা দেয়া অপমান করারই সামিল। স্বামীজি একারণেই সবসময় চিন্তিত ছিলেন। তাঁর চেতনায় বরং ধরা পড়েছিল- কিভাবে জনগণের মধ্যে অন্ন যোগান জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিতরণ করা যায়। যে বাস্তবমুখী জ্ঞান দান ও শিক্ষার মধ্যে থাকবে মনে বলিষ্ঠতা গঠন ও আত্মার উদ্বোধন জন্য থাকবে প্রয়োজনীয় উপাদান। স্বামীজি একেই বলেছেন, মানুষ গড়ার শিক্ষা। এই ভাবে মানুষ যখন গড়ে উঠবে তখন তার মধ্যে সমাজ চেতনা দানা বাঁধবে এবং ধীরে ধীরে মানবতা জাগ্রত হয়ে উঠবে। মানবতা থেকেই মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব এবং ঈশ্বরত্ব প্রকাশ পাবে। স্বামীজি প্রত্যেকের জীবনকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত করতেই সর্বদা উৎসাহী ছিলেন। অর্থাৎ আগের হৃদয়ে দয়াগুন সঞ্চার করে- তার হৃদয় প্রস্তুত করার পর- অতঃপর তাকে দাতা করে গড়ে তোলাই ছিল তাঁর এই অন্তর্নিহিত শিক্ষার অর্থ, আমার স্বল্পজ্ঞানে আমি এই মনে করি।

উল্লেখ্য এই যে, কার্যকারিতার দিক থেকে স্বামীজির দৃষ্টিতে শিক্ষা ও ধর্ম আলাদা কিছু নয়। ভগ্নি নিবেদিতা এই জন্যেই বলেছিলেন, "স্বামীজির কাছে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন এমন কোনকিছুই ছিল না।"[৪]

৪। পূর্বোক্ত, Sister Nivedita, Notes of some wondering with Swami Vivekananda, P., 7

তবে তিনি সাধারণের প্রতি অগ্রে সামাজিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠার পর ধর্মের সাথে মানবাত্মার যে অন্তর্নিহিত শাশ্বত সনাতন শিক্ষা তা প্রথমে না চেয়ে পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হওয়ার দিক নির্দেশনাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। স্বামীজি এই লক্ষ্যেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানলেন, "শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যাপক ও ফলদায়ী করে তুলবার জন্য মৌল উপাদানের পরিপূরক হিসেব অন্যান্য উপকরণ অবশ্য প্রয়োজন। এই হল অন্যতম আপেক্ষিকতার সমস্যা। ভারতের পক্ষে যা প্রয়োজন তা হল বেদান্ত ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমন্বয়। মূল প্রেরণার জন্য চাই ব্রক্ষচর্য্য, শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস।"[৫] সামান্য আলোচনা হতে আমরা যতটুকু বুঝতে পারলাম তাতে এই প্রতীয়মান হয় যে, স্বামীজির শিক্ষা শুধু ধর্মভিত্তিক ছিল না, তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থাটি হল, নূতন সমাজের জন্য নূতন শিক্ষকগোষ্ঠী তৈরী করা। অর্থাৎ সমাজকে ঢেলে সাজানো। তাঁর বিশ্বাস ছিল, এই পরিকল্পিত সমাজ ব্যবস্থার ফলেই উন্নয়ন যাত্রা অধিক সম্ভব। স্বামীজির বিশ্বাস ছিল, এই অজ্ঞ মূর্খ অবহেলিত নিরূপায় এবং অসহায় সমাজকে যদি গণ আন্দোলন মাধ্যমে সচেতন করা বা আদর্শের উদ্ভবে গড়ে তোলা সম্ভব হত তবে সকল প্রতিবন্ধকতা অপসারিত হয়ে জাতীয় শিক্ষায় এক আমূল পরিবর্তন সৃষ্টি হয়ে জাতিকে সমৃদ্ধ শালী করে গড়ে তুলতে সক্ষম হওয়া যেত। পরিশেষে আমার মনে হয়- স্বামীজির এই আদর্শকে অন্যতম উদ্ভব তত্ত্ব বললেও অত্যুক্তি হবে না।

৫.২: শ্রী অরবিন্দের শিক্ষা

শ্রী অরবিন্দের শিক্ষা চিন্তা এবং বিবেকানন্দজী শিক্ষা চিন্তা আদর্শগত দিক দিয়ে বেশি একটা পার্থক্য না থাকলেও কার্যত দৃষ্টিতে মতপার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। কারণ প্রত্যেকের চিন্তা চেতনা প্রত্যেকের আপন আপন। স্বামীজির শিক্ষা চিন্তার চেয়েও শ্রী অরবিন্দের শিক্ষা অনেক বেশি আধুনিক। তুলনামূলক আলোচনাটি আমরা তুলনামূলক অধ্যায়ে করব। আমরা জানি- শ্রী অরবিন্দের বাল্য কৈশোর এবং যৌবন যে সময়টি মানবের শিক্ষার সময়কাল, সেই সময়টি অতিবাহিত হয়েছিল শ্রী অরবিন্দের পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠার জীবন-যাপনের মাধ্যমে।

৫। পূর্বোক্ত, Bipin Pal, The Complete Works of Swami Vivekananda, P.,130

পাশ্চাত্যের শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি শ্রী অরবিন্দের জীবনের সাথে ছিল অতি একান্তভাবে সম্পৃক্ত। শিক্ষা ছিল শ্রী অরবিন্দের জীবনব্রত। তিনি ছিরেন যেমন শিক্ষানুরাগী ও অধ্যবসায়ী অনুরূপ শিক্ষাদানের প্রতিও ছিল তাঁর অতি আগ্রহ ও অধ্যবসায়। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন একজন বিদ্যোৎসাহী। সবাই উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে গড়ে উঠুক এই ছিল তাঁর প্রাণের প্রেরণা। তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় বিদ্যোৎসাহী অধ্যবসায়ী একজন স্বনামধন্য শিক্ষিত সাধু। তিনি পৃথিবীর বহু জ্ঞানী গুণি দেশ জাতির সাহিত্য সংস্কৃতি জ্ঞান গুণ লাভের জন্য বহু ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। তিনি প্রথম ভূ-ভারতে একজন তিক্ষ্ণ প্রখর বিচক্ষণ বুদ্ধিমান আই সি এস পাশ শিক্ষাবিদ সাধু ছিলেন। তিনি এদিকে যেমন রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক, পত্রিকা সম্পাদক এবং দেশপ্রেমিক, অন্যদিকে সর্বত্যাগী, যোগী, ধর্মানুরাগী, সাক্ষাৎ ভগবান বাসুদেবের অলৌকিক দর্শন লাভকারী ব্যক্তিত্ব। তিনি আধুনিক- ভারত ধর্ম যাজকদের অগ্রদূত।

দুই মহামানব স্বামীজি ও শ্রী অরবিন্দের জন্ম একুশ শতাব্দীতে হলেও স্বামীজির জীবন গড়ে উঠেছিল ভারত ভূমিতে। ভারতের সামাজিকতার আদর্শের উপর। শ্রী অরবিন্দের জীবন গড়ে উঠেছিল পাশ্চাত্য সভ্যতাকে কেন্দ্র করে- পাশ্চাত্যে। স্বামীজি যেমন করে ভারতকে অনুধাবন করেছিলেন অরবিন্দজীর জীবন সেভাবে সুযোগ লাভ ঘটেনি। সমাজের অবহেলিতদের প্রতি স্বামীজির দৃষ্টি ছিল প্রখর। কেননা এরা না জাগলে ভারত জাগবে না। শিক্ষা সংস্কৃতিতে এরা উন্নত হবে না, ভারতের পরাধীনতা ঘুচবে না। স্বামীজিকে এজন্য গড়ায় জল ঢালতে হয়েছিল। অরবিন্দজী এলেন ত্যাগ ও সত্যাগ্রহ মাধ্যমে জ্ঞানাস্ত্র দ্বারা স্বাধীনতার আন্দোলনে ভারত সন্তানদের শিক্ষায় দীক্ষায় উন্নত জীবন দান করতে। যথার্থ দেশপ্রেমিক করে গড়ে তুলতে।

দেশের স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য বেশ কয়েকবার তাঁকে বিদেশী শাসকদের রোষানলে অভিযুক্ত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হতে হয়েছিল। তবুও তিনি বিদেশী শাসকদের ভয়ে ভীত না হয়ে মাতৃভূমিকে উদ্ধারের জন্য জীবন পণ করেছিলেন। বরোদায় যখন তিনি শিক্ষকতায় নিযুক্ত হলেন সরকারি সকল সুযোগ সুবিধা প্রত্যাখান করে নিভৃতে নিরালায় অতি সঙ্গোপনে দেশ হিতৈষীদের সাথে মত বিনিময় করার মোক্ষম সুযোগ হাতের নাগালে পেলেন, তখন তিনি নিষ্ঠাভরে কলেজের যুবক স্বাধীনতা প্রেমিক ছাত্র-ছাত্রীদের দেশের কাজে

লাগাতে লাগলেন। স্বাধীনতা আন্দোলন গোপনে তীব্রতর করে শিক্ষার্থীদের অস্ত্র চালনা, আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র তৈরী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলে স্বদেশের মুক্তি কামনায় দেশবাসীর জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে– ভারতবাসীকে দেখিয়ে ও দেখায়ে গেলেন- একজন শিক্ষিতের শিক্ষাগ্রহনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য কি? দেশ জাতির মুক্তির জন্য একজন শিক্ষার্থীর দায়িত্ব কর্তব্য কতখানি। জাতীয় শিক্ষাহীন একটি পরাধীন জাতির দুরদশা কথ খারাপ হতে পারে; সেই বিষয়েও যথেষ্ঠ সচেতন করতে ছাড়েননি। জাতীয় স্বাধীনতা ছাড়া কোন জাতি শিক্ষায় দীক্ষায় কোনভাবেই যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না তিনি তা নিজের জীবন দিয়ে দেশবাসীকে দেখিয়ে গেছেন।

ভারতবাসীকে কি শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে এবং সেই শিক্ষা অনাদিকাল জীবনে শান্তি দান করবে এমন চিন্তার মুল সূত্রগুলি শ্রীমা- ঋষি অরবিন্দের নিকট হতে যেভাবে যা প্রাপ্ত হয়েছিলেন নিম্নে সেই বিভাজিত শিক্ষা নীতিগুলিকে তুলে ধরা হল। যা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে আলোচনার গুরুত্ব বহন করবে। যথা- (ক) জীবন-বিজ্ঞান(আত্মজ্ঞান ও আত্মসংযম), (খ)শিক্ষা, (গ)শারীরিক শিক্ষা, (ঘ)প্রাণের শিক্ষা, (ঙ)মানসিক শিক্ষা, (চ)অন্তরাত্মিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা।

নিম্নে সংখ্যানুক্রমিক সংক্ষেপে এই শিক্ষাগবেষণা সূত্রগুলি আলোচ্যাংশে তুলে ধরে সর্বসমক্ষে বুঝানোর চেষ্টা করেছি শ্রীমা শ্রী অরবিন্দ ভারতে শিক্ষিত সন্তানরূপ ছাত্রদের কাছে শিক্ষা বিষয়ক কি প্রকার প্রত্যাশা জ্ঞাপন করে গেছেন। মোটামুটি একটি ধারণা এখানে তুলে ধরা হল-

(ক) জীবন-বিজ্ঞান: তাদের প্রথম প্রশ্ন ছিল মানব জীবনের লক্ষ্য কি? এই বিষয়ে তাদের মত হল- মনে রেখ, লক্ষ্য ও পরিকল্পনা নিয়েই একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন। লক্ষ্যহীন জীবন দূঃখের জীবন। পরিকল্পনা একাধিক পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু নির্ধারিত লক্ষ্য কোনভাবেই পরিবর্তন হবে না। লক্ষ্যটি হতে হবে অবশ্যই উন্নত বৃহৎ, উদার ও নিঃস্বার্থ। এরই নাম তারা দিলেন জীবন-বিজ্ঞান। পক্ষান্তরে বুঝালেন, আত্মজ্ঞান লাভ। আর এটি সম্ভব করতে হবে আত্মসংযম মাধ্যমে।

অনুশীলন করতে হবে জীবনের উর্দ্ধতম সত্তাকে আন্তরাত্মিক স্তরে। অস্তিত্বের উপর এতখানি একাগ্র হতে হবে যে, যেন আমাদের নিকট জীবন্ত হয়ে উঠে। আমরা যেন তাঁকে নিজেদের সাথে অভিন্ন করে তুলি। এই উপলব্ধি এবং পরিণামে এই সাযুজ্য লাভের জন্য দেশে-দেশে, যুগে-যুগে নানা উপায় আবিস্কৃত হয়েছে। কতকগুলি মনস্তত্ত্বগত, কতকগুলি ধর্মভাবগত, কতকগুলি আবার একান্ত বাহ্যক্রিয়াগত। কার্যতঃ উচিত প্রত্যেকের নিজের উপযুক্ত উপায়টি আবিস্কার করে নেওয়া। আর-তার যদি থাকে জ্বলন্ত এবং অটল আস্পৃহা, অক্লান্ত এবং সক্রিয় ইচ্ছাশক্তি, তবে যে পথেই হোক- লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় সহায় তার নিশ্চয়ই মিলবে।

(খ) শিক্ষা: মানুষের শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত একেবারে তার জন্ম থেকে আর চলা উচিত সারাজীবন ধরে। সত্যিকার অর্থে শিক্ষার পূর্ণফল পেতে হলে জন্মের আগে থেকেই তার শুরু করা উচিত। এই আরম্ভ মায়ের মধ্যে সৃষ্টি হয় প্রথম দুই ধারায়- একটি তার নিজের সম্বন্ধে নিজের উন্নতি নিয়ে, দ্বিতীয়টি- যে শিশুকে মা অবয়ব দান করেছে তাকে নিয়ে। মায়ের সংকল্প আকাঙ্খার উপরেই নির্ভর করবে শিশুটির ভবিষ্যত জীবনের- শারীরিক, মানসিক, প্রাণিক, হৃদয়াত্মিক এবং আধ্যাত্মিক দিকগুলি। এজন্য আমরা প্রবন্ধের পটভূমিকায় তুলে ধরেছি 'একজন আদর্শ মা শত শিক্ষকের সমান'। মা যে উপদেশ সন্তানকে দান করেন তা শুধু মুখে বলে দিয়েই নয়, জীবন্তভাবে কাজে কর্মে ব্যবহারে– সন্তানকে সাথে করে দেখিয়ে ও দেখায়ে গড়ে তুলেন বলেই সন্তান তার শিক্ষাগুলি বেশি পছন্দ ও আগ্রহ ভরে গ্রহণ করে। ক্লাশে শিক্ষকগণ ভাল ভাল কথা বলেন, ভাল উপদেশ দেন, কিন্তু ফল তেমন হয় না। শিক্ষকগণ শিক্ষার দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোন উন্নত মহৎ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে প্রমাণ দিয়ে উপদেশ দান করতে পারেন, যদি না শিক্ষক স্বয়ং তার কর্মে ও আচরণে সেই উন্নত ব্যক্তির আন্তরিকতা, সততা, ঋজুতা, সাহস, অনাসক্তি, নিঃস্বার্থতা, ধৈর্য, সহ্যশক্তি, অধ্যবসায়, শান্তি, স্থিরতা, আত্মসংযম এসব জিনিস মনোরম বক্তৃতার পরিবর্তে কার্যত দেখাতে না পারেন বা ছাত্র তার কার্যে ব্যবহারে দেখতে না পায়; তবে তার ফল ভাল হয় না। যেমন পিতামাতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করা সন্তানকে শিখিয়ে দিতে হয় না, মায়ের ঈশ্বরে ভক্তি বিশ্বাস ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা, নম্রতা ও ভদ্রতা ইত্যাদি সৎ

গুনগুলি দেখেই সন্তান শিখে থাকে। আমার মা বাবা যেহেতু আমাকে পৃথিবীতে এনেছেন তখন সকল শিক্ষার দায়িত্ব শুধুই আমার নয়, তাদেরও। শ্রী অরবিন্দ ও শ্রীমা এই শিক্ষার উপরেই জোর দিয়ে গেছেন প্রভূত বেশি।

শুধু উপদেশ দিয়েই এর ইতি করেননি, পন্ডিচেরীতে **১৯৫২** সালের ৯ই জানুয়ারি দেশের বিশিষ্ট বিদ্বোৎমন্ডলীর উপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত করেন "শ্রী অরবিন্দ আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র"। এই শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্দেশ্য হল শ্রীমা ও শ্রী অরবিন্দ তাঁদের অর্জিত বহু দিনের শ্রম ও আদর্শ প্রদান, যেখানে থাকবে ছেলেমেয়েদের একটি সামগ্রিক শিক্ষা। যাতে তারা নিজেদের জীবনকে নিজেরাই বুঝতে ও আবিষ্কার করতে পারে। দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গতানুগতিক যা শিক্ষা দেওয়া হয় এখানে সেগুলি ছাড়াও থাকবে কিছু ব্যতিক্রম।

শ্রী মা বলেন, "আমরা এখানে এমন কিছু করতে চাই যা অন্য কেউ করে না। করতে পারে না, কারণ এমন যে করা যায় সে ধারণাই তাদের নেই।"[৬] আরও বলেন, "যেসব ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যতের জন্য সংসৃষ্ট, আমরা এখানে তাদের জন্য সেই ভবিষ্যতের পথ খুলে দিতে চাই।"[৭]

৫.৩: শারীরিক শিক্ষা, প্রাণের শিক্ষা, মানসিক শিক্ষা, অন্তরাত্মিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা

আমরা এখানে অধ্যায়ক্রমিক শিক্ষার আলোচনাগুলি পরপর আলোচনা না করে সংক্ষিপ্তাকারে যুগপৎ সমন্বয়াকারে বেশি সুবিধা হবে বলে একত্রে তুলে ধরছি। শিক্ষা বলতে যদি আমরা শুধু কারও দেওয়া পুঁথিগত সিদ্ধান্তগুলি মুখস্থ করা বিদ্যাকেই বুঝি তবে শিক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে না।

৬। অমলেশ ভট্টাচার্য, **অমৃত পুরুষ শ্রী অরবিন্দ,** কলিকাতা: শ্রী অরবিন্দ ভবন, **১**ম সংস্করণ, ২০০৮, পৃ.,৬৯
৭। পূর্বোক্ত, পৃ.,৭০

যেমন অধ্যায়ক্রমিক শারীরিক শিক্ষা, যদি এর প্রতি জ্ঞান না থাকে তবে শিক্ষায় মন বসবে না। কারণ শরীর হল ধারণ শক্তির আধার। শরীরের সাথে মনের সম্পর্ক। মনের সাথে বুদ্ধির, আর বুদ্ধির সাথে যদি প্রাণের শক্তি না থাকে তবে বিদ্যালাভ অসম্ভব। যেমন- শরীর অসুস্থ হলে লেখা-পড়া, খাওয়া-দাওয়া, কোনকিছু ভাল লাগে না। প্রত্যেক অভিভাবককে স্মরণে রাখতে হবে যে, আমাদের শরীরের নিজেরই একটা সূক্ষ্মবোধ আছে, তা যতক্ষণ অটুট কার্যকরী থাকে ততক্ষণ সকল মতবাদের চেয়ে সে বেশি নির্ভরযোগ্য। অতএব আমাদের উচিত সন্তানকে স্বাভাবিক ভাবেই বেড়ে উঠতে দেওয়া। যে খাদ্যে তার অনিচ্ছা, জোর করে তাকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য না করা। কারণ শরীরে সূক্ষ্মবোধ তাকে তার ভিতর থেকেই বুঝিয়ে দেয় কোনটি গ্রহণ করা উচিত কোনটি অনুচিত। আহার শক্তিকে শক্তি, পুষ্টি সাধন, ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন জন্য, রসনাতৃপ্তির জন্য কখনোই নয়।

প্রাণের শিক্ষা হল অন্য শিক্ষা অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য। মানুষের স্বভাবে প্রকৃতই প্রাণ এক স্বৈরাচারী প্রভূত্বকামী অত্যাচারী রাজা। অধিকন্তু তার মধ্যে রয়েছে সামর্থ্য, শক্তি, উৎসাহ, কার্যকরী সক্রিয়তা কিন্তু এই প্রভূটির তৃপ্তি কখনোই হয় না। এর দাবিরও কোন সীমা নেই, সেজন্য অনেকে তাকে সমীহ করে চলে, সর্বদা খুশি রাখতে চেষ্টা করে। মোটকথা সংক্ষেপে এই প্রতীয়মান হয় যে, প্রাণের সাথে স্বভাবের একটা আন্তরিক যোগ আছে। অতএব নিজের স্বভাব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা চাই। তারপর চাই নিজের সকল বৃত্তির ওপর কর্তৃত্ব, যাতে যে- সব জিনিসের রূপান্তর করতে হবে তাদের ওপর পূর্ণ শাসন এবং সেসবের রূপান্তর শাসন করা যেন সম্ভব হয়। এই আত্মশাসন এবং রূপান্তরের প্রয়াস জন্য চাই একটি আদর্শ। এই আদর্শই মানসিক শক্তি গড়ার উপযুক্ত অধিকারী।

মানসিক শিক্ষা হল ৫টি। যা মনে প্রকৃত শিক্ষা, যা তাকে উর্দ্ধতর জীবনের জন্য তৈরী করে। প্রথমটি হল- একাগ্রতা শক্তি ও মন সংযোগের সামর্থ্য বৃদ্ধি। দ্বিতীয়টি হল- প্রসার, বৈচিত্র্য, ব্যাপৃতি এবং ঐশ্বর্যদায়ক বৃত্তির অনুশীলন। তৃতীয়টি হল- একটা মূলভাব বা উচ্চতর আদর্শ যা জীবন পথের দিশারী, যাকে নির্ভর করলে জীবনের ভুল হয় না। চতুর্থটি হল- অবাঞ্ছনীয় চিন্তা রাশি বর্জন, যাতে ভাবতে পারি ঠিক যা চাই এবং

যখন চাই । পঞ্চমটি হল- মানসিক নিস্তব্ধতা, পূর্ণ প্রশান্তি, সত্তার উর্দ্ধলোক হতে প্রাপ্তি সামর্থ্যতা । এ পাঁচটি শক্তি শিক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

যেহেতু মনেরও একটি বিশ্রাম প্রয়োজন আছে এজন্যে শিক্ষার সাথে মনের প্রশান্তি হেতু ধ্যানাসনের যে কোন একটি আরামদায়ক আসন যেমন পদ্মাসন বা সিদ্ধাসন । এই আসন বা মুদ্রা মাধ্যমে প্রথমেই মন স্থিরের জন্য ধ্যান শিক্ষা অভ্যাস প্রয়োজন । তবে চঞ্চল মনকে বিশ্রাম দেওয়া সম্ভব । মন আমার কথা শুনতে বাধ্য । যদি বাধ্য হতে না চায় তবে বন্ধ করে তুলাই বুদ্ধিমানের কাজ । কারণ প্রকৃত বন্ধুত্ব কেউ কাউকে বঞ্চিত করে না । বরং আপন করাই তার স্বভাব ।

আর তক্ষুনি আন্তরাত্মিক বা আধ্যাত্মি শিক্ষা- সম্ভব হয়ে উঠে । মনকে যত গভীরে পাঠাতে চাই ততদুর সে যেতে সক্ষম । তখনেই আমাদের মাঝে থেকে সে নিস্তব্ধতার আলো প্রকাশ হয়ে নুতন নুতন সামর্থ্যের সম্ভাবনা দেহ মন প্রাণে জাগিয়ে দেয় । এই শিক্ষা শক্তির নামই হল- আন্তরাত্মিক স্থিতধী শক্তি, অনন্ত শিক্ষা শক্তি । এটি আমাদের ভিতর সুপ্ত হয়ে আছে, তাকে জাগিয়ে তুলতে হবে । এই শিক্ষাই হল মানব জীবনের যথার্থ শিক্ষা ।

ঋষি অরবিন্দদেব তাঁর এই শিক্ষা নীতিকে শুধুই উপদেশ দিয়ে শেষ না করে- বাস্তব জীবনে যাতে এটিকে সুপ্রতিষ্ঠা দান করা যায় তার জন্য এমন একটি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুললেন যা অন্যান্য স্কুল হতে সেটি ব্যতিক্রম । এই স্কুলের পড়াশুনা, নিয়মকানুন, সব আলাদা । এখানে দেশ-বিদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনা করে । এই আন্তর্জাতিক স্কুলে কোন পরীক্ষার বালাই নাই । বর্তমানে এই শিক্ষাকেন্দ্রে প্রায় দেড়শত পূর্ণ ও আংশিক সময়ের শিক্ষক ও সাড়ে চারশত ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে । নার্সারী থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত পড়ার সুযোগ রয়েছে। পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত মানবিক(Humanities), ভাষাশিক্ষা(Languages), চারুকলা(Fine Arts), বিজ্ঞান(Science), প্রযুক্তিবিদ্যা(Technology), ইঞ্জিনিয়ারিং(Engineering), হাতের কাজ ও কারিগরী শিক্ষা(Vocationat Training), শিক্ষার সুবিধার জন্য রয়েছে গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, কর্মশালা ও নৃত্যগীত, খেলাধুলা ও চিত্রাঙ্কনের জন্য থিয়েটার ও স্টুডিও সবকিছুর বন্দোবস্ত রয়েছে। শুধু

মানসিক প্রশিক্ষণেই নয়, শিশুর সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও বিকাশের জন্যই বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয় এখানে। একারণেই এখানে শারীরিক শিক্ষার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এই শিক্ষাকেন্দ্র হতে কোন ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা দেওয়া হয় না। যারা জ্ঞানের শিক্ষা সমাপন করে তাদেরকে বাইরে স্নাতক বলে গণ্য করা হয়। এখান থেকে দুই হাজারেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা শেষে ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে, যার গতিধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং যুক্ত হয়েছে নানা কর্মকান্ডে। তারা এই আশ্রমের ধর্মভিত্তিক, কর্মভিত্তিক, যোগধ্যানভিত্তিক, আত্মকর্মক্ষম মূলক বিদ্যা লাভ করে নিজে শিক্ষক হয়ে শিক্ষা দান করছে। প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তোলার অঙ্গিকার ও শপথ নিয়েছে। এখানে পাঠ্যবিষয়ে বিশেষ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এই শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্দেশ্য একটি নুতন জাতি গঠন করা। এই শিক্ষাকেন্দ্র হতে শিক্ষার্থীরা শিখতে পারবে– মানুষে-মানুষে, দেশে-দেশে, কোন জাতির ভেদ থাকবে না, সব মানবজাতি এক, ভাই-ভাই। অরবিন্দ আশ্রম থেকে ৮ কি.মি দূরে এই শিক্ষাকেন্দ্রটি তৈরী করা হয়েছে। এখান থেকে বর্তমানে ১২৪টি দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা এই শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষালাভ করে এই আশ্রম অরোভিলে বা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত এই ঊষানগরীতে– তাদের জীবনশিক্ষা ও পরীক্ষা প্রয়োগ করে জীবনের সিদ্ধান্ত বেছে নিচ্ছে। এই অরোভিল নামক অরবিন্দ নগরীতে ৫০,০০০ মানুষ এসে পাশাপাশি বাস করবে ভাইয়ের মতন করে। এই নগরীতে এই শিক্ষাকেন্দ্র গঠিত ছাত্রগুলির মধ্যে কোন হিংসা দ্বেষ থাকবে না, নিজস্ব কোন সম্পত্তি থাকবে না, থাকবে শুধু প্রেম, আনন্দ, ও ভগবানের সেবায় উৎসর্গীত জীবন।

শ্রীমা বলেছেন, ‘‘অরোভিলেই বিরাজ করবে শান্তি সামঞ্জস্য, মানুষের যুদ্ধ লিপ্সা নিযুক্ত হবে একমাত্র তার দূঃখ দৈন্য কষ্ট জয় করতে, তার অজ্ঞান দুর্বলতা অতিক্রম করতে। তার সংকীর্ণতা অক্ষমতা জয় করতে.... ।’’[৮]

অরবিন্দ আশা করেন তাঁর এই শিক্ষা চিন্তা অচিরেই জগতে বিরাট পরিবর্তন আনবে। সেদিনেই ভারতবাসী তার দূরদর্শিতা প্রমাণ পাবে। তাঁর সাধনার সিদ্ধি এই মাটির পৃথিবীতে উর্দ্ধলোক হতে এক জ্যোতির্ময় সত্তার আলো বিচ্ছুরিত হয়ে সমগ্র জগতকে নুতন করে সাজিয়ে তুলবে– অমরত্বের এক নবস্পর্শ দান করে।

৮। নীরদবরণ, **শ্রীঅরবিন্দায়ণ,** কলকাতা: শ্রীঅরবিন্দ পাঠ মন্দির, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৮, পৃ.,৯৩

তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন ইতিমধ্যে তার কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে। তিনি এই রূপান্তর ভগবানের কাছ থেকে এই মাটির পৃথিবীতে নিয়ে আসবেনই, এই ছিল তার প্রতিজ্ঞা। বর্তমানে তাঁর অনুসারিগণ সবাই এই প্রতিজ্ঞায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

৫.৪: শ্রী নিগমানন্দের শিক্ষা

স্বামী নিগমানন্দের শিক্ষা চিন্তার গ্রহণযোগ্যতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, শিক্ষা বিষয়ক চিন্তা চেতনার মূল আদর্শ হলো, শিশুদের দৈহিক, মানসিক এবং আত্মিক বিকাশ। বর্তমানে এর অবমূল্যায়ণ করে বরং সেই তুলনায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তির প্রখরতার উৎকর্ষ বৃদ্ধি দ্বারা অর্থ ও নাম যশের সম্মানীয় ব্যক্তি হিসেবে সমাজে কিভাবে সুপরিচিতি লাভ করা যায় এবং বুদ্ধির বদৌলতে জীবনে নুতন কোন একটিকে তাৎক্ষণিক দেখিয়ে চমক লাগিয়ে দেওয়া যায়, অর্থোপার্জনে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা যায়, এক্ষুনি শিক্ষার মূল মর্ম বলে এটাই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বেশি। কিন্তু নিগমানন্দের শিক্ষার মূলে হল–

সর্বপ্রথম চরিত্র গঠন, অতঃপর দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক এবং নৈতিকতার প্রসার লাভ ঘটা, শেষে চেয়েছেন, 'সৎ শিক্ষার বিস্তার', এবং 'আপামর জনসাধারনকে শিক্ষিত করে তোলা'। এর মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর জীবনের উন্নয়ন। যেহেতু গড়া মজবুত না হলে সৎ বুদ্ধি অসৎ কাজে জড়িয়ে পড়ে দেশ জাতির উপকারের চেয়ে ধ্বংস বয়ে নিয়ে আসে বেশি, এই বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ আছে বলে আমার জানা নেই।

বর্তমান পৃথিবী প্রতি মুহূর্তে তার প্রমাণ দিয়ে জানাচ্ছে– কিভাবে আজ অশিক্ষা ও কুশিক্ষার প্রভাবে প্রখর বুদ্ধিমান শিক্ষার্থীরা এবং কি- যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মানুষ গড়ার কারিগর অথচ সেখান থেকেও এই সকল উচ্চ ডিগ্রীধারী শিক্ষার্থীরা বের হয়ে যারা নাকি দেশ জাতির ভবিষ্যত কর্ণধার হবে আজ তারাই মানবের কল্যাণ কাজে না লেগে বরং মানবের জীবনের ঝুঁকিকে বাজি করে ভালবাসা নয়, ভয় হয়ে শাসাচ্ছে। ভয় ছাড়া পৃথিবীর মানুষ আজ দেখছে ও ভাবছে বর্তমান শিক্ষার গৌরব কত মহান ও কত আদর্শ পূর্ণ? দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজ এর প্রতিরোধ কল্পে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে; সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মিটিং মিছিল করছে।

এতেই প্রমাণিত হয়না কি বর্তমান সময়ে শ্রীনিগমানন্দের শিক্ষা চিন্তার গ্রহণযোগ্যতা কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং দেশ জাতির উন্নয়নের সহায়ক। মানুষ হয়ে যদি মানুষের মনুষ্যত্বই না জাগ্রত হলো তবে এই শিক্ষা প্রতিযোগিতার কোন মূল্য থাকে কি? স্বামী নিগমানন্দজী একারণেই অবগত করালেন,

"ছাত্রজীবনেই সৎ শিক্ষার একমাত্র ব্রত ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা জীবন। ভারতে প্রাচীন উন্নতির ও পূনরুত্থানের এই একমাত্র বীজমন্ত্র। এই অমূল্য ছাত্রজীবনে ছাত্রগণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত (নীতি, বিবেক ও বল) হারাইয়া অশিক্ষায়, কুশিক্ষায় আজ শক্তিহীন, দুর্বল ও ভয়ঙ্কর হইয়া পড়িয়াছে।"[৯] অর্থাৎ আমরা ধর্মজীবন ও শিক্ষাজীবনকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলেছি এবং এদের কারও সঙ্গে যে কোন কারও সম্পর্ক নেই এই ভেবে ধর্মকে আজকাল শিক্ষার পরিপন্থি বলে গ্রহণ করেছি। এর মূলে হল পিতা-মাতা, অভিভাবক, ছাত্র-শিক্ষক এবং জাতীয় শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহই সম্পূর্ণ দায়ী বলেই আমি মনে করি। স্বামী নিগমানন্দজীর মতে যতদিন না শিশুদের নীতি শিক্ষা গ্রন্থ যেমন– পূর্বের 'বাল্যশিক্ষা', 'বোধোদয়', মদনমোহনের 'শিশুশিক্ষা', ঈশ্বরচন্দ্রের 'হিতোপদেশ', যিনি আঠারো বছর ধরে ১৮৫৫ থেকে ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নবযুগে বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক নির্ণয় করে গেছেন। রামমোহন রায় শিক্ষার নব দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন, কিন্তু রাজনীতিবিদ ও নব্য শিক্ষাবিদদের নিকট আধুনিক শিক্ষানীতির প্রবল হাওয়ার আকর্ষণে সব ধূলিস্যাৎ করে ডিরোজিওর শিক্ষানীতি দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বসল। ধ্বংস হলো ভারতের প্রাচীন চিন্তা চেতনার যে অমৃত ফল; যা এক কালে ভারতবাসীকে তার জাতীয় কৃষ্টি সভ্যতা ও ঐতিহ্যকে মহিমান্বিত করে রেখেছিল। এর প্রমাণ মিলে কবি শ্রেষ্ঠ মধূসূদন দত্তের স্বীকারোক্তিতে।

৯। স্বামী নিগমানন্দ, **ব্রহ্মচর্য্য সাধন**, কলকাতাঃ আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, ১৯শ সংস্করণ, ১৪০৭, পৃ., ৫

'পরধনলোভে মত্ত করিনু ভ্রমন

পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি,

কাটাইনু বহুদিন সুখ পরি হরি

অনিদ্রায় অনাহারে সঁপি কায়-মনঃ

মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি।'

ভারতের জাতীয় সম্পদ হল বেদ বেদান্তমূলক শিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। এবং ধর্মকে শিক্ষার অঙ্গভুক্ত করা। নুতন পুরাতন নিয়ে বর্তমান পৃথিবীকে আজ বহুল আলোচিত ও প্রচারিত। কিন্তু ভারতের জাতীয় সম্পদ বেদ-বেদান্ত বলে যা চিরপ্রমাণিত, যার ক্ষয় নাই, যা সবসময় অপরিবর্তনীয়, সেটি কোনদিন নুতন-পুরাতনের রূপ ধরে না। চিরকালের তরে নূতন। অতি পুরাতনের পরেও নুতন। যেহেতু অবিনশ্বরের ক্ষয় কোনদিন সম্ভব নয়। বরং সেটি নূতন নূতন ভাবে এককে সময় নূতনরূপে– রূপ বদলিয়ে তার চির নবীন ও নূতনত্বের জীবনন্তার প্রমাণ জানায়– এই মাত্র এর বেশি নয়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত ব্যক্তিগণ তাদের উদ্ভাবিত শিক্ষানীতির উদ্ভাবিত মত পথগুলিকে– স্বার্থ সংরক্ষণে কোন ক্ষতি হবে না, এমন ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করে তুলেছিলেন বলেই নূতন প্রজন্মের শিক্ষার্থী আমরা তাদের মতদানগুলিকে সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছি। প্রাচীনকালে বালকদের ব্রহ্মচর্য্যই ছিল শিক্ষার মূল ভিত্তি। সেটি দশ হাজার বছর পরে আজও প্রাণবন্ত। বালকদের ব্রহ্মচর্য্যই হল শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য। বর্তমান পরিবর্তনশীল, নিত্য নূতন পদ্ধতিতে বিদ্যাদান শিক্ষা বারবার পরিবর্তন হয়ে চলছে। স্থায়ীভাবে সুনির্দিষ্ট কোন আলোকোজ্জ্বল পথ দেখাতে পারছে না। স্বামী নিগমানন্দজীর শিক্ষা পদ্ধতি এ যুগের মানুষের নিকট অচল হলেও, বর্তমান কালের নুতনত্ব কোন দেখতে না পেলেও তাঁর স্বরচিত শিক্ষা পুস্তক ' ব্রহ্মচর্য্য সাধন' পুস্তকটি আজ পর্যন্ত বিংশ সংস্করণে লক্ষ লক্ষ পুস্তকে প্রচারিত ও উন্নীত হয়ে পৃথিবীর অধিকাংশ মানবের হৃদয় স্পর্শ করে বসে আছে। আজ পর্যন্ত কেউ তাঁর শিক্ষানীতিকে অনুপযোগী বলে উপেক্ষা করতে পারেনি।

নিগমানন্দজীর সাধন লব্ধ বহু পরীক্ষিত এই পুস্তকটি মোটেই অবহেলার যোগ্য নয়। অতীত যুগের ক্রান্তদর্শী ঋষিগণের মঙ্গলাশীর্বাদ– স্বরূপ হিন্দু সমাজের ভাবি ভরসাস্থল সুকুমারমতি কুমার ও যুবকগণের করে তিনি তাঁর এই গবেষণা লব্ধ শিক্ষা পুস্তকটি দান করে প্রমাণ করেছেন যে, আমরা যত শিক্ষানীতি ও পাঠ্যসূচি পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করি না কেন, তাঁর শিক্ষানীতির পরিবর্তন হয়নি, হবে না। ভারতে এই পুস্তকের আদলে তাঁরই প্রাণপ্রিয় সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী চিদানন্দজী 'ব্রহ্মচর্য্য-প্রসঙ্গ' নামে যে পুস্তকটি রচনা করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার তা জাতীয় করণ করে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার্থীদের তা পাঠ্যপুস্তক বলে সিলেবাসভূক্ত করেছেন।

দেশে আজ ধর্মের নামে যে বিষম অধর্মের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, অশিক্ষা কুশিক্ষায় মানব জীবন পর্যুদস্ত হচ্ছে, শিক্ষাকে নীতি ধর্মহীন বলে বর্তমান শিক্ষাবিদগণ উপেক্ষা অবজ্ঞা সনাতন পরীক্ষিত শিক্ষা পদ্ধতিকে যতই তুলনা করে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করুক না কেন এই ত্রিকালদর্শীর চিন্তা চেতনা কোনদিন উপেক্ষিত হবে না। পরমহংস শ্রী নিগমানন্দজী বলেন, "শিক্ষা হল অন্তর্নিহিত বিদ্যা। তুমি যেকোন বিদ্যা লাভ করিতে চাহ না কেন, বীর্য ধারণ করিতে না পারিলে কোন বিষয়েই কৃতকার্য হইতে পারিবে না।"[১০]

খাদ্য বিষয়ে শিক্ষার তুলনা করতে গিয়ে বর্তমান যুগে 'নানা মুনির নানা মত'। কিন্তু পরমহংস নিগমানন্দজী তাঁর শিক্ষা পুস্তকে উল্লেখ করেছেন, " সাত্ত্বিক আহারের অশেষ গুণ, পৌরাণিক যুগে তাহার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। আতপ তন্ডুল ও কাঁচা কলা খাইয়াই জ্ঞান গরিষ্ঠ ঋষি শ্রেষ্ঠ বশিষ্ট, ব্যাস, পতঞ্জলি, জৈমিনী প্রভৃতি মহাত্মারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান লোকে ভারতবর্ষ আলোকিত করিয়াছিলেন।"[১১]

শিক্ষাকে স্বামী নিগমানন্দ তাঁর রচিত ছাত্রদের জন্য 'ব্রহ্মচর্য্য সাধন' পুস্তকে ছাত্রদের প্রতি ঋষি প্রণীত প্রাচীন শিক্ষানীতিকেই সমর্থন দান করেছেন বেশি– এই কারণে যে, তিনি শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের জীবন গঠনের জন্য তাঁর রচিত শিক্ষা পুস্তক 'ব্রহ্মচর্য্য সাধন' নামক পুস্তকে তিনটি অধ্যায়ে মানব জীবন শুরুর বর্তমান অবস্থা থেকে আরম্ভ করে বার্ধক্য কাল পর্যন্ত যা যা প্রয়োজন, সব তুলে ধরে যে অনুচ্ছেদগুলির মাধ্যমে বিস্তারিত

১০। ঐ, পৃ., ৭
১১। পূর্বোক্ত, সত্যচৈতন্য ও শক্তি চৈতন্য, **উপদেশামৃত**, পৃ., ১৪৬

বর্ণনা দান করেছেন এবং আরোগ্যের জন্য চিকিৎসা বিধান ব্যবস্থা পর্যন্ত প্রদান করে গেছেন– তাতে এই প্রমাণিত হয় যে, তিনি ছিলেন একমাত্র প্রকৃত শিক্ষক। যিনি শুধু উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি। প্রতিকারের ব্যবস্থাও করে গেছেন। কি উপায়ে শিক্ষা লাভ হবে তারও উপায় তাঁর রচিত পুস্তকে উল্লেখ করে গেছেন। নষ্ট জীবন কিভাবে পুনরুদ্ধার হবে তারও উপায় বলে গেছেন।

চতুরাশ্রমের অন্তর্ভূক্ত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম। শিক্ষাকালকে তিনি বিশেষ মূল্যদান করে গেছেন। 'ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ' (পাতঞ্জল দর্শন)। অর্থাৎ জীবনের প্রথম ২৫ বছর শিক্ষাকালরূপ ব্রহ্মচর্য্য জীবনটি গঠিত করতে হবে একমাত্র বীর্যধারণ করে। বীর্যই শক্তি, বীর্যই প্রাণ, বীর্যই বল, বীর্যরূপ বিন্দুই হল ব্রহ্ম। শাস্ত্রে এজন্য বীর্যকে ওজঃ ধাতু বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব শিক্ষাকালে কোনক্রমে এই ওজঃ ধাতুরূপ বিন্দুকে বিচলিত করা যাবে না। স্বামী নিগমানন্দজী শিক্ষার্থীদের ওপর এই বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। মানুষ যদি সত্যিকার মানুষ হতে চায় তবে এই বীর্য রক্ষা দ্বারাই তার মনুষ্যত্ব জাগ্রত হবে। নিগমানন্দ তাঁর বাণীতেও সে কথাই উল্লেখ করেছেন, " আমি অন্য কোন আন্দোলন বুঝি না, চাই শুধু শিক্ষার প্রসার। আপামর জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোল, শিক্ষাই মনুষ্যত্ব জাগাবে।"[১২]

সর্বসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা যেমন মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য নচেৎ দেশ জাতি অধঃপাতে যাবে। কারণ শিক্ষার প্রসার ছাড়া মানুষের উন্নতি হওয়ার কোন সুযোগ নেই, অনুরূপ বীর্য ধারণ ছাড়া শিক্ষাকালে এই শিক্ষারও কোন বিকল্প নেই। অতএব আপামর জনসাধারণকে অর্থাৎ যারা শিক্ষার্থী তাদেরকে শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষা সহযোগীবৃন্দ সবাই মিলে মনুষ্যত্বরূপ বীর্যবান ও বলশালী করে গড়ে তুলতে হবে।

১২। ঐ, পৃ., ১৫২

অদ্যাবধি আমি বিবেকানন্দ, অরবিন্দ এবং নিগমানন্দজীর শিক্ষা নিয়ে শিক্ষা বিষয়ক তাঁদের ব্যক্তিগত মতামতগুলি পর্যালোচনা করেছি এবং সার বিষয়গুলি সংক্ষেপে তুলে ধরেছি। এক্ষণে আমি তাঁদের শিক্ষা বিষয়ক তুলনামূলক আলোচনাগুলি তুলে ধরব।

৫.৫: তুলনামূলক আলোচনা

বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও নিগমানন্দজীর শিক্ষা বিষয়ক আলোচনাগুলি আমি সংখ্যানুক্রমিক আলোচনা করতে চাই। তাতেই আলোচনার সুবিধা বেশি। কারণ তুলনামুলক আলোচনা করা বড় শক্ত বিষয়। বিশেষ করে যারা সত্যলাভকারী মহামানব তাঁদের চিন্তা চেতনা প্রায় কমবেশি একই পর্যায়ের। এছাড়াও যুগের প্রয়োজনে এরাঁ পৃথিবীতে নেমে আসেন, মানব জীবনে মৌলিক অধিকার যেহেতু অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বাসস্থান তখন এই আলোচনাগুলি এই লক্ষ্যে প্রত্যেক মহামানবকেই কিছু না কিছু আলোচনা করতে হয়েই। আরও যেমন তাঁদের সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় এবং দেশ জাতি পরিবার ও সমাজ সবকিছুকে লক্ষ্য করেই উত্তরণের জন্য এঁদের নির্দেশনা দান করতে হয়। প্রয়োজনে ধর্ম বর্ণ জাতি সমাজের প্রতি প্রত্যেকের উন্নয়নের প্রথম ধাপ যে শিক্ষা নামক সবচেয়ে বড় সমস্যা এ বিষয়ে সবাইকে পরিবেশ পরিস্থিতি অনুপাতে সেই সকল সমাজের কুসংস্কারগুলি সময়মত দূর করে সংস্কার করতে হয়। বেশিরভাগই এই আদর্শ পুরুষদের দর্শনগুলি যদিও অভিন্ন ও সাদৃশ্যমূলক তবুও বৈসাদৃশ্য থাকবেই। প্রত্যেকের জীবন দর্শনগুলি সবার জন্যই যে এক রকম হবে এমন নয়। তুলনা থাকবেই। আর এই তুলনা না থাকলে তাঁদের জীবন দর্শনের কোন বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ পাবে না।

৫.৬: বিবেকানন্দজীর তুলনামূলক শিক্ষার আলোচনা

প্রথমত: স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার সাথে অরবিন্দের ও নিগমানন্দের শিক্ষা চিন্তার যথেষ্ট মত পার্থক্য আছে। ভাবভেদে খুঁজে না পেলেও কার্যভেদে প্রচুর প্রভেদ আছে। স্বামীজি চেয়েছেন সমগ্র ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করতে। তিনি চান না ভারতবাসী উন্নতিশীল এই উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিকতা থেকে

অন্ধকারের কুপমন্ডুকে আবদ্ধ থাকুক। ভারতবাসীগণ যদি শিক্ষায় দীক্ষায় উন্নীত না হন তবে ভারতবাসীকে চিরকাল পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে হবে। স্বাধীনতার স্বাধীকারের আলো দেখতে পাবে না।

দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষে সবথেকে বড় সমস্যা ধর্মে– বিভিন্ন জাতি, বর্ণ সম্প্রদায়ভিত্তিক মতে । যা সাম্প্রদায়িকতায় রূপ নিয়ে সমাজে ধর্ম অর্থ যে– শান্তি; এর নামে অশান্তি সৃষ্টি করে আত্মকলহে নিমজ্জিত হয়ে পড়ছে। এই ভাবে জাতীয় ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ায় জাতিচ্যুত হয়ে তারা ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হচ্ছে। অনেক হিন্দু স্বার্থের লোভে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম ও খ্রিস্টান হচ্ছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ গীতায় যদিও স্পষ্ট বলা আছে– " স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম ভয়াবহঃ"। নিজের ধর্মে মৃত্যুও ভালো তবুও পরের ধর্ম গ্রহণ অনুচিত বা ভীষণ পাপ। তবুও স্বার্থ সবল, ধর্ম দুর্বল। সনাতন ধর্ম এবং কি পৃথিবীর অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ধর্মগুলি সবাই বারবার বলেছেন, কারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করিও না। এছাড়াও যেহেতু ঈশ্বর এক অনাদি অদ্বৈত। তাঁকে সবার ধারণ করার নামই হল ধর্ম। ধর্মের অপর অর্থ যখন সত্য, শিব ও সুন্দর, তখন ধর্মান্তর কিভাবে সম্ভব? হিন্দু মুসলিম, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ ইত্যাদি এগুলি ধর্ম নয়, এগুলি এক একটি মত পথ। স্বামীজি বিশ্ব ধর্ম সভায় এই সত্যটি উদ্‌ঘাটন করে বিশ্ববাসীর ভুল ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। এরপরেও ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা কেন? এর মূল কারণটি স্বামীজি দৃঢ় স্বরে বলেছেন, ভারতবাসীগণ শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত বিরাগ। তারা না পড়ছে নিজেদের বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত। না পড়ছে সংস্কৃত, ইংরেজি, ফারসি ইত্যাদি ভাষা। এবং না শিখছে অন্যান্য জাতি সম্প্রদায়ের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন ও ইতিহাস। এই আধুনিক যুগেও ১৩০ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে এখনও এমন কিছু প্রদেশে এমন কিছু সম্প্রদায় বা মতপথের অধিকারী আছে যারা শিক্ষার অভাবে এখনও আদিম যুগের মত বসবাস করছে। শিক্ষার অসম্প্রসারনের জন্যই আজও ভারতবাসীর অগ্রযাত্রা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের থেকে এখনো অনেক পিছিয়ে।

তৃতীয়তঃ নারী শিক্ষা ভারতবাসীদের মধ্যে বাধ্যতামূলক ছিল না বলেই ভারতের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। তাদের কোন ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিল না। দেশ জাতির উন্নয়নে তারাও যে সম-অধিকারী, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ভারতবাসী– তাদের মেধাকে রান্নাঘরে এবং স্বামী ও পরিবারের সেবায়

আবদ্ধ করে রেখেছিল। স্বামীজির নারীমুক্তি আন্দোলন এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি একমাত্র মনীষী যিনি প্রথম নারীদের ধর্মে কর্মে সমাজ সেবা ও রাষ্ট্র পরিচালনা ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্রতী করতে বদ্ধ পরিকর ছিলেন।

চতুর্থতঃ স্বামীজি ভারতবাসীকে একটি নুতন শিক্ষা দান করে গেছেন যা অতীতে তার মত এই পৃথিবীতে কেউ ছড়িয়ে দিতে পারেননি। তা হল জীব সেবা শিক্ষা। বিশ্ববাসীকে এর জন্য একটি অমূল্য বাণী দান করেছেন, “জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর”। এটি যেমন ব্যবহারিকভাবে বা কার্যতঃ সত্য আবার ভাবভেদে বা ধর্মক্ষেত্রেও এই শিক্ষাটি সত্য। ভালবাসার শিক্ষাই হল পৃথিবীর জন্য আজও একটি অন্যতম শিক্ষা। ভালবাসতে না পারলে কোন শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা হবে না। যা কিছুই জানতে ও শিখতে চাই তার মূলে থাকা চাই– সেই বস্তুটির প্রতি আন্তরিকতা বা ভালবাসা। শিক্ষার মূলে হল প্রাণভরে যে বিষয়টিকে জানতে চাই, সেটিকে জানার জন্য আপন অন্তরে স্থান দেওয়া। আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করা।

পঞ্চমতঃ স্বামীজির মতে প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মানুষ গড়া। অতএব প্রকৃত শিক্ষা কখনোই তথ্যভিত্তিক হতে পারে না। কারণ এ ধরণের শিক্ষা শুধু তোতা পাখিরই সৃষ্টি করে। ক্রমে তাদের যন্ত্রবৎ চালিত করে। এ শিক্ষা বড়জোর কেরাণীকুল সৃষ্টিকার্যে সার্থক হতে পারে। কোন মহৎ কল্যাণকর কার্যে সমর্থ নয়। গ্রীকদেরও আদর্শ ছিল–সুন্দর দেহাভ্যন্তরে একটি সুন্দর মন। স্বামীজি যোগ করলেন সেখানে আত্মা নামক একটি বস্তুকে। স্বামীজির মতে আত্মোপলব্ধি হল শিক্ষা মূল। সাধারণের পক্ষে যেহেতু এ শিক্ষা কঠিন, তাই সর্বসাধারণের জন্য চাই মনের বলিষ্ঠতা গঠনে আত্মার উদ্বোধনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান। স্বামীজি এই শিক্ষাকেই বলেছেন মানুষ গড়ার শিক্ষা। বিবেকানন্দজী মনে করতেন এই ভাবে মানুষ গড়ে উঠলে তার মধ্যেই সমাজ শিক্ষা চেতনার দানা বাঁধতে বাধ্য।

ষষ্ঠতঃ স্বামীজি এছাড়াও শিক্ষার জন্য প্রত্যাশা জ্ঞাপন করেছেন, মাতৃভাষা শিক্ষাকে। এছাড়াও ধর্ম, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিদ্যা, কালোত্তীর্ণ প্রাচীন সাহিত্যের চর্চা, পাশ্চাত্য জ্ঞান লাভের জন্য পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষা। আরও

চাইতেন– কান্তিবিদ্যা, চারুকলা ও উপযোগবাদের সমন্বয়, যার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের উন্নয়ন পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় ছন্দ সৃষ্টি করা । শিক্ষার জন্য শরীর

চর্চার প্রতিও তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন । ব্রহ্মচর্য্যও যে শিক্ষার মূল তাও উপেক্ষা করেননি । তাঁর বাণীতেই এর প্রমাণ পাই । যথা–

"শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যাপক ও ফলদায়ী করে তোলবার জন্য মৌল উপাদানের পরিপূরক হিসেবে অন্যান্য উপকরণ অবশ্য প্রয়োজন এ হল অন্যতম আপেক্ষিকতার সমস্যা । ভারতের পক্ষে যা প্রয়োজন তা হল বেদান্ত ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমন্বয় । মূল প্রেরণার জন্য ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা এবং আত্মবিশ্বাস । "[১৩]

শিক্ষা সম্পর্কে স্বামীজি আরও অনেক খুঁটিনাটি তথ্য ও তত্ত্ব দান করেছেন । তবে যে বিষয়গুলি বিশেষভাবে আলোচ্যপূর্ণ এখানে সেগুলিই তুলে ধরা হল । মানব জাতির শিক্ষার জন্য আমার জানা মতে আর এমন কোন অতিরিক্ত তথ্য আছে বলে আমার মনে আসে না, যা তিনি আমাদের জন্য উপহার স্বরূপ প্রদান করেননি ।

৫.৭: অরবিন্দজীর তুলনামূলক শিক্ষার আলোচনা

প্রথমত: শ্রীঅরবিন্দজী ছিলেন স্বশিক্ষিত হিসেবে একজন পূর্ণ সুশিক্ষিত মহাজন ব্যক্তিত্ব । তিনি স্বামীজির মত জাতীয় সভ্যতার আদর্শ মতে শিক্ষা গ্রহণ করেন নাই । তিনি প্রথম থেকেই পাশ্চাত্য সভ্যতায় অত্যাধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন । বাল্য হতে যৌবনের পূর্ণ বয়সকাল পর্যন্ত তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষালাভ করে পৃথিবীর বহু ভাষা শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি শিক্ষালাভ করেন । তিনি ছিলেন ভারতীয় সাধুদের মধ্যে অন্যতম জ্ঞানী গুণী ও শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব । ভারতবর্ষের মাটিতে বড় না হলেও তাঁর জীবনের ব্যতিক্রম ছিল এখানেই যে, তিনি জন্মভূমি স্বদেশকে কোনদিন ভুলে যাননি ।

---

[১৩] । পূর্বোক্ত, K. C. Lahiri, The Complete Works of Swami Vivekananda, P.,130

ভারতের জাতীয় শিক্ষা হল ধর্ম। ধর্মের প্রকৃত তত্ত্বগুলি রচিত আছে সংস্কৃত ভাষায়। জীবনের প্রথম দিকে স্বদেশ সম্পর্কে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কোন পরিচয় ছিল না তার জন্মভূমির ভাষা শিক্ষা সাহিত্য সম্পর্কে। বয়সের সাথে যখন জ্ঞান বাড়ল তখনেই তিনি প্রস্তুতি নিতে থাকলেন বিদেশ থেকে ভারতভূমিতে চলে আসার। স্বদেশে এসেই মনোযোগ দিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ঋকবেদের প্রতি। অদম্য স্পৃহা নিয়ে শুরু করলেন, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায়। আবিস্কার করলেন বেদ-রহস্য। শিক্ষার সর্বশেষ সম্মানীয় ধাপ আই সি এস পাশ করেও তিনি সরকারি চাকুরী না নিয়ে ত্যাগই যে ভারত ধর্মের মূল মর্ম তা জানার জন্য কোন মতে জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে বরোদায় এক জমিদারের অধীনে একটি প্রাইভেট কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ভারতীয় গুরুদের মত বেশ ভূষা ধারণ, নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ ও কঠোর ব্রক্ষ্মচর্য্য ব্রত পালন ইত্যাদি সকল রকম নিয়ম নীতি ও আদর্শ অনুকরণ করে– বেদ উপনিষদ গীতা স্মৃতি ও পূরাণাদি ইত্যাদি জ্ঞান গর্ভমূলক গভীর শাস্ত্রগুলি রাত-দিন সমভাবে কলেজের শিক্ষকতার পাশাপাশি পাঠ নিতে থাকেন।

দ্বিতীয়তঃ স্বদেশে তখন চলছে পরাধীনতার শৃঙ্খল হতে মুক্তি পেতে স্বাধীনতার আন্দোলন। নিজেকে সপে দিলেন দেশ মাতার স্বাধীকার আদায়ের আন্দোলনে। গোপনে ভারতবাসীকে শিক্ষায় দীক্ষায় জাগ্রত করার জন্য হলেন বদ্ধ পরিকর।

যুদ্ধ শুরু করলেন বিদেশীদের বিরুদ্ধে অসি দিয়ে নয়, মসি দিয়ে। অনেক কয়েকটি পত্রিকার নামহীন সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখে ভারতবাসীর অন্তরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠার জ্ঞানের অগ্নিময় দীপ্তি প্রজ্বলিত করতে জাতিকে জাগ্রত করে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন। যে ভারতবাসী বিলাস ব্যসনে এতদিন মাথা ঢাকা নিয়ে নিজের দেশকে, জাতিকে, সভ্যতাকে, শিক্ষাকে, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে পরের দ্বারে বিলিয়ে দিয়ে গর্ববোধ করেছিলেন, জ্ঞান বুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে আরামে দিন কাটাচ্ছিলেন, কলমের তুলির আচর দিয়ে তিনি তাদের জ্ঞানের উন্মেষ ঘটাতে শুরু করলেন। সমগ্র ভারতবাসীর যত আমলাতান্ত্রিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, শিক্ষিত প্রজাবৃন্দ, রাজা জমিদারবৃন্দ, কেরাণী থেকে উচ্চ পদস্থ কর্মচারীবৃন্দ, শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ, প্রশাসনবৃন্দ, সমাজপতি, ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ অর্থাৎ সমাজের আপামর সর্বসাধারণকে– তাঁর মর্মভেদী

আঘাতপূর্ণ অজস্বী লিখনি দ্বারা ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক সবরকম শিক্ষামূলক প্রবন্ধ রচনা করে– তাদের জাতীয় অভিশাপ থেকে মুক্ত করে তুলতে ভারতবর্ষের গোটা ঘুমন্ত একটি জাতিকে জাগ্রত করতে লাগলেন। এর জন্য ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অভিযুক্ত হলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাণের দাবিতে সম্মান জানাতে এই লক্ষ্যেই বলে উঠেছিলেন, ‘ হে অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার’।

তৃতীয়তঃ ভারতবাসীকে সর্বতোমুখী অশিক্ষা, কুশিক্ষা থেকে মুক্ত করতে তিনি প্রথম জীবনে জাতিকে শিক্ষা দিলেন, কর্ম মাধ্যমে যোগ শিক্ষা, ‘বন্দে মাতরম্’ মন্ত্রকে ভারতবাসীর অন্তর শক্তিরূপে মুখেমুখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া, অর্থ শক্তিকে পূর্ণ জাগরিতকরণ করা, ব্যবসা-বাণিজ্যে ও শিল্পকর্মে এবং আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ জীবন লাভ দান, ভারত স্বাধীনতার সূচনায় উদ্দীপনা, রাজনীতি ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে অরবিন্দের অবদান, মানবপ্রেম, অরোভিল প্রতিষ্ঠা, মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠা, রূপান্তরের সাধনা, সমগ্র ভারতে সংস্কৃতির বিস্তার, শ্রী অরবিন্দ আন্ত র্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র, শারীরিক শিক্ষাপদ্ধতি এবং এরূপ আরো অন্যান্য বহু বিষয়ে তিনি ভারতবাসীকে বিবেকানন্দজীর তুলনায় আরও অনেক বেশি আধুনিকতার মধ্যে অবস্থান করেও শিক্ষায় দীক্ষায় গড়ে তুলেছিলেন।

চতুর্থতঃ শ্রী অরবিন্দ সম্পর্কে ভারতীয় মনীষীগণ অনেক কথা বলেন, তন্মধ্যে শ্রীমা বলেন, বিশ্বের ইতিহাসে শ্রী অরবিন্দের যা তাৎপর্য তা’ কোন শিক্ষা ধারা নয়, এমনকি সত্যের উদ্ভাষণও শুধুমাত্র নয়, সর্বোত্তমেরই তা’ চূড়ান্ত প্রত্যক্ষ এক ক্রিয়া। শ্রী মা তাঁর মর্ম বাণীতে আরও জানান, তিনি যা দিয়ে গেছেন এই পৃথিবীতে আর কেউ তা দিয়ে যাননি। শ্রী অরবিন্দ মতে, শিক্ষা হল মানব সত্ত্বার স্ফুরণ, জীবন হল শিক্ষার মাধ্যম। অতএব জীবনই শিক্ষা। শিক্ষাহীন জীবন যেমন শিক্ষার অঙ্গ হতে পারে না, অনুরূপ জ্ঞানহীন শিক্ষাও জীবনী শক্তি সঞ্চার করতে পারে না। শিক্ষারও অঙ্গভুক্ত হতে পারে না। অতএব জীবন মানেই শিক্ষা আর এই শিক্ষাকে মানব জীবনে কাজে লাগানোই হল জীবন- যুদ্ধের প্রতি শিক্ষা সংগ্রামে ব্রতী হওয়া।

পঞ্চমতঃ শ্রী অরবিন্দ দর্শন চিন্তা চেতনাকে সম্বল করে শ্রীমা তাই শিক্ষাকে ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেন, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। কার্যক্ষেত্রে পুনঃ অভিব্যক্তি প্রকাশ করছে মাত্র। যথা– (১) জীবন-বিজ্ঞান, (২)

শিক্ষা, (৩) শারীরিক শিক্ষা, (৪) প্রাণের শিক্ষা, (৫) মানসিক শিক্ষা, (৬) আন্তরাত্মিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা। শিক্ষার জন্য একজন মানব শিশুর গর্ভে থেকে শুরু হয় শিক্ষার কর্মসূচি। মা হন তখন তার শিক্ষা গুরু। শিশুর ভবিষ্যত তখন সম্পূর্ণ মায়ের উপর নির্ভরশীল। গর্ভে মা যেভাবে গড়ে তুলবেন সন্তান সেই শিক্ষাই লাভ করবে। এরই নাম হল জীবন বিজ্ঞান। জন্মের পর হতে প্রথম শিক্ষাগুরু তার মা। পিতা তার আংশিক। শিক্ষার মূল হল শরীর গঠন। এজন্যই শিশুকাল হতেই মায়ের কর্তব্য হল শিশুর দেহ মনকে শিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তোলা। শিশু যেন মনেপ্রাণে বুঝতে পারে তার প্রাণের উৎসাহ উদ্দীপনা। মন গঠনে তার ভিতরে এখন থেকেই শুরু করতে হবে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি ও শক্তি সঞ্চালন ক্রিয়া। মন যখন দৃঢ় প্রত্যয়ে বিশ্বস্ত হবে তখনেই তার ভিতর এক ইন্দ্রিয়াতীত প্রতিভা উদ্ভাবিত হয়ে উঠবে। বাহ্যক্রিয়াকে অন্তরের অন্তঃস্থলে নিয়ে এসে জাস্টিফাই করার অদম্য স্পৃহা জাগ্রত হবে। অন্তরে বাইরে এক আধ্যাত্মিক আন্তরাত্মিক শক্তি অজান্তে সক্রিয় হয়ে উঠবে। ভিতর বাহির একাকার হওয়ার জন্য অন্তরে এক অহেতুক প্রেরণা জাগ্রত হবে। শ্রী অরবিন্দ এই জাগ্রত শক্তিকেই মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি জীবনের এই রূপান্তরিত আন্তরাত্মিক বিদ্যাকেই মানব জীবনের লক্ষ্য বলে অভিহিত করে গেছেন।

৫.৮: নিগমানন্দজীর তুলনামূলক শিক্ষার আলোচনা

নিগমানন্দজীর শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা উপর্যুক্ত দুই মনীষী থেকে একটু ভিন্নতর। নিগমানন্দজী ব্যবহারিক শিক্ষার চেয়ে আধ্যাত্মিক শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করেছেন বেশি। আধুনিক যুগে জন্মালেও তিনি ছিলেন রক্ষণশীল। প্রাচীনকেই তিনি বর্তমানের চেয়ে গুরুত্ব দিয়ে গেছেন বেশি। তিনি মনে করেন, পুরাতনই নুতনের জাগ্রত শক্তি। পুরাতনকে কেন্দ্র করেই নুতনের জয়যাত্রা।

এই লক্ষ্যে তিনি ভারতীয় ত্রিকালজ্ঞ ঋষি প্রণীত যত শাস্ত্র ও সাধনা যোগ, জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই সার্বভৌম চারিটি পথকেই মানব জীবনে শিক্ষার আদর্শ হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তিনি প্রথম জীবনে নাস্তিক ছিলেন। মৃত্যু নামক এক আশ্চর্য বিভীষিকা এক মুহূর্তে তাঁর জীবনে নিয়ে আসে এক অতি অদ্ভূত চেতনা।

নিম্নে সংখ্যানুক্রমিক তাঁর জীবনের অতি অদ্ভুত চেনা রূপ শিক্ষা প্রেরণাগুলি তুলে ধরলেই বরং বেশি সুন্দর হবে বুঝতে ও বুঝাতে।

প্রথমতঃ ভারত ধর্মে ঋষিগণ মানব জীবনকে চারি আশ্রমের চারিটি বর্গে ও চারি বর্ণে বিভাজিত করে একটি পরিকল্পিত সুন্দর শিক্ষা জীবন দান করে গেছেন। অনেকেই বলবেন এতে নুতনত্বের কোন ছাপ নেই। এই অর্থে নিগমানন্দের শিক্ষা প্রেরণা আমাদের তেমন কোন প্রেরণার সঞ্চার করে না। স্বামী নিগমানন্দ এই প্রাচীন পদ্ধতিকে প্রথম জীবনে পছন্দ করেননি। আমরা জানি তিনি অতি আধুনিক ভারত সাহিত্যের সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের নাতি। প্রথম জীবনে তিনি তাঁর দাদুর শিক্ষা দীক্ষাকে সম্বল করেই জীবনের অগ্রযাত্রা শুরু করেছিলেন। বেশ কয়েকটি উপন্যাস ও নাটক লিখে সাহিত্য পুরস্কারও লাভ করেছিলেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সে ১১ বছর বর্ষীয়া তাঁর স্ত্রীর বিবাহিত জীবনের যে অন্তিম মৃত্যু যবনিকা-অধিকন্তু তিনি ৩ থেকে ৪ বছরের দাম্পত্য জীবনের ব্যবধানেই শেষ হয়ে যায়– তাঁর ব্যবহারিক জীবন যাত্রা। এক মধ্য রাত্রির অকস্মাৎ মৃত্যু পরিণতি তাঁর জীবনে তাঁকে যে এক নুতন শিক্ষা প্রেরণা দ্বারা স্বয়ং বিশ্বনিয়ন্ত্রী প্রকৃতি রূপে অপরূপ এক ভালবাসা দান করে গেলেন এবং পরবর্তীতে যত ঘটনা ঘটে গেল তাঁর জীবনে, তিনি পরবর্তীতে একে একটি সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা বলে প্রকাশ করেন। 'যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি' কবির এই উক্তিটি তাঁর জীবন শিক্ষারই একটি অতুলনীয় দিক। জীবনকে তিনি এজন্যই শিক্ষার একটি প্রধান

অঙ্গ বলে উল্লেখ করেছেন। আমরা কেউ জানি না আমার জীবন শিক্ষা আমাকে কিভাবে শিক্ষা দান করবে। আমরা যা চাই তা প্রায় সময়ই পাই না। অতএব আমাদের চাওয়াও ঠিক না, পাওয়াও তৎক্ষণাৎ তা হয় না।

দ্বিতীয়তঃ তাঁর মৃত স্ত্রীর আত্মা জগৎ জননী রূপে যখন তাঁর সামনে ফুটে উঠলেন তখন তিনি এতদিন যা জেনেছিলেন বুঝেছিলেন এবং ব্যবহারিক শিক্ষাকেই শিক্ষা বলে মানতেন ও জানতেন, এই দিব্য দৃষ্টির পর হতেই সব গেল পাল্টিয়ে। তিনি আশ্বস্ত হলেন অপরা বিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যা, জীবন বিদ্যা। এই গুপ্ত বিদ্যার গুরুই হলেন তাঁর তান্ত্রিক গুরুর ব্যবহারিক শিক্ষার রূপ রসে ভরা বিশ্ব জননীর বিশ্ব শিক্ষা।

তিনি জ্ঞানীগুরুর নিকট যখন জ্ঞান লাভ শিক্ষা করলেন, তখন হল তাঁল আত্মোপলব্দি। চিনলেন নিজেকে অর্থাৎ আমি কে? এই শিক্ষার চেয়ে তাঁর নিকট অধিক আর কোন শিক্ষা বড় বলে মনে হল না। সব অজানা জানা হয়ে গেল। নুতন করে প্রেরণা জাগল– আমি এই চরম ও পরম শিক্ষাকে অন্তরে বাইরে পেতে ও দেখতে চাই। যোগী গুরুর মাধ্যমে তখন দেখলেন, বাহ্য দেহটির মধ্যে নিয়ন্ত্রকরূপে একটি অদ্ভুত আত্মা পরমাত্মার খেলা চলছে। এ একটি এমন শিক্ষা যে নিগমানন্দ বললেন, ' বিশ্বাস করুন, আমি যা দেখছি আমার দেহ ভান্ডে তাই দেখছি বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে।' সব যেন একাকার। অন্যত্র তাঁর আরেকটি নুতন মর্মার্থ প্রকাশ করে জানালেন:

> এখন কেন যেন বিশ্বের সবকিছুকে আমার একান্ত আপন বোধ মনে হচ্ছে, ভালবাসার জন্য প্রাণ ছটফট করছে তাই এই নিখিল বিশ্বটি যেন আমি ও আমার। ভালবাসায় ভলে উঠল আমার সমস্ত দেহ মন ও প্রাণ। কেউ আমার পর নয় সবাই আমার আত্মজ, প্রিয় প্রাণারাম। এই অধরাকে যিনি ধরিয়ে দিলেন আমার প্রেমবোধ জন্মিয়ে তিনি আর কেউ নন, আমার প্রেমিকগুরু গৌরিমা। সেই সময় দিবারাত্রি আমার সমানে চলতে থাকে এক অনুপম অধরা মধুরারতির খেলা। আমি হয়ে গেলাম পুরুষ, আমার মৃতা স্ত্রীর আত্মা হয়ে গেল আমার প্রকৃতিরূপা জায়া।[১৪]

প্রেমিকগুরু গৌরিমা জাগিয়ে দিলেন আমার দেহে এই প্রেমের বন্যা।

তৃতীয়তঃ এই জীবন্ত শিক্ষা তিনি একাকি ভোগ করলেন না; লিখনি মাধ্যমে বিলিয়ে দিলেন সমগ্র জগতে যোগ-সাধনা (যোগী গুরু), জ্ঞান সাধনা (জ্ঞানী গুরু), তন্ত্র সাধনা (তান্ত্রিক গুরু) ও প্রেম সাধনা (প্রেমিক গুরু) এই চার নামে পৃথিবী বিখ্যাত অমূল্য চারিখানি গ্রন্থকে। জীবনের শুরুতে কি করে এই অমূল্য শিক্ষা লাভ করতে হবে তার জন্য লিখলেন জীবন গঠনের প্রথম শিক্ষা– 'ব্রহ্মচর্য্য সাধন' পুস্তক। তিনি নিশ্চিত– এই পুস্তকটির মাধ্যমে যদি কারও জীবন গঠন ও প্রশিক্ষণ মূলক শিক্ষা শুরু হয় তবে পৃথিবী শ্রেষ্ঠ শিক্ষা- তাঁর রচিত যোগ, জ্ঞান, তন্ত্র ও প্রেম, যা পেলে আর কোন অজানা থাকে না তা জানা ও পাওয়া যে হবেই তাতে

১৪। পূর্বোক্ত, স্বামী সত্যানন্দ, **জীবনী ও বাণী**, পৃ.,৩২-৪৫

কোন সন্দেহ নাই। জীবনকে তিনি এজন্যই চারি আশ্রমের ভিত্তি স্বরূপ প্রথম আশ্রম ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমকে জীবন গঠনের জন্য মানব জীবনের শিক্ষার প্রথম ধাপ হিসেবে দৃঢ়তার সাথে ধারণ করার উপদেশ দিয়ে গেছেন। চতুর্থতঃ ব্রহ্মচর্য্য সাধন গ্রন্থটির ব্রহ্মচর্য্য পালনের নিয়মাবলিগুলিকে তিনি নিম্নে– গ্রন্থটিকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করে যথারীতি নিম্ন বর্ণিত অনুচ্ছেদগুলি তুলে ধরেছেন। যথা– প্রথম অধ্যায়ঃ জীবনের বর্তমান অবস্থা, শিক্ষা কি?, প্রাতঃকৃত্য, স্নান বিধি, হোম বিধি। দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ আহার শুদ্ধি, চিত্ত শুদ্ধি, যম সাধন, নিয়ম সাধন, ক্রোধ জয়, পরিকর্ম সাধন, মৃত্যুচিন্তা, তত্ত্ব বিচার, বিন্দু ধারণের উপকারিতা, ব্রহ্মচর্য্যহীনের দুর্গতি, বিশেষ নিয়ম, গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য্য, আসন সাধন, প্রাণায়াম সাধন, মুদ্রা সাধন, উপসংহার। তৃতীয় অধ্যায়ঃ দিন-চর্যা, সদবৃত্তি, ঋতু-চর্যা, যৌগিক প্রক্রিয়া এবং ঔষধ ও চিকিৎসা।

আশা করি অনুচ্ছেদ পর্বগুলি থেকেই সম্যক উপলব্ধি করাতে পারছি– শিক্ষার জন্য একটি খাঁটি জীবন গঠনে কি কি বিষয় শিক্ষার প্রয়োজন। প্রাচীনকালের ঋষিদের শিক্ষা বিষয়ক চিন্তা চেতনাগুলি কত তত্ত্ব সমৃদ্ধ।

নিগমানন্দজীও আধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষাকে সম্মান দান করেছেন। তবে প্রাচীনকে উপেক্ষা করে নয়। তাঁর বাণীতেই আমরা প্রমাণ পাই তিনি তাঁর ইচ্ছাকে কিভাবে বাস্তবায়িত করতে চেয়ে গেছেন। যথা– " আমি চাই ধর্মের মধ্য দিয়ে এই অধঃপতিত জাতিকে উঠিয়ে তুলতে। এদের মধ্যে সেই ঋষি যুগের মহান আদর্শগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে, সেই যুগের ঋষিদের মত মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ দান– আত্মার স্বরূপ জ্ঞান দান করতে।"[১৫]

তিনি বাল্যকালকে শিক্ষার মূল ভিত্তি বলে নির্দেশনা দান করে গেছেন। বাল্যকালের এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমকেই শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলে উল্লেখ করেছেন। বীর্য ধারণই যে শিক্ষার্থীর শিক্ষার ক্ষেত্রে ধী শক্তি, শ্রী শক্তি, মেধা শক্তি ও একাগ্র শক্তি এবং পৃথিবী বিখ্যাত যে শক্তি মনোজয় শক্তি, তা একমাত্র বীর্য ধারণ ক্ষমতা থেকেই লাভ হয়ে থাকে। নিগমানন্দদেব তাঁর শিক্ষা নীতিতে এই শিক্ষারই মূল্যায়ণ দান করেছেন বেশি। 'বীর্য ধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্' বলে শাস্ত্র বাক্যটিও উল্লেখ করেছেন।

১৫। পূর্বোক্ত, অখন্ডানন্দ সরস্বতী, **নিগমানন্দের অমিয় বাণী সম্ভার**, পৃ., ৩১

৫.৯: স্বামী বিবেকানন্দজীর সমাজ সংস্কার

আজ আমাদের দেশ ও জাতি এক ক্রান্তিলগ্নে উপস্থিত। আমরা প্রতি মুহূর্তে দেখছি এক পুরাতন সমাজ তার জীর্ণ প্রতিষ্ঠান সমূহ ও মূল্যবোধ নিয়ে ক্রমবিলীয়মান। তার পরিবর্তে যে নুতন সমাজের রূপ মন্ডল চলছে তা এখনো সর্বাংশে সুষ্ঠু নয়। ইতিহাসের পট পরিবর্তনের এরূপ সন্ধিক্ষণে পরিস্থিতির অনিশ্চয়তার জন্য গণমানুষের বিভ্রান্তি ও অস্থিরতা স্বাভাবিক। সেই জন্য এই আগ্নেয়লগ্নে চিন্তাশীল ব্যক্তি ও মানব কল্যাণে চিন্তায় যারা নিযুক্ত তাঁদের দৃষ্টি খুঁজে ফিরছে সেই ক্রান্তদর্শী ঋষিকে, পুরাতন থেকে নুতনে উত্তরণ ঘটছে যার জীবনে মননে ও চেতনায়। অবশ্য বহু মনীষীর যৌথ মননের ফলশ্রুতিতে নুতন কালের রূপ মন্ডল ঘটে। তবুও যার মধ্যে এই নুতন পূর্ণায়ত হয়ে ওঠে, তাকেই বিশেষভাবে সে নুতন যুগের স্রষ্টা পুরুষ বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। যার মধ্যে এমনি করে একটি সম্পূর্ণ নুতন কাল রূপায়িত হয়ে উঠে, তার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। সেটি হল এই যে, যে সকল মনীষীর মননের যৌথ প্রয়াস নুতন কালের রূপায়ণ ঘটায় তার মধ্যে তাদের চিন্তা রাশির সমন্বয় ঘটতে হবে অর্থাৎ তাকে একটি দুরূহ কাজ করতে হয়, তাকে ঐ সকল বিচিত্র চিন্তার মধ্যে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়। সেখানেই তার প্রতিভার পরিচয় মিলে। সেই সমন্বয় ও সামঞ্জস্য থেকেই পুরাতনের চৌহদ্দি থেকে চিন্তার মুক্তি ঘটে, এবং তারই ফলশ্রুতি নুতনের আবির্ভাব।

বর্তমান সময়ে আমরা নিঃসন্দেহে এই সকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী দেখেই চিন্তানায়ক বিবেকানন্দে। তাঁর চিন্তার গভীরে প্রবেশ করলে এ সত্য সহজেই প্রতিভাত হয়, যেমন হয়েছিল নিবেদিতার প্রজ্ঞা দৃষ্টির সম্মুখে। নিবেদিতার সমীক্ষান্ত সিদ্ধান্তঃ “তাঁর মধ্যে অতীত ভারত ও পৃথিবীর অগণিত গুরু ও ঋষির আধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা ও সিদ্ধির উত্তরাধিকারীকে আমি প্রত্যক্ষ করেছি একদিকে, অপরদিকে দেখেছি তাঁর মধ্যে ভাবি নুতন অভ্যূদয়ের এক প্রবর্তক ঋষিকে।”[১৬]

১৬। Sister Nivedita, **The Master as I Saw him**, Calcutta: Udbadhon Office, 1977, 1st edition, P., 80

বিচার ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নিবেদিতার সিদ্ধান্ত নিছক গুরুভক্তি প্রসূত নয়। এ উক্তি একজন নিপুণ সমাজ বিজ্ঞানীর বিজ্ঞান ও যুক্তি ভিত্তিক প্রজ্ঞা প্রসূত। বিবেকানন্দের এই সমাজ দর্শন এই নুতন কালের সমাজ দর্শন। তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধ্যান ধারণাসহ অন্যান্য অনেক সামাজিক ধারণা এই নুতনকালের। বস্তুত বিবেকানন্দের লক্ষ্য ছিল এক। 'আমূল রূপান্তর', এই রূপান্তরকে রূপ দিতেই তাঁর আবির্ভাব। বিবেকানন্দ তাঁর এই আমূল পরিবর্তনকেই রূপ দিতে চেয়েছেন সমাজ সংস্কার এর মাধ্যমে তার সেখানেই তার এই চিন্তাধারার গুরুত্ব।

সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ নিজেকে সমাজ সংস্কারক বলে ঘোষণা করতে দ্বিধা করেননি, কিন্তু অন্যান্য সমাজ সংস্কারের সঙ্গে তাঁর মূলগত পার্থক্য ছিল। সমাজের বিভিন্ন বিষয় ও অবস্থান নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন, এই আলোচনার মধ্যেই তাঁর সমাজ সংস্কারের রূপটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। নিম্নে আমরা তাঁর সমাজ বিষয়ক বিভিন্ন সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে তাঁর সমাজ সংস্কারের রূপটি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করব।

স্বামী বিবেকানন্দজী প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন ধর্ম দিয়ে ধর্মের সমস্যা সমাধান হবে না। সর্বপ্রথম চাই গণজাগরণ। তাই তিনি দেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে, ভারতবাসীর নাম বিদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য, নিজেকে ভারতবাসীর স্বনামধন্য হওয়ার জন্য, নেতৃত্ব লাভের জন্য– যেহেতু বাঙালিরা বিশ্বাস করে, বিদেশীরা যদি আমাদের কাউকে সম্মান দান করেন তবে আমরা বিশেষভাবে সম্মানিত বোধ করি। তার প্রতি বেশি উৎসাহী ও আগ্রহী হই। তার বাণীকে দেব বাণী ভাবি। এই লক্ষ্যে নিজের দেশের ভাব মূর্তিকে অক্ষুণ্ন রাখার তাগিদে ইউরোপে গমন ও বিশ্ব ধর্ম সভায় বক্তৃতা দান এবং ভারতবাসীর জয়গান পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া ভারতবাসীর নেতৃত্ব লাভ করে স্বদেশে তাঁর ফিরিয়ে আসা, এসব কিছুর পিছনে ছিল যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের হাত। এই লক্ষ্যে সমাজের কালিমা দূর করতে তাঁর আবির্ভাবের পিছনে এই প্রভাবিত শক্তিটি ছিল তাঁর মূলধন।

একজন শূদ্র ধর্ম যাজকের উপদেশ বা কোন কথা সমাজে নাম মাত্র ধর্মের ধ্বজাধারী একচেটিয়া পৌরহিত্যকারী ব্রাহ্মণগণ যারা ধর্ম সম্পর্কে নিজেরাই অনবগত তাদের প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ পাওয়া–

স্বামীজির পক্ষে বেশ কঠিন হত। যদি না তিনি বাঙালির স্বভাব– পরিণত ধর্মের সার্টিফিকেট বিদেশ থেকে না নিয়ে আসতেন। গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে একজন মহামানবকে যে কত যাতনা ও উপায় সহ্য ও পরিকল্পনা করতে হয় তা তিনিই জানেন। ভারত ভুমিতে তাঁর আগমন ও সামান্য সময়ের জন্ম গ্রহণের কারণ ছিল এটি। ভারতে শ্রীরামকৃষ্ণ অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিস্তার করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন বলেই তাঁকে তাঁর মত করে স্বামীজিকে তৈরী করতে এবং শক্তি সঞ্চার করতে হয়েছিল। স্বামীজিকেও সেইভাবে প্রস্তুত হতে হয়েছিল।

ভারতে শ্রীরামকৃষ্ণ 'শিব জ্ঞানে জীব সেবা' এবং স্বামীজি এর রূপান্তরে– 'জীব রূপে শিব সেবা' অথবা 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'। এই নব বেদান্তটি তিনি যদি আজ ব্যাপকভাবে গণ সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রচার না করতেন তবে ভারত আজ সমৃদ্ধশালী হত না। জাতীয় ঐক্য বজায় থাকত না। বর্ণভেদ দূর হয়ে হিন্দুমাত্রই যে এক জাতি, এক ধর্ম, এক ঈশ্বর। স্বামীজির এই মর্মবাণীটি বহুল প্রচার না হত তবে ভারতে ভ্রাতৃত্ব ভাব প্রতিষ্ঠা পেত না। অখন্ড ভারত আজ খন্ড বিখন্ড হয়ে যেত। ধর্মান্তরিত হয়ে অন্য জাতিতে পরিণত হতে হত। সম্প্রদায়গুলি সাম্প্রদায়িকতায় ভরে গিয়ে বর্ণে ধর্মে ও সমাজে বাক বিতন্ডার সৃষ্টি হয়ে– যে ধর্ম আমাদের রক্ষা করে, ধারণ করে, সেই ধর্মই আমাদের ধ্বংস নিয়ে আসত। আমাদের ঐক্যতা বিনষ্ট করে বিদেশীরা এই ভারতকে আক্রমন করতে সুবিধা পেত। ব্রিটিশরা এই পলিসি করেই ভারতের সর্বনাশ আনতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল। ভারত সমাজে যেহেতু ধর্মই একমাত্র এই জাতির সম্বল তখন তারা এই দুর্বলতাটিরই সুযোগটি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু 'ধর্মে রক্ষেতি ধার্মিকঃ' ধর্মের কর্মই যখন ধার্মিককে রক্ষা করা তখন ধর্মগুরু ভারতকে ধ্বংস করবে কেন? যে ভারত ভূমির ধূলি কণায় শত শত অবতার মহাপুরুষের জন্ম, স্বয়ং ভগবান রূপে যখন ভগবান কৃষ্ণের আবির্ভাব, রামের মত প্রজাবাৎসল্য রাজার শুভাগমন, বুদ্ধের মত জীবদরদী কর্মীর আবির্ভাব, এই এশিয়া মহাদেশেই প্রেমের প্রতীক ভগবান যিশুর জন্ম, প্রেমাবতার শ্রী চৈতন্যের আবির্ভাব, জাতীয় ঐক্যবাদী বেদান্তের অনুগামী ও মহাম্মদ সবাই এসছেন এই এশিয়াকে সমৃদ্ধশালী করতে, তখন আমাদের ভয় কোথায়? নানা দিক বিবেচনা করে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, স্বামীজি আমাদের জন্য একজন একনিষ্ঠ সমাজ সংস্কারক। তাঁর চিন্তা চেতনা– পরিব্রাজক

অবস্থায় বিভিন্ন প্রদেশ দেশ পরিভ্রমন করে তিনি যে বিভিন্ন সামাজিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়পূর্বক ভারতবাসীকে যে একটি নুতন শিক্ষা দান করে গেছেন তা'হল ভারতের সমাজ ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করণ এবং অসাম্প্রদায়িকভাবে জীবন যাপন। 'যত মত তত পথ' এ বাণীর সার্থক রূপদান করণ। অর্থাৎ সম্প্রদায় থাকবে কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না। কারণ একটিই তা'হল আপন আপন সম্প্রদায় আপন আপন মত পথে চলবে কেউ কারও বাঁধা হবে না বা বাঁধা সৃষ্টি করবে না। যেহেতু সব মত সব পথ সত্য। লক্ষ্য সবার এক ঈশ্বর। এ নীতি তিনি সমগ্র ভারতে ব্যাপক প্রচার করেছিলেন বলেই ভারতে সামাজিক দ্বন্দ্ব আজ বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

৫.১০: শ্রী অরবিন্দের সমাজ সংস্কার

শ্রী অরবিন্দের সমাজ সমাজ সংস্কার এর সাথে স্বামীজির সমাজ সংস্কারের সাদৃশ্যতা একদিকে এক মনে হলেও আরেকদিকে ভিন্ন। কারণ শ্রী অরবিন্দদেব যেভাবে সমাজ সংস্কার করতে ভারত ভূমিতে এগিয়ে এসেছিলেন তার সাথে স্বামীজির কোন মিল বা সম্পৃক্ততা ছিল না।

শ্রী অরবিন্দ ভারতের মৌলিক সমাজ ব্যবস্থার সাথে কোনভাবেই যুক্ত ছিলেন না। জীবনের অনেকটা সময় তিনি পাশ্চাত্যে কাটিয়েছিলেন। তিনি যতটা পাশ্চাত্যের সমাজ ব্যবস্থার সাথে সুপরিচিত ছিলেন সে তুলনায় জন্মভুমির সামাজিক কোন সমস্যা সম্পর্কের সাথে জড়িত ছিলেন না। অতএব তিনি ভারত সমাজ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তবে তিনি যে কারণে এই সমাজ সংস্কারে ভূয়সী প্রশংসার অধিকারী ছিলেন তা'হল স্বদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকা। একটি পরাধীন দেশে স্বাধীনতা এনে দিতে যে শক্তি তিনি জীবনে ক্ষয় করেন, স্বীয় সুন্দর জীবনটিকে দুর্বিষহ করে তুলেন, জেলের ঘানি টানেন, দেশবাসীর প্রতি স্বাধীনতার মুক্তি ও আনন্দের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে পারেন, সমস্ত ভারতবাসীকে অনায়াসে একত্র করতে পারেন, তাঁর ডাকে সবাই সাড়া দেন, জাতীয় ঐক্য এনে দিতে পারেন, সমাজের ভেদ বিভেদ ভূলে গিয়ে ভারতবাসীকে স্বাধীনতার স্বাদ দিতে একত্র করতে পারেন, ভারতে এমন কোন ধর্মগুরু এই ভাবে সমাজ সংস্কারে এগিয়ে এসেছেন কি?

পৃথিবীর সব জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও সমাজকে দুটি সুত্রে একত্র করা যায়– একটি হল 'ধর্ম' অপরটি হল দেশের 'স্বাধীনতা' দান। ধর্ম ও দেশকে পৃথিবীর সব মানুষ মূল্য দান করেন। মানুষ প্রয়োজনে ধর্মের জন্য এবং দেশ রক্ষার জন্য জীবন দান পর্যন্ত করতে পারেন। শ্রী অরবিন্দ এই দুটি শক্তিকে সম্বল করেই জন্মভূমিতে আগমন করেছিলেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় ভিত্তিতে সমাজের শত বৈষম্য তিনি দূর করেন এবং সবাইকে একত্র করেন একটিমাত্র বাণীতে:

> এই দেশ শুধু তোমার নয়, তোমার আমার সবার। বর্তমান মুহূর্তে আমাদের দেশ মাতার সেবাই আমাদের পক্ষে মহত্তম কর্তব্য। এই কঠিন সময়ে এটিই আমাদের উচিত কার্য। আমাদের শক্তি সংরক্ষণের এটিই যথার্থ সময়। অধীর হয়ো না, হতাশ হয়ো না, আস্থা হারিয়ো না। বর্তমান অবসাদ আর নিষ্ক্রিয়তা স্বাভাবিক, প্রতিটি জাতির ইতিহাসেই এই রকম উদাহরণ তোমরা দেখতে পাবে। প্রত্যেককেই শক্তি সংরক্ষণ করতে হবে। নুতন আশা ও তেজে প্রস্তুত হও মায়ের পূজার জন্য। দিব্য শক্তি জাতির মধ্যে ভরে দিয়েছেন এক নুতন তেজ। এই শক্তিই একদিন জাতিকে তুলে ধরবে।[১৭]

১৯০৬ সালে শ্রী অরবিন্দ জীবনের নব সূচনা বঙ্গপর্ব। অর্থাৎ বাংলাকে কি করে একত্রীকরণ সম্ভব। বাস্তবায়িত হল তাঁর ৩৪তম শূভ জন্মদিনে, 'বন্দেমাতর্‌রম্' পত্রিকায় যোগদান মাধ্যমে। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর লেখায় এ পত্রিকা পূর্ণ স্বাধীনতার স্বপ্নে জাগিয়ে তুলল পুরো দেশবাসীকে। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে বুঝতে ভূল হল না যে, ইনিই সবচেয়ে তাদের জন্য বিপজ্জনক ব্যক্তি। তাঁর জ্ঞানের প্রতিভা এত প্রখর ও দীপ্ত ছিল যে, যেই একবার তাঁর সান্নিধ্যে এসেছে সেই মুগ্ধ হয়ে গেছে। তাঁর ত্যাগ সহিষ্ণুতা এত তীব্র যে, কেউ তাঁকে ভূল বুঝে দূরে সরে থাকতে পারেন না। তাঁর এত মানব প্রেম যে, কেউ তাঁকে উপেক্ষা করতেও সাহস পান না। তিনি এমন জ্ঞানের অধিকারী যে সবাইকে এক সূত্রে গ্রথিত করতে তাঁকে কোন বেগ পেতে হত না।

১৭। ত্রিজ রায়, **শ্রীঅরবিন্দঃ বঙ্গ পর্ব,** কলকাতা: শ্রীঅরবিন্দ পাঠ মন্দির, ১ম সংস্করণ, ২০০৭, পৃ., ৩২

তিনি যখন জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে যোগ দিলেন এবং দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন, তখন সকল ছাত্র সমাজ তাঁর বন্দনায় মুখর। এক কথায় তিনি তাঁর প্রতিভা দিয়ে সমাজের সকল ভেদ বিভেদ মুক্ত করে দেশের স্বার্থে সবাইকে একত্রিত করেছিলেন। তাঁর সমাজ সংস্কারের বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য এখানেই বিশেষভাবে উপলব্ধব্য।

৫.১১: শ্রী নিগমানন্দের সমাজ সংস্কার

উপরোক্ত দুইজন মনীষী(স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ) সমাজ সংস্কার থেকে শ্রীনিগমানন্দের সমাজ সংস্কার অনেকটা ব্যতিক্রম। কারণ তিনি ছিলেন একজন স্পষ্টবাদি ধর্ম বক্তা। আকার ঈঙ্গিতে তিনি কোন কথা বলতেন না, যা বলতেন তা সরাসরি এবং সব জেনে সব শুনে ও দেখে। তিনি সমাজের ধর্মের ধ্বজাধারী ব্যক্তিদের অর্থাৎ যারা ধর্মের নামে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে মুরুব্বীয়ানা দেখান তাদেরকে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপেক্ষা ও অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। দুই একটি প্রমাণ তুলে ধরলেই বুঝতে পারব তিনি কি প্রকার স্পষ্টবাদী ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যথা:

> দেখ! সমাজে আজ বিষম কাল পড়িয়াছে– হিন্দু সমাজের উপযুক্ত নেতার অভাব হওয়ায় সমাজে উচ্ছৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাচারিতা বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে। লোক সকল উন্মার্গগামী হইয়া পড়িয়াছে। সমাজে অধিকাংশ লোক বিপদগামী; অথচ সকলেই শাস্ত্রবেত্তা, ধর্মবক্তা ও উপদেষ্টা। তাহারা আপন আপন শিক্ষা দীক্ষা অনুসারে যাহার যেমন সংস্কার বা ধারণা জন্মিয়াছে, সে সেইরূপ শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া ধর্ম শিক্ষা দিতেছে। ইহাতে নিজেরা তো প্রতারিত হইতেছেই, আবার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচজনকেও বিপথগামী করিতেছে। কেহ কেহ অবিদ্যা অভিমানে উন্মত্ত হইয়া আত্মদর্শী ও সত্যমর্মী ঋষিগণের ভ্রম প্রদর্শন পূর্বক আপন কৃতিত্ব জাহির করিতেছে। কেহবা একই শাস্ত্রের কতক প্রক্ষিপ্ত, কতক অতি রঞ্জিত এবং কতক মিথ্যা লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া বাদ দিয়া আপন মতলব সিদ্ধির উপযোগি অংশ বাছিয়া লইয় ধর্ম প্রচারক সাজিয়াছে। কেহ কেহ পুরাণ তন্ত্রগুলি বালিকার পুতুল খেলা ভাবিয়া বৈদান্তিক ব্রহ্মবিদ হইয়া বসিতেছে। কেহবা কোন শাস্ত্রকে আধুনিক, কোন শাস্ত্রকে স্বার্থপর ব্রাহ্মণের রচিত বলিয়া মুন্সীয়ানাচালে বিজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। কেহ ব্যাকরণের তাপে পুরাণগুলি গলাইয়া তাহার খাদ বাহির করিয়া দয়াপরবশ হইয়া খাঁটি অংশ বাহির করিয়া

দিতেছে– সে তাপে ঐতিহাসিক সত্য পর্যন্ত উড়িয়া যাইতেছে। কোন দল বা নিয়ম সংযম বিধি নিষেধ কুসংস্কার বলিয়া স্বেচ্ছাচারের পরিচয় দিতেছে। কিন্তু সকলে ধর্মহীন, বিপথে ঘুরিয়া মরিতেছে। ধর্মের লক্ষ্য হারাইয়া বসিয়াছে। অথচ মুখে বড় বড় কথা। দর্শন, উপনিষদ, যোগ, জ্ঞান ভিন্ন তাহারা ছোট কথার ধারই ধারে না। তাহারা কেহ বেদান্তের মায়াবাদী, কেহ বৌদ্ধ ধর্মের শূণ্যবাদী, কেহ গীতোক্ত কর্মযোগী, কেহ উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানী, কেহ তন্ত্রোক্ত কৌলাচারী, কেহ উজ্জ্বল রসাস্বাদী, আর কাহারো মুখে যোগ সমাধি।[১৮]

এক্ষণে বুঝতে পারছি সমাজে ধর্মের ধ্বজাধারীদের তিনি কি চোখে দেখতেন। তিনি ছিলেন একজন খাঁটি সিদ্ধ সাধক। তিনি নিজ জীবনে ধর্মের সত্যকে প্রমাণ করে দেখার পরেই এমন মন্তব্য করতে সাহসী ছিলেন। ধর্মকে পুঁজি করে কেউ সমাজে ধর্ম ব্যবসা করুক বা ধর্মের কদর্থ করে পৃথিবীর বিখ্যাত ঐতিহ্যবাহী সনাতন হিন্দুধর্মকে সমাজে ধীক্কার দান বা জড়োপাসক বলে নিন্দা করুক তিনি এটি মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। হিন্দু সমাজের আরেক শ্রেণীর লোককে তিনি জারজ ধর্মাবলম্বী বলে আখ্যায়িত করেন। তাঁর ভাষায়:

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যাত হিন্দু শাস্ত্র পাঠ করিয়া ইহারা অজ্ঞ সমাজে বিজ্ঞ সাজিয়া বসিয়াছে। তাহাদের মুখে কেবল কুসংস্কার ও পৌত্তলিকার ধুঁয়া, কেবল ধর্মশোভা ও বক্তৃতার উচ্চ নিনাদ। যাহারা গীতার প্রথম শ্লোকটি অনুবাদ করতে গিয়া সাতটি ভুল করিয়া বসিয়াছে, তাহাদিগের সমালোচিত হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু শাস্ত্র পাঠ করতঃ এক শ্রেণীর লোক পণ্ডিত হইয়া হিন্দুদিগের গুরু হইতেছে। ঋষিগণ সংস্কৃতাভিজ্ঞ বুঝিয়া তাহাদের প্রণীত শাস্ত্রাদির ভ্রম সংশোধন ও শ্লোকাঙ্গ কর্তন করিয়া তাহারা হিন্দু সমাজের নিঃস্বার্থ উপকার সাধন করিতেছে। এই শ্রেণীর লোক দ্বারা হিন্দুধর্ম রূপ কল্পপাদপ ফলমূল পত্রাদি যুক্ত শাখা-প্রশাখা শূন্য হইয়া স্থানুবৎ শোভিত হইবার যোগাড় হইতেছে।[১৯]

১৮। নিগমানন্দ সরস্বতী, **প্রেমিকগুরু**,মেহেরপুর, কুতুবপুর, ১ম সংস্করণ, ১৪১৮, পৃ., ৩৪
১৯। ঐ, পৃ., ৩৫

আশাকরি অদ্যাবধি স্বামী নিগমানন্দজীর ধর্ম ভিত্তিক সমাজ সংস্কার চিন্তার আলোচনা থেকে সম্যক উপলব্ধি করতে পারছি। তিনি সমাজে ধর্মের কুসংস্কার মোটেই পছন্দ করতেন না। সামাজিক ভাবে সমাজপতিদের সমাজের প্রতি অন্যায় নিয়ম নীতি প্রচলন এবং বাধ্যতামূলক তাদের চেপে দেওয়া চিন্তা চেতনাকেও তিনি কখনো সমর্থন করতেন না। তার প্রমাণ পাই তাঁর জীবনীতে।

তিনি একদা পাড়ার ভিতর দিয়ে বাইরে বেড়াতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ কান্নাকাটি শুনতে পেয়ে উক্ত বাটির ভিতরে প্রবেশ করার পর জানতে পারেন– ছোট জাতের এক পরিত্যক্তা মহিলা মরে পড়ে আছে কিন্তু কেউ সৎকার করছেন না, কারণ জাত যাবে এই ভয়ে। মাথা মুড়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, সমাজপতিদের অর্থদন্ড দিতে হবে, এই ভয়ে সেখানে কেউ নেই। কেবল একটি ছোট মেয়ে শুধু সেখানে বসে কাঁদছে। স্বামী নিগমানন্দজী একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ছেলে হয়েও কোন ভয়ভীতিতে আক্রান্ত না হয়ে নিজের কাঁধে শবদেহটি নিয়ে সৎকার করতে চলে যান। এখানেই প্রমাণ হয় তিনি কি প্রকার উদার, মহৎ ও মানবতাবাদী এবং সমাজ সংস্কারক ছিলেন। সমাজের কুসংস্কারকে তিনি কত ঘৃণার চোখে দেখতেন। সমাজের কুসংস্কার দূর করতে তিনি যে কখনও কাউকে ভয় পেতেন না এর প্রমাণ আমরা তাঁর আলোচিত কর্তব্য কর্মের প্রতি দৃষ্টি দিয়েই সম্যক্ উপলব্ধি করলাম।

৫.১২: বিবেকানন্দজীর তুলনামূলক সমাজ সংস্কার

স্বামীজির তুলনামূলক সমাজ সংস্কারগুলি আমি সংখ্যানুক্রমিক ভাবে মূলসূত্রগুলি এখানে তুলে ধরে এটাই বুঝাতে চাই যে, যদিও সত্যদ্রষ্টা মনীষীদের পরস্পর তুলনা করা যায় না তবুও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যতটুকু চোখে পড়ে দৃষ্টিভঙ্গিভেদে এখানে সেভাবেই উপস্থাপন করে বিষয়টি তুলনামূলক আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

প্রথমত: স্বামীজির সমাজ সংস্কারের যে বিষয়টি অন্য আর দুই মনীষী থেকে আমার নিকট যা ভিন্ন মনে হয় তা হল- স্বামীজি সমাজ সংস্কার সামাজিকতার উপরেই বেশি প্রাধান্য লাভ করেছে। তিনি গণচেতনার উপরেই গুরুত্ব দিয়ে গেছেন বেশি।

দ্বিতীয়ত: আর একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় দিক হল- প্রাচ্যের সাথে পাশ্চাত্যের সমন্বয়। এর মূল কারণটি ছিল দীর্ঘদিন ব্রিটিশ শাসন ভারতবাসীকে যেভাবে প্রলুব্ধ করে রেখেছিল তার লোভ অনেকেই ভূলতে পারেননি। তিনি তাই চাইলেন, দুই দেশের মধ্যে ঘৃণা না জন্মিয়ে যদি ভাবের আদান প্রদান করা যায় তাতেই সমাজের মঙ্গল বেশি বলে মনে হয়। কারণ শত্রুকে মিত্র করাই ভারত ধর্মের সামাজিক অনুশাসন। নৈতিকতাও তাই বলে।

তৃতীয়ত: তিনি সমাজে সবচেয়ে যেটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন তা'হল ভারতবাসীর মধ্যে সমাজের সে সময় এত কুসংস্কার প্রবেশ করেছিল যে, মানুষ জাতিতে এক হলেও, তাদের আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন এক হলেও কেউ কাউকে সহ্য করতে পারত না। ধর্মে বর্ণে সংস্কারে সমাজে উঁচু নিচু ভেদে এত মতপার্থক্য ও বৈসাদৃশ্য ছিল যে কেউ কাহারও হাতে জল পর্যন্ত স্পর্শ করত না। নিচু জাতি উঁচু জাতিকে ছুঁলেই তাদের জাত যেত। এক ঘরে হতে হত। সমাজে ধর্ম তখন ভাতের হাড়ির মধ্যে চলে গেছিল। এক কথায় ছুঁলেই জাত যায়। মানুষে জাতি ধর্ম বর্ণ কি এতই ঠুনকো যে একটু নাড়াচাড়া করলেই ভেঙ্গে যাবে আর জোড়া লাগবে না।

চতুর্থত: স্বামীজি পরিব্রাজক অবস্থায় ভারতের বহু প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিভ্রমন করে এই উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতবাসীকে জাগাতে হলে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। গণজাগরণ মাধ্যমে তাদের মধ্যকার তমঃ গুণ দূর করে তাদেরকে রজঃ গুণের অধিকারী করে গড়ে তুলতে হবে। তখনেই তারা দেহ মনে শক্তি ফিরে পাবে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করবে না। সাথে স্বামীজি এটিও ভাবছিলেন যে, তাঁর যে নব বেদান্ত আবিষ্কার তখন সমাজে সহজেই প্রস্ফুটিত হওয়ার সুযোগ পাবে। সর্বভূতে যে এক ভগবানই বিরাজ করছেন এবং কেউ যে কারও থেকে ছোট বা বড় নন সবাই যে আমরা এক প্রভূর সন্তান এই ভাব যত দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে জাতির

জন্য ততই মঙ্গল। সমাজ সংস্কারে স্বামীজির তুলনামূলক আলোচনার গুরুত্ব এখানেই বিশেষভাবে প্রাধান্যতা লাভ করে।

৫.১৩: অরবিন্দজীর তুলনামূলক সমাজ সংস্কার

অরবিন্দজীর সমাজ সংস্কার স্বামী বিবেকানন্দজীর মত ছিল না। কারণ তিনি যে সময়টিতে দেশের কাজে লাগতেন সেই সময়টিতে তিনি ছিলেন বিদেশে। বিদেশের সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে তিনি যতটা পরিচিত ছিলেন সেই তুলনায় নিজ দেশের জাতি সমাজ সম্পর্কে ছিলেন ততটাই পিছিয়ে। কারণ তিনি পাঁচ বছর বয়সে বিদেশের মাটিতে সেটেল্ট হয়ে দীর্ঘ ২৪ বছর কাল পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করে যখন দেশে আসলেন তখন দেশে স্বাধীনতার আন্দোলনের ধুম পড়ে গেছে। চারিদিকে শুধু একটিই সুর বিদেশী হটাও দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আন। স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দাও। বিদেশী দ্রব্য বর্জন কর। পূর্বেই অনেকবার আলোচনা করেছি মনীষীদের তুলনামূলক আলোচনা করা বড় কঠিন কাজ। তবুও প্রশ্নের উত্তর দান করাই যথার্থ। নিম্নে সংখ্যানুক্রমিক সাধ্যমত দু চারটি আলোচনা যা স্বামীজি গুরুত্ব দিয়ে যাননি সেগুলি এখানে তুলে ধরেছি।

প্রথমত: দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে সমাজ সংগঠনে যে সকল কর্ম তাঁকে গঠনমূলক ভাবে করতে হয়েছিল তিনি লক্ষ্য দিয়েছিলেন সেদিকেই বেশি। সমগ্র ভারতবাসীকে তিনি অসি দিয়ে নয় মসি দিয়ে জাগিয়ে তুলে– সামাজিক আন্দোলনে ব্রতী করেছিলেন শুধুমাত্র দেশের স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জনে।

দ্বিতীয়ত: তিনি গড়া থেকেই বিদ্যানুরাগী ছিলেন। জ্ঞান অর্জনই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র সম্বল। এই জ্ঞানের চর্চার মাধ্যমেই তিনি তাঁর কলেজের সকল ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এমনভাবে আত্মগঠন করে তুলেছিলেন যে, সামাজিক কোন বন্ধনেই যেন তারা আবদ্ধ না থাকে। সামাজিক চাপে কেউ যেন তাদের স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে পরানুখ করে রাখতে না পারে। প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী যেন পাড়ায় মহল্লায় সমাজে পরিবারে স্বাধীনতার জয় গানে মুখর হয়ে উঠে।

তৃতীয়ত: স্বদেশী বিপ্লবী ভাইদের নিয়ে সমাজপতিদের সাথে আলোচনা করে এবং তাদের যেন তেন প্রকারেণ দেশ মাতার সেবায় আত্মনিয়োগে যাতে তারা উদ্বুদ্ধ হন এবং পূর্ণসহযোগিতার হাত বাড়ান সেই জন্য তিনি

দিবারাত্র প্রয়ান্ত প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। এছাড়াও তখন যেহেতু সশস্ত্র বিপ্লবের সাফল্যের কোন সম্ভাবনা ছিল না। কাজেই আমলাতন্ত্রের সাথে সাহসিকতা ভরে বিচক্ষণতা পূর্বক সংঘর্ষে প্রবৃত্ত করাই ছিল শ্রী অরবিন্দের সামাজিক আন্দোলন।

চতুর্থতঃ সে যুগে কংগ্রেসী নেতারা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন ভিন্ন আর কোন রাজনৈতিক আদর্শ কল্পনা করতে পারতেন না। তাদের সে সাহস ছিল না। এজন্যেই জাতির পক্ষে পরাধীনতা ক্রমশঃ দূঃসহ হয়ে উঠেছিল। শ্রী অরবিন্দের চিন্তা চেতনা ও বিচক্ষণতা এবং স্বাধীনতার আদর্শে অটল বিশ্বাস ও পূর্ণ ধৈর্য্য সমগ্র ভারতবাসীকে তাঁর অজস্বী বক্তৃতা ও লিখনী দ্বারা এমনভাবে সংঘবদ্ধ করে গড়ে তুলেছিলেন যে, ধর্ম এবং মাতৃভূমির জন্য পৃথিবীর সব মানুষ যে এক হতে পারে এই শিক্ষা অরবিন্দের অন্তরে ছিল বলেই তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন জাতি সমাজ বর্ণ ধর্ম ও সম্প্রদায়ীদের তাঁর অনূকুলে আনতে সক্ষম হয়েছিল। তিনি ধর্ম ও দেশ মাতৃকার মুক্তি- এই দুই উপায়কে সম্বল করে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলেছিলেন। ভারতের সকল জাতি ধর্ম বর্ণকে এক সুত্রে গ্রথিত করে সমাজ সংস্কারের সাথে ধর্ম ও দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে এনেছিলেন। সমাজ সংস্কারে তাঁর তুলনামূলক আলোচনার বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট এখানেই।

৫.১৪: শ্রীনিগমানন্দজীর তুলনামূলক সমাজ সংস্কার

নিগমানন্দজীর তুলনামূলক সমাজ সংস্কারে যে বিষয়টি সবচেয়ে প্রাধান্য দান করে তা হল– ধর্ম ভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক চেতনা। নিগমানন্দ এসেছিলেন সর্ব ধর্ম সমন্বয়ে অসাম্প্রদায়িকভাবে ধর্মের বিস্তার করতে। আর এ জন্যই তাঁর প্রয়োজন পড়েছিল ধর্ম রক্ষার জন্য সমাজের বিদ্বেষ, বিদ্রোহ দূর করা। তিনি বুঝেছিলেন, ধর্মের সাথে সমাজ না জাগলে দেশ জাতির কল্যাণ কোনভাবেই সম্ভব নয়। অসম্প্রদায়িক চেতনা আনা ততদিনেই সম্ভব যতদিন না সমাজ তার ধর্মের মাধ্যমে তাদের দোষ গুণ বিচার করতে পারে। এজন্যই তিনি জানান, 'বিচারহীন আচার আর উদ্দেশ্যহীন নিষ্ঠা' কোনদিনেই মানব কল্যাণ দান করে না। নিম্নে তাঁর দু চারটি তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরছি।

প্রথমত: স্বামী নিগমানন্দজী ছিলেন বেদান্তের নির্বিকল্প ব্যুত্থিত পুরুষ। তিনি নিজের পরিচয় নিজে দিয়েছেন 'আমাকে তোমরা সদ্ গুরু বলে জেনো'। সদ্ গুরু হলেন এককথায় অন্তর্যামী সত্তা। তিনি সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেন। ধর্মই হল তাঁর জীবনব্রত। ঈশ্বর লাভই ছিল তাঁর জীবনের মূল বিষয়। এজন্য তিনি সমাজের জন্য যা কিছু করেছেন তা ধর্মকে ধারণ করে। ধর্মভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলাই ছিল জীবন সিদ্ধান্ত।

দ্বিতীয়তঃ ব্যবহারিক সমাজ সংস্কার জীবন থেকে তিনি যে, একেবারে দূরে থাকতেন তা কখনোই নয়। যেহেতু সত্য আবিষ্কারই মানবের জীবন ধর্ম, তখন সত্য তিনভাবে উপলব্ধি করতে হয়। এছাড়াও সবাই যখন চায় তার মতটিই সত্য সিদ্ধান্ত বলে গণ্য হোক, তখন এই সত্যের দৃষ্টি ভঙ্গির জন্যই কি সামাজিক মত দ্বৈততা সৃষ্টি হয় না? সত্যকে এজন্য তিনি সমাজের প্রতি ব্যক্তিকে তিন দৃষ্টি ভঙ্গিতে দেখতে বলেন। এক প্রাতিভাসিক সত্য, দুই ব্যবহারিক সত্য এবং তিন পারমার্থিক সত্য।

প্রাতিভাসিক সত্য হল ইন্দ্রিয়গত সত্য দৃষ্টি। যা কিছু সময়ের সত্য থাকে আবার সময় অন্তে তার মিথ্যা সে নিজেই প্রকাশ ঘটায়। যেমন ঘটনাটি নিজ চোখে দেখলাম, শুনলাম। তখন সত্য মনে হল। কিছু পরে যখন জানলাম শুনলাম এবং বুঝলাম অর্থাৎ যা আমি পূর্বে শুনেছিলাম, দেখেছিলাম তা যথার্থ সত্য বলে আর টিকল না। অনুরূপ ব্যবহারিক সত্যদৃষ্টিটিও আর একটু বেশি সত্য। যেমন- মা-বাবা, ভাই-বোন এরা আমার আপন জন, প্রিয়জন। যতদিন নিঃস্বার্থতা এদের সাথে থাকে ততদিন তারা সত্য। যখন স্বার্থ এসে বাসা বাঁধে তখন প্রয়োজনে তাদের হত্যা করতেও পশ্চাদপদ হই না। অতএব যেটি উচ্চ সত্য বা বড় সত্য তা হল ধর্মরূপ ঈশ্বর। এই সত্যটি অবিনশ্বর সত্য। বাকি দু'টির প্রথমটি হল অল্প সত্য, দ্বিতীয়টি হল নিম্ন সত্য।

তৃতীয়তঃ স্বামী নিগমানন্দজী এই দৃষ্টিভঙ্গি ভেদেই আর দুই মনীষী থেকে তাঁর ধর্ম দৃষ্টিতে সমাজের সংস্কার দেখেছেন। তিনি মনে করেন সমাজ সংস্কার যদি এই দৃষ্টিতে করা যায় তবে সমাজ হবে চির সুন্দর। জ্ঞানের অভাবেই মানুষের মাঝে মানুষের যত সমস্যা। অজ্ঞানতাই সকল প্রকার দ্বন্দ্বের মূল কারণ। মানুষকে ধর্মভিত্তিক আত্ম সচেতনতা যতদিন আমরা উপহার দিতে না পারব ততদিন সমাজের অবক্ষয় বন্ধ হবে না।

মানুষ সামাজিকভাবে সচেতন হবে না। অতএব ধর্মদৃষ্টিতে সমাজ সচেতনতাই হল প্রকৃত সমাজ সংস্কার। সমাজ সংস্কার সম্পর্কে স্বামী নিগমানন্দজীর এই ছিল ব্যক্তিগত অভিমত।

৫.১৫: স্বামী বিবেকানন্দজীর ধর্মচিন্তার তুলনামূলক আলোচনা

বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দজী মাত্র ঊনচল্লিশ বৎসর বয়সের জীবিতকালের মধ্যে বাল্য ও কৈশোর জীবন বাদ দিলে যে সময়টি দাঁড়ায় তা প্রায় চব্বিশ থেকে পঁচিশ বৎসর মাত্র কাল তাঁর শিক্ষা ও ধর্মজীবন ধরা যায়। এই সামান্য সময়ে অসাধারণ কৃতিত্ব বহন করা কোন সাধারণ মানবের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। এখানেই প্রমাণ হয় তিনি ছিলেন সত্যিকারের একজন ক্ষণজন্মা জ্যোতিরাজঃ দেবমানব।

পৃথিবীতে ঈশ্বর ও মহাপুরুষ বলতে যে একটি বস্তু আছেন তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। ঈশ্বর ও ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষগণ যে ইচ্ছা করলে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ তার জ্বলন্ত ও জীবন্ত দৃষ্টান্ত। স্বামীজির জীবন কর্ম ধর্ম ও দর্শন যুগপৎ বিবেচনা করলে এই দাঁড়ায়– তিনি মাত্র ২০/২৫ বৎসরে ভাষা, শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প, কবিত্ব, দেশপ্রেম, বিজ্ঞান, রাজনীতি, ধর্ম ও ধর্ম প্রচার, সাংগঠনিক ক্রিয়াকর্ম, মঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা, সমাজ সংস্কার, দর্শন, লেখক, গীতিকার, পরিব্রাজক, দীর্ঘ সময় বিদেশ ভ্রমন, বিশ্ব ধর্মসভায় যোগদান ইত্যাদি ভূয়সী প্রশংসার অধিকারিত্ব অর্জন– ভারতবর্ষে এমন আর কারো জীবনে যুগপৎ ঘটেছিল বলে আমার জানা নেই।

তিনি একমাত্র বীর সাধক যিনি নিজ শক্তি বলে ধর্মের নামে যত কুসংস্কার, কু আচার, কৃ প্রথা, সমাজের অনাচার, অবিচার দূর করে মানব সমাজকে নব বেদান্তের সু শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলেছিলেন। ধর্মের সাথে খাওয়া-পড়া, চলা-ফেরা, প্রতিমা পূজা, সাম্প্রদায়িকতা, যত বাঁধা বিপত্তি তিনি সৎ সাহস দ্বারা ভারতবর্ষকে নব প্রযুক্তির প্রগতি শীলায় প্রথম উন্নীত করেছিলেন। মানব সেবাই যে যুগ ধর্ম এবং মানুষই দেবতা, ঈশ্বর ও ভগবান এবং কর্মকে পূজা জ্ঞান করে– কর্ম করাই যে ভগবদ পূজা, তা তিনি নিজ জীবন দ্বারা প্রমাণ করে গেছেন। পাশ্চাত্যকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা না করে প্রাচ্যের সাথে প্রতীচ্যের মহামিলনই যে ভারতের উন্নতি তা তিনি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে প্রথম দেখিয়ে গেছেন। তিনি এই মিলনের পিছনে যে কর্ম ও

ধর্মের যোগসুত্র বিদ্যমান, তা উভয় দেশ জাতিকে পরস্পর মহামিল করে– তারা যাতে আপন আপন উন্নতি করতে পারেন তার প্রমাণ তিনি দিয়ে গেছেন।

ভারতের সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক হল– ধর্মের জন্য জাত পাত বিচার, উঁচু নিচু বর্ণের বাক-বিতন্ডা, পৌরহিত্য ও ব্রাহ্মণত্যের অভিমান এবং দৌরাত্ম্য, ধর্মে গুণ ও কর্মের প্রাধাণ্য না দিয়ে জন্মগত জাত পাত হিংসা, ভারতের জাতীয় ঐক্যতাকে খন্ড-বিখন্ড করা, ধর্মের অপর নাম যে সমবেদনা, সহমর্মিতা, একতা, ভালবাসা, জীব মাত্রই এক সত্তা, বেদের এই অভিজ্ঞান ভুলে গিয়ে আমরা আজ যে স্তরে নেমে এসেছি তা সনাতন হিন্দু ধর্মের পতনের সামিল। যে ধর্ম আমাদের জাতীয় গর্ব সেই ধর্ম আজ কত উপহাসের কত অনাদরের। স্বামীজি তাই বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে আমাদের জীবনকে যে আশার আলো দেখিয়ে গেছেন অতীত আর এমন করে কেউ দেখাননি। স্বামীজির তুলনামূলক আলোচনার কৃতিত্ব এখানে এটাই।

৫.১৬: শ্রী অরবিন্দের ধর্মচিন্তার তুলনামূলক আলোচনা

শ্রী অরবিন্দের ধর্মচিন্তা আর দশজন মহামানবের থেকে একটু ব্যতিক্রম। ঈশ্বর লাভ করা সকল ধার্মিকেরই ধর্ম। তবে একেকজন তাঁকে একেক ভাবে পেয়ে থাকেন বিশেষত্ব শুধু এখানেই। তিনি যেতেহু অসীম এজন্য তাঁর সীমারেখা নির্ধারণ করা যেমন অনুচিত; তাঁকে সবাই একভাবে পাবে এটা ভাবাও তদ্রূপ উচিত নয়। শ্রী অরবিন্দ ঈশ্বরকে পেতে চেয়েছিলেন এইভাবে, অর্থাৎ তিনি আজীবন প্রয়াস করেছিলেন কেবল অতি মানবকে নামিয়ে আনতে নয়, বরং এই মাটির পৃথিবীতে তাঁকে সচল ও সক্রিয় ভাবে দেখতে।

তিনি নিজের মুক্তির জন্য যতটা না তৎপর ছিলেন তার চেয়ে অধিক চিন্তাশীল ছিলেন, জগতের একটা আমূল পরিবর্তন ঘটাতে। অদেখা স্বর্গলোককে যাতে অনায়াসে ভূলোকে নেমে এনে সবাইকে ও সবকিছুকে রূপান্তরিত করা যায় এই প্রত্যাশা ছিল সর্বক্ষণ তাঁর অন্তরে। অমৃতকে নামিয়ে আনতে হবে এই মর জগতে– সব মৃতকে অমৃত করে তুলতে। বর্তমানকে ভবিষ্যতে রূপায়ণে রূপান্তরিত করে গড়ে তুলতে হবে অতি আন্ত

রিকতার সাথে। শুধু ধর্মে-কর্মে নয়, এবং কি ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিল্পকর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিকতাতেও।

শ্রীমা এজন্যই ব্যক্ত করলেন, "পৃথিবীতে মানুষ যে অবস্থার মধ্যে বাস করছে সে তার নিজেরই চেতনার অবস্থার দ্বারা সৃষ্ট। সেই চেতনাকে না বদলে পৃথিবীর অবস্থাকে বদলাতে যাওয়া অমূলক প্রয়াস।"[২০] এটি বদলানো যায় কিভাবে শ্রী অরবিন্দ বলেছেন, যে ইউরোপ যে সকল রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করতে পারেনি, তা যদি ভারতকে করতে হয়, তাহলে তাঁকে এমন কিছু করতে হবে যা আগে কখনো করা হয়নি। সেটি কি কাজ? তা'হল পাশ্চাত্যের যতকিছু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে সম্পূর্ণরূপে সমৃদ্ধ হয়ে তার ওপরে উচ্চতর জগতের জ্ঞানালোকপাত করা, তখন এই দুই জ্ঞানের মিলনে যে জিনিস দাঁড়াবে তার দ্বারা আধুনিক জগতের মানুষকে প্রভাবিত হতেই হবে। কারণ আধুনিক মানুষের মন দুই-ই চায়; কেবল আধ্যাত্মিকতা এবং কেবল বিজ্ঞানের কথা তার মনের কোন উন্নতি করেনি।

বিজ্ঞানের দ্রূত সাফল্য যখন আমাদের মনকে ধাঁধিয়ে দিয়েছিল এবং ভগবানকে পর্যন্ত সিংহাসন চ্যূত করবার জোগাড় করেছিল তখনেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে এসে নিজের দাবি তুলে জানালেন, 'আমি আছি', আর আমি আছি বলেই সবকিছু আছে। আর তিনি যে আছেন আমি এই চোখেই তাঁকে দেখি। এমনই ছিল তাঁর বাণীর মর্মার্থ। একমাত্র ভগবানই মানুষ হয়ে জন্মাতে পারেন, এই সত্য তিনি নিজ মুখেই ব্যক্ত করে গেছেন।

অরবিন্দ এসে এবার দেখালেন যে, সকলেই আমরা ভগবানের অভিব্যক্তির যন্ত্র স্বরূপ হতে পারি। প্রত্যেক মানুষেরই আকারের মধ্যে যে ধাতু রয়েছে তাঁকে গলিয়ে খাঁটি সোনা মিলতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর তুলনামূলক ধর্ম চিন্তায় অন্যান্যদের চেয়ে এ বিষয়ে বেশি প্রত্যাশা করে গেছেন।

২০। পূর্বোক্ত, নারায়ণপ্রসাদ, **শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম জীবন কথা**, পৃ., ১১৩

তিনি এখানেই ক্ষান্ত হননি পন্ডিচেরী থেকে ৮ কি.মি. দূরে অরোভিল বা ঊষানগরী নাম দিয়ে যে শহরটি গড়েছেন এবং সেখানে মানুষের প্রয়োজনীয় যা যা সব উপকরণ সংগ্রহ করে যে যে প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রয়োজন– যেমন স্কুল, কলেজ, আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্প, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কুটির শিল্প, তাঁত শিল্প, করকারখানা, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা জনিত আর অন্য যতকিছু দ্রব্য এবং দ্রব্যের জন্য উপকরণ ও উপাদান প্রয়োজন সবগুলিকে সত্যের আলোকে আলোকিত করে নব মানুষের জন্ম দিয়ে সত্যের অমর জ্যোতি দ্বারা দিব্য পৃথিবীর রূপ দিতে পূর্ণ সমর্থ না হলেও আমূল পরিবর্তন অরোভিলে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর তুলনামূলক সাধনার বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য এখানেই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য এবং উল্লেখযোগ্য।

৫.১৭: শ্রী নিগমানন্দের ধর্মচিন্তার তুলনামূলক আলোচনা

শ্রীনিগমানন্দজীর ধর্ম চিন্তার তুলনামূলক আলোচনাটি পূর্বালোচিত দুই মহামানব থেকে সত্যিকার অর্থেই সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁদের চিন্তা চেতনার সাথে তাঁর ভাবনা ও সাধনার কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। ধর্ম চিন্তার ক্ষেত্রে নিগমানন্দের ধর্ম সাধনাটি এই বাংলায় তাঁর জীবনেই প্রথম এবং প্রাচীন ঋষি যুগে বশিষ্টদেব ও যাজ্ঞবল্ক্য ছাড়া আর কেউই এই সাধনায় উপস্থিত হতে পারেননি। সবাই ধর্ম সাধন রাজ্যে ঈশ্বর লাভের জন্য মোটামুটি ভাবে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি ভাবকে আকড়ে ধরেন। কিন্তু স্বামী নিগমানন্দজীর সাধনা ও ভাবনা ভগবান লাভের জন্য তো ছিলই না পরন্তু উক্ত ভাবগুলিরও তাঁর কোন যোগ ছিল না। তাঁর ভাবনা ও সাধনা ছিল মৃতা স্ত্রীর অশরীরী আত্মা তাঁর নিকট কেন এবং কিভাবে অত্যাশ্চর্যভাবে বারবার পুনরাবির্ভাব হয়ে তাঁর চিত্তকে আকর্ষিত করছে? কে সে? মৃতের দেহ ধারণ কিভাবে সম্ভব? প্রশ্ন বিদ্ধ করেছিল তাঁকে– এ কি আমার আর তার একান্ত আত্মিক ভালবাসার বন্ধন, না– অন্য আর কিছু?

এর উত্তর তিনি পেয়েছিলেন অনেক কাঠখড়ি পুড়িয়ে অবশেষে তান্ত্রিক সাধনা মতে রূপের সাধনায় জগৎ জননীকে আপন স্ত্রী রূপে দেখা পেয়ে। এই পৃথিবীর বুকে যা এক অতি আশ্চর্য ঘটনা ও সাধনা। প্রথম এই রূপকে আশ্রয় করেই তাঁর সাধনা অগ্রসর হয় অরূপে জ্ঞানপথে, অতঃপর এই অরূপ রূপ নেয় স্বরূপে

যোগ সাধনা নামক আত্মা ও পরমাত্মাতে, সাধনার শেষ পর্ব বাকি ছিল অপরূপের, এটির প্রকাশ লাভ ঘটে প্রেম সাধনার এক মধুরাত্রিতে– জগৎ জননীকে জায়া রূপে লাভ করে। আমি শ্রীনিগমানন্দজীর এই অত্যাশ্চর্য চিন্তা চেতনাকে সম্বল করেই এই থিসিস্‌কে আপন পছন্দনীয় বলে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছি। প্রার্থনা করি– আমার এই গবেষণা যেন আমার জীবনের একমাত্র কেন্দ্র বিন্দু হয়ে গড়ে ওঠে। শ্রীনিগমানন্দের মানস পুত্র শ্রীমৎ অনির্বাণজীর লিখিত একটি ভূমিকা এখানে উল্লেখ করেই পরপ্রসঙ্গে আমি নিগমানন্দের ধর্ম চিন্তার তুলনামূলক আলোচনায় অগ্রসর হব। এ প্রসঙ্গে শ্রী অনির্বাণের একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেই:

> ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। আবহকাল থেকে ভারতীয় ভাবনার বিভিন্ন ধারা সঙ্গম ও সমন্বয় ঘটেছে বাংলার বুকে। বাঙালি চিরকাল এক অখন্ড ভারত ধর্মের ধারক এবং বাহক। স্বামী নিগমানন্দজীকে আমরা দেখেছি এই ভারত ধর্মের মূর্ত বিগ্রহ রূপে। ভাবনা, সাধনা এবং সিসৃক্ষার বিশ্বতোমুখী বৈচিত্র্যকে যেমন তাঁর মাঝে সংগত হতে দেখেছি, তেমনি দেখেছি এক মহা ভবিষ্যতের পানে তাঁর বিচ্ছূরণ। বর্তমানের এক নৈদ্রুব বিন্দুতে দাঁড়িয়ে অতীতের সমারোহকে ভবিষ্যতের খাতে প্রবাহিত করবার শক্তি, ঔদার্য এবং নৈপুণ্য তাঁর ছিল। সনাতনত্ব ও প্রবাহমানতা– দুটিকেই তিনি জানতেন শিব শক্তির যুগলদ্ধ রূপ বলে। তাঁর কাছ থেকে ভারত সংস্কৃতির প্রাণটিকে আমরা যেমন চিনতে পেরেছিলাম, তেমনি পেরেছিলাম নিস্প্রাণ সংস্কারের আবর্জনা হতে চিত্তকে মুক্ত করতে। যিনি আকাশবৎ, আকাশ বিহারের মুক্তি এবং আনন্দ তিনিই দিতে পারেন। তাঁর কাছে আমরা এই মুক্তি পেয়েছিলাম অকৃপণ দাক্ষিণ্যের প্রাচুর্যে।
>
> ভাবনার জগতে বলতে পারি, তাঁর মুক্তি ছিল যুক্তির মুক্তি। কোনদিন তাঁর কাছে অযৌক্তিক কোন কথা শুনিনি। আর সেই যুক্তির পিছনে ছিল সর্ববিধ সংস্কার মুক্ত এক হৃদয়ের বিশালতা। হয়তো বা বাঙালি সুলভ হৃদয়বত্তার ভাগই তাঁর মাঝে একটু বেশি ছিল।
>
> এই হৃদয়বত্তার গুণেই তাঁর ভাবনা নুতনকে অতি সহজেই আপন করে নিতে পারত। দীর্ঘ দিনের সান্নিধ্যে দেখেছি, শুধু অধ্যাত্ম বিদ্যাতেই নয়, দর্শনে, সাহিত্যে, শিল্পে, রাষ্ট্রনীতিতে, সমাজনীতিতে সকল বিষয়েই তাঁল চিত্ত সত্যের অভিনব প্রকাশকে অকুন্ঠচিত্তে বরণ করে নিয়েছে। এই সত্যধৃতির সঙ্গে ছিল তাঁর এক আশ্চর্য ঐতিহাসিকতার বোধ– ভারতবর্ষের ভাবনার গঙ্গোত্রী হতে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত সবটাই যেন তাঁর চোখে ভাসত। তাঁর কিছুটা পরিচয় তাঁর গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়। অথচ শ্রী সিসৃক্ষার গঙ্গাসাগরে পৌছে দিয়েই

তিনি ক্ষান্ত থাকতেন না– নীল সিন্ধুর ওপারে দিকচক্রবালে জ্যোতিস্তরলিত রহস্যের পানে থাকত তাঁর তর্জনীর বিদ্যুন্ময় ইঙ্গিত। 'এই শেষ'– এ কথা কোনদিন তাঁর কাছে কোনদিন শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

তাঁর স্বরূপের পরিচয়ে রয়েছে 'নিগম' এই সার্থক সংজ্ঞা; তাঁর প্রচারিত সনাতন ধর্মে মুখপত্রের নাম 'আর্য্যদর্পণ', তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম 'ঋষি বিদ্যালয়'। এই সংযোগগুলি কাকতালীয়বৎ নয়, এগুলি তাঁর ভাবনার গঙ্গোত্রী সংকেত। সেই ভাবনাকে শঙ্কর ও গৌরাঙ্গের ভিতর দিয়ে রামকৃষ্ণ পর্যন্ত টেনে এনে 'এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে' দাঁড়িয়ে তিনি আমাদের বলেন, 'ঐ দেখ! তিমির বিদার উদার অভ্যূত্থান আসন্ন। প্রস্তুত হও'।

এই প্রস্তুতির দীক্ষা এবং শিক্ষা তিনি আমাদের দিয়ে গিয়েছিলেন নিরলস সেবা ব্রতের ভিতর দিয়ে। সে সেবা মহতের সেবা, জগতের সেবা। সেবায় একাধারে আত্মবিসর্জন আবার আত্ম প্রতিষ্ঠা, জীবত্বের নিরসনে শিবত্বের জাগরণ। তা হতেই অধিকারীর সর্বার্থসিদ্ধি হতে দেখেছি। না, যোগ বা তন্ত্রের আনুষ্ঠানিক সাধনার কৃচ্ছ্রতা আমাদের কাউকেই স্বীকার করতে হয়নি। অথচ কৈবল্যানুভবে, ব্রহ্মবিজ্ঞানে, শক্তিমত্তায় এবং রস মাধুর্যে তাঁর ফলশ্রুতিকে জীবনে সার্থক হতে দেখেছি।"[২১]

শ্রীনিগমানন্দ ছিলেন সাধন সিদ্ধ বিজ্ঞান ভৈরব এক পুরুষোত্তম সত্তা। তাই তাঁর পক্ষে জগৎ স্বামী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন হয়েছিল। শাস্ত্রে আছে, শিব না হলে সতী কখনো স্বামী বলে সাধককে স্বীকার করে না। স্বামী নিগমানন্দের ধর্ম চিন্তার তুলনা সম্পূর্ণ যে ব্যতিক্রম তার প্রমাণ আমরা এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই পাই।

২১। স্বামী নির্বাণানন্দ সরস্বতী (অনির্বাণ), **শ্রী নিগমানন্দ কথামৃত**, কলকাতাঃ আসাম বঙ্গীয় সারস্ব মঠ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৪, পৃ.,২

৫.১৮: উপসংহার

অদ্যাবধি আমি আমার জ্ঞান গরিমা ও শিক্ষা দীক্ষা থেকে যতটুকু উপলব্ধি করেছি– তুলনামূলক আলোচনায় তিন মনীষীর শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ও ধর্ম চিন্তা বিষয়ক উপলব্ধিগুলি তাঁদের আলোচিত আপন আপন অংশে– তিন অধ্যায়ে বিভক্ত করে তিনজনের মতবাদগুলি আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা করেছি। কারও কথার সাথে কারও কথার সরাসরি তুলনা করিনি। এবং কি কারও আলোচ্য পংক্তির সাথে কারও আলোচ্য পংক্তিরও তুলনামূলক আলোচনাগুলির সরাসরি নির্দিষ্ট করে তুলনা করিনি। তবে আলোচনার সূত্র আমি যতটুকু তুলে ধরেছি তাতেই যথেষ্ট হবে বলে আমি মনে করি।

শিক্ষা সম্পর্কে যখন আলোচনা করেছি তখন প্রত্যেকের শিক্ষা বিষয়ক এবং তার শিক্ষার তুলনামূলক বিষয়ক নুতনত্ব এবং বিশেষত্বগুলি আপন আপন স্থানে তুলে ধরেছি। যখন সমাজ সংস্কার ও তার তুলনামূলক আলোচনাগুলি করেছি সেখানেও তাঁদের আপন আপন মত পথ ও বিশেষত্বগুলি এবং সমাজ সংস্কার বিষয়ে তাঁর যা কিছু নুতনত্ব ছিল তা আলোচনার মধ্যে তুলে ধরেছি। ধর্মচিন্তা ও তার তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রেও উক্ত চিন্তা চেতনাগুলি সন্নিবেশিত করে আপন আলোচনার গুরুত্ব, নুতনত্ব ও বিশেষত্বগুলি উল্লেখ করেছি। আশা করি তুলনামূলক অধ্যায়ের পর্যালোচিত আলোচ্য বিষয়বস্তুসমূহকে এই ভাবে একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, আমি তুলনার ছকটি কিভাবে উপস্থাপন করে আপনাদের উপহার দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

অর্থাৎ উপসংহারের বিশেষত্বটি আমি এই ভাবে বুঝাতে চেয়েছি– সাধারণ মানুষের তুলনা ও অতি মানবের জ্ঞান গরিমার তুলনার আলোচনা মধ্যে যথেষ্ট সমস্যা ও সাহসিকতার প্রয়োজন আছে। কারণ এরা সবাই সত্য দ্রষ্টা এবং ঈশ্বর কৃপা প্রাপ্ত মহাপুরুষ, এঁদেরকে তুলনামূলক আলোচনায় ছোট বড় করে তুলনা করা গর্হিত অপরাধ বলে আমি মনে করি। এক্ষেত্রে নিজের মনটিকে তাঁদের নিকট অপ্রাসঙ্গিক ও অপরাধী বলে বোধ হয়। অর্থাৎ আমি এখানে কাকে ছোট, কাকে বড় করেছি, বিষয়টি মনে তাড়না সৃষ্টি করে। তুলনা করতে গিয়ে অস্বস্তি লাগে। বাস্তবিক অর্থে এরা সবাই সম পর্যায়ের। কেউ কোন বিষয়টিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, কেউ কম দিয়েছেন, পার্থক্যটুকু শুধু এখানেই, কিন্তু আলোচনা পর্বে কোন বিষয়কে কেউ বাদ দেননি বা কেউ অপারগতা প্রকাশ করেননি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বর্তমান সময়ে বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও নিগমানন্দের শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ও ধর্মচিন্তার গ্রহণযোগ্যতা

৬.১.১: ভূমিকা

বাংলার এই তিন মহান ব্যক্তিত্বের জীবনদর্শন, চিন্তা, চেতনা, জন্ম ও কর্ম যা কিছু– বলা বাহুল্য হবে না; মোটামুটি সবকিছুই প্রায় একসূত্রে গাঁথা। কারণ এঁরা তিনজনেই অষ্টাদশ শতাব্দীর কেউ প্রথমার্ধে, কেউ মাঝামাঝি, কেউ শেষ দিকে এই অবহেলিত, নির্যাতীত ও নিষ্পেষিত বাংলা মায়ের কোলে জন্মলাভ করেন। সমসাময়িক কালে তাঁদের আবির্ভাব এটাই প্রমাণ করে যে– ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা সংস্কৃতি ও ধর্মচিন্তার মূল প্রবক্তা হিসেবে এঁদের জন্মগ্রহণ ছিল সেসময় সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনজনেরই বৈশিষ্ট্য ছিল ভারতকে পরাধীনতার শৃংখল থেকে অবমুক্ত করা এবং প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য, সনাতন ধর্মের উদারতা, বেদ, উপনিষদ, গীতার সারমর্ম প্রচার মাধ্যমে দেশ জাতির শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ও ধর্মচিন্তাকে সুপ্রতিষ্ঠা দান করা। ধর্মই যে ভারতের প্রাণ তারই প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা।

বেদসাহিত্যের মূল গর্ব আমরা জীবমাত্রই যে এক এবং অভিন্ন আত্মা, ব্যবহারিক দশায় আমাদের তা যতই পরস্পর আলাদা মনে হোক না কেন সর্বভূত যেমন আমাতে, অনুরূপ আমি সর্বভূতে। এই ভাতৃত্ববোধের মহান শিক্ষা ও আবিষ্কার যে ভারতের রত্ন ঋষিমুনিদের হাজার হাজার বৎসরের ত্যাগ তপস্যা ও সাধনার অমৃত নির্যাস এরই সুপ্রতিষ্ঠা ও শিক্ষা দান করতে এবং জাতিগত সমাজগত হিংসা বিদ্বেষ দূর করতেই যে যুগপৎ এই এক শতাব্দীতেই তিন মহামানবের আলাদা আলাদা ভাবে আবির্ভাব এবং গুরুত্ব প্রচার প্রয়োজন ছিল তারই যুক্তিকতা দেখিয়ে, দেখায়ে এবং প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তাঁরা। এঁরা তিনজনেই বর্তমান ভারতের শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ও ধর্মচিন্তার পূর্ণআশীর্বাদক বললে অত্যুক্তি হবে না বলে– আমার বিশ্বাস।

৬.১.২: বর্তমান সময়ে স্বামী বিবেকানন্দজীর শিক্ষাচিন্তার গ্রহণযোগ্যতা

বর্তমান দার্শনিকদের সবসময় একটিই অভিব্যক্তি যে, তুমি যা কিছু বলবে, মতদান করবে বা করেছ, তা যেন পুর্বে আর কেউ বলেন নি বা করে দেখান নি এমন মতদানকেই তাঁরা নতুন বলে বুঝেন ও গ্রহণ করেন। তাঁদের দার্শনিক দৃষ্টিতে দর্শনে সেটিই গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য ও বিবেচিত হয়ে আসছে।

কিন্তু একটি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অব্যক্ত অপ্রকাশ বলতে সাধারণ অর্থে আমরা যা বুঝি তা মামুলি একটা অজ্ঞান ও অজানা বা অল্প সত্য প্রকাশ ছাড়া অন্য কিছু নয়। কিন্তু প্রকৃত অজানা অব্যক্ত বলতে যা কিছু আজও এবং এখন পর্যন্তও বুঝায়; তা একমাত্র ঈশ্বরকেই বুঝায়। তাঁর অব্যক্ত সৃষ্টিকে তিনি কাউকে আশ্রয় করে মাঝে মাঝে যতটুকু ব্যক্ত হন তাই চিরকাল বেদের মত অবিনশ্বর সত্য হয়ে থাকে। অর্থাৎ অদ্বয় অব্যয় ও শাশ্বত সনাতন অব্যক্ত অবিনশ্বর ঈশ্বর ভিন্ন আর বাকি যা কিছু আজও আমাদের নিকট যে সকল বিষয়বস্তু অজানা বলে মনে হচ্ছে বা হয় মূলতঃ কিন্ত পারমার্থিক দৃষ্টিতে তাঁর আর কোন অব্যক্ততা নেই, যেহেতু অন্তরে বাইরে তিনি সবার মধ্যে সর্বক্ষণ একসত্তারূপে বর্তমান হয়ে আছেন এবং তাঁর লীলা তিনিই প্রয়োজনে যতটুকু যা প্রকাশ প্রয়োজন তা প্রকাশ করছেন বা কখনও অপ্রকাশ থাকছেন অথবা পূর্ণ প্রকাশ হয়ে উঠছেন, এই মহিমা সম্পূর্ণ তাঁর।

'এক' যেহেতু দুই হতে পারেন না। শুধু যা কিছু দেখছি তা প্রকাশের ভিন্নতা বা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন মাত্র, প্রকারান্তরে তাঁর তিনপাদের একপাদ যা ব্যক্ত পৃথিবীরূপে পূর্বথেকেই বহিঃপ্রকাশ হয়ে আছে– প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে, স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে, বা ইতিহাসের পাতায় কালের গর্ভে আজ পর্যন্ত যা অবলুপ্ত বলে মনে হয় উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার– দার্শনিক ডারুইনের পূবেই তাঁর অভিব্যক্তবাদ (Theory of evolution) যাকে বলে জীবের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধীয় মতবাদ প্রকাশ করেছেন বলে যে বিশ্ব-আখ্যায়িত হয়েছেন; তার কয়েক হাজার বৎসর পূর্বেই উপনিষদে ঋষিগণ জীবের এই ক্রমবিবর্তনবাদ আলোচনা করেছেন। যেমন হার্বার্টের অভিব্যক্তবাদের পরে ডারুইনের অভিব্যক্তবাদ বেশি পরিচিতি লাভ করেছে। জগদীশ চন্দ্র বসুর চেয়ে মার্কিনীর রেডিও আবিষ্কার বেশি আলোচিত হয়েছেন। বিষয়টি আমি এই মতামতের

উপর নির্ভর করেই একবিংশ শতাব্দীতে যা চির নতুন যাঁর সম্পর্কে বলার শেষ হয় না, তাঁকে কেন্দ্র করেই শিক্ষার অভিব্যক্তবাদ স্বামীজির জীবন দর্শন ও আদর্শের উপর প্রশংসিত আদর্শটি সংযুক্ত করে বুঝাতে চেষ্টা করেছি। স্বামীজি যেমন ত্রিকালদর্শী শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে তাঁর জীবন শিক্ষা-সমস্যার সমাধানের চাবিকাঠি খুঁজে পেলেন, ব্যবহারিক বস্তুগত জীবনে যে অজ্ঞেয়বাদী হার্বার্ট স্পেন্সারের শিক্ষা পুস্ত কটিকে সে সময় যে দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি নিজে অজ্ঞেয়বাদী সেজে তাঁর শিক্ষার আদর্শকে স্বীকার করে– শ্রেষ্ট বলে আখ্যায়িত করেছিলেন এবং উক্ত শিক্ষা গ্রন্থে হার্বার্ট– শিক্ষাকে যে দৃষ্টিতে বৌদ্ধিক, নৈতিক এবং ভৌতিক এই তিন অধ্যায়ে আলোচনা করে প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন সেই স্বামীজিই পরবর্তিতে তিনি তাঁর মতবাদের সাথে একমত হয়ে থাকতে পারেন নি। অথচ তিনি অতি দক্ষতার সাথে বহু ত্যাগ ও কষ্ট করে দার্শনিক হার্বার্ট-এর ইংরাজী ভাষায় অনুদিত শিক্ষা পুস্তকটি ভারতবাসী তথা জাতির জীবনে মঙ্গল আনয়ন লক্ষ্যে পাশ্চাত্য দার্শনিক পরিভাষাকে বাংলাভাষায় রূপান্তরিত করে যে দুরূহ কাজটি করেছিলেন তাতেই প্রমাণ হয়– আমরা যখন যা বলি তখন সেটিকে যে দৃষ্টিতে নীরেট সত্য বলে দাবি করি অথবা সেটি যে একেবারেই মিথ্যা তাও কিন্তু নয়; তা আপাত ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্য মনাই যুক্তি সন্নত। কিন্তু উচ্চসত্য আরও সামনে। এই উচ্চসত্য লাভকারীই হলেন প্রকৃত দার্শনিক। আর আমরা যুগোপযোগী যাঁদের দার্শনিক বলি তাঁরা বর্তমান কালের নব্যবুদ্ধিবাদী ব্যবহারিক বস্তুবাদী যুক্তিবাদী তার্কিক পন্ডিত বা দার্শনিক। অল্প সত্যের অধিকারী। এই সত্যের যে প্রয়োজন নেই তা বলি না, বরং এই সত্যই যে এককালে সেই সর্বোচ্য আলোকিত এক সুমহান সর্বশ্রেষ্ঠ উচ্চ সত্যে কোন একদিন পৌঁছে দিবে সেই লক্ষ্যেই এর অগ্রযাত্রা বা অভিব্যক্তি বলে– বলা উচিত। তবে সত্য সত্যই।

স্বামীজি পরবর্তিতে শিক্ষা পুস্তক না লিখলেও শিক্ষার উপর যেসকল আলোচনাগুলি করে গেছেন তা সর্বকালীন শাশ্বত সত্য বেদান্ত দর্শনের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর যা সুপ্রতিষ্ঠিত; যা কোন কালে ব্যতিক্রম ঘটেনি, পূর্বথেকে আজ পর্যন্ত যা একই মত আছে– তারই আলোকে জানালেন, “মানুষের অন্তর্নির্হিত পূর্ণতার প্রকাশই শিক্ষা। এই পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে বর্হিজগত হইতে কিছু বিষয় আহরণ করিলেই চলিবেনা, যে-জ্ঞান

মনের অভ্যন্তরে পূর্ব হইতেই অবস্থিত, তাহার উপরের আবরণগুলিকে সরাইয়া দিতে হইবে। তাহার জন্য চাই ভাবের আন্তরীকরণ, চাই সদ্গুরুর সান্নিধ্য, চাই ব্রহ্মচর্য ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ।"[১]

অর্থাৎ সময় বা কালটিই আমাদের সম্মুখে যুগপৎ অতীত ও বর্তমান রূপ হয়ে দেখাচ্ছে, বা কখনও ভবিষ্যৎ রূপ হয়ে দেখা দিচ্ছে। এটি সম্পূর্ণ আমাদের নশ্বর ইন্দ্রিয়গত চেতনারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। যেমন এক সত্যকে কখনও আমরা প্রাতিভাসিক রূপে, কখনও ব্যবহারিক রূপে, কখনও পারমার্থিক রূপে এক এক সময় এক এক রকম দেখে থাকি।

কখনও মিথ্যা, কখনও ভ্রম বা কখনও সত্য বলে প্রতিপন্ন করি, কিন্তু সত্য সত্যই । তার কোন পরিবর্তন নেই। এখন যা সত্য, কাল বা কিছু সময় পরে যা সত্য– তাও সেই একই সত্য। সবকিছু দৃষ্টিভঙ্গির খেলা। আমাদের প্রাচীন দর্শন, বেদ, উপনিষদ এই শিক্ষাই দিচ্ছেন। সত্যদ্রষ্টা অবতার মহামানবগণও এই দর্শনকেই প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। অদ্বৈতবাদী শংকর দর্শন প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূবেই এই দর্শন দেখিয়ে ও দেখায়ে গেছেন। বুদ্ধ তারও পূর্বে ব্যক্ত করে গেছেন।

শিক্ষা বিষয়ক পর্যালোচিত আলোচনাগুলিও সকল প্রকার চিন্তা ও চেতনাও আলোচিত পটভুমিকারই অন্ত র্ভূক্ত বলে ভারতীয় দর্শন স্বীকার করেন। সৃষ্টিকর্তাই একমাত্র আদি শিক্ষক বা গুরু। তারপর অধুনাতনকাল পর্যন্ত যা কিছু পেয়েছি বা পাচ্ছি সবই অনুকৃত। নতুন বলে কোন কিছুর দাবি রাখতে আইনত পারি না। নতুন একমাত্র তিনি (ঈশ্বর) বাকি সব পুরাতন। যদিও আধুনিক আবিষ্কারের যুগে এই মতদান অচল কিন্তু আর এক দার্শনিক দৃষ্টিতে পূর্বালোচনাটিই সত্য। অতএব আপনার মতে যেটি সত্য আমার মতে তা মিথ্যা। আপনার মতে যা নতুন আমার মতে তা পুরাতন। সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত এই পরস্পর বিরুদ্ধবাদ বা এমন নিয়মেই চলে আসছে। এই মতটিও সত্যের একটি দাবিদার। অতএব আপন-পর করার কোন যুক্তি বা উপায় নেই। তুমি যদি বল তোমারটি সত্য তবে আমিও বলতে পারি আমারটিও সত্য। অতএব নতুন কিছু নেই সব পুরাতন। পুরাতনকে নতুন রপে রূপদান করাই হল আমরা যাকে বলছি নতুন, এ সেই নতুন। অর্থাৎ যে হারিয়ে গেছে এখানে তাকে আপন জীবনে ফিরিয়ে আনাই নতুন।

১। স্বামী বিবেকানন্দ, **শিক্ষা**, কলিকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়, বেলুড় মঠ, প্রথম সংস্করণ ১৯৮১, পৃ., ২

জ্ঞানই শিক্ষা, শিক্ষাই জ্ঞান। আর– সব জ্ঞানই বেদ। বেদ মানেই জ্ঞান। এবং এই বেদ হতেই বেদান্ত। ঈশ্বর যেমন অনন্ত, বেদ বা জ্ঞানও অনুরূপ অনন্ত। স্বামীজিও সে কথা বলেছেন,

> জ্ঞান কেহই সৃষ্টি করিতে পারে না। তোমরা কি কখনও জ্ঞানকে সৃষ্ট হইতে দেখিয়াছ? ইহাকে আবিষ্কার করা যায় – যাহা আবৃত ছিল, তাহাকে অনাবৃত করা যায়। জ্ঞান সর্বদা এইখানেই অবস্থিত, কারণ জ্ঞানই স্বয়ং ঈশ্বর। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের জ্ঞান সবই আমাদের সকলের মধ্যেই রহিয়াছে। পূর্ব থেকেই আছে। আমাদের দেশে যিনি বেদ পাঠ করেন, তাঁহার সন্মুখে আমরা নতজানু হই। আর যে ব্যক্তি পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছে, তাহাকে আমরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না। এটা কুসংস্কার– মোটেই বেদান্তমত নয়। এও জঘন্য জড়বাদ। ঈশ্বরের নিকট সকল জ্ঞানই পবিত্র। জ্ঞানই ঈশ্বর। অনন্তজ্ঞান পরিপূর্ণরূপে সকল মানুষের মধ্যেই নিহিত আছে। যদিও তোমাদিগকে অজ্ঞের ন্যায় দেখায়, কিন্তু তোমরা সত্য সত্যই অজ্ঞান নও। তোমরা ভগবানের শরীর – তোমরা সকলেই। তোমরা সর্বশক্তিমান্ সর্বত্রাবস্থিত, দেবসত্তার অবতার। তোমরা আমাকে উপহাস করিতে পার, কিন্তু একদিন সময় আসিবে, যখন তোমরা বুঝিতে পারিবে, অবশ্যই বুঝিবে–কেহই বাকি থাকিবে না।[২]

পরিশেষে শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে এই নির্ধারিত হয় যে, নিজেকে আগে দর্শন করাই হল যথার্থ শিক্ষা। এই জানা কথাটিই একটি অজানা। কারণ যতক্ষণ না তা নিজ জীবনে প্রমাণ হয়ে না ফুটে ওঠে। নিজে জেনেই অতঃপর জানার দাবি তুলাই প্রকৃত জানা, তাই নতুন। নচেৎ এ কথার কথা। সবাই যেমন বলেন এও তেমন তাই। শুনে বলা আর জেনে বলার মধ্যে পার্থক্য থাকবেই।

পাঠশালা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আমাদের বর্তমান শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি হল– শিক্ষকের কর্তব্য হচ্ছে– কতকগুলি ইনফরমেশান দিয়ে ছাত্রের ভিতরটিকে সাজিয়ে তুলা। কিন্তু প্রাচীন দার্শনিক শিক্ষকদের কর্তব্য ও উদ্দেশ্য ছিল–সে কে ? আগে তার পরিচয় জানিয়ে দেওয়া। তার মাঝেই যে অনন্ত শক্তি বিদ্যমান এই 'অভীঃ' (ভয়হীন) মন্ত্রে তাকে দীক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত করে তুলা।

২। স্বামী বিবেকানন্দ, **বাণী ও রচনা**, কলিকাতা: উদ্বোধন কার্যালয় ৩য় খন্ড, ১ম সংস্করণ, ১৩৬৯ সাল, পৃ., ৩৮৬

বালক নরেন্দনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) যখন পাঠশালার ছাত্র ছিল তখন সে হয়তো শিক্ষকের হাতে কোন না কোন দিন মার খেয়েছে, কিন্তু কোন ঘটনায় সেই মার খাওয়া ছাত্রটিই সুশিক্ষক দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন শ্রীরামকৃষ্ণের ছাত্র হয়ে এসে– তাঁর স্নেহ প্রীতি ও মমতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাঁরই করুণার স্পর্শে তাঁর জ্ঞানের দুয়ার উন্মোচিত হয়ে গেল। এতখানি জ্ঞান যে তাঁর ভিতর ছিল তিনি তা স্কুল কলেজ থেকে পাননি। বর্তমান শিক্ষা দার্শনিকগণ এর বিপরীতে অবশ্য বলবেন, বর্তমানের স্কুল কলেজগুলি কি কোন ভাল লোক সৃষ্টি করেন নি ? In spite of this education বিবেকানন্দ, নিগমানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ জন্মাল কি করে? এটাই আশ্চর্য। অনুসন্ধানে জানা যায়, এঁরা বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির স্কুল ও কলেজের Product ছিলেন না। এঁরা আর এক মেশিনারীর প্রডাক্টশান। এই যে অজানা বিদ্যা বা জ্ঞান এ শুধু শংকরাচার্য, বিবেকানন্দ, নিগমানন্দ, অরবিন্দ, অনির্বাণ বর্তমান কালের ডঃ মহামব্রহ্মচারীজি শুধু এঁদের মধ্যেই যে সীমাবদ্ধ তা কিন্তু নয়, এই জ্ঞান সব শিক্ষার্থীর মধ্যেই আছে। আপনার মধ্যেও আছে, আমার মধ্যেও আছে। শুধু আবরণ উন্মোচনের জন্য চাই আদর্শ শিক্ষক, যিনি আত্মজ্ঞানী। এই শিক্ষা এককালে গ্রীসদেশেও ছিল। এমন শিক্ষক শুধু তাঁদের বেলাতেই ছিল, আমাদের বেলায় তা এখনও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। দূর্ভাগ্য আমাদের এখানেই। কারণ আমাদের উপর পাশ্চাত্যের বর্তমান শিক্ষা এমনভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আমাদের আর বের হওয়ার কোন উপায় নেই। আমাদের জাতীয় শিক্ষাকে এইভাবেই নষ্ট করা হয়েছে এবং এই লক্ষ্যেই আমাদের আজ সর্বনাশ ঘটেছে। এর ফল যে অন্যদিকে পাশ্চাত্যরা নিজের পায়ে নিজেই কুঠার মেরেছে, পরের জন্য খাল কেটে যে কুমির ডেকে এনেছে, তা তারা তখন বুঝেনি, বুঝেছে এই দেশ ত্যাগ করে চলে যাওয়ার সময়। সেই ভুলটি ছিল তাদের জাতীয় ভাষা ইংরেজী আমাদের বাধ্য করে শিখানো। যা তারা ঘুনাক্ষরেও পূর্বে বুঝতে পারেন নি। এইভাবে তাদের যে নিজ কর্মদোষে বাধ্য হয়ে– এই দেশ ত্যাগ করে চলে যেতে হবে, এটাই তাদের বুদ্ধিহীন অজ্ঞানতা ও দুর্বল শিক্ষার উপযুক্ত কারণ। অর্থাৎ নিজের গুমার নিজেই ফাঁক করে দিয়েছেন।

মানুষের জীবনটি কি শুধু বুদ্ধির উপরেই নিয়ন্ত্রিত না ইচ্ছার উপর ? এটি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষত শিক্ষাবিদ্‌গণ না জানলেও আমাদের জাতীয় শিক্ষা আমাদের প্রমাণ দ্বারা বুঝিয়েছেন। ইচ্ছা শক্তির উপর আর কোন বৃহৎ শক্তি আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়নি। ভারতবাসীর জন্য এটিই মহাশক্তি অর্জনের একমাত্র হাতিয়ার। শুধু বিদ্যা কেন অসম্ভব আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে সব ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অনায়াসে অর্জন সম্ভব। মানুষ তৈরি করাই হল আমাদের জাতীয় শিক্ষা শক্তির উৎস। রবীন্দ্রনাথ তাই আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননী, রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি।" শিক্ষকশ্রেষ্ঠ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাই শিক্ষার্থীদের জানালেন, যদি প্রকৃত মানুষ ও সুশিক্ষক হতে চাও তবে প্রতিদিন একটি প্রার্থনা জানাবে– "অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে, নির্মল কর, উজ্জ্বল কর, সুন্দর করহে ।" এটিই হল শিক্ষার মূল মন্ত্র ও মূল তত্ত্ব। এই শক্তিই একদিন আমাদের বলতে সাহায্য করবে, ঋষির বাণী–

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।" হে অমৃতের পুত্রগণ ! তোমরা সকলে শোন, আমি সেই জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে জেনেছি। অন্ধকারের পরপারে যিনি অবস্থান করছেন আমি তাঁকে দেখেছি, জেনেছি এবং চিনেছি। আমি তিনিই তিনি আমিই। এই শিক্ষাই ভারতীয় জাতীয় শিক্ষা। এই শিক্ষাই বর্তমান সময়ে আমাদের জন্য নতুন শিক্ষা। এই শিক্ষার কথা বেদ উপনিষদে শুনলেই পুরানা হয়না বরং আপন আপন জীবনে 'বোধে-বোধ' হওয়াটাই এর নতুনত্ব। স্বামী বিবেকানন্দ, নিগমানন্দ ও অরবিন্দের বর্তমান সময়ে শিক্ষা চিন্তার গ্রহণযোগ্যতা এবং তাঁদের শিক্ষা বিষয়ক এটাই অন্তর্নিহিত তাৎপর্যতা।

৬.১.৩: বর্তমান সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ সংস্কার চিন্তার গ্রহণযোগ্যতা

প্রাকঐতিহাসিক কাল থেকেই ভারতে জাতিগত, সমাজগত সংঘর্ষ লেগেই আছে। কখনও বাহ্যজাতির সংঘর্ষে ভারত ক্রমে বিনিন্দ্র হচ্ছে, কখনও অল্পজাগরূকতার ফলস্বরূপ স্বাধীন চিন্তার কিঞ্চিৎ উন্মেষ ঘটছে। একদিকে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিপ্রতিঘাতিপ্রভা, অপরদিকে আর্যসমাজের কঠোর নিয়মতান্ত্রিক বহু

সম্প্রদায়গত প্রভাব ভারতের সামাজিক জীবনে অনেক বিভ্রান্তি ছড়ালেও এর মর্মভেদী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ধর্মের জন্য ভারতের অন্তর্নির্হিত ঐক্যতা এক।

পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজি বহুদেশ ভ্রমণ করেন। শুধু তাই নয়–বরং সে সব দেশের, পরিবারের ও সমাজের – শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, সভ্যতা, সমাজ ব্যবস্থা এবং তাদের ভাষা সাহিত্য ইতিহাস এবং ভিত্তিভূমি নিঁখুতভাবে তুলনামূলক পর্যলোচনা করে ভারতবাসীকে উদ্বোধিত করেন। তিনি গবেষণা করে দেখেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজ যেমন একদিকে পরস্পর বিরুদ্ধ অপরদিকে সম্মিলিত। একে অপরের নিকট আমাদের যে অনেক কিছু শিখার আছে তা আমরা কেউ আমলে নেই না বা মানতে চাই না।

সমাজে দুই শ্রেণীর লোক দেখতে পাওয়া যায়, একদলের মতে– পাশ্চাত্য সভ্যতার যা কিছু সবই নিঁখুত ও সর্বাঙ্গসুন্দর। অপর দলের নিকট এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এদের নিকট হিন্দু সমাজেরও যে– কোন দোষ ত্রুটি থাকতে পারে তারা তা একেবারেই অসম্ভব বিবেচনা করেন। একবিংশ শতাব্দীর যুগে পাশ্চাত্য সমাজ ও সভ্যতা প্রায় সমগ্র পৃথিবীকে এমনভাবে গ্রাস করেছে যে, আমাদের নিজেদের যা কিছু আছে আজ তা সব ভুলে সবকিছু বদল করে নিয়েছি। নিজের অস্তিত্বটুকুও রাখিনি– এটাই আমাদের সর্বণাশের মূল কারণ। বর্তমান সমাজ সংস্কারের চিন্তায় আজ আমরা আমাদের ঐতিহ্যকে পিছনে ফেলে দিয়েছি। স্বামীজি এই চিন্তা করেই ভারতমাতার সকল গুণগুলি জাতির সামনে তুলে ধরে বুঝাতে চেয়েছেন যে, আমরাও কম উন্নত নই। তিনি আরও প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ভারতমাতা যেহেতু সর্বংসহা ও সর্বগ্রাহ্যকারিণী মহাশক্তির আধার এবং এর গ্রহণ ও বর্জন, ত্যাগ ও ভোগ দুটি ক্ষমতাই আছে। তখন এ জাতির জন্য কারও উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই।

যে জাতি ও সমাজ প্রাক্ঐতিহাসিককাল অর্থাৎ বৈদিক যুগ থেকেই– মহানুভবতা উদারতা ও ত্যাগের মূর্ত প্রতিভূ, যে স্বদেশবাসীর বিশ্বাস – সকল স্বার্থশূন্য কাজই সৎ এবং সকল স্বার্থপরতাই অসৎ। এই লক্ষ্যে হিন্দুর প্রাচীন সভ্যতা হতে এই প্রমাণ লাভ করতে পারি– হিন্দুর নিজের জন্য গৃহ নির্মাণ স্বার্থপরতা। বরং হিন্দু গৃহ নির্মাণ করে– ঈশ্বরোপাসনা ও অতিথি সেবার জন্য, তারা মনে করে নিজের জন্য আহার্য রন্ধন স্বার্থপরতা, তাই সে রন্ধন করে দরিদ্রসেবার জন্য; যদি কোন ক্ষুধার্থ আগন্তুক প্রার্থী আসে, তবে আগে তার

সেবা করে অবশেষে সে নিজের আহার্য গ্রহণ করে– এই ভাবটি হিন্দু সমাজে আজও কমবেশি সর্বত্র বিরাজ করছে। যে কেউ খাদ্য ও আহার্য প্রার্থী হোক না কেন, সব দরজাই তার জন্য খোলা। হিন্দুর জাতিভেদ ও সমাজভেদের সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। হিন্দু সমাজ ও জাতির বৃত্তি বহুকাল ধরে বংশগত, প্রকৃত অর্থে যদিও গুণ ও কর্মগত। কিন্তু বর্তমানে এই প্রথাকেই সবাই বরণ করে নিয়েছেন। একজন ছুঁতোরমিস্ত্রির ছেলে ছুঁতোর হয়েই জন্মায়, স্বর্ণকারের ছেলে স্বর্ণকার, কারিগরের ছেলে কারিগর, পুরোহিতের ছেলে পুরোহিত। এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে সমাজিক যে সকল ত্রুটি তা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। হাজার হাজার বৎসরের তুলনায় এই সংস্কার কিছুই নয়। এখান থেকেও একটি ভালদিক বেরিয়ে আসবে। যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বর্তমানে বৈশ্য ও শূদ্রের কর্ম করে দেশ জাতির কল্যাণে আরেক ভাবে আত্মনিয়োগ করেছে। এতে এককালের শূদ্রের নীচত্ব দূর হতে শুরু করেছে। তারা আজ ধর্মে কর্মে সবার সন্মানভাজন হয়ে উঠছেন।

এমন এক ত্যাগী উদার ও সেবাপরায়ণ জাতির পক্ষে সামান্য ভোগের হাওয়া তাকে অত সহজে দোলায়িত করতে পারে না। তার নিকট ভোগসুখ যত সুন্দরই হোক ত্যাগসুখ তার থেকেও অনেক বড়। স্বামীজি প্রব্রজ্যাকালীন বহু দেশে গিয়ে তাদের জ্ঞান, চিন্তা, চেতনা, শিক্ষা, সভ্যতা, আদর্শ ও কৃষ্টি যা কিছু সব জেনেই তবে তাদের স্বাগত জানিয়েছেন। এটি তার একটি দীপ্তজ্ঞানের উচ্চচিন্তার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু আমরা তা না বুঝে বিদেশীদেরকে আমাদের সমাজে আমরা মিশতে দিতে অনীহা প্রকাশ করি। তাদেরকে অন্তরে উপেক্ষা করে ম্লেচ্ছ বলে গালাগাল দেই। তারাও আমাদের ‘কালো দাস’ বলে ঘৃণা করে। এসবই হল উভয় দেশ ও জাতি সমাজের পরস্পরের নগ্নদৃষ্টির বহিঃপ্রকাশ। পরস্পর উন্নতির বাঁধা। স্বামীজি এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অন্ধকার দূর করে জানালেন, “প্রত্যেক জাতি-সমাজের এক একটা নৈতিক জীবনোদ্দেশ্য আছে, সেইখানটা হতে সেই জাতি সমাজের রীতিনীতি বিচার করতে হবে। তাদের চোখে তাদের দেখতে হবে। আমাদের চোখে এদের দেখা, আর এদের চোখে আমাদের দেখা– এ দুই ভুল।”[৩]

৩। পূর্বোক্ত, স্বামী বিবেকানন্দ, **বাণী ও রচনা**, পৃ., ১৯৬

Evolution Theory বা পরিণামবাদে – স্বামীজি পরিণামবাদকে যে ভারতের মূল ভিত্তি বলে অভিহিত করেছেন, এখন সেই পরিণামবাদ ইউরোপীয় বর্হিবিজ্ঞানে প্রবেশ করেছে। ভারত ছাড়া অন্য সকল দেশের ধর্মে ছিল দুনিয়াটা সব টুকরো টুকরো, আলাদা আলাদা, এইরকম পশুপক্ষি কীট-পতঙ্গ সব আলাদা আলাদা সৃষ্টি। জ্ঞান অর্থ যে, 'বহুর মধ্যে এক দৃষ্টি' তা তারা আজও জানে না, জানলেও মানে না। এই জন্য ভারতের মত তারা সবাইকে আপন করে গ্রহণ করতে পারে নি। এই পরিণামবাদেরই ফল আমাদের প্রতি তাদের ঘৃণা জন্মা।

কিন্তু আমাদের ধর্ম বিজ্ঞান বলেন, ছোট জানোয়ার বদলে বদলে বড় জানোয়ার হচ্ছে, বড় জানোয়ার কখনও ছোট হচ্ছে, লোপ পাচ্ছে; তেমনি তেমনি মানুষও যে একটা সুসভ্য অবস্থায় দুম করে জন্ম পেল, একথা বিশ্বাস কেউ করে না। কারণ অসভ্য থেকে সভ্য না সভ্য থেকে অসভ্য এটি আজ পর্যন্ত নির্ণয় হয়নি। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বেশ বুঝা যায় ভাল-মন্দ, সভ্য-অসভ্য সব সময় মিলে মিশেই ছিল। যেমন শ্রীরামচন্দ্র আর্যরাজা, রাবণ লঙ্কার রাজা, রামায়ণে বেশ লেখা আছে, রাবণ কত হিংস্র অমানবিক ও আসুরিক প্রকৃতির অথচ শ্রীরামচন্দ্র কত মহৎ উদার। সভ্যতার দিকে যদি তাকাই তবে রামচন্দ্রের রাজ্যের চেয়ে লংকার সভ্যতা অনেক বড় বই কম নয়, যেমন গোড়া থেকে ইউরোপের উদ্দেশ্য–

"সকলকে নাশ করে আমরা বেঁচে থাকবো, আর্যদের উদ্দেশ্য সকলকে আমাদের সমান করবো, আমাদের চেয়ে বড় করবো। ইউরোপের সভ্যতার উপায় তলোয়ার, আর্যের উপায় বর্ণবিভাগ, ইউরোপে বলবানের জয়, দুর্বলের মৃত্যু, ভারতবর্ষের প্রত্যেক সামাজিক নিয়ম দুর্বলকে রক্ষা করা।"[৪]

স্বামীজির সর্বোতমুখী প্রতিভার দয়ায় বর্তমান ভারত আজ বঙ্গসাহিত্যে এক অমূল্য রত্ন সদৃশ। তমসাচ্ছন্ন ভারতেতিহাসে একটা পূর্বপর সম্বন্ধ দেখা অতি কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে। স্বামীজি আজ আমাদের দেশের মানুষের চোখ খুলে দিয়েছেন। তাঁর প্রতিভার গুণেই আজ আমরা পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ শান্তি প্রিয় জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছি। ত্যাগ মহানুভতার সম্মানে ভূষিত হয়েছি। বর্তমান সমাজ সংস্কারকগণও ভারতকে জানতে চিনতে শিখেছে। 'মদাত্মা সর্বভূতাত্মা, সর্বভূতান্মমদাত্মৈব'। 'আমার আত্মাই

৪। ঐ, পৃ., ২১১

সর্বভূতের আত্মা, সর্বভূতের আত্মাই আমার আত্মা', এই একটি মাত্র আবিষ্কারের ফলেই আজ আমরা বিশ্ববরেণ্য হয়েছি। সেবা, উদারতা, মানবতা ও মহানুভবতা প্রকৃত অর্থে কি এই ভারত থেকেই সবাই শিক্ষা লাভ করেছে। এই শিক্ষা হঠাৎ করে আসেনি– হাজার হাজার বৎসরের ত্যাগ তপস্যার ফলরূপে ভারতধর্মের মহান ঋষিপুরুষগণ এই তত্ত্ব আবিষ্কার করে আমাদের ধন্য করে গিয়েছেন। এই গুণগুলি যে একমাত্র ত্যাগ তিতীক্ষা ও কঠোর তপস্যার ফলেই অর্জিত হয় তা আমাদের জাতি সমাজ আজ জানতে পেরেছে।

ভারতেতিহাসের যে অভাব পাশ্চাত্যরা ভাবেন তা ঠিক নয়, বরং এর সম্বন্ধ সংযোজনে ভারত সন্তানই একমাত্র সমর্থ। এবং যথার্থ শিক্ষা ও সংগঠন একদিন তাদের দ্বারাই সম্ভব হবে। কারও নিকট মাথা বিক্রি করতে হবে না। স্বামীজির এই বলিষ্ঠ আহ্বান সারা পৃথিবীকে কম্পিত করে তুলেছে। স্বামীজির আশা ছিল মহাপুরুষদিগের অলৌকিক প্রাতিভ-জ্ঞানোৎপন্ন শাস্ত্রশাসিত সমাজের শাসন রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, মূর্খ, বিদ্যান – সকলের উপর অব্যাহত হাওয়া অন্ততঃ বিচারসিদ্ধ, কিন্তু কার্যে এটি প্রতিফলিত যতদিন না সম্পূর্ণ হচ্ছে, ততোদিন ভারতের সার্বিক উন্নতি ব্যহত হতেই থাকবে। আমেরিকার গঠন-তন্ত্র যদিও আমাদের সামনে আমাদেরকে মুক্ত উদার কণ্ঠে শাসাচ্ছে যে, 'এদেশের প্রজাদিগের শাসন প্রজাদিগের দ্বারা এবং প্রজাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত হইবে।' এই পদ্ধতি ত্রেতাযুগে এই ভারতবর্ষেই রাজা রামচন্দ্র বহুপূর্বে প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়ে গেছেন।

এই শাসনপদ্ধতি ও গৃহিত নীতি আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে লাভ করেই আজ তারা আমাদের সত্তায় সত্তবান হয়ে নিজেদের মহিমা ছড়াচ্ছে। আড়াইশত বৎসর ভারত শাসন কালীন সময়ে তারা এভাবেই আমাদের সম্পদ হরণ করে আজ নিজেদের প্রতিভা ছড়াচ্ছে। আজ যে সৃজনশীল বিদ্যা শিক্ষার কথা দেশে প্রচার করা হচ্ছে তাও আমাদেরই পূর্বার্জিত বিদ্যা।

মূল বিষয়টি হল– স্বামীজির বর্তমান সমাজ সংস্কার ও চিন্তা-চেতনার গ্রহণযোগ্যতা যদি আমরা পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে চাই এবং বর্তমান সময়ে কাজে লাগাতে চাই – তবে অনেক আলোচনার মধ্যে পড়লেও মূল কয়েকটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি দিতে হবে। তিনি ভারতের পুনুরুদ্ধার চিন্তা যে দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন সেগুলি

হল– প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার জ্ঞানার্জন, ধর্ম ও মোক্ষ সম্পর্কে পর্যালোচনা, স্বধর্ম বা জাতিভেদ যা বৈদিক সমাজের ভিত্তি ও তার আলোচনা, শরীর ও জাতিতত্ত্ব ,অর্থাৎ সাদা-কালোর বিচার। পরিচ্ছন্নতা, অর্থাৎ বাহ্যসূচি ও অভ্যন্তরসূচি , আহার ও পানীয় অর্থাৎ স্থানভেদে, জলবায়ুভেদে ও কার্যভেদে এর গ্রহণযোগ্যতা, বেশ-ভূষা কাপড়-চোপড়ে ভদ্রতা ও অভদ্রতা বুঝানো, রীতি নীতি, এক এক দেশের এক এক নীতি ও এক এক পদ্ধতি এসব বিষয়ে জ্ঞানলাভ। পাশ্চাত্যের শক্তিপূজা, অর্থাৎ যেমন আমাদের শক্তিমান দেবদেবীদের পূজা, অনুরূপ তাদের কলকারখানা ও যন্ত্রপাতির উন্নত ব্যবহার বা পূজা। নবজন্ম যাকে আখ্যা দিয়েছে– রেনেসাঁ। সর্বশেষ সমাজের ক্রমবিকাশ এবং পরিণামবাদ। স্বামীজির আলোচিত এই সমস্ত বিষয়গুলির উপর মনোনিবেশ করলেই জানতে পারবো বর্তমানে কেন তাঁর সমাজচিন্তা-চেতনার সংস্কার আজ আমাদের জন্য সবিশেষ গ্রহণযোগ্যতার অধিকারভূক্ত।

পৃথিবীতে শুভ-অশুভ শক্তি– সৃষ্টির আদি থেকেই ছিল, আছে এবং থাকবে। এটাই সৃষ্টির নিয়ম। যেহেতু আমরা সৃষ্টির আদি জানি না, অন্তও জানি না, তখন আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি না আমাদের ধারণা বা হিসাব মতবাদটি পূর্বে অসভ্য, বর্বর ছিল। বেদ প্রমাণ করে – আমরা পূর্ব থেকে উন্নত, সভ্য, সত্য ও ন্যায়পরায়ণ ছিলাম, পরে কালের বিবর্তনে আমরা আবার অশুভের আশ্রয়ে অসভ্য বর্বর হয়েছি। কারণ নীতিশাস্ত্র বলে– উন্নত থেকেই অনুন্নত। অনুন্নত থেকে উন্নত হতে পারে না। যেমন আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্য উন্নত হয়েও এই বর্তমান সময়ে অশুভের আশ্রয়ে বিপর্যস্ত ও কবলিত হয়ে অসভ্য বর্বর হয়ে নিজেকে গড়ে তুলছি, সভ্য হয়েও অসভ্যতার কর্ম করছি। বিবেকবান হয়েও অবিবেচিত কর্মে লিপ্ত হয়েছি। ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য আমরা পিতারূপে সন্তানকে, সন্তান হয়ে পিতাকে খুন করছি। মা বোনের সন্মানের উপর অকথ্য জুলুম অত্যাচার করছি, মা-বোনদের উপর বর্বরোচিত নির্যাতন ধর্ষণ অহরহ ঘটাচ্ছি। পত্রিকার পাতা খুললেই হেড লাইন হিসেবে সেগুলি প্রতিদিন প্রকাশ পাচ্ছে। এখনও কি আমরা এযুগে দাঁড়িয়ে দাবি করতে পারি আমরা সভ্য ? অতএব প্রতিযুগেই সভ্য অসভ্য ছিল, প্রাচীন গ্রীস দেশ যেমন একসময়ে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ছিল, তখন ইউরোপবাসীগণ তাদের তুলনায় নগণ্য, অনুর্বর ও অজ্ঞানী ছিল। এইভাবেই কত শত জাতিসংঘাত সৃষ্টি ও

ধ্বংস হয়েছে। সভ্যের সাথে সভ্যের তুলনা হয়েছে। আজ আমরা গরীব হয়েছি। অথচ এককালে পৃথিবীব্যাপী রাজ্য শাসন করতাম, সর্বজয়ী ছিলাম। আজ বর্হিবিশ্ব আমাদের লক্ষ্মী সরস্বতীর সম্পদ (অর্থাৎ ধন ও জ্ঞান) উভয়কে একাধিপত্য হিসেবে অর্জন করেছে। তারা আজ বড়াই করছে, প্রতিযোগীতায় নেমেছে। আমরা আজ সব হারিয়ে ফেলে নিঃস্ব হয়েছি বলে। স্বামীজি তাই এই অত্যাধুনিক যুগে আবির্ভূত হয়ে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন শাশ্বত সেই বেদ বাণী– "উত্তিষ্ঠ জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্ নিবোধত।' হে ভারত সন্তানগণ ! আর ঘুমিয়ে থেকো না, উঠ, জাগ, সন্মুখে তাকাও, অগ্রসর হও। তাকিয়ে দেখ, তোমার সামনে অন্ধকার দূর করা কত আলো। ধর্ম তোমাদের মূল জাতিসত্তা, তোমরা তাকে পুনঃ বরণ ও গ্রহণ কর। তবেই তোমরা আবার বীর জাতিতে পরিণত হবে। আবার চিরমুক্ত উন্নতশীর হয়ে বিশ্বের বুকে ধ্বজা ধারণ করবে।

তোমরা পূর্বপুরুষদের অর্থাৎ পুরোহিতদের শক্তি অর্জন কর, রাজা ও প্রজার শক্তি অতীতে রাজারা যেভাবে প্রজাবাৎসল্য নীতিতে করে গেছেন, সেই নীতি গ্রহণ কর। মুসলিম অধিকার থেকে দেশকে এবং নিজেকে রক্ষার জন্য সত্যের পূজারী হও। কেউ যেন আর ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্বকে ধুলিষ্যাৎ করতে না পারে। আজ আমরা যত বৈশ্য ও শূদ্রশক্তির (ব্যবসা বানিজ্য ও সেবা ধর্ম) আধিপত্য লাভ করতে পারব আমরা ততই পাশ্চাত্যদের সমকক্ষ হতে পারবো। ততই আমাদের মধ্যে ক্ষাত্রশক্তি (বাহুবল) বৃদ্ধি পাবে। পুনঃ ব্রাহ্মণ্যশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠবে। আমরা আবার পৃথিবীর শাসনকর্তা রূপে সর্বজনসমাদৃত হব। স্বামীজি এই লক্ষ্যেই ছুঁৎমার্গ, খাদ্যাখাদ্যের বাড়াবারি, হীন, নীচ, জাতিকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা না করে তাদের বুকে তুলে নিতে বলেছেন। "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর" এই বিশ্বনন্দীত বাণীর সার্থক রূপদান চেয়েছেন। আমাদের ব্যবহার কর্ম আলাদা হলেও আমরা পরস্পর এক আত্মা। এক স্রষ্টার সৃষ্টি। এরা সবাই আমাদের ভাই, একথাটি বুঝার জন্যই বর্তমান সময়ে তাঁর সমাজ সংস্কার চিন্তার গ্রহণযোগ্যতা তিনি প্রমাণ করতে এই ভূ-ভারতে আগমনকরেছিলেন।

৬.১.৪: বর্তমান সময়ে স্বামী বিবেকানন্দজীর ধর্মচিন্তার গ্রহণযোগ্যতা

যদিও বর্তমান পন্ডিতগণের মত– অতীত স্মৃতি বেদনাদায়ক, কেবল পূর্বগৌরব স্মরণে মনের অবনতি হয়, তাতে কোন ফল হয় না। অতএব ভবিষ্যত ভাবাই জ্ঞানীর কাজ। কথাগুলি যদিও সত্য, তবে এটাও বুঝতে হবে যে, অতীতের গর্ভেই ভবিষ্যতের জন্ম। অতএব যতদূর সম্ভব অতীতের শিক্ষা নিয়েই বর্তমানের দিকে এগিয়ে চলাই আমার মনে হয়– বুদ্ধিমানের কাজ।

পাশ্চাত্যের যে অনন্ত নির্ঝরিণী প্রবাহিত তা উপেক্ষার জন্য এই আলোচনা নয়, বরং প্রাণভরে তাদের আকণ্ঠ জলপান করে সন্মুখ প্রসারিত দৃষ্টি নিয়ে অগ্রসর হওয়াই ভারত ধর্মের বৈশিষ্ট্য। আমাদের প্রাচীন আর্যনীতি ও যুগধর্ম বেদান্ত আমাদের এই শিক্ষাই দান করে। উদ্দেশ্যটি হল, আমাদের ধর্মজীবনের প্রাচীন কাল যত উচ্চ গৌরবশিখরে আরূঢ় ছিল, তাকে তদপেক্ষা উচ্চতর, উজ্জ্বলতর, মহত্তর এবং আরও অধিকতর মহিমামন্ডিত করাই হল ভারতধর্মের শিক্ষা। শ্রেষ্ঠ ভারতধর্ম বেদান্ত আমাদের কাউকে বা কোনছিকে উপেক্ষা বা অবহেলা করার শিক্ষা দান করে না, বরং আরও বেশি সম্পৃক্ত হওয়ার পরামর্শ দান করে। কারণ পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান যেখানে যত বেশি হয় সেখানে নতুন নতুন আলোর সন্ধান লাভ হয়।

আমাদের জাতি ধর্ম সম্পর্কে মনীষীদের অনেক কটূক্তি আছে– যেমন এ-ধর্মে জাতির অবান্তর বর্ণবিভাগ, বহু মত, পথ ও ধর্মপ্রণালী, অগম্য দূর্ভেদ্য ভাষা, শাসন-প্রণালী, আচার-বিচার, নিয়ম-নীতি, বহুসম্প্রদায়গত বিভিন্নতা, পরস্পর বিদ্বেষ, ঘৃণা, সাপ্রদায়িকতা, বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা, বিচারহীন আচার, কারও ভাবের সাথে কারও ভাবের মিল না থাকা, এই সমূদয় নিয়েই গঠিত একটি জাতি। আমরা যদি এক একটি জাতি নিয়ে অন্য আর একটি জাতির সাথে তুলনা করি তবে দেখব, যারা যে উপাদানে গঠিত তারা তাদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্প নয়ত বেশি। এছাড়াও আর্য, দাবির, তাতার, তুর্কী, মোঘল এবং ইউরোপীয়দের পর্যন্ত শোণিত এদেশে বাসা বেঁধে আছে। এই ভূ-ভারতে নানা কৃষ্টি, নানা সভ্যতা, নানা ভাষাভাষির সমাবেশ আমাদের নানা বিভ্রান্তি ছড়ালেও আমাদের জাতির পবিত্র একটি ঐতিহ্য আছে–আমাদের ধর্ম আমাদের সম্মিলন ভূমি। এই ভিত্তিতেই আমাদের জাতীয় জীবন গঠন করে তুলতে সক্ষম হয়েছি বলেই

হিন্দ, মুসলমান, খৃষ্টান ও বৌদ্ধ এরূপ আরও অনেক জাতি ধর্মকে আমরা সম্মানের সাথে বরণ করে নিতে পেরেছি। একটি জাতীয় ঐক্য তৈরি করে শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্রের রূপ দিতে সক্ষম হয়েছি। পৃথিবীবিখ্যাত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে পরিণত হয়েছি। সবার স্বাধীনতা রক্ষা করে সবাইকে বুকে তুলে নেওয়ার শিক্ষা ও যোগ্যতা ভারতের সার্বজননীন একমাত্র পৃথিবী বিখ্যাত উৎকৃষ্ট ধর্ম বেদান্তই আমাদেরকে এই মহানুভবতা, উদারতা ও নৈতিকতার দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছে। বেদান্তের একটি মাত্র সূত্র মাধ্যমে যথা––'তৎতুসমন্বায়াৎ'।

আমরা বাইরে যত নাম, রূপ, আকৃতি, প্রকৃতিই ধরি না কেন, আমাদের ধর্মদর্শন বেদান্ত আমাদের শিক্ষা দিয়েছে আমরা এক অভিন্ন আত্মা। আমাদের সবার পরমাত্মা– এক আত্মা। স্রষ্টা এক, সৃষ্টিও এক। শুধু সৃষ্টির বৈচিত্র্যতা হেতু বাহিরে যত ভিন্নতা। বেদান্ত আমাদের আরও শিক্ষা দান করেছে, ধর্মরূপ সত্য সবার জন্য এক, কিন্তু প্রাপ্তিতে একেক জনের এক এক রূপ। অর্থাৎ 'যত মত তত পথ'। 'ভাব বহু কিন্তু মূলে এক'। 'তদন্তরস্য তদু সর্বসাস্য বাহ্যত,' যা তোমার বাইরে তাই তোমার অন্তরে। 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি' যেমন এক সূর্য সকলকে সর্বত্র সমভাবে আলোদান করছেন অনুরূপ একসত্যরূপ আত্মা বা পরমাত্মাই সবাইকে আপন অঙ্কে স্থান দিয়ে সবাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে আছেন। মা বলতে যেমন সমগ্র বিশ্বের সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের একটিই ভাব, সন্তান বলতেও তেমনি একটিই ভাব, বেদান্ত 'তৎ তু সমন্বায়াৎ' অর্থাৎ আমরা বাইরে আলাদা হলেও ভিতরে আমরা এক চৈতন্যের চেতনারূপ সত্তা। এই সমন্বয় সূত্র ধরেই আজ পর্যন্ত সেইভাবে ভারতের জাতীয় সত্তা ও ধর্মের নিরপেক্ষতা ভারতবর্ষকে ধরে রেখেছে, রক্ষা করছে, রক্ষা করবে। ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্র একারণেই অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্টগুলির মত বলতে সক্ষম হয়েছে– 'এদেশে প্রজাদিগের শাসন প্রজাদিগের দ্বারা এবং প্রজাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত হইবে।'

অদ্যাবধি আমি যে আলোচনাগুলি ধর্মের মূল পটভূমিকারূপে এপর্যন্ত পর্যালোচনা করেছি এবং এই অধ্যায়ে তুলে ধরেছি তা স্বামীজিরই মর্মকথা। নিম্নে একে কয়েকটি ভাগে ভাগ করলেই ধর্মকে কি কি সমীক্ষা দ্বারা স্বামীজি তাঁর আলোচনায় নিয়ে এসেছেন তা সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারব এবং ধর্ম কি তা সম্পূর্ণরূপে জানতে পারবো। ধর্মকে– ধর্মবিজ্ঞান, ধর্মসমীক্ষা, ধর্মদর্শন ও সাধনা, বেদান্তের আলোকে ধর্ম, যোগ ও মনোবিজ্ঞান

ইত্যাদি মৌলিক কয়েকটি অধ্যায় মাধ্যমে স্বামীজি বিভিন্ন পঙ্ক্তি ও প্রণালীতে সংযোজিত ও বিভাজিত করে ধর্মকে আমাদের সামনে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন এবং যে বিষদ জ্ঞান দান করেছেন তা অকল্পনীয়। ধর্ম সম্পর্কে এমন আরও কত শত বহু উচ্চ ধরণা ও মতামত তিনি যে দৃঢ়তার সাথে ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে ভারতবাসী তথা সমগ্র বিশ্বকে জ্ঞাত করে গেছেন, তা অতুলনীয়। তিনিই একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ যুগপুরুষ যিনি ভারতবাসীকে প্রাচীন বনের বেদান্ত থেকে নববেদান্তে রূপ দিয়ে 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর', অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের 'জীবরূপে শিব সেবা।' এই মহা অমৃতবাণী দ্বারা এই প্রমাণ করে গেছেন যে, তুমি তোমার নিজের স্বার্থ সর্বাগ্রে ত্যাগ করে অগ্রে সবাইকে তোমার বুকে স্থান দান কর। প্রাণভরে জীবকে ভালবাস। কারণ সে তোমার আপন আত্মজ বা তোমারই ভাই । সবার আগে নিজের কথা ভুলে– পরের সেবায় নিজের জীবনকে অগ্রে বলিদান কর। তবেই তুমি বেদান্তের সর্বশেষ বাণী 'আত্মার স্বরূপ জ্ঞান' তথা নিজের মুক্তি উপলব্ধি করতে পারবে। তুমি কে, ঈশ্বর কে, এবং এই জীব-জগত কে, সমূদয় অবগত হতে সক্ষম হবে। এযুগে জীবপ্রেমই হল স্বামীজি মতে শ্রেষ্ঠ যুগধর্ম। বর্তমান সময়ে আমি মনে করি– 'আত্মমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' বেদান্তের এই মহাবাণী যা স্বামীজির উপলব্ধি 'দরিদ্রদেব ভব'; নিজের জীবনে প্রথম উপলব্ধি করে বিশ্ববাসীর মাঝে তুলে ধরে, যে মানবতা ও উদারতার পরিচয় ও শিক্ষা দান পূর্বক– জীব জগতের উপকারের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ দ্বারা কিভাবে তা বহুল প্রচার ও প্রসার মাধ্যমে জগতে সর্বত্র বহুকর্মী, সংগঠন, সংঘ, সমিতি, আশ্রম ও মিশন তৈরি করে দরিদ্রের কল্যাণে আপন জীবন উৎসর্গ করা যায় তার প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, বর্তমানেও আজ তা প্রবহমান আছে। তাঁর অন্তর্নিহিত এই উপলব্ধি আজও সে শিক্ষা সারা পৃথিবীর মানুষ অন্তরে উপলব্ধি করে– তাঁকে স্বাগতম সুস্বাগতম্ অভিনন্দন জ্ঞাপন করে বিশ্বে তাঁকে মহীয়ান করে তুলে ধরেছেন। পৃথিবীতে সেবার থেকে যে বড় ধর্ম আর কিছু নেই স্বামীজি তার সাক্ষাত নিদর্শন। তবে এই সেবা অবশ্যই নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থভাবে হতে হবে। কোন গর্ব বা অহংকারের সাথে করা যাবে নাা। পরের উপকার করতে হবে আত্মভাবে, নিজের প্রয়োজনে। নিজের মধ্যে দয়াগুণ সঞ্চারের জন্য।

দান করতে হবে গ্রহীতার নিকট হাটু গেড়ে অনুমতি প্রার্থনা সাপেক্ষে। দরিদ্রকে যা দিবে তা যেন অবশ্যই উৎকৃষ্ট দ্রব্য হতে হবে। নিজের পছন্দের চেয়ে তার পছন্দমত হলে দানটি আরও ভাল হয়।

বর্তমান সময়ে তাঁর ধর্মচিন্তার গ্রহণযোগ্যতা যে বিশ্বনন্দীত ও প্রমাণযোগ্য তা চিকাগোর মহা বিশ্ব-ধর্মসম্মেলনে এবং কি আজ পর্যন্ত কেউ যে তা উপেক্ষা বা অস্বীকার করেছেন, তা আমার জানা নেই। আমার শুধু একটি বিষয়ই মনে দোলা দেয়, ধর্ম সম্পর্কে আমরা নিত্যান্তই জ্ঞানহীন শিশুসম। তাই আমাদের উচিত হবে না বলে আমি এই বিশ্বাস করি যে, নিম্নভূমির দৃষ্টি হতে উচ্চতর বস্তুর বিচার করা নিত্যান্তই মুর্খামী। যেমন অনন্তের বিচার অনন্তের দ্বারাই করতে হবে। আমাদের একটি বিষয় সর্বক্ষণ মাথায় রাখতে হবে যে, ধর্ম সমগ্র মানব জীবনে অনুস্যূত, শুধু বর্তমানে নয়– ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সর্বকালে। মানুষ বর্তমানে যা, তাও তার ধর্মের শক্তিতেই হয়েছে। আর এই ধর্মই মনুষ্য নামক প্রাণীকে যে দেবতা করে গড়ে তুলতে সক্ষম তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মানব সমাজ হতে এই ধর্মকে একবার বাদ দিয়ে দেখলেই বুঝতে পারব এর অবশিষ্ট কি থাকে ? স্বামীজি এই লক্ষ্যেই জানালেন:

> তোমরা প্রত্যেকের মধ্যেই সেই ঈশ্বরকে দর্শন কর, যিনি সকল হাত দিয়া কার্য করিতেছেন, সকল পা দিয়া চলিতেছেন, সকল মুখ দিয়া খাইতেছেন। প্রত্যেক জীবে তিনি বাস করেন, সকল মন দিয়া তিনি মনন করেন। তিনি স্বতঃপ্রমাণ– আমাদের নিকট হইতেও নিকটতর। ইহা জানাই ধর্ম– ইহা জানাই বিশ্বাস। ...যতদিন আমরা সেই প্রভু ব্যতীত জগতে আর কাহাকেও না দেখি, ততদিন এইসব দুঃখকষ্ট আমাদিগকে ঘিরিয়া থাকিবে, এবং আমরা এই সকল ভেদ দেখিব; কারণ সেই ভগবানেই – সেই আত্মাতেই আমরা সকলকে অভিন্ন, আর যতনি না আমরা ঈশ্বরকে সর্বত্র দেখিতেছি, ততদিন এই একাত্মানুভূতি হইবে না।[৫]

৫। পূর্বোক্ত, স্বামী বিবেকানন্দজী, **বাণী ও রচনা**, পৃ.,১১৩

বেদান্তের 'তত্ত্বমসি' এবং অদ্বৈত বেদান্তের 'আত্মানাং বিদ্ধি,' অর্থাৎ 'আমি কে' ? এবং 'আমি তুমি-ই'। সনাতন হিন্দুধর্মের এই দু'টি মূলতত্ত্বই হল এই ধর্মের জন্য যেমন সারকথা, অপর ধর্মেরও পক্ষে পক্ষান্তরে এটাই সবার– আকারে-প্রকারে মূল মন্ত্র ও মূলসূত্র এবং মর্মকথা। আমি যদি আমাকেই না জানি, না চিনি, আমি যে প্রাণিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চেতন প্রাণী এবং জ্ঞান বিবেকসম্পন্ন একটি আত্মসত্তা, তার প্রমাণ কি আমি নিজে নই ? তখন আমাকে বাদ দিয়ে আর অন্য কিছু কি ? এই আলোচনা শুধু আমাদের আলোচ্য যে বিষয়– শুধু বর্তমান সময়ের জন্য; তা কিন্তু নয়। পৃথিবীতে মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন এই একটি প্রশ্নই বারবার করবে– আমি কে, ঈশ্বর কি এবং এই জগত বা ব্রহ্মান্ড কি ? এই ত্রিবিধ জিজ্ঞাসা বন্ধ হবে না।

বর্তমান বিজ্ঞানও সরাসরি এই চিন্তা না করলেও পক্ষান্তরে করছে। তারাও স্থূল ছেড়ে সূক্ষ্মের দিকে এগোতে বাধ্য হচ্ছে। আর বস্তু বা স্থূল ছেড়ে সূক্ষ্মে না আসা পর্যন্ত তাদের আবিষ্কারও কোনদিন সুসম্পন্ন হবে না। স্বামীজি একারণেই বেদান্তের উদ্ধৃতি দিয়ে জানালেনঃ

> বেদান্তের আরম্ভ নিতান্ত দুঃখবাদে এবং শেষ হয় যথার্থ আশাবাদে। ইন্দ্রিয়জ আশাবাদ আমরা অস্বীকার করি, কিন্তু অতীন্দ্রিয় আশাবাদ আমরা জোরের সহিত ঘোষণা করি। প্রকৃত সুখ ইন্দ্রিয়ভোগে নাই– উহা ইন্দ্রিয়ের উর্ধ্বে এবং প্রতি মানুষের ভিতরেই রহিয়াছে। জগতে আমরা যে আশাবাদের নিদর্শন দেখি, উহা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ধ্বংসের অভিমুখে লইয়া যাইতেছে। আমাদের দর্শনে ত্যাগকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ ত্যাগ বা নেতিভাব আত্মার যথার্থ অস্তিত্বই সূচিত করে। বেদান্ত ইন্দ্রিয় জগতকে অস্বীকার করেন– এই অর্থে বেদান্ত নৈরাশ্যবাদী, কিন্তু প্রকৃত জগতের কথা ঘোষণা করে বলিয়া আশাবাদী।[৬]

এই বেদান্ত সম্পর্কে অন্যত্র আরও বলেন, "বেদান্ত মানুষের বিচারশক্তিকে যথেষ্ট স্বীকৃতি দেয়, যদিও ইহাতে বুদ্ধির অতীত আর একটি সত্তা রহিয়াছে, কিন্তু উহারও উপলব্ধির পথ বুদ্ধির ভিতর দিয়া। সমস্ত পুরাতন কুসংস্কার দূর করিবার জন্য যুক্তি একান্ত প্রয়োজন। তারপর যাহা থাকিবে তাহাই বেদান্ত। একটি সুন্দর সংস্কৃত কবিতা আছে, যেখানে ঋষি নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,

৬। ঐ, পৃ., ৩১৪

> হে সখা ! কেন তুমি ক্রন্দন করিতেছ ? তোমার জন্ম-মরণ-ভীতি নাই। তুমি কেন কাঁদতেছ ? তোমার কোন দুঃখ নাই, কারণ তুমি অসীম নীল আকাশ-সদৃশ, অবিকারী তোমার স্বভাব। আকাশের উপর নানা বর্ণের মেঘ আসে, মুহূর্তের জন্য খেলা করিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু আকাশ সেই একই থাকে। তোমাকে কেবল মেঘগুলি সরাইয়া দিে হইবে।[৭]

পরিশেষে স্বামীজি এ যুগের সব মানুষকে এবং সংসার ত্যাগীকে কর্মযোগী হওয়ার নির্দেশ দান করেছেন। কর্মকেই পূজা জ্ঞান করতে পরামর্শ দিয়েছেন। নিজের মুক্তিকে বড় না ভেবে জগতের কল্যাণে নিষ্কাম নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে উৎসাহী করে গেছেন। বর্তমান যুগে বা সময়ে স্বামীজীর ধর্মচিন্তা সবার জন্য যে গ্রহণযোগ্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সারা পৃথিবী আজ কর্মব্যস্ত তবে তা আত্মস্বার্থমূলক, এই আত্মস্বার্থমূলক কর্মকে যে দিন আমরা কর্মযোগে রূপ দিতে পারব সেদিন হবে আমার কর্ম স্বার্থক কর্ম। 'যোগসু কর্মকৌশলম্ ' যে কর্মই জগতে করি না কেন তা যেন ঈশ্বরের সাথে যোগযুক্ত হয়েই করি। এই কৌশল যেন ত্যাগ না করি। অর্থাৎ ফলকামনা না করে– তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র। এই বোধে যেন সব কর্ম করি। কর্মে আমার কোন আমিত্বভাব থাকবে না। কর্তব্য জ্ঞানে তাঁর আদেশ ভেবে যেন কর্মটি নিষ্পন্ন করি। এর পরবর্তি ধাপেই আসবে প্রাণের টানে কর্ম, এ আরও বেশি মধুর। 'ভালবাস বলেই ভালবাসি', তাই তো তোমার জন্য কিছু না করলে অতৃপ্তি বোধ করি।

কর্ম অপরাধ নয়। কর্ম একটি আদর্শ। বাসনাই হল কর্মজনিত যত দুঃখের কারণ। ধর্ম সম্পর্কে নতুনত্ব কিছু নেই বরং নিজের জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করাই এর নতুনত্ব বলতে যা কিছু বুঝায়। যা শুনে এসেছি, যা দেখছি, তার যোজনা করতে হবে নিজের জীবনের উপলব্ধির দ্বারা। যিনি যখন বোধে-বোধ হয়ে তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত হতে পারেন তাঁর জীবনের নতুনত্ব তখন তার নিকট সেটাই। আমাদের বেদ উপনিষদের এইটিই উক্তি। ঈশ্বর চির নতুন বলেই তাঁর কোন পুরাতনত্ব নেই।

৭। ঐ, পৃ., ৩১৫

তিনি যখনেই যার নিকট তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেন তখন সেটিই একটি বিশেষ নতুনত্ব। যার ইতি নেই তার অন্তও নেই। অতএব যা কিছু– সব তিনি, সব তাঁর, সবই নতুন। প্রকৃত অর্থে ব্যবহারিক আবিষ্কার কোন আবিষ্কার নয়, শুধু কারও দ্বারায় তা প্রকাশ পেয়েছে মাত্র এই যা– । কারণ স্রষ্টা যখন তাঁর মাত্র একপাদ এই ব্যক্ত সৃষ্ট পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তখনেই বিশ্বব্রহ্মান্ডে সবকিছু প্রকাশ পেয়েই আছে। গবেষকগণ শুধু সেই অব্যক্তগুলি খুঁজে খুঁজে বের করছেন–এই মাত্র। স্বামীজি যাকে বলেছেন, Invention (সৃষ্টি) এবং Discover (আবিষ্কার বা উদ্‌ঘাটন)। বর্তমান সময়েও তাঁর প্রয়োজন কোনভাবেই নিঃশেষ হয়নি, হবেও না। বরং বিজ্ঞানের নতুন নতুন অন্বেষণে তিনি আরও নতুন ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। কোনদিন তাঁর নতুনত্ব ফুরাবে না। স্বামীজি তাঁর নব বেদান্তের ধর্মচিন্তার মর্মার্থ এবং গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে এবার এভাবেই সবার সম্মুখে তুলে ধরেছেন। পৃথিবীতে এযাবত যত মহামানব আবির্ভূত হয়েছেন, বেদের অজ্ঞেয়তা তাঁর নিকট আরও নতুন জ্ঞেয় বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে। অতএব পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত এর অজ্ঞেয়তা থাকবে এবং নতুন করে জানারও জিজ্ঞাসা থাকবে। স্বামীজি বর্তমান সময়ের বিশ্বের সকল মানবের জন্য ধর্মের গ্রণযোগ্যতা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞান একারণেই এভাবে ব্যক্ত করে গেছেন। ধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগের বিশেষত্ব এখানেই।

৬.২.১: বর্তমান সময়ে শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষাচিন্তার গ্রহণযোগ্যতা

শ্রীঅরবিন্দের জীবনের শুরু এক অতি উন্নত শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই। এই শিক্ষার জন্য গোড়াতেই তাঁর পিতা তাঁকে প্রাচ্য সংস্কৃতি থেকে অবমুক্ত করে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও উন্নীতকরণ লক্ষ্যে তাঁর নব জীবন দান করতে তাঁকে তাঁর জন্মভূমি ত্যাগ করে বর্তমান শিক্ষায় সর্বশ্রেষ্ঠ সুশিক্ষিত করতে সুদূর বিলেতে পাঠিয়েছিলেন মাত্র সপ্তম বর্ষ বয়সে।

বর্তমান শিক্ষাপ্রসারের যুগে সত্যিকার অর্থেই তিনি একজন সনামধন্য বিখ্যাত শিক্ষক রূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। তিনি বহুভাবিদ্ ছিলেন, জ্ঞানী বিচক্ষণ ও উজ্জ্বল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তিনি দেশজাতির জন্য বরোদায় অবস্থান কালীন সময়ে বরোদা কলেজের সনামধন্য শিক্ষকরূপে সুপ্রতিষ্ঠ হন। তিনি ছাত্রদের

সত্যিকার শিক্ষাগুরু ছিলেন। শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে ছাত্রদের শারিরীক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশের জন্য তিনি তাদের সাথে বন্ধুর মত ব্যবহার করতেন। স্নেহ, মমতা, ভালবাসা এবং নৈতিক জ্ঞান দান করাই ছিল তাঁর– ছাত্রদের প্রতি শিক্ষার উৎসর্গপত্র। তিনি সকল শিক্ষার্থীদেরকে যে উপদেশ দান করতেন তা স্বয়ং অগ্রে সম্পূর্ণ পালন করেই তা করতেন। নিজে আচরণ করে তবে শিক্ষাদান করতেন। তিনি তৎকালীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান হয়েও বিন্দুমাত্র বিদ্যার গৌরব কোন সময়ে প্রদর্শন করেন নি। তিনি যে পৃথিবী উন্নত পাশ্চাত্য শিক্ষা অধিগ্রহণ করে ভারতে ফিরে এসেছিলেন এবং সেই শিক্ষা দান করাই ছিল যে তাঁর জীবনের দায় দায়িত্ব এবং বিদেশীদেরকে চ্যালেঞ্জ জানানোর কর্তব্য; তিনি তা না করে– ছাত্রদের সুশিক্ষক তৈরীর লক্ষ্যে আত্মগঠনমূলক কার্যে নিয়োজিত করেছিলেন।

প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যাগুরুদের মত অনাড়ম্বড় জীবন-যাপন করতেন। সাধারণ সপাক খাদ্য খেতেন। পোষাক পরিচ্ছদ ও বিলাসিতার বিন্দুমাত্র ছাপ তাঁর জীবনকে কোনদিন স্পর্শ করেনি। আধুনিক শিক্ষার প্রতি তাঁর কোন উৎসাহ ছিল না। শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রী সিভিল সার্ভিস্ লাভ, যার ফলে তাঁর পিতার অভীপ্সা মোতাবেক তিনি হতে পারতেন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশাসনিক কর্মকর্তা। কিন্তু তিনি সেই পদকে পরিত্যাগ করে সাধারণ এক বেসরকারী কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর একটিই– ভারতীয় আদর্শ ত্যাগ তিতীক্ষাপূর্ণ সনাতন আর্যঋষিপথে ব্রহ্মচারীর মত জীবন গঠন। এবং এই শিক্ষাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা তিনি নিজ জীবনে জীবন্ত উপলব্ধি করে দেশপ্রেমের জন্য সেই অর্জিতবিদ্যাকে বাকি জীবনে কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি বিদেশী শিক্ষায় দীক্ষায় সুশিক্ষিত হয়েও একজন বাঙালী হিসেবে বাংলার রক্তের টান ভারতীয় ঋষিদের গোত্রীক সম্পর্ক কখনও উপেক্ষা করতে পারেন নি। পারেন নি ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করতে। পারেন নি ভারতের স্বাধীনতার রাজনৈতিক উত্তাল তরঙ্গ থেকে নিজেকে দূরে সরে রাখতে।

রাজনীতিকে তিনি ক্ষমতা গ্রহণের উৎস বলে কোনদিন গ্রহণ করেন নি। তিনি রাজনীতির গভীরে প্রবেশ করে রাজনীতি বলতে যা প্রতিপন্ন করে গেছেন, তার প্রকৃত অর্থ হল, চরিত্রগঠন। রাজনীতি যে কখনই নিরুপায়ের জুয়ার চাল নয়, চরিত্র গঠনের বিদ্যাপীঠ, তা তিনি নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন।

আধুনিক শিক্ষার বর্তমান ঋষি হলেন শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর আধুনিক শিক্ষার যে আদর্শ তা ইউরোপে সাধারণত আধুনিক শিক্ষা বলতে যা বুঝায় তার চেয়ে অনেক উচ্চ। এ শিক্ষা ব্যবহারিক শিক্ষার সাথে এক পরম আধ্যাত্মিক শিক্ষাযোগ। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষালাভ করে এই উপলব্ধি করেছিলে যে, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা বর্তমানে যত নগন্য বা পুরাতন বলে আখ্যায়িত হোক এই শিক্ষা চিরকাল চির অবিনশ্বর এবং চির নতুন। এই শিক্ষার ভিতর যিনি যত গভীরে প্রবেশ করবেন তিনি তত অমৃতের আস্বাদ পাবেন। কারণ এই শিক্ষা বাহ্যিক জীবনকে দিব্য-চেতনায় অভিব্যক্ত করার ক্ষমতা রাখে মানব সমাজের সর্বস্তরে। জাতীয় কলেজে তাঁকে যদি পূর্ণ দায়িত্ব অর্পন করা হত, সে-কলেজ তবে শুধু ভারতের আধুনিক শিক্ষার স্থানই হত না বরং সমস্ত জগতের শিক্ষার ইতিহাসে সূচিত করত নতুন এক অধ্যায়। আধুনিক সংস্কৃতির ভাবধারার যে বস্তুনিষ্ঠা, তার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের আদর্শবাদের এই সমন্বয় যদি ঘটার সুযোগ বৃটিশশাসকগণ তাঁকে সেদিন দান করতেন তবে ভারতবর্ষ বিশ্বের শিক্ষাদাতার পদেই শুধু পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হত না, আধুনিক সভ্যতাকেও হয়তো রক্ষা করতে পারত নীচ সর্বগৃধ্নু শ্রম-শিল্পীজিবীদের চাপ থেকে, সর্বাঙ্গীন পতন ও এবং ধ্বংসের হাত থেকে।

বর্তমান সময়ে শ্রী অরবিন্দের শিক্ষার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে তিনি তাঁর মত প্রকাশ করে বলেন, "আমরা শিক্ষার নতুন উদ্দেশ্য কেবল বুঝিতেছি। শিক্ষার্থীকে তাহার মানসিক, শৌর্যবিষয়ক,আবেগসম্পর্কিত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্তা ও সামাজিক জীবন তাহার স্বভাব ও শক্তি অনুসারে পুষ্ট করিতে হইবে।"[৮]

অর্থাৎ তিনি চান– বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিকে শিক্ষার্থীর প্রতিরোধকারী মস্তিষ্কে অবিচলিত জ্ঞান এবং তার বিরোধী প্রবলভাবে স্থিতিস্থাপকতা-বর্জিত নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এটাই ছিল তাঁর শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য। তাঁর মতের প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রদত্ত হবে তা কেবল বিদ্যাই দিবে না, পরন্তু শিক্ষার্থীকে উন্নত জীবনের পথে অগ্রসর করবে। যে নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন শ্রী অরবিন্দ দেখেছিলেন, তারই উপযুক্ত সমাজ তৈরি করবে তাঁর রচিত এই আন্তর্যাতিক শিক্ষাকেন্দ্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতি।

৮। বিশ্বনাথ দে, **শ্রীঅরবিন্দ স্মৃতি**, কলিকাতাঃ সাহিত্যম প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ১৬ই জুন ১৯৭১, পুর্নমূদ্রণ, ১৯৯৩, পৃ., ১৭০

জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে পৃথিবীর যে কোন ভাগ হতে এই বিশ্ববিদ্যলয়ে এসে জ্ঞানের যে কোন বিভাগে শিক্ষা লাভ করতে পারবে। শ্রীঅরবিন্দ পরিকল্পিত এই আন্তর্যাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ সাধারণ নহে। কিন্তু যিনি এই পরিকল্পনা করেছিলেন, এ তাঁরই ন্যায় অসাধারণ পুরুষের জন্য উপযুক্ত। সম্পাদকের ভাষায় এর মহিমা প্রচার ও প্রকাশ করতে চাইলে এভাবে করা যায়: " ব্যথিত, পীড়িত ও হতাশ পৃথিবীকে পুনরুজ্জীবিত প্রাচী-র পক্ষাঘাতগ্রস্ত শিরায় শোণিত সঞ্চারিত করিবার ও প্রতীচীর জড়বাদবিড়ম্বিত ব্যাধি প্রাচী-র আধ্যাত্মিকতার দ্বারা আরোগ্য করিবার জন্য যে মহাসত্যের পাবনীধারার প্রয়োজন– এই শিক্ষা-কেন্দ্রের উৎস হইতে তাহা উদ্‌গত হইবে। তাহা হইলেই উদ্ভূত হইবে মহাধরণী।"[৯]

আমরা আশা করি, সেই বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষাবিস্তার সাধন করিয়া যে প্রসস্ত দিবা-র সূচনা করিবে, তাহা নতুন উষার কণক কিরণে সমুজ্জ্বল হইয়া মানব জাতিকে অভূতপূর্ব উন্নতির রজ্যে লইয়া যাবে। আমরা যে দেশমাতৃকার পূজা করি– যাহার মন্দিরে শ্রীঅরবিন্দ পূজারী ও পুরোহিতের কাজ করিয়াছেন– সেই দেশমাতৃকার আশীর্বাদে এই পরিকল্পনা পূত।

আজ শ্রীঅরবিন্দের কণ্ঠ নীরব – লেখনী স্তব্ধ; কিন্তু তিনি যেন তাঁহার সমাধির অন্তরাল হইতে তুর্যনাদে মানব সমাজকে বলিতেছেন, " When all the temple is prepared within.

Why nods the drosy worshipper outside ? "[১০]

আন্তর্যাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের (পন্ডিচেরী) প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের বর্তমান শিক্ষা বিষয়ে তাঁর এটি একটি অমূল্য ভাষণ যা সংক্ষিপ্তভাবে এখানে উল্লেখ করা হল। আমরা জানি, শ্রীঅরবিন্দের জীবন এবং তাঁর শিক্ষার গূঢ় তাৎপর্য সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য নয়। তাঁর দর্শন হল মানবাত্মার অশ্রান্ত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে গড়ে তোলা এক সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণ চিন্তাধারা। এই আধ্যাত্মিক প্রয়াসের শিখরে উঠে যাওয়া আমাদের মধ্যে অতি অল্প কয়েকজনের ভাগ্যেই ঘটে। কারণ তার জন্য প্রয়োজন দেহমনের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব , আর যে-জিনিষ আরও দুরূহ –সূক্ষ্মের খাতিরে স্থূলের মায়া ত্যাগ করা। অতীতে ঋষিরা উঠে গিয়েছিলেন সেই স্থূলের দাবির উর্ধ্বে– সৃষ্টির শাশ্বত সত্যসমূহের অনুসন্ধানে। শ্রী অরবিন্দও চেয়েছিলেন এমনি একটি জীবন। তিনি তাঁর জাতির

৯। ঐ, পৃ., ১৭৮
১০। ঐ, পৃ., ১৭১

সংস্কৃতি না ভুলে চেয়েছিলেন জীবন-চেনার ত্রিবিধ প্রকাশ। তাঁর ভাষায় শিক্ষার আদর্শকে তিনি যেভাবে বুঝিয়েছেন তা নিম্নরূপ:

"এক রয়েছে চিন্তার দিক, আদর্শের দিক, উর্ধ্বমুখী এষণা এবং অন্তরাত্মার অভীপ্সার দিক ; এক সৃজনক্ষম আত্মপ্রকাশের এবং উদার সৌন্দর্যবোধের দিক, বুদ্ধি ও কল্পনার দিক ; আর এক রয়েছে বাস্তব করিৎকর্মের এবং স্থূলের দিক।"[১১] তাঁর এই সংস্কৃতির তিনটি দিকের মধ্যে প্রথমটি হল– দর্শন এবং ধর্ম নিয়ে। শিল্প, কাব্য, সাহিত্য হল– দ্বিতীয়টি নিয়ে। তৃতীয়টি – সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে। কিন্তু মূলভাবটি ছিল ভারতবাসীর জীবন, সংস্কৃতি ও সামাজিক আদর্শ সমূহ। যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষের সত্যকার আধ্যাত্মিক সত্তার ও জীবনের সার্থকতার অন্বেষণ। তিনি চেয়েছিলেন, যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্ত-মানুষ এসে শিখবে তার জীবনের শাশ্বত সত্য সব। একটি সত্যিকার আন্তর্যাতিক বিশ্ববিদ্যালয় বলতে তিনি এই বুঝিয়ে- ছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যা শান্তিনিকেতনে এই সম্ভাবনা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এর অন্তর্নির্হিত তাৎপর্য ছিল– আমাদের উপনিষদের তিনটি রূপ– সত্যম্ শিবম্ অদ্বৈতম্ এর রূপায়নে এসে মিশবে কত শত মানব সভ্যতা, আশ্রয় পাবে ও রূপ নিবে এক সমন্বয়ের মিলনমেলায়।

তিনি তাঁর অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন, এই পূণ্য ভারতভূমির বেদান্তের সেই সমন্বয় বাণী। যা শুধু আধ্যাত্মিকতায় সীমাবদ্ধ নয়, জনসাধারণের মনেও তা ব্যাপ্ত ছিল। তিনি জীবনভর এই শিক্ষাকেই যেমন নিজের জীবনে বেছে নিয়েছিলেন, তেমনিভাবে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, বিশ্বরূপে বিশ্বমানবের মাঝে। তাঁর প্রত্যাশা ছিল তাঁর মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে পন্ডিতেরা মিলিত হবেন এবং ভারত তথা বিশ্বের সাংস্কৃতিক পুনর্জন্মের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় খুলে দিবেন। শ্রীঅরবিন্দ যেমন চেয়েছেন, শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক আভ্যন্তরীণ মুক্তিই মানুষের জীবনের প্রকৃত বিদ্যা বা শিক্ষা ও শৃংখলা এনে দিতে পারে,

---

১১। ঐ, পৃ., ১৬৭

তেমনি এই মুক্তি মানুষের নিম্নতর শরীর, প্রাণিক এবং মানসিক প্রকৃতিকে এড়িয়ে যেতে চায় না বা যেতে পারে না। তাঁর রচিত আন্তর্জাতিক এই বিশ্ববিবদ্যালয়ের অবকাঠামো তিনি যে যুগপৎ আধুনিক পাশ্চাত্য ও প্রাচীন আর্যঋষিধারকে অবলম্বন করে শিক্ষার জন্য যে নব পরিকল্পনার প্রেরণা দান করে গেছেন এবং বাস্ত বায়ন করে পরিচালনা করেছেন সেই উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালে পন্ডিচেরীতে অরবিন্দ আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের সভাপতি নিজেই দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিপন্ন করেছেন– 'আমি নিশ্চিত জানি, একদিন এই প্রস্তাবিত ও বাস্তবায়িত বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে দাঁড়াবে পৃথিবীর আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম-আকাঙ্ক্ষারমূর্ত প্রতীক– হিংসা-দ্বেষ, সন্দেহহীন সংঘাতে আকীর্ণ উষর মরুভূমিতে শ্যামল মরুদ্যানের মত।'

ইতিমধ্যেই এই শিক্ষাকেন্দ্র বর্তমান ভারতের একটি বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে। ১৯৪৩ সালে মাত্র কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে অগ্রযাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে এই শিক্ষাকেন্দ্রে দেড়শত পূর্ণ ও আংশিক সময়ের শিক্ষক ও সাড়ে চারশত ছাত্র-ছাত্রী আত্মগঠনমূলক এই শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষা গ্রহণ করছে। নার্সারি থেকে স্নাতক স্তর পর্যন্ত পড়ার সুযোগ রয়েছে। পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত (Humanities), ভাষাশিক্ষা (Languages), চারুকলা (Fine arts), বিজ্ঞান (sciences), প্রযুক্তিবিদ্যা (Technology), ইঞ্জিনিয়ারিং, হাতের কাজ কারিগরি শিক্ষা (Vocational Traning) । শিক্ষার সুবিধার জন্য রয়েছে গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, কর্মশালা এবং নৃত্যগীত ও চিত্রাঙ্কনের জন্য থিয়েটার ও ষ্টুডিও। শুধু শিশুর মানসিক প্রশিক্ষণই নয়, শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্যই বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয় এখানে। এখানে এখানকারই ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা নিতে হয়। কোন শিক্ষাবোর্ড থেকে কোন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়না। এটি একটি শায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। শারীর শিক্ষাপদ্ধতি ও বার্ষিক ক্রিড়া প্রতিযোগীতা এখানকার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য আনুষ্ঠানিক দিক। এই শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্দেশ্য হল শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের বহুদিনের শ্রম ও আদর্শ, যেখানে থাকবে ছেলেমেয়েদের একটা সামগ্রিক শিক্ষা। যাতে তারা নিজেদের জীবনকে জানতে বুঝতে শিখতে ও আবিষ্কার করতে পারে। অর্থাৎ দেশের গতানুগতিক অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যা করা হয় আমরা যে তাই একটু ভালভাবে করব এ শিক্ষা তাও নয়, আমরা এখানে এমন কিছু শিখাতে চাই– যা অন্য

কেউ করে নাই। আর এমন যে করা যায় সে ধারণাও তাদের নেই। এই অদ্ভুত অত্যাধুনিক চিন্তা চেতনাই শ্রী অরবিন্দের আন্তর্জাতিক শিক্ষার বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য। বর্তমান সময়ে তাঁর রচিত এই শিক্ষাকেন্দের শিক্ষাচিন্তার গ্রহণযোগ্যতা মানবজাতির জন্য নিঃসন্দেহে গৌরবের বিষয় বলে আমি মনে করি।

৬.২.২: বর্তমান সময়ে শ্রীঅরবিন্দের সমাজ সংস্কার চিন্তার গ্রহণযোগ্যতা

এই প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বলগ্নেই আমরা শ্রীমায়ের একটি চিরন্তন চিরনতুন বাণী দিয়েই আলোচনা শুরু করতে চাই। মা বলেছেন, " পৃথিবীতে মানুষ যে অবস্থার মধ্যে বাস করছে সে তার নিজেরই চেতনার অবস্থার দ্বারা সৃষ্ট। সেই চেতনাকে না বদলে পৃথিবীর অবস্থাকে বদলাতে যাওয়া অমূলক প্রয়াস।"[১২] তাঁর এই অমূল্য উক্তিটি জীবন্ত সত্য।

আমরা জানি পৃথিবী চলে তার নিজস্ব গতিতে। তাকে বদলানো মানুষের সাধ্যাতীত কিন্তু তাকেও যে একটি কেন্দ্রবিন্দু থেকে পরিচালিত হতে হয়; তা অন্য কেউ স্বীকার না করলেও শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্ শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি মত প্রকাশ করেছেন, যে ইউরোপ যে সেকল রাজনৈতিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যার সমাধান আজও পরিপূর্ণ করতে পারেন নি, তা যদি ভারতকে করতে হয়, তাহলে তাকে এমন কিছু করতে হবে যা আগে কখনও করা হয় নি। তাঁর মতে এটাই হল উচ্চতর জগতের জ্ঞানালোকপাত করার ভারতীয় অভিজ্ঞান এবং প্রকৃত সমাজ সংস্কার। বর্তমান ভারতের উন্নয়ন। এই কর্মকৌশল ভারতের আছে। এই কৌশল দিয়েই বর্তমান ভারত তার সামাজিক চিন্তার অগ্রগতি ঘটাচ্ছে। আগামীতেও ঘটাতে হবে।

যাঁর জীবন বাল্যকাল হতে বিদেশে, সেই বিদেশের শিক্ষা, স্বভাব, রুচি, প্রকৃতি, প্রতিভা ও সংস্কৃতি যার সমস্ত জীবনকে ঘিরে তিনি যখন ভারতভূমিতে পদার্পন করেই ভারতীয় সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করতে পারেন নি বরং তিনি এই প্রেক্ষিতে বাণীদান করেছেন, "আমি জানি, এই পতীত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারিরীক বল নয়, তরবারি বা বন্ধুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না। জ্ঞানের বল।"[১৩]

১২। পূর্বোক্ত, নারায়ণ প্রসাদ, **শ্রী অরবিন্দ আশ্রম জীবন কথা**, পৃ., ১১৩
১৩। পূর্বোক্ত, মাধবী মিত্র, **শ্রীঅরবিন্দ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন**, পৃ., ৫৮

শ্রী অরবিন্দ আরও বলেছেন, 'মায়ের বুকের উপর বসিয়া একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে ?' এটি যেমন অসহনীয়, তাঁর জীবন ক্ষেত্রেও সেটি ঘটেছিল। তিনি ভারতবাসীর স্বাধীকার অর্জনে দেশ জাতি, পরিবার ও সমাজের উন্নতি কল্পে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। ভারতীয় ঐতিহ্য যে ত্যাগের মহিমা তিনি তাই অর্জন ও গ্রহণ করে দেশমাতৃকার উদ্ধার কল্পে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। উপায়টি ছিল সরাসরি যুদ্ধ নয়, জ্ঞান-যুদ্ধ-বল দ্বারা এর উত্তরণ ঘটা। ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা যে আধ্যাত্মিকতা, তার দ্বারা। আমি এই লক্ষ্যেই বলতে চাই, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার যদি উন্নয়ন ঘটাতে চাই, তবে ভারতের জাতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা যা বহু প্রাচীন কাল থেকে আজও বর্তমান, তারই সম্প্রসারণ ঘটাই একমাত্র পথ।

বর্তমান সময়ে শ্রীঅরবিন্দের সমাজ সংস্কার চিন্তার গ্রহণযোগ্যতা যদিও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন সেতু, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মিলনে দ্রুত সম্ভব, তবুও তিনি নিজের উপলব্ধি থেকে যে বাণী দান করে গেছেন, আমরা তা উপেক্ষা করতে পারি না। তিনি বলেছেন:

> আমাদের উদ্দেশ্য সনাতন ধর্ম প্রচার– ও সনাতন ধর্মাশ্রিত জাতিধর্ম ও যুগধর্ম অনুষ্ঠান। আমরা ভারতবাসী আর্য জাতির বংশধর, আর্য শিক্ষা ও আর্য নীতির অধিকারী। এই আর্যভাবই আমাদের কুলধর্ম ও জাতি ধর্ম। জ্ঞান, ভক্তি ও নিষ্কাম কর্ম– আর্য শিক্ষার মূল ও জ্ঞান, উদারতা, প্রেম, সাহস, শক্তি, বিনয় আর্য চরিত্রের লক্ষণ। মানব জাতিকে জ্ঞান বিতরণ করা, জগতে উন্নত, উদার চরিত্রের নিষ্কলঙ্ক আদর্শ দেওয়া, দুর্বলকে রক্ষা করা, প্রবল অত্যাচারীকে শাসন করা, আর্য জাতির জীবনের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনে তাহার ধর্মের চরিতার্থতা । আমরা ধর্মভ্রষ্ট, লক্ষ্যভ্রষ্ট, ধর্মসঙ্কর ও ভ্রান্তিসঙ্কুল তামসিক মোহে পড়িয়া আর্য শিক্ষা ও নীতিহারা।
>
> আমরা আর্য জাতি হইয়া শূদ্রত্ব ও শূদ্র ধর্মরূপ দাসত্ব অঙ্গীকার করিয়া জগতে হেয়, প্রবল পদদলিত ও দুঃখ-পরম্পরা প্রপীড়িত হইয়াছি। অতএব যদি বাঁচিতে হয়, যদি অনন্ত নরক হইতে মুক্ত হইবার লেশমাত্র অভিলাষ থাকে জাতির রক্ষা আমাদের প্রথম কর্তব্য। জাতি রক্ষার উপায় আর্যচরিত্রের পুনর্গঠন যাহাতে জননী জন্মভূমির ভাবী সন্তান

> জ্ঞানী, সত্যনিষ্ঠ, মানব-প্রেমপূর্ণ, ভাতৃভাবে ভাবুক, সাহসী শক্তিমান, বিনীত হয়। সমস্ত জাতিকে বিশেষতঃ যুবক সম্পদায়কে সেইরূপ উপযুক্ত শিক্ষা, উচ্চ আদর্শ, ও আর্যভাব-উদ্দীপক কর্ম প্রণালী দেওয়া আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।'[১৪]

আশাকরি এ চেয়ে আর কিছু নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখেনা। শ্রীঅরবিন্দ যা বলেছেন, ভারতের জাতীয় জীবনের পুরুদ্ধারের জন্য এই যথেষ্ট। আমরা যদি তাঁর এই নীতি চিন্তা চেতনাকে সমগ্র ভূ-ভারতে ছড়িয়ে দিতে পারি যুবকদের চারিত্রিক বলিষ্ঠ ও সাংগঠনিক ধারাকে সুরক্ষা ও টেকসই করতে পারি তবে বর্তমান ভারতকে বা ভারতের উন্নয়নকে কেউ ব্যাহত করতে পারবে না। 'ভোগে সুখ নাই ত্যাগেই সুখ' ভারতীয় এই চিরন্তন শাশ্বত বাণীকে আমরা যত প্রসার ঘটাতে পারব ততই ভারতের সামাজিক পারিবারিক সকল সমস্যার সমাধান হবে।

৬.২.৩: বর্তমান সময়ে শ্রীঅরবিন্দের ধর্মচিন্তার গ্রহণযোগ্যতা

বস্তুবাদী, অবিশ্বাসী, সংশয়বাদী ও নাস্তিক হিসেবে তিনি যে নিঃসন্দেহ ছিলেন না এমন একজন বিদেশী সংস্কৃতিতে আজীবন গড়ে ওঠা মানুষ কি করে আপন স্বরূপ স্বভাব ও সংস্কৃতি বদলিয়ে একজন গোড়া ভারতীয় হতে পারেন, আশ্চর্যের বিষয় এখানেই। ভারতধর্ম বলে এরই নাম জন্মান্তরীণ সংস্কার। পূর্ব জন্মে যার যতটুকু করা থাকে, তাকে পুনঃ জন্মের পর সেখান থেকেই অগ্রসর হতে হয় বা তার জীবন শুরু হয়। শ্রী অরবিন্দ ছিলেন তারই প্রত্যক্ষ স্বীকার।

ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠা জীবন তিনি বা তাঁর পিতা চাইলেও তা কখনও সম্ভব হয়ে ওঠেনি, বা জীবনে প্রস্ফূটিত করে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। শ্রী অরবিন্দ তাই দেশবাসীকে জানালেন, "হে ভগবান তুমি যদি সত্যি থাক , তবে নিশ্চয়ই তুমি আমার মনের কথা জান, আমি মুক্তি চাই না। অপরে যা চায় এমন কোন জিনিষই আমি চাই না। আমি শুধু চাই, এই জাতিটাকে তোলবার শক্তি। আমি শুধু চাই, এই– যে ভারতের লোক সকলকে আমি ভালবাসী, যেন এদের জন্য জীবন ধারণ করতে পারি, এদের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পারি।"[১৫] এই একটি মাত্র কামনাই তাঁকে তাঁর জীবনের সমস্ত প্রকৃতি বদলিয়ে দিতে সক্ষম হয়ে উঠেছিল।

১৪। ঐ, পৃ., ৬৩

১৫। পূর্বোক্ত, হরেন্দ্রনাথ মজুমদার, **ঋষি অরবিন্দের যোগ-জীবন ও সাধনা**, পৃ.,২৪

ভারতমাতাকে ভালবাসতে চাওয়াই ছিল তাঁর জীবনে ধর্মের মূল সূত্র। ধর্ম অর্থ– ধারণ করা, যিনি নিজেকে না চেয়ে অপরকে আপন করে ধারণ করেন, ধর্মের সংজ্ঞা তো সেখানেই নিহিত। যা অজানিত ভাবে অতি সংগোপনে তাঁর জীবনে প্রবেশ করেছিল।শ্রী অরবিন্দ এক জবীনে যে অসম্ভব সাধনা করে মানুষের অন্তরের যত স্বপ্ন যত আশা সোনার আর নীলের মাঝখানে যে রূপালী হাওয়ায় মণিমুক্ত দিয়ে গড়ে তুলেছেন যে ইন্দ্রনীল পাহাড়– তার উচলে ঝলসায় সূর্যের আলো আর নিচলে যত রাত্রির অন্ধকার সেখানেই শ্রী অরবিন্দ জ্বেলে দিলেন স্বর্গের বহ্নি। খুলে দিলেন সোনার জলধারা, সোনার বরণ রাঙা সোপান বেয়ে নেমে এলেন স্বর্গের দেবতারা। শ্রীঅরবিন্দের এই সাধনাই উদিত হয়ে উঠল মানব জীবনের 'দিব্য-জীবন' সাধনায়। অর্থাৎ এই জীবনেই যাতে দেবতার স্বর্গ নেমে আসে এই মর্ত্যভূমিতে এই ছিল তাঁর যোগসমন্বয়। তার জন্য সকলে মানুষের হয়ে তার সকল দুঃখ কষ্ট দৈন্য দুর্বলতা অজ্ঞান অন্ধকার নিজের অঙ্গে মেখে নিতে হবে তার জন্য তাঁকে করতে হবে চরম আত্মত্যাগ। সব কিছু ছাড়তে হবে। দরকার হলে তাঁর দেহ পর্যন্ত। এই ত্যাগার্জনই হল শ্রীঅরবিন্দের বর্তমান সময়ে বা সমসাময়িকের চোখে তাঁর ধর্মচিন্তার গ্রহণযোগ্যতা।

বহু মহামানব বহুযুগধরে এই ভারতভূমিতে শুভাগমন করে অনেক ভাবে ধর্মলাভের পথ দেখিয়ে গেছেন, কিন্তু বর্তমান সময়ে এই অত্যাধুনিক যুগে শ্রীঅরবিন্দের ধর্মচিন্তার গ্রহণযোগ্যতা এখানে যে কারণে বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করেছে তার কারণটি হল– আমরা এই পৃথিবীর অনেক অদর্শনকে দর্শন করি যেমন কবির কবিতায়, সাহিত্যিকের সাহিত্যে, শিল্পীর শিল্পে, ইতিহাসে, ভুগোলে বা লোকমুখে শুনে। রজত শুভ্র মৌনী হিমগিরির শান্ত শোভা হয়তো চর্মচোখে আমাদের চাক্ষুষ করার সৌভাগ্য হয়নি কিন্তু যুগমানব শ্রীঅরবিন্দ আবির্ভাব ও প্রত্যক্ষ দর্শন এ যুগের মানুষকে এই জন্যেই বেশি আকৃষ্ট করেছে যে, এই ভোগবিলাসপূর্ণ বর্তমান পৃথিবীতে একজন সর্বজননন্দিত সুশিক্ষিত প্রাজ্ঞ বিচক্ষণ পন্ডিত ব্যক্তি নিজের চাওয়া পাওয়া কি করে সমস্ত ত্যাগ করে, কি করে পরের জন্য, দেশ জাতির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে পারেন, এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় কি ? বাঙালী জাতির জনক বঙবন্ধুর যে ত্যাগটুকু দেখেই আমরা বাঙালী হিসেবে আজ যত গর্ববোধ করছি সেই তুলনায় শ্রীঅরবিন্দ সাধনা ও প্রাপ্তি বিশ্ববাসীকে কি উপহার দান করেছেন বা

করতে পারেন– আমরা তার তুলনা করতে পারি কি ? যাদের দেখার সৌভাগ্য হয়েছে তারা বিস্ময়ে বলে উঠেছিলেন, এ কী দেখছি ? ইনি কি এই পৃথিবীর রক্ত মাংসে গড়া মানুষ ? না, সেই অতিমানস লোকের কনক জ্যোতি-কলেবরধারী দেব-মানব, যিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন, দুশ্চর তপস্যা করেছেন মানুষের বর্তমান চেতনার নব রূপান্তর ঘটাবার জন্যে অতিমানস চেতনার আলোকে। এ কি সেই মানুষ ?

আমরা এই বিষয়টিকে লক্ষ্য করে এই বলতে চাই যে, বর্তমানের এই হিংস্র দাবানলরূপ রাক্ষসপূর্ণ মানবসকল কি পারি না– শ্রীঅরবিন্দের মত শিক্ষায়-দীক্ষায়, শরতের সদ্য প্রস্ফূটিত পদ্মের মত আপনার স্বদেশের স্বধর্ম ও সভ্যতার মহিমায় প্রস্ফূটিত হয়ে ওঠা জননীর মত বিরাট ও উদার হতে। তিনি দৃঢ়নিষ্ঠ সাধনার দ্বারা নীরবে কারাগারে বসে শান্ত সুস্থিরভাবে একদিকে যেমন অধ্যাত্মশক্তি সঞ্চয় করেছিলেন, অপরদিকে দেশমাতৃকার জন্য জীবন দান করেছিলেন। অর্থাৎ একদিকে ঈশ্বরলাভ অপর দিকে দেশজননীর স্বাধীনতা সৌন্দর্য ঐশ্বর্য লাভ– বর্তমান সময়ে এমন মানব জীবন কি আমরা সবার নিকট অরবিন্দের জীবনের মত প্রার্থনা করতে পারি না ? তাঁর আর একটি লক্ষ্যণীয় দিক ছিল– তিনি কখনও সাময়িক জয়গানের চাপে পথভ্রষ্ট হন নি। তিনি সত্যিকার মানুষ হয়ে ভগবানের আশীর্বাদপুষ্ট মানব রূপে মানব কল্যাণের বাণী বহন করে এসেছিলেন। বাংলাদেশে এমন একজন নেতার অভাব কতকাল ধরে অপেক্ষা করছিল একটু চিন্তা করলেই অনুধাবন করতে পারি। তাঁর অদেয় কিছু নেই। তাঁর হস্তে বাংলা তথা ভারতের সম্মান ও স্বার্থ নিরাপদ থাকার কোন আপত্তি আমাদের নিকট থাকতে পারে কি ?

তাঁর মহত্ত আমাদের কথায় যতটা না বিশ্বস্থ ও পরিষ্ফুট হয়ে ওঠে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথায় বললে নিশ্চয় কারও মনে সংশয় থাকবেনা। কারণ তিনি নিজেই মহান ও মহৎ। আর মহতের দ্বারাই মহতের গুণগান শোভা পায়। আমরা অবগত আছি– শ্রীঅরবিন্দ দিনের পর দিন 'বন্দেমাতরম্ 'পত্রিকায় তাঁর অগ্নিবর্ষী বাণী দিয়ে জাতীয় চেতনাকে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, যার কারণে তিনি রাজদ্রোহ অপরাধে গ্রেপ্তার হলেন ঐ পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে। তাঁর বিরুদ্ধে কোন কিছু প্রমাণ না থাকার কারণে যদিও তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন, কিন্তু সারা দেশে তখন চলছিল প্রবল উত্তেজনা ও আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথ শ্রী অরবিন্দের গ্রেপ্তারের সংবাদ শুনে

আবেগে উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠলেন। তিনি রাজ-বিদ্রোহী শ্রীঅরবিন্দের দেশপ্রেম , নির্ভীকতা ও আত্মত্যাগের নির্বিকার মূর্তি দেখে জানালেন তাঁর অন্তর উদ্বেলিত অপার শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি-মাখা ভালবাসা। এরই প্রমাণ পাই তাঁর সশ্রদ্ধ অভিনন্দনের বাণীমূর্তি 'নমস্কার' নামক সুদীর্ঘ এক কবিতায়। এই কবিতাটি রচিত হয়েছিল ১৯০৬ সালের সেই অগ্নিযুগে।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর সঙ্গে দেখা করে কলম হাতে নিয়ে যেদিন আমাদের জানালেন, প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম – ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্যি করে চেয়েছেন, সত্য করে পেয়েছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন বললে, ইনি এর অন্তরের আলো দিয়েই বাইরের আলো জ্বালাবেন। কথা বেশি বলবার সময় হাতে ছিলনা। অতি অল্পক্ষণ ছিলুম। তার মধ্যে মনে হল, তাঁর মধ্যে সহজ প্রেরণাশক্তি পুঞ্জিত। কোন খরদন্তুর মতের উপদেবতার নৈবেদ্য রূপে সত্যের উপলব্ধিকে তিনি ক্লিষ্ট ও খর্ব করেন নি। তাই তাঁর মুখশ্রীতে এমন সৌন্দর্যময় শান্তির উজ্জ্বল আভা। মধ্যযুগের খ্রিষ্টান সন্ন্যাসির কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি জীবনকে রিক্ত শুষ্ক করাকেই চরিতার্থতা বলেন নি। আপনার মধ্যে ঋষি পিতামহের এই বাণী অনুভব করেছেন, 'যুক্তাত্মনঃ সর্বমেবাবিশন্তি'। (প্রার্থনা কবিতায় যার বহিপ্রকাশ তিনি দেখিয়েছেন– 'যুক্ত করহে সবার সাথে মুক্ত করহে বন্ধ, সঞ্চার করহে সকল কর্মে শান্ত তোমার ছন্দ।') পরিপূর্ণের যোগে সকলের্ই মধ্যে প্রবেশাধিকার– আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার। (তিনিও চেয়েছিলেন ভারতাত্মার এই অমৃতময় আবিস্কৃত বাণী বিশ্বময় ছড়ায়ে দিতে।) আমি তাঁকে বলে এলুম– আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই অপেক্ষায় থাকব। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে , শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। এই মর জগতে কি করে মানুষ অমর হয়ে বেঁচে থাকার সন্ধান জানতে পারে সেই শিক্ষা কি আমরা রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দের জীবনস্মৃতি পর্যালোচনা করলে বুঝতে পারিনা ? এই লক্ষ্যেই আমি বলতে চাই– বর্তমান সময়ে শ্রীঅরবিন্দের ধর্মচিন্তার গ্রহণযোগ্যতা কেন অতি অত্যাবশ্যক ? কারণ আমাদের পক্ষেও সম্ভব তাঁদের মত মানুষ হয়ে গড়ে উঠা। শুধু চাই আমাদের পরকল্যাণে নিঃস্বার্থ নিষ্কাম ভালবাসা ও আত্মত্যাগ। বিদ্যালাভ শুধু নিজের ঐশ্বর্য উদ্ধার ও বড় চাকুরী করে জীবন ধন্য করা মোটেই নয়।

বরং নিজের সম্পূর্ণ স্বার্থ জাতিকে বিলিয়ে দিতে হবে নিষ্কাম নিঃস্বার্থ ভালবাসা দ্বারা। শ্রী অরবিন্দ যা উপহার স্বরূপ এবার নিজের জীবন দিয়ে, দেখিয়ে ও শিক্ষা দিয়ে গেলেন জাতিকে। একটু ইচ্ছা করলে আমরাও পারি তাঁদের মত মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে। তাঁদের মত ভোগী না হয়ে ত্যাগী হতে। বিশ্বের মানুষকে ভালবাসতে। দেশ জাতির কল্যাণ করতে। শ্রী অরবিন্দের এই ধর্মরূপ সত্য-চিন্তা-চেতনাই বর্তমান সময়ে সবার জন্য আজ একান্ত প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেদিন থেকে পরকে আপন করার ভালবাসা শিক্ষা জনজীবনে জাগ্রত হয়ে উঠবে সেদিনেই ধর্ম কি তা বিশ্ববাসী জানতে পারবে– শ্রী অরবিন্দ আক্ষেপ করে কি চেয়েছেন প্রকৃত অর্থে আমাদের কাছে। কবির ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়ঃ

কেন চেয়ে আছ গো মা, মুখপানে
এরা চাহেনা তোমারে চাহে না যে,
আপন মায়েরে নাহি জানে।
এরা তোমায় কিছু দেবেনা–
মিথ্যা কহে শুধু কত কী ভানে।।
তুমি তো দিতেছ মা, যা আছে তোমারি–
স্বর্ণশস্য তব জাহ্নবী বারি,
জ্ঞান ধর্ম কত পুণ্য কাহিনী।
এরা কি দেবে তোরে ! কিছু না, কিছু না।
মিথ্যা কবে শুধু হীন পরাণে।।
মনের বেদনা রাখ মা মনে ।
নয়ন বারি নিবারো নয়নে।।
মুখ লুকাও মা, ধুলি শয়নে–
ভুলে থাক যত হীন সন্তানে।
শূন্যপানে চেয়ে প্রহর গণি
দেখ কাটে কিনা দীর্ঘ রজনী।
দুঃখ জানায়ে কি হবে জননী ,
নির্মম চেতনাহীন পাষাণে।[১৬]

১৬। সুশীল চন্দ্র বর্মন, **শ্রীঅরবিন্দ অনুধ্যান,** কলিকাতাঃ শ্রীঅরবিন্দ কর্মী ট্রাষ্ট সংঘ, হাবড়া দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৭, পৃ.,৬৫-৬৬

৬.৩.১: বর্তমান সময়ে নিগমানন্দের শিক্ষা চিন্তার গ্রহণযোগ্যতা

বর্তমান সময়ে স্বামী নিগমানন্দের শিক্ষা চিন্তার গ্রহণ যোগ্যতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, শিক্ষাবিষক চিন্তা চেতনার মূল আদর্শ হল, শিশুদের দৈহিক, মানসিক এবং আত্মিক বিকাশ। বর্তমানে এর অবমূল্যায়ন করে বরং সেই তুলনায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তির প্রখরতার উৎকর্ষ বৃদ্ধি দ্বারা অর্থ ও নাম যশের সম্মানীয় ব্যক্তি হিসেবে সমাজে কিভাবে সুপরিচিতি লাভ করা যায় এবং বুদ্ধির বদৌলতে জীবনে নতুন কোন একটিকে তাৎক্ষণিক দেখিয়ে চমক লাগিয়ে দেওয়া যায় এক্ষণে শিক্ষার মূল মর্ম বলে এটাই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বেশি। কিন্তু নিগমানন্দের শিক্ষার মূলে হল:

সর্বপ্রথম চরিত্র গঠন, অতঃপর দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক এবং নৈতিকতার প্রসার লাভ ঘটা, শেষে চেয়েছেন, 'সৎশিক্ষা বিস্তার' মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর জীবনের উন্নয়ন। যেহেতু গোড়া মজবুত না হলে সৎবুদ্ধি অসৎ কাজে জড়িয়ে পড়ে দেশ জাতির উপকারের চেয়ে ধ্বংস বয়ে নিয়ে আসে বেশি, এই বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ আছে বলে আমার জানা নেই। বর্তমান পৃথিবী প্রতি মুহূর্তে প্রতিক্ষণে তার প্রমাণ দিয়ে জানাচ্ছে– কিভাবে আজ অশিক্ষা ও কুশিক্ষার প্রভাবে প্রখর বুদ্ধিমান শিক্ষার্থীরা এবং কি– যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মানুষ গড়ার কারিগড় অথচ সেখান থেকেও এই সকল উচ্চ ডিগ্রীধারী শিক্ষার্থীরা বের হয়ে যারা নাকি দেশ জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার হবে আজ তারাই মানবের কল্যাণ কাজে না লেগে বরং মানবের জীবনের ঝুঁকিকে বাজি করে ভয় হয়ে শাসাচ্ছে। ভয়ে সারা পৃথিবীর মানুষ আজ দেখছে ও ভাবছে বর্তমান শিক্ষার গৌরব কত মহান ও কত আদর্শ ? দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজ এর প্রতিরোধ কল্পে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মিটিং মিছিল করছে। এতেই প্রমাণিত হয় না কি বর্তমান সময়ে শ্রীনিগমানন্দের শিক্ষা চিন্তার গ্রহণযোগ্যতা কত বেশি দেশ জাতির উন্নয়নে সহায়ক। মানুষ হয়ে যদি মানুষের মনুষ্যত্বই না জাগ্রত হল তবে "ছাত্রজীবনে সৎশিক্ষার একমাত্র ব্রত ব্রহ্মচর্য রক্ষা জীবন। ভারতের প্রাচীন উন্নতির ও পুনরুত্থানের এ-ই একমাত্র বীজমন্ত্র। এই অমূল্য ছাত্রজীবনে ছাত্রগণ ব্রহ্মচর্যব্রত (নীতি, বিবেক ও বল) হারাইয়া অশিক্ষায় কুশিক্ষায় আজ শক্তিহীন, দুর্বল ও ভয়ঙ্কর হইয়া পড়িয়াছে।"[১৭] অর্থাৎ আমরা ধর্মজীবন ও শিক্ষাজীবনকে

১৭। স্বামী নিগমানন্দ, **ব্রহ্মচর্য সাধন,** কলিকাতা: আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, হালিসহর. উনবিংশ সংস্করণ, ১৪০৭, পৃ., ৬

সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলেছি এবং এদের কারও সঙ্গে যে কারও সম্পর্ক নেই এই ভেবে ধর্মকে আজকাল শিক্ষার পরিপন্থী বলে গ্রহণ করেছি। এর মূলে হল পিতা-মাতা, অভিভাবক, ছাত্র ও শিক্ষক এবং শিক্ষানীতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহই সম্পূর্ণ দায়ি বলে আমি মনে করি। স্বামী নিগমানন্দজীর মতে যতদিন না শিশুদের নীতি শিক্ষা যেমন– পূর্বের 'বাল্যশিক্ষা', 'বোধোদয়', মদন মোহনের 'শিশু শিক্ষা', ঈশ্বরচন্দ্রের 'হিতোপদেশ', যিনি আঠারো বছর ধরে এককালে ভারতবাসীকে তার জাতীয় কৃষ্টি সভ্যতা ও ঐতিহ্যকে মহিমান্বিত করে রেখেছিল। এর প্রমাণ মিলে কবিশ্রেষ্ঠ মধুসুদন দত্তের স্বীকারোক্তিতে।

পরধনলোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি,
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরি হরি
অনিদ্রায় অনাহারে সঁপি কায়-মনঃ
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি। [১৮]

আজকের এই সুসভ্য একবিংশ শতাব্দীর অত্যাধুনিক যুগে কেন আমাদের শিক্ষার প্রতি অনুরাগ না হয়ে বিরাগ জন্মাচ্ছে প্রাজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তিত্বগণ একটু চিন্তা করলেই উপলব্ধি করতে পারবেন। অতএব প্রকৃত শিক্ষার বিকাশ চাইলে প্রাচীন ভারতের তপস্যীদের লব্ধজ্ঞান কখনই উপেক্ষা করে অন্য কিছু হবার নয় বলে স্বামী নিগমানন্দের সমাধিলব্ধ অভিজ্ঞান এযুগে আবির্ভব হয়ে তার প্রমাণ দিয়ে গেছেন। বর্তমান সময়ে স্বামী নিগমানন্দজীর শিক্ষা চিন্তার গ্রহণ যোগ্যতা এখানেই উপযুক্ত প্রমাণ প্রকাশ লাভ করে বলে আমি মনে করি।

অতএব আমাদের মনে রাখতে হবে, ধর্মই সর্বপ্রকার শিক্ষা উন্নতির একমাত্র ভিত্তি। ধর্মের মূল নীতিগুলি যেমন– কারও প্রাণে দুঃখ দিবে না, কাউকে আঘাত করবে না। হিংসা দ্বেষ থেকে বিরত থাকবে। সদা সত্যপথে চলবে, সত্য কথা বলবে, মিথ্যা ছল-চাতুরী থেকে সর্বদা দূরে থকবে। পৃথিবীর সকল জীবকে আপনার ভাববে। কারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না। তবে স্বাধীনতার নামে যাতে কেউ স্বেচ্ছাচারী না হয়ে উঠে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। পিত-মাতা ও গুরুজনদেরকে শ্রদ্ধাভক্তি করবে। পরদ্রব্য অপহরণ করবে না, চুরি করবে না, কাউকে ঠকাবে না। পরের উপকারে সর্বদা নিজেকে উৎসর্গ করবে, আত্মস্বার্থ ভুলে পরকল্যাণে

১৮। পূর্বোক্ত, উদ্ধৃত, লীলা নারায়ণী দেবী, **বাংলার সাধনা ও শ্রীশ্রীনিগমানন্দদেব**, পৃ., ১১

নিবেদিত প্রাণ হয়ে বাকি জীবনটুকু অতিবাহিত করবে। দেশ জাতির সকল শ্রেণীর মানুষকে আপন ভাই-ভগ্নি মা-বাবা বলে ভাববে। এই মানবতার উৎকর্ষ সাধনই হল প্রকৃত শিক্ষা , স্বামী নিগমানন্দজীর এটাই অভিমত।

'ধর্ম ' অর্থ– শুধু ঈশ্বর স্বীকার বা তাঁকে অন্ধ ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করা নয়, ধর্ম মানেই সত্য রক্ষা, সত্য মানেই যথাযথ নিয়ম নীতি মত জীবন যাপন করা। শিক্ষা অর্থ হল, মানব জীবনের অন্তর্নিহিত ঐশী শক্তির এই গুণাবলিগুলির দ্বারা উন্মোচন সাধন করা। অতএব যে পুস্তক পাঠ করলে মানবতার বিকাশ হয় সেই শিক্ষা লাভ করাই যথার্থ শিক্ষা। ধর্মহীন শিক্ষা ব্যতীত কখনই আমিত্বের সংকীর্ণ গন্ডি নষ্ট হয় না। এ কথায়– 'ঘসে-মেজে রূপ, আর ধরে-বেঁধে পীরিত' কখনই সম্ভব হয় নি হবেও না। আমরা পিতা-মাতা অভিভাবক ও শিক্ষক যতদিন না আমাদের সন্তানদের ব্রহ্মচর্যের নীতি নিয়মের বেড়ার আদর্শে গড়ে তুলতে না পারব ততদিন এই দেশের বর্তমান শিক্ষানীতি কোনদিন মানুষকে মানুষ করে গড়ে তুলবে না। স্বামী নিগমানন্দজী এ কারণেই জোর দিয়ে বলেছেন:

> আমরা আজ বিজাতীয় শিক্ষা বলে এতটাই বলশালী হইয়াছি যে, একটু বিদ্যাভিমানী হইলেই ও সমাজে উচ্চপদ লাভ করিলেই বান্ধবসমাজে বহু পরিবার-পোষক দরিদ্র পিতাকে বাটির চাকর না বলিলে তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না। আমাদের নজর আজ শিক্ষাবলে এতই উচ্চ হইয়াছে যে, আমাদের ধর্ম ধর্মই নহে,আমাদের শিক্ষা শিক্ষাই নহে, আমাদের সংসারের সার বঙ্গ-ললনাগণ স্ত্রী মধ্যেই গণনীয়া নহেন, আমাদের বঙ্গীয় ঔষধ ঔষধই নহে এবং আমাদের ক্রিয়া-কর্ম ধর্ম মধ্যেই গণ্য নহে। কারণ ধর্মরক্ষার্থে আমরা কোন শিক্ষাই পাই নাই। [১৯]

প্রকৃত ধর্মার্জনই যে শিক্ষার যথার্থ বাহক ও প্রতিপালক এর গভীরে আমরা আজ পর্যন্ত গমন করি নি।

৬.৩.২: বর্তমান সময়ে নিগমানন্দের সমাজসংস্কার চিন্তার গ্রহণযোগ্যতা

আলোচ্য বিষয়টি যুগোপযোগী আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করলেই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু যুক্তিবিশ্লেষণের যুগে স্বাভাবিক ভাবেই মনে দোলা দেয়, অতীত ও বর্তমান পরস্পর বিরুদ্ধ। কারণ বিজ্ঞানের ধারণা অতীত অর্থ অন্ধকার বা গত, অর্থাৎ যা গত তা অবশ্যই অনালোকিত, অনুন্নত ও অনুজ্জ্বল। আর যা বর্তমান তা অবশ্যই অজ্ঞান অন্ধকার বহির্ভূত, আঁধারহীন আলো ও একটি উন্নত জীবন। অতীতের দিনগুলির চেয়ে বর্তমান

১৯। পূর্বোক্ত, স্বামী নিগমানন্দ, **ব্রহ্মচর্য-সাধন**, পৃ., ২

দিনগুলি আমাদের অনেক অন্ধকার থেকে রেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছে ও করছে, বর্তমানে আমাদের এটাই বিশ্বাস। অতীতে মানুষ যেহেতু প্রকৃতির উপর ছিল সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। আরও ছিলেন, ঈশ্বরের অনুদান ও আশীর্বাদরূপ যেমন– প্রকৃতির দান জলের উপর নির্ভর করে চাষাবাদ ও খাদ্য যোগান। ধনের দেবী লক্ষ্মীর উপর নির্ভর করে ধন উপার্জন ও সংসার পরিচালন। না জানতো আলোর ব্যবহার। না জানত রান্না করে খেতে, না জানত পরিবার ও সমাজ নিয়ে একটি সুন্দর সুসভ্য জীবন গড়ে তুলতে। সমাজ বলতে যে একটি সুসংবদ্ধ শক্তিশালী ও একটি সুসভ্য উন্নত বাস্তব জীবন তৎকালীন তা কিছুই ছিল না। বিজ্ঞানই আজ মানুষকে পরনির্ভরতার হাত থেকে বাঁচিয়ে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলেছে। মানব জীবনকে দিয়েছে কত জ্ঞান গড়িমার মহিমা ও একটি শান্তি, সুসভ্য, সুসংবদ্ধ সমাজ জীবন। মানুষ আদীম বর্বর অসভ্য চাষা থেকে লাভ করেছে কত সভ্য সুন্দর জীবন। আমাদের জন্ম কর্ম সমাজ ব্যবস্থা ও শিক্ষা সবই ছিল অনুর্বর অজ্ঞ ও অসভ্য মানবেতর। সেই তুলনায় বর্তমানে আমরা অনেক অনেক জ্ঞান ও গুণে সুসভ্য শিক্ষিত ও উর্বর মনোজ্ঞানের অধিকারী।

কিন্তু ধর্ম দিচ্ছেন সম্পূর্ণ এর বিপরীত ব্যাখা। ধর্ম বলছেন, অতীত অর্থ শুরু বা আরম্ভের পর যাকে স্বাভাবিক অর্থে বলা হয় গত বা অতীত এর অর্থ কিন্তু তা নয়। যার শুরুই কেউ জানে না তার আবার অতীত ভবিষ্যত কি, আজ পর্যন্ত কেউ প্রমাণ করে দেখাতেও তা পারেন নি। যতটুকু ব্যক্ত হয়েছে বা সময় প্রকাশ করা হয়েছে, তা আনুমানিক বা আন্দাজের উপর নির্ভরশীল। সনাতন হিন্দুধর্মের পৃথিবীশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা যা ৫৮টি ভাষারও অধিক ভাষাভাষিগণ তাদের নিজ প্রয়োজনে এই মহামূল্যবান গ্রন্থটিকে অনুবাদ করে আত্মজীবন গঠনে দেশে ও বর্হিবিশ্বে জ্ঞান বিলাচ্ছেন, কারণ গ্রন্থটি স্বয়ং 'শ্রীভগবান উবাচ' বলে সর্বসমক্ষে বাস্তব পৃথিবীর কর্মময় জীবনযজ্ঞে আশীর্বাদস্বরূপ বলে গণ্য হয়েছে। গীতায় স্পষ্ট বলা আছে:

অব্যক্তাদীনি ভূতানি, ব্যক্ত মধ্যানি ভারত। অব্যক্ত-নিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা। –গীতা, ২য় অধ্যায়, ২৮ শ্লোক। শ্রীভগবানের এই বাণীটি দ্বারা সৃষ্টির অতীত ভবিষ্যত ও বর্তমান প্রমাণ হয়েছে– অর্থাৎ আমাদের যেমন অতীত অব্যক্ত, অনুরূপ ভবিষ্যতও অব্যক্ত, বর্তমানটি শুধু ব্যক্ত। অতএব এই নিয়ে কোন

আলোচনা পর্যালোচনা ধর্মতত্ত্ববিদ্‌গণ যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। গীতায় আরও বলা আছে অতীতে এরূপ আমাদের আরও কত– শত শত জন্ম যে হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। প্রকৃতির যেমন পরিবর্তন আছে, তখন ভূত ভবিষ্যতেরও পরিবর্তন আছে। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করছি– গবেষণাকারী দার্শনিকগণ সেই সম্পর্কে তারা শুধু একটি ব্রহ্মান্ডের সৃষ্টির একটা আনুমানিক ধারণা দিয়েছেন মাত্র কিন্তু এই নিখিল বিশ্বে এমন আরও কত অনন্তকোটি ব্রহ্মান্ডের মধ্যে কত শত হাজার বার যে সৃষ্টি ও ধ্বংস হয়েছে, কত শত বিবর্তন ও পরিবর্তন হয়েছে, কত ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান অবলীলায় পার হয়ে গেছে, সামাজিক পরিবেশ তৈরি হয়েছে ও ভেঙেছে তার গণনাও নেই, কেউ এর অতীতও জানে না। ধর্ম এ কারণেই দাবি করেন, সৃষ্টি অনাদি এবং এর ধ্বংসও অনাদি। শুধু মাঝখানে যা কিছু দেখছি সবই ক্ষণিক পরিবর্তন মাত্র। সময়ের একটা হেরফের মাত্র। ক্রমবিবর্তনের ধারায় শুধু ওলট পালট হচ্ছে এই যা।

বর্তমান বিজ্ঞান যে অতীত সময়কে আদি বলে সমাজকে অনুন্নত ও অসভ্য বলছে সেই প্রেক্ষিতে বর্তমান সুসভ্য যুগেও যদি তাকিয়ে দেখি বা গণমাধ্যম সংবাদপত্র দেখি– তবে প্রতিদিন দেখব হাজার হাজার মানুষ এই সভ্য সমাজে কিভাবে লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, অপদস্ত ও হতাশ হচ্ছে, কতশত ভাল মানুষ মানুষেরই হাতে রক্ষা না পেয়ে মৃত্যু বরণ করছে, কত শত মায়ের কোল শূন্য হচেছ, কত মাতৃজাতীর অসন্মান হচ্ছে, কামনা বাসনার কবলে পরে কত শত মা বোন তাদের সন্মানীয় ইজ্জতটুকু হারাচ্ছে। মাকে মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, স্বার্থের লোভে পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে খুন করছে, আমরা কি তবুও এই অত্যাধুনিক যুগকে সভ্য যুগ বলব ? ধর্মভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা বরং এই বলতে চায়, অনাদি কাল থেকে পৃথিবীতে সব সময় এইরূপ কিছু সময় ভাল, কিছু সময় মন্দ, এইভাবে– সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়, লাভ-অলাভ, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট এবং সভ্য ও অসভ্য-র ক্রমিক পরিবর্তন ক্রমবিবর্তনধারায় ঘটছে, ঘটে আসছে, এবং আগামীতেও ঘটবে। কিন্তু মানুষের বিবেক রূপ ধর্ম মানুষকে চিরকাল সত্যের দিকে পূর্বেও পথ দেখিয়েছে বর্তমানেও দেখাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও দেখাবে। ন্যায় সত্য প্রতিষ্ঠা করাই ধর্মের অগ্রযাত্রা। কিন্তু আমরা লোভী স্বার্থপর ও আত্মপ্রশংসাকারী বলেই নিজবুদ্ধি খাটাই এবং আপন যুক্তি ও মতদান করি। উপরিউক্ত আলোচনাটি সম্পর্কে

ও তার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী নিগমানন্দজীর সমাজ সংস্কার বিষয়ক অনেক আলোচনার মধ্যে কিছু বাণী এখানে তুলে ধরে বুঝানোর চেষ্টা করছি তিনি কিরূপ সমাজ সংস্কার ও সমাজ ব্যবস্থা চেয়েছিলেন ।

> হিন্দু (এই শব্দটিকে বুঝাতে– তিনি 'হীনত্ব দুষয়তি যঃ স হি হিন্দু' । এখানে হীনতা পরিত্যাগকারীকেই হিন্দু বলে বুঝিয়েছেন । হিন্দু কোন জাতি নয়, হীনতাত্যাগকারী সকল জাতি ধর্মই হিন্দু বলে বিবেচ্য ।) ধর্মে একসময় ব্যক্তি, সমাজ ও ধর্ম সব বিষয়ের মধ্যে এমন এক সমুজ্জ্বল ভাব ও বিধি বর্তমান ছিল, যাতে প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে থেকেও তার দ্বারা মহান্ কর্তব্যের সন্ধান পেত । তখন অবস্থাভেদে ব্যবস্থা ছিল । এখন দেখি হিন্দুর সব যেতে বসেছে । সামঞ্জস্য নেই, ছন্দ নেই, আছে কেবল উচ্ছৃংখল স্বেচ্ছাচার । হিন্দুর এখন বড় দুর্দিন এসেছে ।.... সে সময় সমাজ ও দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির অনুকূল ভিন্ন প্রতিকূল ছিল না । বর্তমানে কালের পরিবর্তনে, শাসকের পর শাষকের পরিবর্তনে পারিপার্শ্বিক বহু বিপর্যয়ের মধ্যে এই সনাতন ধর্ম ও সমাজ এখনও জীবীত আছে সত্য কিন্তু অস্থিচর্মসার । হিন্দুর আজ বড় দুর্দিন । সকলকে সংঘবদ্ধ হতে হবে ।–নতূবা আর উপায় নাই ।[২০]

অন্যত্র এছাড়াও তিনি বর্তমান সমাজ সংস্কারকদের উদ্দেশ্যে অতীতের সাথে তুলনা করে আরও এই সম্পর্কে বুঝিয়েছেন:

> তোমরা পথ ছাড়িয়া বিপথে ঘুরিয়া মরিতেছ কেন ? গৃহের ভিত্তি ছাড়িয়া আগেই ছাদের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছ কেন ? ধর্ম ও সমাজ থাকিলে তো তাহার সংস্কার করিবে ? এখন যে ভায়ে-ভায়ে, পিতা-পুত্রে,স্বামী-স্ত্রীতে বিভিন্ন সমাজ ও বিভিন্ন ধর্ম । তোমরা তবে সংস্কার করিবে কি ? মাথা নাই মাথাব্যথা হইবে কিরূপে ? আগে একতার বন্ধনে সমাজ স্থাপন কর, তৎপরে দোষ দেখিলে সমাজ সংস্কার করিও । মৃত সমাজ-দেহে আঘাত করিয়া কি লাভ ? আগে সমাজ -দেহকে সঞ্জীবিত কর , তৎপরে দুষিত অঙ্গ কাটিয়া ফেলিও, দেখিবে ঔষধ ও পথ্যে দুইদিনেই ক্ষত স্থান আরোগ্য হইয়া উঠিবে । আগে নিজে সংস্কৃত হও, ধর্মলাভ কর, তৎপর সংস্কার ও ধর্মপ্রচার করিও । বড় বড় কথায় বক্তৃতা না দিয়া সর্বাগ্রে প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার কর । প্রকৃত শিক্ষা লাভে যখন জীব,

---

২০ । পূর্বোক্ত, সত্য চৈতন্য ও শক্তি চৈতন্য, **শ্রীশ্রী নিগমানন্দ উপদেশামৃত**, পৃ., ১৮০

> জগৎ ও শ্রীভগবানের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, তখনেই "মাতা চ পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বর। বান্ধবাঃ শিব ভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম।" এই সুমহান উদারভাব – অচ্ছেদ্য প্রেমের ভাব বুঝিতে পারিবে। তখন আমিত্বের সংকীর্ণ গন্ডি বিশ্বময় প্রসারিত হইবে, জগতের স্বার্থে আত্মস্বার্থ পদদলিত হইয়া যাইবে।, আমিত্বের একটি শৃংখলে রাজা-প্রজা দীন-দরিদ্র, ব্রাক্ষণ-চন্ডাল, এমন কি পশু-পক্ষি, কীট-পতঙ্গ, পর্যন্ত বাঁধা পড়িবে। তখনেই প্রকৃত সমাজ প্রতিষ্ঠা হইবে। তখন তোমরা একতার হার গলে পরিয়া বিশ্বজয় করিতে সক্ষম হইবে। পঠিত শিক্ষায় গঠিত জীবন না হইলে সে শিক্ষার নামে যে ধিক্কার পড়িবে ? অতএব প্রথমতঃ শিক্ষালাভ করিয়া তদনুযায়ী চরিত্র গঠন কর।[২১]

স্বামী নিগমানন্দজীর অন্তর্নির্হিত ইচ্ছা ছিল– ভারতের এই অধঃপতিত জাতিকে প্রাচীন ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের আদর্শে বর্তমান সমাজে পুনঃরুজ্জীবিত করে তুলা। কারণ সেকালের ঋষিযুগে সকলেই আনন্দে বসবাস করতেন। এর কারণটি ছিল– তৎকালীন ধর্মভিত্তিক আদর্শ সমাজ-জীবন-গঠন ব্যবস্থার প্রবর্তন। মানব সমাজকে আজও যদি আমরা আনন্দে রাখতে চাই, একটি আদর্শ সমাজ-জীবন দান করতে চাই– তবে বর্তমান মানবসমাজকে স্বামী নিগমানন্দজী প্রতিষ্ঠিত সমাজের বুকে সমাজ গঠনমূলক তিনি যে সকল অবদান রেখে গেছেন, [দ্রঃ যুগসমস্যায় ঠাকুর নিগমানন্দ গ্রন্থ] যেমন– প্রধানতঃ সাপ্তাহিক সারস্বত সংঘ প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ আপন বাড়ী, পাড়া ও প্রতিবেশিদের নিয়ে একটি নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে একত্র বসে ধর্মভিত্তিক নিয়ম নীতিপূর্ণ আদর্শ জীবন গড়ে তুলার জন্য আচার্য কর্তৃক প্রতিনির্দেশিত হওয়া। এইভাবে মাসিক ও বাৎসরিক জেলা ও বিভাগীয় সম্মেলন, ভক্তসম্মিলনী প্রবর্তন, মাসিক আর্যদর্পন গ্রহণ, মুষ্টিভিক্ষা সংরক্ষণ, মূলতঃ জনহিতকর ধর্মজ্ঞানদান নীতিমূলক আত্মিক এই কর্মগুলি দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সমাজে– পরস্পরের মধ্যে ধারাবাহিক এক নিগূঢ় আত্মিক সামাজিক বন্ধন, আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা গঠন, এবং এর বৃদ্ধিকরণ।

২১। স্বামী নিগমানন্দ, **প্রেমিকগুরু**,কলিকাতা : আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, ১৪শ সংস্করণ, ১৪১১ বঙ্গাব্দ, পৃ., ২০৫

আজকের যুগে আমাদের সমাজ সংগঠন ও সমাজ সংস্কারের জন্য পরস্পর সংঘবদ্ধ হওয়াই হল এর একমাত্র সঠিক উপায়। স্বামী নিগমানন্দজীও এটাই চেয়েছেন। ব্যবহারিক জীবনের সাথে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ধর্মের আলোচনা মাধ্যমে একটি সুন্দর ও সুষ্ঠু সমাজ গঠন ব্যবস্থা– স্বামী নিগমানন্দজী মুখে না বলে– ঘরে-ঘরে গিয়ে ত্রিশ বৎসর ধরে এর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

"জদদ্ধিতায় বহুজনহিতায় চ" যে মহান আশ্রমের ব্যবস্থা, তার জন্য সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসি হতে হবে না বরং সংসারে থেকেই স্বামী নিগমানন্দজীর আদর্শ পথে ত্যাগ-প্রতিষ্ঠিত ভোগপূর্ণ সামাজিক জীবন-গঠন মাধ্যমেই একটি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলা সম্ভব। আদর্শগার্হস্থ্ জীবন গঠনই হল বর্তমান সমাজের জন্য প্রকৃত সমাজ গঠন ব্যবস্থা।

স্বামী নিগমানন্দজী প্রবর্তিত বিজ্ঞাপন বিহীন শতাধিক বৎসর অতিক্রান্ত সনাতন ধর্মের মুখপত্র নামে মাসিক আর্যদর্পন পত্রিকা যা আজও ঘরে-ঘরে সমাজ সংগঠন লক্ষ্যে পর্যালোচিত হয়ে আসছে। এছাড়াও তাঁর প্রবর্তিত প্রতিবৎসর বিভিন্ন স্থানে দেশ-বিদেশ ব্যাপি নির্দিষ্ট একটি আলোচিত স্থানে সার্বভৌম ভক্ত সম্মিলনী মাধ্যমে মিলিত হয়ে পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময়, সম্মিলনীর উদ্দেশ্য– আদর্শ গার্হস্থ্ জীবন গঠন, সংঘশক্তি প্রতিষ্ঠা, ও জীব সেবা এই ধর্ম-সংঘরূপ কর্মগুলি থেকেই আমরা জীবনভর জানতে ও শিখতে পারছি কিরূপে একটি আদর্শ সমাজ সংগঠন করা সম্ভব। আমাদের নৈতিকতা ও চরিত্র গঠন করা উচিত। সংক্ষিপ্তভাবে বর্তমান সময়ে শ্রীনিগমানন্দের সমাজ সংস্কার চিন্তার গ্রহণযোগ্যতা আমরা সারস্বত সমাজ ত্রিকালদর্শী এই সিদ্ধসাধকের আদর্শিত উক্ত মহান চিন্তা চেতনাকেই সঠিক সিদ্ধান্ত বলে মনে করি। এবং তাঁর আদর্শ ও চিন্তা চেতনাকে আপন জীবনে বাস্তবায়ন করে অদ্যাবধি ঠকিনি বরং আজও উপকৃত হচ্ছি প্রতিক্ষণ প্রতিমুহূর্তে।

৬.৩.৩: বর্তমান সময়ে নিগমানন্দের ধর্মচিন্তার গ্রহণযোগ্যতা

১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীনিগমানন্দজীর জন্ম– আমাদের এই প্রমাণ করে যে, উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিশ্বে বিজ্ঞানের প্রবল হাওয়া সমগ্র পৃথিবীকে প্রবাহিত করে তুলেছে; আর নিগমানন্দজীও বড় হয়ে উঠছেন সেই হাওয়ার তালে, ঠিক এমনই এক জন্ম সন্ধিক্ষণে শ্রীনিগমানন্দের আবির্ভাব কাল– এটাই প্রমাণ করে যে, ধর্ম নিয়ে একদিকে পৃথিবীর মানুষের কিছু অন্ধকুসংস্কার এবং অন্যদিকে কিছু আধুনিকতার প্রাদুর্ভাব যুগপৎ মিলে নিগমানন্দের শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ও ধর্মময় জীবন তাঁর প্রাণকে এমনই এক অভাবনীয় উজ্জ্বল আলোর পথ দেখিয়েছিল যে, তিনি না পেরেছেন ধর্মকে উপেক্ষা করতে, না পেরেছেন বিজ্ঞানের চিন্তা চেতনাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে। হয়ত ঠিক একারণেই আমরা তাঁকে পরবর্তিতে পেয়েছি– অসম্প্রদায়িকভাবে সর্বধর্মসমন্বয়ক রূপে এই পৃথিবীর বুকে শান্তির সমন্বয়ক প্রতিষ্ঠালাভকারী রূপে।

স্বামী নিগমানন্দজীর জীবন ও কর্ম আর দশজনের চেয়ে ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তাঁর জন্মের সাথে তাঁর কর্মের সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ হয়েছিল। সবাই জন্মের পর শিক্ষা এবং তার পরেই সংসারে অগ্রযাত্রা অতঃপর শুরু হয় কর্মময় জীবন প্রতিষ্ঠা। কিন্তু তাঁর জীবনে না হল পরিপূর্ণ শিক্ষা জীবন; না হল পরিপূর্ণ সংসার কর্ম জীবন। এই দুয়ের মাঝখানে হঠাৎ প্রবেশ করল এক আকস্মিক দুঃখময় দূরাশার দুর্ভাবনার জীবন। অকালে বিয়ে, অকালে ঝড়ে পড়া সতী সাধ্বী প্রিয়তমার জীবন; সংসারের একটু সুখ আসতে না আসতেই সবকিছুর চিরঅবসান। শুরু হল নতুন আর এক জীবন। তিনি ছিলেন একদিকে যেমন প্রগতিবাদীরূপে যুক্তিবিশ্লেষণকারী ও প্রতিবাদী, অন্য দিকে ছিলেন সত্যসন্ধানী, সত্যপ্রত্যাশী ও সত্যানুসারী। এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে তিনি যখন পথহারা দিশেহারা তখনেই তাঁর জীবনে অজান্তে প্রবেশ করে এক অপরিবর্তনীয় অমানানীয় অমিত এক অধরা শক্তি। যে শক্তি অসম্ভবকে সম্ভব করে এবং সম্ভবকে অসম্ভবে পরিণত করে দেখাতে পারে তাঁর অপরিণামীদর্শীতা। যাকে জোর করেও না যায় দূরে সরা, না যায় কাছে ধরে রাখা, এই অঘটন-ঘটন-পটিয়শী শক্তির তিনি হন সম্পূর্ণ অধীন। আমরা সবাই জানি জন্ম হলেই মৃত্যু নিশ্চিত কিন্তু কেউ মানিও না

বিশ্বাসও করি না যে, মরার পরেও অমৃত হয়ে থাকা যায়। নিগমানন্দের জীবনে এই অভাবনীয় অঘটনটিই ঘটেছিল অযাচিতভাবে অপ্রত্যাশীত উপায়ে। তাঁর ধর্মজীবনের বৈশিষ্ট্য এখানেই বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের এক্ষণে প্রশ্ন হল, বর্তমান সময়ে তাঁর ধর্মচিন্তার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু বা কি, তাই অবগত হওয়া। তাঁর ধর্মচিন্তার নৈতিকতাগুলি এখানে তুলে ধরলেই বুঝতে পারবো এর গ্রহণযোগ্যতা। আমরা অবগত আছি– 'ধমার্থকামমোক্ষঃ' অর্থাৎ– ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চারিটি প্রবৃত্তি মানব জীবনে অপরিহার্য ও অঙ্গাঙ্গী জড়িত। প্রাথমিক দৃষ্টিতে অর্থ ও কাম আমাদের জীবনের বড় লক্ষ্য ও প্রত্যাশা– যৌবনের প্রথমার্ধ্বে অর্থ ও কামনা-বাসনা আমাদের মন-প্রাণকে স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট করলেও যখন এ'দুটি প্রত্যাশা কালের প্রভাবে আমাদেরকে বার বার আঘাতের পর আঘাত দিয়ে বুঝিয়ে দেয় শান্তি এখানে নেই, শান্তি অন্য কোনখানে। তখন বিবেক আমাদের বাধ্য করে উপলব্ধি করায়– তোমার জীবনের প্রথম পর্ব নীতি-ধর্মকে ধারণ করেই যে তোমার পথ চলা উচিত ছিল তা তুমি কর নি। ধর্মের সাথে অর্থ উপার্জন এবং ধর্মের সাথে মানবজীবন পরিচালনার জন্য কামনা-বাসনা করাই যে মানব জীবনের উন্নত আদর্শ গঠিত জীবন, তা তুমি প্রথম থেকেই অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করেছ বলেই আজ জীবনের শেষ মুহূর্তে উপস্থিত হয়ে– অশান্তি ও আপছোসে ভূগছো। আত্যন্তিক দুঃখভোগ থেকে মুক্তি মোক্ষ লাভ করাই যে মানব জীবনের জন্ম , কর্ম ও ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য তা থেকেও তুমি দূরে থেকেছ। বর্তমান সময়ে আমরা আজ আমাদের এই দুর্দমনীয় আকাঙ্খা ও অভাবের তাড়নাতেই প্রতিনিয়ত সংসার জীবনে পর্যুদস্ত ও বিপর্যস্ত হচ্ছি। কোনভাবেই নিস্তার লাভ করতে পারছি না।

এই লক্ষ্যেই স্বামী নিগমানন্দজী ব্যক্ত করলেন, "আমি চাই ধর্মের মধ্য দিয়ে এই অধঃপতিত জাতিকে উঠিয়ে তুলতে। এদের মধ্যে সেই ঋষিযুগের মহান আদর্শগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে। সে যুগের ঋষিদের মত মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ দান,– আত্মার স্বরূপ জ্ঞান দান করতে।"[২২]

২২। পূর্বোক্ত, স্বামী সত্যানন্দজী, **'আমি কি চাই'**, পৃ., ৩১

কারণ হল– আমি যদি আমার স্বরূপ আমাকেই না জানি, না চিনি, না বুঝি এবং সেই চেষ্টায় ব্রতী না থাকি, তবে এই দেশ-জাতি-জীব ও মানুষকে আমি আপনার করে চিনবো এবং জানবই বা কি করে ? বর্তমান সময়ে নিগমানন্দের ধর্মচিন্তার আদর্শ দ্বারা আমার জীবনকে বদলাবোই কি করে ? আমার স্বরূপ ও অপরের স্বরূপ যে– সৎ-চিৎ ও আনন্দে ভরা তা বুঝবো কি করে ? নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ ও অপরের সুখ আনন্দ পাব এবং দিব কিভাবে ? ভারতধর্মের আদর্শই হল অগ্রে নিজেকে চিনে অপরকে চেনা, অতঃপর নিখিল ব্রহ্মান্ডের প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রহ্মান্ডকে জানা ও চেনা ।

এই চেতনাই একদিন আমাকে জানিয়ে দিবে– জীব জগত ও মানুষের প্রতি এযুগে আমার কর্তব্য কর্ম কি ? তাদের সাথে আমার সম্পর্ক কি ? তারাই বা কে, আমিই বা কি ? কেন আমরা তাঁর (আপন বিবেকের) নির্দেশিত কর্তব্যগুলি প্রতিপালন করবো, ধর্মের সাথে এই কর্তব্য কর্মগুলির কি এমন সম্পর্ক ? তাঁর বাণী এর প্রমাণ ।

> মনে রেখ ! নরই সাক্ষাত নারায়ণ, নরের সেবা ব্যতীত নারায়ণের কৃপা হয় না । তাই গার্হস্থ্য ধর্মের এত মাহাত্ম্য । আপন প্রাণকে বিশ্ব প্রাণের সহিত মিলাইতে হইবে । স্ত্রী-পুত্রের দ্বারা প্রথম প্রাণে সে বীজ উপ্ত হয়, পরে বিশ্বের কীট-পতঙ্গে সমপ্রাণতা আইসে । তখন ভগবান, যাচিয়া দয়া করিয়া থাকেন । নতুবা মুখের প্রার্থনায় তাঁহার সিংহাসন টলে না । আশীর্বাদ করি– তোমাদের প্রাণের দ্বার খুলিয়া যাউক, আত্মসত্তা বিশ্বসত্তায় পরিণত হউক, তোমরা বিশ্বের মঙ্গলে– বিশ্বের সেবায় আত্মহারা পাগলপারা হইয়া যাও ।[২৩]

বর্তমান সময়ে ধর্মের নামে যে ভাবে হিংসা, বিদ্বেষ, নাশকতা, চুরি, মিথ্যা, অপহরণ, এবং কি আপন স্বার্থের জন্য যদি কারও জীবনকে ছিনিয়ে নিতেও হয় তবুও কোন মানবতা রূপে– মানুষের জন্যই যে মানুষ, মানুষকে ভালবাসার জন্যই যে মানুষকে ভাললাগা, সেই বোধের আজ আর কোন মূল্য নেই । নিগমানন্দজীর মতে মানবসেবারূপ ভালবাসার ধর্মকে ধরেই মানুষ পারে মানুষকে বর্তমান এই ধ্বংসের হাত হতে সমাজকে বাঁচাতে । "আত্মমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" জগতের হিত ও নিজের মুক্তিই হল বর্তমান যুগধর্ম । নিগমানন্দের এরূপ ধর্মচিন্তার গ্রহণযোগ্যতা নিম্নে তাঁর মুখনিসৃতঃ বাণীই আমাদের সেই আশ্বাস দান করে, যথা–

২৩ । ঐ, পৃ., ৩১

Dhaka University Institutional Repository

"আমি চাই তোমরা মানুষ হও"... । তোমরা তোমাদের মধ্যের ক্ষুদ্রত্ব ,নীচত্ব , হিংসা, দ্বেষ এ সব ভুলে গিয়ে একপ্রাণ হও । মিলে মিশে পরস্পর জীবন-যাপন কর ।" "আমি চাই তোমরা আদর্শ গৃহস্থ হও, আমি চাই তোমরা সংঘবদ্ধ হও, আমি চাই তোমাদের মাঝে পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান চলুক, এমনি করে মর্ত্যেই তোমরা অমৃত রসাস্বাদনের অধিকারী হও ।"[২৪]

পরিশেষে আমি আমার জ্ঞানমতে যা আমি বিশ্বাস করি এবং মান্য করি– সেই লক্ষ্যকে ধারণ করে ও ধরে এই বুঝাতে চাই যে, পৃথিবীর বর্তমান যে পরিস্থিতি; যে কালের পৃথিবীকে আজ আমরা সর্বোত্তম বলে চিহ্নিত করেছি, মানুষের শান্তি-সুখের, আরাম-আয়াস ও ভোগ-বিলাসের যে পরিপূর্ণতা আনতে সক্ষম হয়েছি, তাতে সুখের চাইতে মনে হয় বরং দুঃখই ভোগ করছি বেশি । তাই আজ সেই হাজার হাজার বৎসরের বেদ উপনিষদের পুরাতন ভগবৎ বাণী মনকে দোলা দেয়– "নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্" । আমরা এই পৃথিবীতে আজ যা কিছু ভোগ করছি তা অতি তুচ্ছ ও অল্প এবং ক্ষণিক । এবং সবচেয়ে যা কিছু বেশি বা বিরাট, পরিপূর্ণ ও শাশ্বত এবং অবিনশ্বর তা– তিনি। অতএব ভোগে সুখ নেই, ত্যাগেই প্রকৃত সুখ। 'ত্যাগেনৈকত্বঅমৃতত্ত্বমানসুঃ', একমাত্র ত্যাগ অবলম্বনেই অমৃতলাভ সম্ভব । স্বামী নিগমানন্দজীর প্রাক্ পরিচিন্ত নীয় ধর্মাদর্শই আমার মনে হয়, এ-যুগের জন্য সঠিক সিদ্ধান্তপূর্ণ একটি গ্রহণযোগ্য দিক্ । আমি পৃথিবীর মহাশান্তির নিমিত্ত আজ আমার গবেষণাপর্বে এই বিষয়বস্তুটিকেই ঠিক এ-কারণেই গবেষণার বিষয় বস্তু বলে গ্রহণ করেছি ।

---

২৪ । ঐ, পৃ., ৩৭

৬.৩.৪: উপসংহার

ঊনবিংশ শতাব্দীর এক যুগ সন্ধিক্ষনে বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও নিগমানন্দের আবির্ভাব ঘটেছিল। উপমহাদেশের ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিশেষ করে হিন্দু সমাজে তখন ছিল অযৌক্তিক অন্ধ অনুকরনের আধিক্য। বিকৃত ধর্মীয় অনুশাসন ও বিকারগ্রস্থ অস্বাভাবিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশে মানুষ তখন বহুলাংশে দিশেহারা। সেই অনিবার্য ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে, মহামানব বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও নিগমানন্দ মানুষকে সত্য পথের সন্ধান দেয়ার জন্য শিক্ষা, সমাজসংস্কার ও ধর্মীয় বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। সেই সব দিক নির্দেশনা তখনকার সমাজ, সামাজিক প্রেক্ষাপট, জগত ও জীবনকে যেমন ধ্বংশের মুখ থেকে রক্ষা করেছিল, আজকের সামাজিক প্রেক্ষাপট, জগত ও জীবনের ক্ষেত্রে সেই নির্দেশনাগুলো একই রকম ভাবে ক্রিয়াশীল। অর্থাৎ সে সবের গ্রহণযোগ্যতা যেমন তখন ছিল, ঠিক তেমনি এখনও আছে। ঠিক একারনেই আমি আমার এ গবেষণা অভিসন্দর্ভে বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও নিগনামনন্দের শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ও ধর্ম চিন্তা বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি।

বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও নিগমানন্দ সারা ভারতবর্ষ পরিব্রাজক বেশে ঘুরে যে অভিজ্ঞতা বেশি সঞ্চয় করেছেন তা হল সমাজের নির্যাতিত মানুষের চিত্র। অবহেলা, কুসংস্কার ও অত্যাচারে মানুষ কিভাবে ভারত বর্ষে নিপীড়িত ও নির্যাতিত হচ্ছে। সাধারণ নিম্ন বর্ণের মানুষের দু:খ, দুর্দশা, অশিক্ষা, অজ্ঞানতা কিভাবে তাদের তাড়া করছে, কিভাবে তারা ধর্মান্তরিত হচ্ছে। কিভাবে পৌরহিত্যের অত্যাচার সহ্য করছে, কিভাবে ধর্মের নামে পানাহার ও শৌচাদি বিষয়ে একরাশ কুসংস্কার ও দেশচার মানুষকে নিম্নগতি করছে ইত্যাদি অবস্থা গুলো তারা সারা ভারত বর্ষ ঘুরে দেখে যার পর নাই ব্যাথাতুর হলেন। এগুলো দূর করার জন্য তারা যুব শিক্ষা সংগঠনে তৎপর হলেন এবং বেদান্তের ছায়াতলে ভারত বাসীকে নিয়ে আসতে ব্রতী হলেন, কারণ তাঁরা মনে করতেন বেদান্তই পারে ভারত বর্ষকে শান্তির বাণী শোনাতে। এজন্যেই বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও নিগমানন্দ বেদান্তের আলোকেই তাদের শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ও ধর্মীয় মত ব্যাক্ত করেন। বেদান্তের মর্মবাণী ঈশ্বর এক, মানুষ এক, আত্মা এক, কোন ভেদা-ভেদ নেই। বর্তমান সময়ে মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ

করতে সফল হয়েছে, জলে, স্থলে ও আকাশে অবলীলায় চলাচল করতে শিখেছে। বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহের সাথেও যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু মানুষ হয়ে কিভাবে মানুষের সাথে এই পৃথিবীতে শান্তিতে বসবাস করা যায় এই আসল কথাটাই যেন মানুষ ভুলে গেছে, তাইতো আজ জগতে চোখ খুললেই দেখা যায় কত রকমের মারামারি, কাটা-কাটি, হানা-হানি, হিংসা ও বিদ্বেষ। গরীবদের প্রতি ধনীদের বিদ্বেষ, অনুরূপভাবে ধনীদের প্রতি গরীবদের। বড় রাষ্ট্রের প্রতি ছোট রাষ্ট্রের ঘৃণা ও বিদ্বেষ, আবার ছোট রাষ্ট্রকে বড় রাষ্ট্রের কুক্ষিগত করার চেষ্টা। সমরাস্ত্রে শক্তি সম্পন্ন রাষ্ট্র সমূহ অপেক্ষাকৃত কম সমরাস্ত্র শক্তি সম্পন্ন রাষ্ট্রকে ভয় ভীতি প্রদর্শনসহ গ্রাস করতে উদ্যত, অপর দিকে কম সমরাস্ত্র শক্তি সম্পন্ন রাষ্ট্র যদিও বাধ্য হচ্ছে অধিক শক্তি সম্পন্ন রাষ্ট্রের পদানত স্বীকার করতে তথাপি অব্যক্ত ভাবে হলেও অধিক শক্তি সম্পন্ন রাষ্ট্রের প্রতি রয়েছে তাদের তীব্র ঘৃণা। এক সম্প্রদায় ও ধর্মের মানুষের প্রতি অন্য সম্প্রদায় ও ধর্মের মানুষের রয়েছে তীব্র ঘৃণা। মানুষের প্রতি মানুষের এই ঘৃণা ও বিদ্বেষই মানুষকে মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আজকের পৃথিবীর চারদিকে চোখ ফেললে এই দৃশ্যই সচরাচর দেখা যায়। আজকের পৃথিবীর মানুষদের তাদের এই বেহাল অবস্থা থেকে মুক্তি দান করতে বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও নিগমানন্দ বেদান্তের আলোকে এক নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা, ধর্ম চিন্তা ও সমাজ সংস্কারের ভাবনা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেন, যার মর্মবাণী হলো, ঈশ্বর এক, মানুষ এক, ধর্ম এক, আত্মা এক, কোথাও কোন ভেদা-ভেদ নেই। বর্তমান বিশ্বের এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও নিগমানন্দের ঐক্যের দর্শন একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

ক. বাংলা

০১। কবি কালিদাস রায়, **উত্তররামচরিতম,** কলকাতাঃ আনন্দ প্রকাশনী, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৬৪

০২। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, **চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ**, কলিকাতাঃ রামকৃষ্ণ মিশন, ইষ্টিটিউড অফ কালচারঃ গোলপার্ক, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৫

০৩। নারায়ণ প্রসাদ, **শ্রী অরবিন্দ আশ্রম জীবন কথা**,কলিকাতাঃ শ্রী অরবিন্দ কর্মীসংঘ ট্রাষ্ট, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৫

০৪। স্বামী নিত্যানন্দ সরস্বতী, **নিগম বাণী**, হালিশহরঃ আসামবঙ্গীয় সারস্বত মঠ, ৫ম সংস্করণ, ১৩৯২

০৫। **রবীন্দ্র রচনাবলী**, কলিকাতাঃ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, পঞ্চদশ খন্ড, ৭ম সংস্করণ, ১৯৭৬

০৬। স্বামী সত্যব্রতানন্দ, **অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ,** কলিকাতাঃ রামকৃষ্ণ মিশন, ১ম সংস্করণ, ১৪০৪

০৭। স্বামী অমৃতত্ত্বানন্দ মহারাজ (সংকলক), **বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা**, দিনাজপুরঃ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম ও মিশন, ১ম সংস্করণ, ১৯৮০

০৮। __________________,**কর্মযোগ,** দিনাজপুরঃ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ও মিশন, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮

০৯। শ্রী প্রণব কুমার সিংহ (সংকলক), **বিবেকানন্দের পত্রাবলী**, দিনাজপুরঃ রামকৃষ্ণ আশ্রম ও মিশন, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৪

১০। নীরোদবরণ, **শ্রীঅরবিন্দায়ন,** কলিকাতাঃ শ্রী অরবিন্দ পাঠ মন্দির, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৪০৮

১১। পৃথ্বীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, **সমসাময়িকের চোখে শ্রীঅরবিন্দ**, কলিকাতাঃ শ্রী অরবিন্দ সোসাইটি, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৯

১২। শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার, **ঋষি অরবিন্দের যোগ-জীবন ও সাধনা**, কলিকাতাঃ শ্রী অরবিন্দ সোসাইটি, শ্রীঅরবিন্দ ভবন, ৫ম পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

১৩। ঋষি অনির্বাণ, **শ্রী অরবিন্দের যোগে দেহের অমরত্ব**, কলিকাতাঃ শ্রী অরবিন্দ পাঠমন্দির, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭০

১৪। নন্দ দুলাল চক্রবর্ত্তী, **পরমহংস শ্রীশ্রী নিগমানন্দদেব,** দিনাজপুরঃ শ্রীনিগমানন্দ সারস্বত সেবাশ্রম, ১ম সংস্করণ, ১৪১৪

১৫। সত্যচৈতন্য ও শক্তি চৈতন্য ব্রহ্মচারী, **শ্রীনিগমানন্দের জীবনী ও বাণী**, কলিকাতাঃ আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, ৯ম সংস্করণ, ১৪০২

১৬। ____________________, **শ্রীনিগমানন্দ উপদেশামৃত**, যোরহাটঃ আসামবঙ্গীয় সারস্বত মঠ, চতুর্থ সংস্করণ, ভক্তসম্মিলনি, ১৪১৫

১৭। লীলা নারায়ণী দেবী, **বাংলার সাধনা ও শ্রীনিগমানন্দ,** কলিকাতাঃ জনা প্রেস ৯ম সংস্করণ, ১৩৯৫

১৮। স্বামী সত্যানন্দ, **অভয় বাণী,** কলিকাতাঃ আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, ৭ম সংস্করণ, ১৪১২

১৯। স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, **স্বামীজির বাণী ও রচনা**, কলিকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়, ৮ম খন্ড, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৮৪

২০। শ্রীমা, **'শিক্ষা',** পন্ডিচেরীঃ শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৯১, পুর্নমুদ্রণ-২০০৬

২১। স্বামী অখন্ডানন্দ সরস্বতী (সংকলক), **শ্রীশ্রী নিগমানন্দ গ্রন্থসম্ভার,** কুতুবপুর, মেহেরপুরঃ শ্রীশ্রীগুরুধাম প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২২

২২। সুশীল চন্দ্র বর্মন, **শ্রীঅরবিন্দ অনুধ্যান**, উঃ ২৪ পরগণাঃ শ্রী অরবিন্দ কর্মীসংঘ ট্রাষ্ট, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৭

২৩। শ্রীঅরবিন্দ, **নিজের কথা,** পন্ডিচেরীঃ শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, প্রথম সংস্করণ, পূর্নমুদ্রণ, ২০০৪

২৪। মাধবী মিত্র, **শ্রী অরবিন্দ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন**, কলকাতাঃ শ্রী অরবিন্দ সমিতি, ১ম সংস্করণ

২৫। শ্রীতারক হালদার, সাহিত্যরত্ন, **মহাপুরুষ নাটক,** কলিকাতা, হালিশহরঃ আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৫

Dhaka University Institutional Repository

২৬। স্বামী অমৃতত্ত্বানন্দ, (অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতা), **শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা**, দিনাজপুরঃ রামকৃষ্ণ আশ্রম ও মিশন, প্রথম সংস্করণ, ১লা মার্চ, ২০০৬

২৭। স্বামী নিগমানন্দ, **জ্ঞানীগুরু,** মেহেরপুরঃ গুরুধাম প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ১৩৬০

২৮। লীলা নারায়ণী দেবী, **নীলাচলে ঠাকুর নিগমানন্দ,** কলিকাতাঃ আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৯৭

২৯। কানাইলাল রায়, **ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ প্রসঙ্গ,** ঢাকাঃ বাংলাবাজার, আনন্দ পাবলিসার্স, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯

৩০। স্বামী বিবেকানন্দ, **স্বামীজির বাণী ও রচনা**, কলিকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪র্থ সংস্করণ ১৩৮৩

৩১। দূর্গা দাস বসু, **হিন্দু ধর্মের সারতত্ত্ব,** ঢাকাঃ হিমু প্রকাশনী, প্রথম সংস্করন, ২০১৪।

খ. ইংরেজি

১। Apurbananda Maharaj, **The Complete Works Swami Vivekananda**, Calcutta: Advaita Ashrama, vol. vii, 6th edition, 1964

২। A. B. Purani, **The Life of Sri Aurobindo**, Pondicherry: Sri Aurobindo Ashrama, 1st edition, 1964

৩। Vabaniprasad, **Sri Aurobindo**, Pondicherry: Aurobindo Ashrama, 3rd edition, 1972

৪। Swami Gombhirananda, **The Complete Works of Swami Vivekananda**, Calcutta: vol. iv Advaita Ashrama, 8th edition, 1962

Dhaka University Institutional Repository

৫। Bipin Pal, **The Complete Works of Swami Vivekananda,** Calcutta: Udbadhan Karjaloya, vol. iv, 5th edition, 1964

৬। Swami Nirvedananda, **Swami Vivekananda, India and Her Problems**, Calcutta: Advaita Ashrama, 2nd edition, 1970

৭। K C Lahiri, **The Complete Works of Swami Vivekananda**, Calcutta: Udbadhan Karjaloya, vol. v, 1964

৮। Sister Nivedita, **The Master as I Saw Him,** Calcutta: Udbadhan Office, 1st edition, 1977

৯। ______________ ,**Notes of Some Wondering with Swami Vivekananda,** Calcutta: Udbanhon Ofice, 5th edition, 1967

১০। Sister Kristin, **Concerns of Swami Vivekananda His Eastern and Western Admirers,** Calcutta: Advaita Ashrama, 5th edetion, 1961

পত্রিকা / স্মরণিকা

১। **আর্যদর্পন, শতবর্ষ স্মরণিকা**, আর্যদর্পন শতাব্দীজয়ন্তী উদ্‌যাপন কমিটি, পক্ষে মহন্ত স্বামী জ্ঞানানন্দ সরস্বতী, হালিসহর, কলিকাতাঃ আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৫

২। স্বামী জ্ঞানানন্দ সরস্বতী, **শতবার্ষিকী আর্যদর্পন স্মরণিকা**, হালিশহর, কলিকাতাঃ আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, প্রথম প্রকাশ, ১৪ই জানুয়ারী, ২০০৮